রূপনারানের কূলে

দ্বিতীয় খণ্ড

যৌবনের রাজটীকা

গোপাল হালদার

৯ এ্যান্টনী বাগান লেন
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

প্রকাশক এইচ্. এল. সাহা
পুথিপত্র। ৯ এ্যান্টনি বাগান লেন। কলিকাতা-৭০০

প্রচ্ছদ চন্দ্রকুমার দে

মুদ্রক বি. রায়
রায় প্রিন্টার্স। ৯ এ্যান্টনি বাগান লেন। কলিকাতা-৭০০ ০০৯

RUP-NARANER KULE
(Reminiscence : Youth)
By Gopal Haldar
Rupees Twentytwo only

শ্রীরবীন্দ্রনাথ বসু

প্রীতিভাজনেষু

নিবেদন

প্রায় সাত বৎসর যে বই-এর প্রকাশ অপেক্ষিত ছিল যখন সত্যই তা প্রকাশিত হচ্ছে তখন অনেক সুহৃদের মতো আমার অশেষ শুভার্থী অধ্যাপক আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের হাতে তা আমি তুলে দিতে পারলাম না, গভীর মর্মবেদনা ও পরিতাপের সঙ্গে এই কথাটি প্রথম মনে পড়ছে। 'রূপনারানের কূলে' প্রথম ভাগ ('কৈশোরক') তাঁর নিকট যত সমাদর লাভ করেছিল আমার অন্য কোনো লেখাও তা পায় নি। দিনের পর দিন তিনি আমাকে পরবর্তী অংশের জন্য তাগিদ দিতেন, সমাপ্ত করতে দেরী থাকলে স্বয়ং-সম্পূর্ণ দ্বিতীয় ভাগের জন্য পরামর্শ দিতেন। পূর্বেই লেখা আরম্ভ করলেও বারে বারে তাতে ছেদ পড়েছে, তা তাঁকে দুঃখ দিয়েছে ; মুদ্রণ আরম্ভ করলেও তার শেষ তিনি দেখে গেলেন না, এ দুঃখ আমার ও আমার প্রকাশক বন্ধুদের সমান। আমার অমার্জনীয় কালক্ষয়ের কথা তাই গভীর অনুতাপের সঙ্গেই মনে না করে পারি না।

সেরূপ অপরাধে আমি অপরাধী আমার অনেক সুহৃদের নিকট যাঁরা তখন ছিলেন আজ নেই, যাঁরা এ লেখা না দেখাতে আমারও দুঃখের শেষ নেই।

লিখতে লিখতে বুঝেছিলাম আমার অভ্যাস ও আমার শিথিলতার জন্য 'রূপনারানের কূলে' যথারীতি সমাপ্ত করা অসাধ্য হবে। স্মৃতি-প্রবাহ দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে ওঠে, লেখাও বার বার বন্ধ হয়ে থাকে—আমার আয়ুতে তার সম্পূর্ণতা দান অসম্ভব। ইচ্ছা ছিল তাই—অনেকটা সুনীতিবাবুর পরামর্শ মতো—ক্রমবাহিক ধারায় চিহ্নিত না করে আবহমানকে পর্বানুযায়ী স্বসম্পূর্ণ রূপে চিহ্নিত করা ; 'রূপনারানের কূলে'র প্রথম পর্ব যেমন 'কৈশোরক' দ্বিতীয় পর্ব 'যৌবনের রাজটীকা' বলে নামাঙ্কিত হোক। কতকাংশে সে চেষ্টা করেছি। কারণ যত চেষ্টাই করি, যত সংযত করি কলমকে যা অর্থপূর্ণ বলে অনুভব করেছি তার অনেক কিছুই আর লেখা হয়ে উঠবে না। সম্পূর্ণতার প্রতিশ্রুতি যদি দিয়ে থাকি তবে পাঠক বন্ধুদের নিকট এবার তা থেকে নিষ্কৃতি চাই।

কাল কারুর দেখার পরোয়া করে না—ঘটনা প্রবাহও না, রূপ প্রবাহও না। দর্শক গৌণ, কূলেই থাকুন বা অকূলেই ভাসুন ; দর্শকের দৃষ্টির স বহমান ঘটনার প্রবাহে যে রূপের ধারা প্রকাশমান, তাই প্রধান বস্তু। কি

সেই রূপও বিশিষ্ট ব্যক্তির বিশিষ্ট দৃষ্টিক্ষেত্র থেকে দেখা ও বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা অনুলিপ্ত হতে বাধ্য। বিশেষ করে উত্তম পুরুষের স্মৃতি-মন্থনে সেই ব্যক্তিকে একেবারে বাতিল করা সম্ভবপর নয়। তবে ব্যক্তির যা ব্যক্তিগত তা তাতে প্রক্ষেপ; কিন্তু যা ব্যক্তিত্বের মধ্যে জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে সাঙ্গীকৃত, তা প্রকাশের নিয়মে স্বীকার্য। এই নীতি অনুসরণ করতে চাইলেও সত্যই তা অনুসরণ করতে পেরেছি কিনা জানি না, পাঠকই তার বিচারক।

আরেকটি কথা;—বহু মানুষের মুখচ্ছবি আমার চোখে ভাসছে, বহু ঘটনারও। কিন্তু নানাকারণে যে সব মুখের এখানে স্থান করে উঠতে পারি নি; কিম্বা ঘটনার যথার্থ পরিপ্রেক্ষিতে যাদের উপস্থাপিত করা হয় নি—নিজের অক্ষমতায়, মৃত বা জীবিত তাঁদের সকলকেই আমার প্রণাম জানাচ্ছি! রূপনারানের কূলে বুঝেছি—সকল রূপ সমতুল্য নয়, কিন্তু সকল রূপ সমান সত্য।

তথ্যে, তারিখে ও অন্যান্য বিষয়ে ভ্রম-প্রমাদ, অসাবধানতা এবং আরো অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি, বিশেষ করে মুদ্রণকালীন অনুপস্থিতি ও অমনোযোগিতার জন্য বহু অপরাধ ঘটেছে। সেজন্য লেখক যতটা দায়ী অন্য কেউ ততটা নয়। সে সবের জন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী।

পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতিতে দু-একজন মাঝে মাঝে সাহায্য করেছেন, তাঁদের নিকট আমি কৃতজ্ঞ। আমারই দোষে পাণ্ডুলিপি কত ত্রুটিপূর্ণ ছিল তা জানলে বোঝা যেত মুদ্রণকর্মী ও প্রকাশকদের উপর কী অত্যাচার হয়েছে। সেই কর্মী ও বন্ধুদের আমি সবিনয়ে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। ইতি—

কলিকাতা,

বিনীত

গোপাল হালদার

সূচী

যৌবনের রাজটীকা

প্রথম পরিচ্ছেদ

যৌবনের যাত্রারম্ভ

ইস্কুল ছেড়ে কলেজে—নোয়াখালি থেকে এলাম কলকাতা—জানতাম না যে, তা কৈশোর থেকে যৌবন-যাত্রাও।

কলকাতা কিন্তু আমার কাছে তেমন আজব শহর ঠেকল না। তখন পর্যন্ত কলকাতা আবর্জনার শহর নয়, মিছিলের শহর নয়, মরতে-বসা শহরও নয়। কলকাতার তখনো রূপ ছিল, আর সে রূপ মনেও লেগেছিল। কিন্তু চোখে রঙ লাগে নি। তখনো না এখনো না। কলকাতারও মোহ আছে —তা কি আর আমার অজানা? কিন্তু সে বিস্ময়ের মোহ নয়। অপরিচয়ের রোমাণ্টিক রস বরং বোম্বাইতে পেয়েছি। সত্যই, বোম্বাই শুধু 'বোম্বেটে' ফিল্‌মের পীঠস্থান নয়। সে মুম্বই—মোহিনী। প্রথম দর্শনেও বোম্বাইর প্রেমে পড়া যায়—হয়তো বেশি পরিচয়ে সে প্রেম উবে যেতে পারে, কে জানে? কিন্তু দেখা হতেই কলকাতাকে সুন্দরী বলা তখনো দুঃসাধ্য ছিল। মোহিনী তো নয়ই। তার রূপ যা তা একটু-একটু করে আবিষ্কার করতে হয়। হয়তো ছাদে দাঁড়িয়ে আকাশে মেলানো বাড়ির সঙ্গে আকাশে ছড়ানো সূর্যালোকের খেলা দেখতে দেখতে, হয়তো আউটরাম ঘাটে বসে বসে, বা ইডেন গার্ডেনস্ ছাড়িয়ে আরও দক্ষিণে গিয়ে সূর্যাস্তের গঙ্গার ধারে দাঁড়িয়ে; —কিংবা 'সদর স্ট্রীটে'র মতো কোনোখানে,—বিশেষ মানুষের চক্ষে বিশেষ মুহূর্তে,—আর যা তা এখানে নাই-বা বললাম: প্রেসিডেন্সি জেলের গরাদের ফাঁকে দেখা ঝাউ-এর মাথায় পূর্ণিমার চাঁদ নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা কলকাতা, অথবা থানার লক্-আপের মধ্যে আবদ্ধ বসে শোনা—গর্জমান ট্রাফিকের আর্তনাদের অন্তরালে সেই শত দিনের শোনা ফেরিওয়ালার ক্লান্ত ডাকে—দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে ঝিমন্ত কলকাতা,—সেই কলকাতা, এমন কত কত দিনরাত্রির কলকাতা, কি কম সুন্দরী? আসলে কলকাতা সুন্দরী হয় পরিচয়ে—দিনের পর দিন তার রূপ যেন মনের মধ্যে আরও খুলতে থাকে। তখন ক্রমে কলকাতার আড্ডায় আসরে স্বচ্ছন্দ হয়ে ওঠে আলাপ আলোচনা। মনের মধ্যে জমে বসে কলকাতার আরেক রূপ —সে কলকাতা 'ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল বিউটি।' তাকে দেখলে চলে না, অনুভব করতে হয়। অনুভূতি জাগেও। তখন কলকাতা—আমার কলকাতা। তাই

প্রথম দর্শনে কলকাতাকে আমার আজব কিছু মনে হয় নি—এখনো হয় না। গ্রামের মানুষের চোখ নিয়ে দু-চোখ বিস্ফারিত করে শহর-দেখা আমার পক্ষে সেই প্রথম দিনও অসম্ভব ছিল। কোলাহলে চমকে উঠি নি। উৎকর্ণ হয়েছি।

অন্য কারণও ছিল। মফঃস্বল থেকে শহরে, স্কুল থেকে কলেজে—সত্যই দৃশ্যান্তর। সেই দৃশ্যান্তরের সঙ্গে সঙ্গে ছিল জীবনের পর্বান্তরও ঃ সচেতন যৌবন। নিজে নিজেই বুঝলাম—কলেজ তো আমার সেই ইস্কুল নয়। কলকাতাও নোয়াখালি নয়। আমার দুরন্তপনা, সেই ডাব-চুরি, সেই অশান্ত কৈশোরের দুষ্টোমি, প্যাকামি, তারুণ্যের স্বতঃউৎসারিত অদম্য উৎসাহ, দুর্দান্ত আচরণ—সব কিছুই সেখানে তাদের এক অশান্ত ছেলের দস্যিপনা। সস্নেহ শাসনে তা সেখানে সহজে মার্জনীয়। এখানে আমার বিচার হবে নিঃসম্পর্কিতের স্নেহহীন চক্ষে। এই বোধের ফল ফলল। যে-ছেলে জন্মেছিল চঞ্চল দুরন্ত, আলাপ-আচরণে অকুণ্ঠিত, চলা-ফেরায় স্বচ্ছন্দ,—এবার এক দিনে সে হয়ে পড়ল দেখা-সাক্ষাতে 'ভীতু', আলাপ-পরিচয়ে সঙ্কুচিত, বেমানানো রকমের shy বা মুখচোরা। অবশ্য পরিচিত বন্ধুগোষ্ঠী ফিরে পেলে আবার দ্বিগুণ উৎসাহে তার শোধ তোলে, মাতে গল্পে উৎসাহে, আড্ডায়-আলোচনায়। কিন্তু নতুনের দেউড়ীটা সহজে পার হতে পারে না। এ পরিবর্তনটা আসলে বয়সের গুণ—যখন কৈশোর-যৌবন দুহুঁ মিলি গেল, সেই তারুণ্যের ধর্ম। দৃশ্যান্তর হয়তো সে তুলনায় বাইরের কারণ। অবশ্য আরও কারণও থাকতে পারে—সেই 'তিন থেকে সাতে'র মধ্যেকার ব্যক্তিত্ব-নিয়ামক পরিস্থিতি, দেহ-মনে নিজের উপর আস্থা যাতে দৃঢ় হতে পারে নি। একান্নবর্তী বাড়ির বড়দের ছায়ায় একে ঢাকা, আবার রূপগুণেও চাকচিক্যহীন। আসলে হয়তো সব কয়টাই সেই সংকোচের কারণ। মোটের উপর কলকাতাতে এসে দেখা দিল একটা অস্বচ্ছন্দ সচেতনতা, অনুভূতির প্রচ্ছন্নতা। নিজেকে বাইরে থেকে গুণ্ঠিত করাই তার লক্ষণ। সে লক্ষণ একেবারে কাটে নি কখনো। তাতেই কি বাড়ে অনুভূতির জোর ও বিচারবুদ্ধির ঝোঁক।

তবু শুধু আমাকে নিয়েই আমি নই। দেশ ও কাল নিয়েই আমি। ১৯১৬ থেকে বিপ্লবী দলে ঢুকেছি, বিবেকানন্দ তাকে বোধন করেছেন, রবীন্দ্রনাথ শোধন করেছেন। তখন ১৯১৮ সালের মধ্যভাগ—প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হয় নি। রুশ বিপ্লব অবশ্য কয়েক মাস আগেই ঘটেছে। বুঝতে চাইলেও তার স্বরূপ তখনো বুঝতে পারছি না। রুশিয়ায় জারের পতনের সংবাদে আনন্দিত হলাম। ধনী-দরিদ্রে সাম্য স্থাপিত হচ্ছে,—আরও উৎফুল্ল হয়েছি তা পড়ে।

মধ্যএশিয়ার তুর্ক তাজিক প্রভৃতি জাতিদেরও তারা স্বাধীনতা দিচ্ছে—জেনে মনে-মনে বলশেভিকদের পক্ষপাতী হয়ে পড়লাম। পরাধীন দেশের এমন বন্ধুও থাকতে পারে, এ-যে স্বপ্নের অগোচর। দেখতে না দেখতে জার সাম্রাজ্যের মতো জার্মান সাম্রাজ্য ও অস্ট্রো-হ্যাঙ্গেরিয়ান সাম্রাজ্যও ভেঙে পড়ল। আরও খুশির কারণ। তারপরে ভার্সেঈতে গড়া চলল একদিকে 'লীগ অব নেশনস্' (রবীন্দ্রনাথ যাকে বললেন 'ক্লিক্ অব্ রবার্স') আর অন্য দিকে ফরাসী-ইংরেজে পৃথিবী গ্রাসের ষড়যন্ত্র। পশ্চিমের সমুদ্র-মন্থনে বিষ ও অমৃত দুই-ই উঠছিল। প্রাচ্যের ভাগ্যেও তা জুটছিল। তবে অমৃতের থেকে বিষের ভাগটাই বেশি। আমাদের দেশে যুদ্ধের সঙ্গেই এসেছিল সংবাদপত্র পড়ার নেশা, স্বদেশীর ব্যর্থ আয়োজন আর পুলিশী-পীড়ন। যুদ্ধ শেষ না হতেই এল 'যুদ্ধজ্বর' বা ইনফ্লুয়েঞ্জা। যুদ্ধশেষে পাঞ্জাবের অত্যাচার ও জালিয়ানাওয়ালা বাগ, ডায়ার ও ডায়ারের তাণ্ডবলীলা। দেখতে না দেখতে স্বরাজ সমস্ত ভারতের সাধনা হল। তার পিছনেই দেখা দিল হিন্দু-মুসলমানের অমীমাংসিত সমস্যা। দেশের যৌবনের সম্মুখে ইতিহাসের চ্যালেঞ্জ।

এই পরিপ্রেক্ষিতেই তো কিশোর আমি অন্তরে-বাইরে যৌবনের আমি হয়েছি। ইতিহাসে যে-কালান্তর আরম্ভ হয়েছিল, তা প্রতিদিনই দুর্বারতর হয়। দেশে স্বাধীনতার উন্মাদনা—সে যৌবন-জলতরঙ্গে আমাদের যৌবন উজান বইতে চায়। ঘাত-প্রতিঘাতে এক-একবার চঞ্চল হয়ে উঠতে হ'ত। আবার ফিরে আসতাম নিজের কোটরে, সেখানে বন্ধুগোষ্ঠীতে অসঙ্কোচে জমিয়ে বসতাম। সেখান থেকেই বা সাধ্য কি ভুলে থাকব সেই যুগ-আবর্তন? কালান্তরের পরীক্ষায় দেশের মধ্যে নতুন মানুষ বেরিয়ে আসে। কালের স্রোতে ভেসে আসে পৃথিবীর ও যৌবনের রঙীন স্বপ্ন;—কোথায় পাব লেখাপড়ায় স্বস্তি? যুগ-সংঘাতে অশান্ত স্পর্ধিত হয়ে উঠত মন; তবু নিজের মধ্যে ভীত সঙ্কুচিত, জিজ্ঞাসা তাই জাগ্রত হতে চেয়েছে বহুদিকে বহুরূপে, যৌবন দেখেছে বৃহৎ-এর স্বপ্ন।

স্কটিশ চার্চেস কলেজে ভরতি হলাম—বাবা ও দাদাও ছিলেন ও-কলেজের ছাত্র। তার থেকেও বেশি সে কলেজের হোস্টেল। ওগিলভী হোস্টেল তখনো নতুন। সেখানেই দাদা আগে থাকতেন (১৯১৫-১৬ সালে ?)। মাত্র বাহান্নটি ছাত্রের জন্য এই ছাত্রাবাস—ছাত্রদের ৪৮টি ঘর, প্রায় প্রত্যেকেরই এক-একটি স্বতন্ত্র ঘর। খেলাধূলা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সকল দিক দিয়েই চমৎকার ব্যবস্থা। তাই পরে যখন প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ভরতির মনোনয়ন-পত্র পেলাম তখন আর কলেজ বদলাতে পারলাম না। কারণ হোস্টেলও বদলাতে হত।

অবশ্য প্রেসিডেন্সি কলেজের, বিশেষতঃ হিন্দু হোস্টেলের, সে সময়কার অনেক ছাত্রের সঙ্গে পরিচয় ও সৌহার্দ্য ঘটেছিল। তাঁরা কেউ কেউ আমাকে বন্ধুরূপে গণ্য করতেন। পরে এম-এ ও ল ক্লাশে বাইরেকার আরও কারও কারও সঙ্গে পরিচয় হয়, সৌহার্দ্য গড়ে ওঠে। বন্ধুচক্র ক্রমেই বৃহত্তর হয়। তাই ভীতু হলেও 'কুণো' ছিলাম না।

স্বভবতই কলেজের সহপাঠী অপেক্ষাও হোস্টেলের বাসিন্দাদের সঙ্গেই আলাপ-পরিচয় প্রথমে হল। কিন্তু তা জমবার আগেই ১৯১৮-এর পূজার ছুটি এসে যায়। সেবার সেই ছুটি দীর্ঘতর হয় দেশব্যাপী ইনফ্লুয়েঞ্জায়। ১৯২১-এর সেন্সসে দেখা যায়—ইনফ্লুয়েঞ্জায় সে বছরে ভারতবর্ষে লাখ পঞ্চাশ লোক মারা গিয়েছে—চার বৎসরের যুদ্ধেও য়ুরোপে তার অর্ধেক লোক মরে নি। আমাদের দেশ তখন ইনফ্লুয়েঞ্জায় অনেক জ্ঞানী-গুণী মানুষকে হারায়। কলকাতার কলেজ খুলল তাই একেবারে বড়োদিনের পর ১৯১৯-এ। ততদিন আমরা ছিলাম বাড়ি বসে।

তখনো পাঞ্জাবের দুর্যোগ দেখা দেয় নি—মাস তিন-চার দেরী ছিল, কলেজের পাঠ ও কলকাতার পাঠ নেবার মত জুটেছিল ঔৎসুক্য ও 'সুযোগ'। দিনগুলি ভরে দিতেন নোয়াখালির বন্ধুরা, বিশেষ করে দাদা রঙ্গীন হালদার।

কলকাতার প্রথম পাঠ

দু-দিনও হয় নি কলকাতায় এসেছি। দ্বিতীয় দিন—রাত্রির পরে প্রথম দিন— সিনেট হলে কেন গিয়েছিলাম দাদার সঙ্গে মনে নেই। বোধহয় দেয়ালে টাঙানো পাশের তালিকায় নামটা স্বচক্ষে দেখতে। ছাপার হরফে পাশের তালিকায় নাম দেখা—সে কি কম কথা। তা ছাড়া, সিনেট হাউস দেখব না? যার সেই বিরাট অপরূপ স্তম্ভ ও গম্ভীর রূপের মহিমার কথা অত শুনেছি বাবার মুখে? ফুটপাত থেকে উপরে উঠে গেছে ধাপের পর ধাপ সিঁড়ি। প্রশস্ত বারান্দায় প্রসন্নকুমার ঠাকুর—রাস্তার ওপারে কলেজ স্কোয়ারে বিদ্যাসাগর-মূর্তি। সত্যিই, কী নতুন চেতনা অনুভব করেছি। ঠিক সেই মুহূর্তে ওপারের ফুটপাত দিয়ে শার্ট পরা, ক্যাম্বিসের জুতো-পায়ে বছর পঁচিশের এক যুবক যাচ্ছিলেন, সিনেট হাউসের বারান্দা থেকে দাদা দেখিয়ে দিয়ে বললেন, 'ওই সত্যেন বোস।' নাম অপরিচিত নয়—বিশ্ববিদ্যালয়ের তখন নতুন উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। পুরানো জ্যোতিষ্কদের নাম আমাদের প্রায়ই জানা ছিল—বাবার আলমারিতে ছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরানো এক খণ্ড ক্যালেন্ডার

—১৮৫৮ থেকে ১৯০০ বা ১৯০১ সাল অবধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের ফলাফলও সেই এক খণ্ডেই তখনো পাওয়া যেত। বঙ্কিমচন্দ্র থেকে আরম্ভ করে সেদিনের বিখ্যাত পুরুষদের পারীক্ষিক পরিচয় তাতেই জানা ছিল। তার পরেকার রেকর্ড-ভাঙা কৃতী ছাত্রদের কথা, এমনকি সমসাময়িক পি-এচ্-ডি-ডি-এস-সি, ছাত্র ও অধ্যাপকদের কথাও মুখস্থ হয়েছিল দাদার মুখের গল্পে। সেই প্রথম দেখলাম একজনকে—সত্যেন বোস। সত্যেন্দ্রনাথ বসু তখনি আমাদের কাছে লিজেণ্ড। ভাগ্যক্রমে কলকাতায় আমার প্রথম দেখা সেই 'দর্শনীয়' তিনি। এ সবের জন্যই তো কলকাতা আমার কাছে কলকাতা। অবশ্য অন্যদিকের বড়ো নামগুলিও ছিল জানা—শিব ভাদুড়ী, বিজয় ভাদুড়ী তখন খেলেন না—গোষ্ঠ পাল তখন উচ্চ চূড়ায়। সাহেব খেলোয়াড় নাইট্, বেনেটদেরও নাম জানতাম। আই-এফ-এ র শীল্ডের খেলায় হাতে ধরে আমাকে দাদার নিয়ে যেতে হয় নি —আমাদের হোস্টেলের ভূতপূর্ব ছাত্র ছিলেন উমাপতি কুমার, প্রফুল্ল সান্যাল অন্য কেউ কেউ। হোস্টেলের সিনিয়রদের নেতৃত্বে বড়ো বড়ো খেলাগুলিতে দল বেঁধে আমরা জুনিয়ররা যেতাম। দাদা জিজ্ঞাসা করতেন, 'গিয়েছিলি' ? যেন না যাওয়াই অন্যায়। তবে, সভা-সমিতির পথটা আমি নিজেই চিনে নিই—সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতি একদিকে, অন্যদিকে গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের মতো শিক্ষাগুরুরা। ওঁদের স্বচক্ষে না দেখলে, এবং স্বকর্ণে না শুনলে এ'দের কথা, কলকাতায় আসা কেন ? অবশ্য সকলের বড় আকর্ষণ রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তখন কলকাতায় ছিলেন না—আর এলেও তখন দুর্লভ-দর্শন। না হলে দাদাই সর্বাগ্রে সেজন্য উদ্যোগী হতেন, কিন্তু আমার সাহসে কুলোত কিনা জানি না। Who can be at ease at Zion ? অবশ্য দশজনার মতো প্রথম কলকাতায় এসে আমিও জাদুঘর, চিড়িয়াখানা না দেখেছিলাম তা নয়। তবে তাড়া ছিল না। চিড়িয়াখানার থেকে আমাকে বেশি আকর্ষণ করেছে জাদুঘর—তার প্রাচীন ভারতীয় ভাস্কর্য ও স্থাপত্য—ওটা ইতিহাসের আকর্ষণ।

পূজার পূর্বে বোধ হয় ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে ছাত্রদের নাটক অভিনয় হত। সেখানকার অভিনয়েই যে শিশির ভাদুড়ী, নরেশ মিত্র, রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি অভিনয়ে একটা নতুন ধারার সূচনা করেছেন, নোয়াখালি বসেও তা না জেনে উপায় ছিল না। কারণ, দাদা আবাল্য ছিলেন থিয়েটারে আসক্ত, অভিনয়ে উৎসাহী। আর নোয়াখালিতে আমাদের দলের (সবুজসঙ্ঘ) নাম ছিল নাটকের জন্য। গিরিশবাবু, দানীবাবুরাও যেমন দাদার 'হিরো', তেমনি তিনি অনুরাগী ছিলেন ইন্‌স্টিটিউটের নতুন অভিনয়-ধারার। অবশ্য

কলকাতায় 'ফাল্গুনী'র অভিনয় তিনি যে না দেখে ছেড়েছেন, কিম্বা 'ডাকঘর'-এর যে প্রথম অভিনয় দেখেন নি—এমন মানুষ তো কখনি নন। তাঁর মুখে সে সব বর্ণনাও শুনতাম—সেই অন্ধ বাউল, সেই ডাকঘরের কালো দৃশ্যপট, আর তার শেষ দৃশ্যের শূন্য খাঁচা। দেখার থেকে না দেখা সেই সব আমার কল্পনায় আজও অপরূপ। শৈলেন চৌধুরী ছিলেন ইনস্টিটিউটের সেই ১৯১৮-২০-এর সময়কার অভিনেতাদের অন্যতম। নোয়াখালির মানুষ। দাদার অনুরাগী। দাদাকে তিনি সেবারের অভিনয় দেখবার জন্য কার্ড দিয়েছিলেন। আমাকে কার্ডটা দিয়ে দাদা বললেন, 'যা দেখে আয়। দেখ্‌বি!'—বলে বড় চোখ আরও বড় করে বিনা বাক্যে যা বোঝালেন তা বাক্যের অসাধ্য। কিন্তু আমার নিজের নাটকের নেশা বিশেষ ছিল না। ওটা সংক্রামক ব্যাধি—নোয়াখালিতে আমরাও তখনি তার কবলে পড়েছি। তবে আমাকে ততটা পায় নি। সাধারণ থিয়েটারে তখনো অভিনয় দেখি নি—আরও দেড় বছর পরে তা দেখেছি। সামান্য ভূমিকায়ও দেখেছিলাম শিশিরবাবুর অসামান্যতা, সেই সঙ্গে সহযোগীদেরও তিনি তাঁর শিক্ষায় একটা স্তরে তুলে আনেন—এটা সাধারণ রঙ্গালয়ে তখনকার দিনে একেবারেই অসম্ভব হত। তবু দাদাকে বললাম, 'যাই বলুন, সিনেমায় অভিনয় দেখে কিন্তু বাঙালি থিয়েটারের অভিনয় দেখতে মন ওঠে না'—তখনও সবই বিলিতি ছবি—'সিনেমায় দেখি ওরা সবাই নিখুঁত অভিনেতা।' দাদা বললেন, 'সে ঠিক, কিন্তু আমরা নাটকে অভিনয়ে কোন স্তরের তা তো বুঝিস!' সিনেমার পথটা অচিরেই চিনিয়ে দিয়ে নিয়ে গিয়েছিল উপেন সেন,—কলকাতায় সাধারণ বাংলা থিয়েটার দেখতে দেরি ছিল। ছবি যা কিছু দেখেছি তাই ভাল লেগেছে—তবে মনে আছে তিনটি নাম: চ্যার্লি চ্যাপলিন, মেরী পিকফোর্ড, ডগলাস ফেয়ারব্যাংক্‌স্‌। চ্যাপলিনের প্রতিভার আসল রহস্য অবশ্য তখনও বুঝি নি—শুধু হেসেই খুন হয়েছি। নাটকের পথটা চিনবার মতো উৎসাহ দাদার কাছেই পেতাম। আর, গান, সাহিত্য? বোধহয় উৎসাহের বিশেষ দরকার ছিল না। হ্যারিসন রোডের কৃষ্ণদাস পালের মূর্তির কোণায় পত্র-পত্রিকার স্টল—যেখান থেকে ব্যাগ-বিক্রেতারা বই-এর স্টলগুলিকে বেদখল করে অনেক পরে,—যে-স্টল থেকে সদ্য প্রকাশিত 'সবুজপত্র' কিনে প্রথমেই গেলাম ৫নং মীরজাফর লেনের (কলেজ রো) মেসে। পরদিনই দাদার পরীক্ষা। তখনো তিনি চা খান নি। চা খেতে তিনি আমাকে নিয়ে বেরুবেন পেলেটিতে বা পেস্তোলিজ্জিতে (পরে যেখানে দেখা দেয় 'ফিরপো')। তাঁর পক্ষে বাইরে চা খেতে হলে ওসব জায়গাতেই যেতে হয়—কারণ, ওসব রেস্টুরেণ্ট পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, আর ওখানেই চা একমাত্র

পানের যোগ্য। কিন্তু সেজন্য প্রস্তুত হতে দাদার অন্তত একঘণ্টা লাগবে—হাত ধোবেন, মুখ ধোবেন, স্নান করবেন, পোশাক-পরিচ্ছদ দোরস্ত করে নেবেন, তবে তো। ততক্ষণে আমি এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেললাম রবীন্দ্রনাথের লেখা (পয়লা নম্বর)। তিনি বললেন, 'রেখে যা, রাত্রে পড়তে হবে।' বলেন কি! এম-এ পরীক্ষার খড়্গটা যে একেবারে মাথার ওপর!—তাতেও দৃষ্টি নেই!

সে পরীক্ষা হয়ে গেল। হঠাৎ এল একখানা পোস্টকার্ড। 'কাল চারটায় এসো। বিশ্ববিদ্যালয়ের 'রীডারশিপের' বক্তৃতা দিচ্ছেন বিজয়চন্দ্র মজুমদার, বাঙলা ভাষার ইতিহাস বক্তৃতার বিষয়।' বিজয়চন্দ্র মজুমদারের লেখা 'প্রবাসী'তে, পড়েছি, দুজনারই তা ভালো লাগত। পাঁচটার মিনিট দশেক আগেই সিনেট হাউসের পশ্চিমের হলে গিয়ে দু'জনায় বসলাম। পণ্ডিত লোকেরা একে একে আসছেন। অজাত-শ্মশ্রু বালকের দিকে কেউ যেন ঝুঁকিয়ে না দেখেন, মনে মনে এই প্রার্থনাই বিধাতার নিকটে করছি। কিন্তু যদি দেখেন সে বিপদ কাটাবার জন্য ভয়ে নতচক্ষু নতমুখ। দাদার সে দিকে কোনো দৃষ্টি নেই। যাঁরা আসছেন চাপা গলায় তাঁদের পরিচয় বলছিলেন আমাকে। হঠাৎ বললেন—'এই—এই সুনীতি চ্যাটুজ্জে।' চমকিত হলাম। নাম আগেই জানতাম—তিনিও এক লিজেণ্ড। কুতূহলী চোখ তুলে একবার দেখলাম, পরক্ষণেই নামিয়ে নিলাম। সুস্থ সবল দেহ, চশমার আড়ালে উজ্জ্বল চক্ষু, বুদ্ধি মার্জিত ললাট ও ওষ্ঠতট। তখনো জানতাম না—সেই আমার শিক্ষা গুরুর দর্শনলাভ। জানবার কথাও নয় তাঁর স্বচ্ছন্দ আলাপ-কৌতুকের আশ্চর্য ক্ষমতা। অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় বক্তৃতার নোট নেবার জন্য পকেটের কলম খুলছিলেন। কে বললে বক্তৃতা টাইপ করা, তিনি কপি পাবেন, মুদ্রিতও হবে। কলম বন্ধ করলেন। বিজয়চন্দ্রের সে বক্তৃতা 'হিস্টোরি অব্ বেঙ্গলি ল্যাঙ্গোয়েজ' নামে পরে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়। প্রারম্ভিক বক্তৃতা সেদিন। একরকম করে বুঝেছিলাম, তবে বুঝব বলে যাই নি, শুনতেই গিয়েছিলাম। বুঝি বা না বুঝি দাদার যা মনে হত মূল্যবান আমার সামনে তা খুলে দিতে উৎসাহ; আর শুধু আমার সামনে নয়, আমার বন্ধুদের সামনেও, যারা তাঁর সঙ্গী-সহচর তাদের সকলের সামনেই,—তাঁর এই স্বভাব: ছোটদের নিজের সমকক্ষ করে নেওয়া—ছোট না রাখা।

মূল্যবান কি শুধু নাটক ও সাহিত্য? সামনে তাঁর পরীক্ষা,—ঐ পেলেটির ও পেস্তোলিজ্জিতে চা কেক-এর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিতে তবু এক সপ্তাহের মধ্যেই নিয়ে গেলেন। তারপর, পটলডাঙার দীনু ময়রার খাপ্‌রার দোকানের রসগোল্লা ও ভীমনাগের সন্দেশের তুলনামূলক রসতত্ত্বের (কম্প্যারাটিব্

গ্যাস্ট্রোনোমির) অনুশীলনে আমাকে দীক্ষিত করতে ছাড়লেন না। তাঁর দৃঢ় ধারণা—রসনাতেই রসের আসল বাসা ; কলকাতার তাও একটা পাঠ।

এমন মানুষ পরীক্ষায় খুব ভালো না করলেও যে মোটামুটি ভালো করলেন, তার কারণ বোধ হয় দুটি ঃ—একটা, তাঁর বহু ব্যাপারে কৌতূহল, আরেকটা তাঁর সুনিশ্চিত হবার দুর্বায়ু। প্রথমটা আমাদের বাড়িতে আশ্চর্য নয়, দ্বিতীয়টা কিন্তু অনেক পরিমাণে বাড়ির ব্যতিক্রম—পারফেকশ্যানের নেশা। অত্যন্ত নিপুণ ভাবে বারে বারে তিনি হাত ধোবেন, বারে বারে পা ধোবেন, পোশাক-পরিচ্ছদ সযত্নে পরেন, পরে বার বার দেখেন—নিখুঁত হওয়া চাই বেশভূষা। তেমনি পড়তে বসে প্রতি কথাটা উল্টিয়ে পাল্টিয়ে পড়েন, সঠিক বুঝে নেন, তার পূর্বেকার কথার সঙ্গে নতুন কথাটা মিলিয়ে বিচার করেন, অর্থ গ্রহণ করেন। কিছু ঝাপ্‌সা বা অনিশ্চিত থাকার উপায় নেই। তাই একবার পড়া হয়ে উঠলে তিনি সুনিশ্চিত হয়ে উঠবেন। লেখার বিষয়েও তাই। এক পৃষ্ঠা পড়তে লাগতে পারে কমপক্ষে আধ ঘণ্টা, একপৃষ্ঠা লিখতে কিন্তু একদিন। কিন্তু যা পড়া হয়ে গেল তা আর মন থেকে মুছে যাবে না কোনোদিন ; যা লেখা হবে তার ওপরে কলম ছোঁয়াতে হবে না দ্বিতীয় বার। উত্তর নিখুঁত। পরীক্ষায় ও প্র্যাকৃটিকাল কাজ যতটুকু করলেন অনবদ্য। বলা বাহুল্য, অত যাঁর 'নিখুঁত' হবার দুর্বায়ু তাঁর পক্ষে সময়ের অভাব অনিবার্য। কোথাও বেরুতে হলেও যেমন, পরীক্ষায় হলেও তেমন। এ-রোগটা কিন্তু সংক্রামক না, বরং তা বিপরীত প্রতিক্রিয়াই ঘটিয়েছে—অন্তত আমার পক্ষে। 'পারফেক্‌শ্যান' থাক, নিখুঁত নিপুণতা না খুঁজে আমি চাই চলনসই বিদ্যা। বুঝে না বুঝে পড়ে যাই রুদ্ধশ্বাসে, যা হোক লিখে যাই ঊর্ধ্বশ্বাসে —যা পড়ি তা ভুলে যাই পর মুহূর্তেই,, যা লিখি তাও মুছে যায় পরদিনই। আমার মনে থাকে না, পরেরও না। আমি ক্ষণিকবাদী, আর অপূর্ণতাবাদী,—সবই স্বল্পায়ু, আর সবই অসম্পূর্ণ—তাই বিধাতারও এই দশা। বিধাতা কিছুই নিখুঁত করে গড়তে পারছেন না—গড়ছেন আর ভাঙছেন ; না হলে সৃষ্টি পারফেক্ট হত—অর্থাৎ থেমে যেত। আমাদের দুজনার স্বক্ষেত্রে দাঁড়িয়েছে এই—দাদার কিছুই লেখা হয় না, আমার লেখা কিছুই হয় না। সাহিত্যে হোক, বিজ্ঞানে হোক, ওঁর যা জানা, তা সত্যই জানা, বোঝা, আপনার করে ফেলা। আর সে দিকে ওঁর কৌতূহল যেমন প্রচুর, রুচি তেমনি সুনিশ্চিত। আমার সেই ষোল বছরের গোড়ায় কলকাতার এই বহুমুখী ও বহির্মুখী জীবনধারার সামনে তখন এই কুতূহলী মানুষ আমাকে জীবনের বহুমুখী জিজ্ঞাসার দিকেও এগিয়ে দেন—অর্থাৎ শাদা কথায়, দাদা আমার মাথাটি খেলেন। তিনি অবশ্য পাশ করলেন, আর

বছর শেষ হতে না হতেই চলে গেলেন পাটনায় বি. এন. কলেজে (ডিসেম্বর ১৯১৮)। খাবার মতো মাথা সেখানেও হয়তো ছিল। আমাদেরও জুটত নিমন্ত্রণ। আমি রইলাম কলকাতায়—সেখানেও পাকামির পাথেয় জুটত সর্বত্র।

কলকাতায় তখন তাই উপেন সেন ছিল আমার প্রধান সঙ্গী। অথবা, আমিই ছিলাম উপেনের সঙ্গী। স্কুলের শেষ কয় বৎসর উপেন কলকাতায় পড়ে, কোর্ট অব ওয়ার্ডস্‌-এর সে ওয়ার্ড—বড় না হোক, কিছু জমিদারী তাদের ছিল—সরকার নিয়েছে নাবালকের সম্পত্তি রক্ষার ভার। ও-রকম আরো দু-চারটি ছেলের সঙ্গে তার কলকাতা বাস নির্ধারিত করেছিল সেই সরকারী অভিভাবকরা। ছুটিতে সে যেত দাদা-বৌদির কাছে নোয়াখালি। দু'জনায় একই বৎসরে পাশ করে একসঙ্গে কলকাতায় আসি পড়তে—সে পড়ে প্রেসিডেন্সীতে, আমি পড়ি স্কটিশে। সে আই-এস-সি পড়ে, থাকে হিন্দু হোস্টেলের ওয়ার্ড ফাইব-এ। সেই ওয়ার্ডের নানা কারণে নাম, তার অধিকাংশ ছাত্র বাসিন্দাই অবস্থাপন্ন, বড়-মানুষি চালে অভ্যস্ত ; অনেকেই দুরন্ত, ও হৈ-চৈতে ওস্তাদ। অবশ্য সেই সঙ্গে কেউ কেউ লেখাপড়ায় অগ্রগণ্য। তিন বৎসর পরে সেই দুর্দান্তদের শায়েস্তা করবার জন্য হিন্দু হোস্টেলের কর্তা ও প্রিন্সিপ্যাল ব্যারো দু'জনায় মিলে হোস্টেল থেকে যাঁদের বিতাড়িত করেন তাঁদের মধ্যে উপেন ছাড়াও ছিলেন আরও কয়-জনা। উপেনের চেনায় তাঁরাও আমার বন্ধু। সে কলেজে পড়লে সে হোস্টেলেই থাকতাম, ও হোস্টেলে থাকলে সে ভাগ্য আমারও হত—দেরি করতে হত না। দুরন্ত বলে আমার নাম উপেনের থেকে বরাবরই বেশি ছিল। ও ধাতটা হয়তো উপেনেরও পরিবারগত। তার দাদা নগেন সেন স্বদেশীতে জুটে পরিবারে সঙ্কট এনেছিলেন। উপেনের মধ্যে এসেছিল তার প্রতিক্রিয়া। স্বদেশীর ছায়াও সে একেবারে মাড়ায় না। এবং সে সমীহ করে ইংরেজকে, ইংরেজের মতো জীবনযাপনেই তার রুচি। কারণ, আমাদের এদেশীয়দের তুলনায় ইংরেজ শুধু প্রবল নয়, রূপে-গুণে, জ্ঞানে-প্রাণে, জীবনযাত্রায় অনেক অনেক উন্নত। ধনে-মানে, শক্তিতে-সামর্থ্যে, শিক্ষায়-কেতায় ইংরেজ আধুনিক পৃথিবীতে তখন সেরা জাত—এ কথা কি আমরাও কেউ না জানতাম ? তবু সে কথাটা আমাদের বিশেষ করে না জানালে নয়—উপেনের ও দাদার। দাদা বলতেন, ওরা জীবনটা উপভোগ করতে জানে। জীবন উপভোগের জন্য—'ত্যাগ' আর কৃচ্ছ্রসাধনের জন্য নয়। এদিকে দাদা আর উপেন একমত। তবে উপেনের এদিকে একটু বেশি যোগ্যতা ছিল। দেখতে সে মোটের উপর রূপবান। কোমলকান্ত নয়, তেজোব্যঞ্জক ছিল তার মুখশ্রী, পরিমিত ব্যায়ামে সে সর্বদা অবহিত, সুস্থদেহ এবং স্বাস্থ্যসচেতন। বাঙালির সস্তা স্যুট ও সস্তা বাবুগিরির প্রতি

দু'জনারই ছিল অভিজাত অবজ্ঞা। পোশাক-পরিচ্ছদে বাঙালী হলেও দু'জনারই বেশভূষা সতর্ক, পরিচ্ছন্ন, পরিপাটি। আচার-ব্যবহারে উপেন সহজ মর্যাদার অধিকারী, দাদা স্বচ্ছন্দ ও সামাজিক। আহারে-বিহারে জীবনযাত্রায় দু'জনেই একমত—"ওদের ('ওদের' বলতেই বুঝতে হবে ইংরেজদের),—মতো জীবন উপভোগ না করলে জীবনটা কেন ?" বিশেষ করে আহারে ও পরিচ্ছদে। ইংরেজী খানা খেলেই মনে হবে 'বেঁচে থাকি'। ইংরেজী হ্যাট-কোট পরলেই মনে হবে—গট্‌গট্ করে বুক ফুলিয়ে চলি। তা না, ওই থোড়-বড়ি-খাড়া খেয়ে চাদরে মুড়ি-সুড়ি দিয়ে চলো, আপনা থেকেই মনে হবে 'হরি হে, পার করো'। বলা বাহুল্য, ওরকম খানা ও সাহেবি জীবনমান আয়ত্ত না হলে ভদ্রলোকের বিয়ে করা চলে না। ও বিষয়েও দাদার সঙ্গে উপেন একমত, তবে পুরোপুরি নয়। উপেনের বক্তব্য আরও একটু বিশিষ্ট—"ভদ্রলোকের বিয়েই করা চলে না। জীবনমান আয়ত্ত হলে তো নিশ্চয়ই না।" 'ভদ্রলোক' কাকে বলে ? ভদ্রলোকের প্রথম চাই—জীবনমান। আর সে জীবনমানই যদি আয়ত্ত হয়, তা হলে স্ত্রী না হলেও চলে,—বরং না হলেই ভালো। একজন বাঙালি আই-সি-এস পাশ করে স্বভাবতই আত্মসন্তুষ্ট—তাঁর বন্ধুকে নাকি জানিয়েছিলেন—অবশ্য ইংরেজিতে—'এখন আমি চাই একটা ঘোড়া, একটা কুকুর ও একটি স্ত্রী।' তার প্রতিও উপেনের অবজ্ঞা—'হর্স ইজ এ নোবেল এনিম্যাল, ডগ্ গুড কম্পানি,—স্ত্রী ? ওর একটাও না।' স্বভাবতই এ-ধরনের ইয়ার্কিতে আমাদের মধ্যেও হাস্যপরিহাসের অন্ত থাকত না। যেমন, আমরা হলাম উপেনের মতের উল্টো পক্ষ—আমাদের বক্তব্য—"জীবনমান না হলে না হলো, কিন্তু জীবনযাত্রায় স্ত্রী না হলে নয়।" বলতাম, "আই-সি-এসদের ঘোড়া আর কুকুর হলেই হয়—ওয়াইফ্ ওদের কম্বাইন্‌ড হর্স এ্যাণ্ড ডগ। কিন্তু আমাদের কেরানীদের গৃহে গৃহিণী সচিব সখা, কম্বাইন্‌ড হ্যাণ্ড—সবার উপরে 'ওগো'।" বন্ধুগোষ্ঠী ভাগ হয়ে যায়—উপেন 'কনফারমড ব্যাচেলর', আমরা 'বর্‌ন্ ম্যারেড্‌ম্যান'। কনফারমড ব্যাচেলরদের মধ্যে উপেনের আবার আরও নিজস্ব বক্তব্য আছে। সেই সব এখানেই শেষ করি—'ভদ্রলোকের এদেশেও থাকা চলে না।' কোথায় তবে থাকা চলে ? "ওদের দেশে" অর্থাৎ বিলেতে। দাদার হয়তো তাতে অমত হত না—কিন্তু হাত ধোবার ও স্নানাদির বিষয়ে 'ওদের' ব্যবস্থা সম্বন্ধে তিনি সুনিশ্চিত নন। 'সে সব ব্যবস্থা করে দোব আপনার,' উপেন আশ্বাস দিত। উপেন,—এবার বোধহয় 'উপেনরা' বলা উচিত—উপেনরা 'ওদের দেশে' থাকবার লোক, আমরা নেটিব। নেটিবরা উপেনকে খোঁচা দিতাম—"যাও না—গিয়ে দ্যাখো না—কী আরাম তোমাদের

'ওদের দেশে' ।" উপেন বলত "দে টাকা আমাকে। দ্যাখ্, আমি থাকি কিনা ওদের দেশে।' বুঝলাম উপেনদের তাতে বাধা—টাকা, 'ওদের মত থাকার জন্য টাকা আবশ্যক। 'ওদের দেশে' থাকবার জন্য টাকা আমাদের 'নেটিব'দের যোগাতে হবে। কেন, তা দুর্বোধ্য নয়—নেটিবদের দেশ টাকা না যোগালে কোনো ভারতত্যাগী ভারতবাসী বা ভারতগ্রাসী ইংরেজের পক্ষেও, 'ওদের দেশে' থাকা চলে না—না হলে সে দেশে হাড়াভাঙা পরিশ্রম। 'ওদের দেশে' যারা খেটে খেয়ে সামান্যভাবে থাকে তাদের আবার 'জীবনমান' কি ?—তা জীবনই নয়। যাক, দাদার মতে 'কনফারমড ব্যাচেলরদের' দলের উপেনই হল আদর্শ, 'পারফেকশ্যান।' সে কোনো কম্প্রোমাইজ্ করবে না 'বরন্ ম্যারেডম্যানদের' সঙ্গে। তাই উপেন-এর 'কনফারমড ব্যাচেলর' ভিন্ন আর একটা নাম হল—'মিস্টার পারফেক্শ্যান'। আমাদের একটাই নাম বরন্ ম্যারেডম্যান'—অবশ্য তখনও নিরানব্বুই জনেরই ভাগ্যে স্ত্রী জোটে নি। 'বরন্ ম্যারেডম্যানরা' 'হাজবেণ্ড' রূপে 'রিবরন্' হয়েছিল অনেক পরে।

উপেন আমাকে সিনেমায় প্রথম নিয়ে গেছল। কী ছবি, নাম মনে নেই। খুব রোমাণ্টিক। গ্রীক কাহিনী হবে হয়তো—'সাইরেনদের' অবলম্বন করে। সমুদ্র-পর্বতের অপূর্ব দৃশ্য, আর তেমনি মোহিনীদের নৃত্যগীত প্রণয়লীলা ; এর বেশি কিছু মনে নেই। কিন্তু এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা ! এ যুগের প্রধান মোহিনী ফিল্মী কলালক্ষ্মী—তবে তার নেশায় তখন পেল না। কারণ উপেন বাজে ছবি দেখবে না। বাজে সিনেমা হল-এ বসেও ছবি দেখবে না। সস্তায় ছবি দেখা সস্তায় সাহেবি-করার মতোই তার কাছে ভাল্‌গার। ভালো ছবি থাকলে সেদিনের মাঝারি-দামের আসনে আমরা দেখতে যাব, মাসে এক-আধদিন। সেদিনের আট আনার আসনই ছিল আমাদের আয়ের তুলনায় উপেনের মতেও ভদ্র, রেস্‌পেকটেবল। আমরাও বোধহয় দেখেই মুগ্ধ হতাম। ভুলতাম এবং ভুলে যেতাম। তাই এখন তো কোন নাম মনে পড়ে না—সেই ডগ্‌লাস্ ফেয়ারব্যাংকস, মেরী পিক্‌ফোর্ড, চার্লি চ্যাপলিন ছাড়া। বোধ হয় নির্বাক ছবিতে হাত-পা নাড়া লাফ-ঝাঁপ একটু বেশিই প্রয়োজন। ভাবভঙ্গি চাই, কারণ বাক্য নেই। না হলে ফিল্ম সচল জীবন হবে কি করে ? হয়তো বাকস্ফূর্তির অভাবটা প্রাণস্ফূর্তি দিয়ে ভরানো প্রয়োজন। আশ্চর্য অভিনয়-নৈপুণ্য ছিল শিল্পীদের। সবাক যুগে এখন বাক্যের বর পেয়েছে ফিল্ম, কিন্তু বাক্যের ঝড় অ্যাটলাণ্টিকী টাইফুন-এর মতোই মাঝে মাঝে মনকে দুমড়ে দেয়। তথাপি আমার তো সেই প্রথম দিককার দেখা ছবির কথা এখন আর বিশেষ মনেই পড়ে না—ডগ্‌লাস ফেয়ারব্যাংকস্-এর দুরন্ত প্রাণচাঞ্চল্যে যতটা অবাক হয়েছি

ততটাই মনে করেছি তা মাত্রাছাড়া। এমন কি, চ্যাপলিন-এর ফিল্ম-এর অদ্ভুত উদ্ভাবনাও ভাবভঙ্গিতে হাসতে হাসতেও মনে করেছি 'চমৎকার—কিন্তু একটু ভাঁড়ামিও।' আসলে চ্যাপলিনের প্রতিভার সন্ধান প্রথম পাই 'কীড'-এ, তারপরে 'গোলড্ রাশ্', 'সিটি লাইট' যখন দেখি তখন তাঁর স্বরূপ বুঝলাম। তবে আমার চোখে চার্লির চরম সৃষ্টি 'মসিয়ে ভার্দু,' পরমসৃষ্টি 'লাইম্ লাইট।' আমি ফিল্মের নিছক দর্শক,—কলারসিক বিশেষ নই। তখন তো নই-ই। আর দর্শন করতে যেতাম প্রায়ই সে ছবি যা উপন্যাস হিসাবে বা ঐতিহাসিক কাহিনী হিসাবে আমার জানা। তাতে ঠকতেও হ'ত। একবার তলস্তোয়ের 'লিভিং কর্পস' দেখতে গিয়ে দেখি শেষটা ট্রাজেডি থেকে তা কমিডিতে রূপান্তরিত। যা ঘটেছে 'সব স্বপ্ন ?' ছবিটা সম্বন্ধে আমার মনের ভাবটা হয়েছিল 'সব ঝুটা হ্যায়।' তবে 'ল্য মিজারেবল', 'হাঞ্চব্যাক অব নতরদ্যম'; কিম্বা 'কুয়ো ভাদিস্' প্রভৃতি ছবি এলে তা দেখবার জন্য খুন চেপে যেত। উপেনেরও তাই। মোটা উপন্যাস দেখলে সে বলত—'থাক। ছবি হয়ে আসুক।' সাহিত্যে তার রুচি নেই—ব্যতিক্রম ছিলেন একজন, শরৎচন্দ্র। অবশ্য তখনো তাঁর বই ছবি হয় নি—দেশী ছবি দেখা দেয় নি। দেখা যখন দিল তখন আমরা তাতে বিরূপ হয়েছিলাম। প্রথম দেখি 'ইল্যাণ্ড রিটার্নড'—হাসি ছাড়া আর কি পাবে ? তখন মেরী পিক্‌ফোর্ড প্রসিদ্ধা। মনে আছে, তার একটা ছবির বিজ্ঞাপনে লেখা ছিল 'লক্ষ হৃদয়ের বাঞ্ছিতা'—'সুইট্ হার্ট অব দি মিলিয়নস্'। হিন্দু হোস্টেল থেকে বেরিয়ে দু'জনায় চলছি—বাইরের দেয়ালে দেখি প্লেকার্ড—মেরী পিক্‌ফোর্ডের ছবিশুদ্ধ ঐ বিজ্ঞাপন। উপেন দেখে তাড়াতাড়ি 'মিলিয়নের' পরে কলমের কালি দিয়ে জুড়ে দিল '+ 1' ; আমি বললাম, 'একি করছিস'। উপেন বললে, 'আমার কথাটা বাদ গিয়েছিল, শুদ্ধ করে দিলাম।' হাসতে হাসতে দুজনায় চললাম আবার বউবাজার হয়ে চৌরঙ্গির দিকে। উপেনের মতে রূপসী মাত্রই—নেহাত নিকট আত্মীয়া না হলে—প্রেয়সী। 'চোখে নাই বা দেখলাম। না পেলাম তার চুম্বন-আলিঙ্গন।' এ বিষয়ে কিন্তু 'ওদের' ও 'আমাদের' প্রতি উপেন সমান অপক্ষপাত।

একটা জায়গায় কিন্তু উপেনের পক্ষপাতিত্ব দেখেছি—খেলার মাঠে,—বিলিতী দলের সঙ্গে দেশীয় দলের খেলার সময়ে। 'ভারতীয় বনাম য়ুরোপীয় ছিল সেদিনের বিশেষ প্রসিদ্ধ ফুটবল খেলা। সে খেলায় আমাদের না গেলেই নয়। বিভিন্ন ক্লাবের এক-আধটি করে বাছাই করা প্লেয়ার নিয়ে দু'দল; তাদের পক্ষে হঠাৎ সেদিন খেলার মাঠে জোট বাঁধা সম্ভব হয় না। স্ব-স্ব ব্যক্তিনৈপুণ্যেই তারা খেলত। তবু খেলা জমত—খেলোয়াড়ের গুণে যেমন,

তার চেয়েও বেশি দর্শকের আগ্রহ-উত্তেজনায়। তবে দু'-একজনের খেলা সত্যাই দেখবার মতো—শাদার দলে নাইট, বেনেট, আর কালার দলের কুমার, বলাই চাটুজ্যে, গোষ্ঠ পাল, বিশেষ করে সামাদ। সামাদকে চিরদিন খেলতে হয় বাজে দলে,—নিয়তির পরিহাস। কিন্তু আন্তর্জাতিক খেলায় সেদিন দেখা যেত নিয়তির ওপর সামাদের টেক্কা মারা। সে কি খেলা, জাদু। বাঙালি খেলোয়াড়রা গোলের মুখে বল নিয়ে গেলেও সেখানে ঠিক তালগোল পাকায়। একে অন্যের থেকে বল কেড়ে নিতে যায়। সামাদের সে গরজ নেই। প্রতিপক্ষর থেকে সে বল কেড়ে নিতে জানে। আশ্চর্য তার কৌশল। যতটুকু খেলা কোথাও ত্রুটির দেখা নেই। বল যখন একবার সামাদের পায়ে যেত তখন আমরা কালার দল আশা-উত্তেজনায় অস্থির হয়ে উঠতাম। ভাঙা চিনেবাদাম মুখে যেত না, শক্ত-মুঠোয় তা চূর্ণ হ'ত। মুখের সে অবসর নেই, তারস্বরে চীৎকার উঠেছে—সামাদ, সামাদ, সামাদ। সে উত্তেজনা চতুর্দিকে সহস্র কণ্ঠে। উপেনের চিনেবাদামসুদ্ধ মুঠো করা হাত কখনো ঊর্ধ্বে উঠছে, কখনো সামনে প্রসারিত, আর কখনো আমার দুর্বল স্কন্ধের শক্তি পরীক্ষা করছে। আমারও আশায়-আশঙ্কায় বুক ঢিব্ ঢিব্ করছে। কিন্তু স্কন্ধের পরীক্ষাও সামান্য না। বন্ধুর মুখের দিকে তাকিয়ে বলছি, 'করছিস কী ?—বল তো আউট্ হয়ে গেল। সামাদ আর কী করবে ?' তারপর টিপ্পনী কেটে বলি 'ওদের সঙ্গে নেটিব্‌দের তুলনা কোথায় ?' উপেন একটু দম নেবার চেষ্টা করে—বলটা সত্যি আউট হয়েছে। হাতের চিনেবাদাম মুখে পোরে। গম্ভীরভাবে বলে, 'দ্যাখো, (এবার আমি আর 'দ্যাখ্' নই, 'দ্যাখো') সব সময় ইয়ার্কি নয়। এ সিরিয়াস্ মেটার। জীবন-মরণের প্রশ্ন।' তার চোখ-মুখ আরক্ত।

সত্যাই 'জীবন-মরণের খেলা' হ'ত সেদিন খেলার মাঠে। এ্যাণ্টি ইম্পারিয়াল জন্‌-এর এমন পাঠ সাধারণ মানুষ আর কোথায় পেত ? জে. এল. বাঁড়ুজ্জের বক্তৃতার ঝড়ে, না বিপিন পালের মেঘগর্জনে ? সত্যাই, উপেন যে উপেন, সেও সেদিন নিয়তির পরিহাসে নিজেকে 'নেটিব্' মেনে ফেলত—ব্লাড ইজ থিকার দ্যান ওয়াটার।' বলমান রূপগুণ বিলাস বৈভব যত কিছু 'ওদের' থাক, সামাদই তার আপনার।

এই বস্তুনিষ্ঠ বন্ধুটি জীবনের আরও বাস্তব পরিহাস থেকে নিস্তার পায় নি। আই-এস-সি পাশ করে তার ডাক্তার হওয়া হ'ল না। পরীক্ষার মার্ক ছাড়াও মেডিক্যাল কলেজে ভরতির যোগ্যতা-লাভ তার পক্ষে দুঃসাধ্য ছিল না। ভর্তির যোগ্যতা অন্য বন্ধুর মতোই অর্জন করা যেত। উপেনেরও তা অসাধ্য হ'ত না। কিন্তু সে কোর্ট অব্ ওয়ার্ডস্-এর 'নাবালক', তার শ্বেতাঙ্গ অভিভাবকরা মানবে

কেন যে মেডিক্যাল কলেজে বার্নার্ড প্রমুখ পাকা আই-এম-এস্‌দের যথোচিত দক্ষিণা দিয়ে ভরতির পথ সুগম করতে হয়। উপেনের থেকে পরীক্ষায় খারাপ করেও অনেকে ভরতি হ'ল। কিন্তু উপেন ভরতির অযোগ্যই রইল। সরকারী অভিভাবকরা কিছুতেই দু-একটা রোগী দর্শনের 'দক্ষিণার' বন্দোবস্ত করলে না। কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজে সে ভরতি হতে পারত; কিন্তু উপেনের মাপকাঠিতে তার হাসপাতালে না আছে ডাক্তারি শেখবার মতো আয়োজন-পত্র, না তার ছাত্রদের চাল-চলনে, পোশাক-পরিচ্ছদে, কথাবার্তায়—ডাক্তারী ছাত্রের যোগ্য স্মার্টনেস্ ও মর্যাদাবোধ। বি এস-সি-তে পরীক্ষার বছরে সে ও কয়েক বন্ধু পড়ে গেল কলেজের অধ্যক্ষের কোপে। স্যার আশুতোষের কৃপায় তাদের পরীক্ষা বন্ধ হ'ল না। যেমন করে হোক পাশ করে উপেন ব্যবসার ক্ষেত্রে ঘোরাফেরা করছিল—বিনি পয়সার এপ্রেণ্টিস্ থেকে শেষে ইস্তফা দিল সে চাকরির আশা। নিজের পুঁজি নিয়ে গেল শেয়ারের বাজারে। উপার্জন হচ্ছিল। আমাদের জানাত অরেকটুকু সুস্থির হলেই আমাদের মতো ভীতু বন্ধুদেরও সে একটা 'ডিসেণ্ট্ লাইফ্'এ স্থাপিত করবে। "উইক্-এণ্ড করবে—তোমরা আমার সঙ্গে বাইরে থাকবে ইউরোপীয়ান স্টাইলে। কলকাতায়ও এক-আধ সন্ধ্যায় থাকবে ডিনার। বিলিতী পানীয় থেকে বঞ্চিত থাকবে না—উইক্-এণ্ডে আরও পাবে ফেয়ার কম্পেনি বাট্ রেস্‌পেক্‌টবল্ এ্যাণ্ড ডিসেণ্ট।" কিন্তু সেই সৌভাগ্য আমাদের লাভ হবার আগেই এল ১৯২৯,—মন্দার বাজার। মার্কিন রাজ্যের ভাগ্যবিপর্যয়ের সঙ্গে উপেনের ভাগ্যের ভরাডুবিও ঘটল কলকাতায়। ১৯৩৭-এ জেল থেকে বেরিয়ে শুনলাম—সকল কিছু থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে সাহেব-অনুরাগী উপেন হ্যারিসন রোডের একটা হোটেলের কোটর আশ্রয় করেছে। কিছুতেই ফোনে ছাড়া তার সঙ্গে কথা হয় না—সাক্ষাৎ সে করবে না। আরও পরে শুনলাম একদিন—দ্বিতীয় যুদ্ধের মধ্যে—সেই স্বাস্থ্যবান, বুদ্ধিমান, বন্ধু—আমাদের অগোচরে—কাঁচড়াপাড়ার যক্ষ্মা হাসপাতালে নিবে গিয়েছে। মনে হল আমাদেরই কি নিয়তি কম পরিহাস করেছে।

আমার কলকাতার সঙ্গে পরিচয়ে প্রথম বৎসর উপেনই ছিল সঙ্গী। পর বৎসর চারু, সাধু, উপেন রায় প্রভৃতি এসে গেল। খেলা কলকাতায় এসে একেবারে ছেড়ে দিই—বিকালে হেদুয়া থেকে হেঁটে যেতাম হিন্দু হোস্টেলে, দু'বন্ধুতে 'বনমালীর' মিষ্টিতে কিঞ্চিৎ রসনা তৃপ্ত করে বেরিয়ে পড়তাম—সেই বউবাজার—কেণ্ডারডেন লেন ধরে গলিতে চাঁদনির দিক দিয়ে এস্‌প্লানেড—তখনো সেনট্রাল এ্যাভিনুর স্কিম-এর কর্ম-সূচনা হয় নি—বাড়ি ভাঙা শুরু হয় কিছু পরে। এস্‌প্লানেড থেকে কখনো হগ্ সাহেবের বাজার ঘুরে চৌরঙ্গী ধরে যেতাম বরাবর।

আর কখনো এস্‌প্লানেড থেকে কার্জন পার্ক পেরিয়ে ইডেন গার্ডেন, আউটরাম ঘাট—সেখানে খোলা ফ্লাটে বসে গঙ্গা দেখা। শুধু আমি আর উপেন নয়, বৎসরে বৎসরে আমাদের পুরনো বন্ধুরা কলকাতায় এলে, চারু, উপেন, প্রফুল্ল, আমরা সকলে—এই ভাবেই বিকাল ও সন্ধ্যা কাটিয়েছি। আউটরাম ঘাটে ছোট-বড় শত শত নৌকা চলছে। পোর্ট কমিশনারের স্টিমার কাছের জেটি থেকে শিবপুর যায়। সম্পন্ন ও পদস্থ কেউ কেউ তাতে দৈনন্দিন যাত্রী—সন্ধ্যাকালে গঙ্গায় নৌবিহার ও গঙ্গার হাওয়া খাওয়া। ওপারে হাওড়ার কল-কারখানা। সূর্য অস্ত যায়, তার আভায় কলের কালো ধোঁয়া তামাটে হয়ে ওঠে। ধীরে সন্ধ্যা নামে—নিচে সেই চিরদিনের গঙ্গা—যা এদিনের গঙ্গার মত ম্লান-মুমূর্ষু নয়। আউটরাম ঘাটে তখনো বিলাতের জাহাজ এসে ভেড়ে—দু' একদিন দেখি বিলাতের যাত্রীরা নামছে। একদিনের কথা তো বেশ মনে পড়ে—সে অবশ্য বছর দুই-তিন পরের কথা। আমরা কয়েক বন্ধু বসেছিলাম; দেখলাম জাহাজ এলো। দেখতে না দেখতে যাত্রীরা নামতে শুরু করলে। সব শাদা মুখ—নারী পুরুষ। কী তাদের ব্যস্ততা—যেন দেরী সয় না; জাহাজের একঘেয়ে জীবন থেকে পাড়ে নামতে পারলেই বাঁচে। আর পার পাওয়া শুধু নয়—ক্যালকাটা! প্রাচুর্য, আরাম, আয়েস, যা দেশে তাদের ভাগ্যে জোটে না, সেখানে তো 'ওরাও' আর 'ওরা' নয়, যতই থাক ভারতের লুঠ-করা টাকায় স্বচ্ছলতা, বাবুর্চি-বেয়ারা খানসামা-আয়া দেশে কোথায় পাবে? সবই নিজেরা। খাটতে খাটতে প্রাণ বেরিয়ে যায়।

নামছে, নামছে, নামছে। কালো অর্ধনগ্ন কুলীরা ছুটছে মালপত্র বহন করে তীরে নামাতে। আর তাদের চিন্তা নেই, আর তাদের মাল বহন করতে হবে না, রাঁধতে হবে না বাড়তে হবে না—এবার আরাম। ক্যালকাটা। নামছে, নামছে,—তাদের দেরী সয় না। এক-একটা জাহাজে সাহেব-মেম আসছে কত! না দেখলে তার অর্থ সম্পূর্ণ বুঝতাম না—হয়তো সংখ্যায় তিনশ কি চারশ, কিম্বা তাও নয়, কিন্তু দেখে বুঝতে হয় তার অর্থ। উল্লসিত, বেশভূষায় সুসজ্জিত, ফ্যাশান-দোরস্ত, অভিনন্দনকারী আত্মীয়-বন্ধু সমাগমে উৎফুল্ল, করমর্দনে, আলিঙ্গনে, চুম্বনে উচ্ছ্বসিত শ্বেতাঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গিনীর পাল, সঙ্গে কিছু কিছু এ দেশের শাদা ক্ষুদে মুনিব,—সকলের মুখে স্বাস্থ্য, স্ফূর্তি, সুনিশ্চিত স্বাচ্ছন্দ্য—বিলাসের সম্ভাবনায় স্বতঃস্ফূর্ত নিশ্চিন্ততা, দৃঢ় প্রত্যয়—এই 'এম্পায়ার', তারা এর রাজা, তারা ঐশ্বর্যে সৌন্দর্যে এ দেশে রাজত্ব করবার জন্য জন্মেছে—জীবনের সব দান এখানে তাদেরই আয়ত্তে। তারা জীবনকে উপভোগ করবে, তারা সকল সুখ-আরাম দু'হাতে ভোগ করবে। —দেখতে দেখতে আপনা থেকে

আমাদের কথা বন্ধ হয়ে গিয়েছে—মন বিষাদে গম্ভীর। সন্ধ্যা হয়ে গেল, জাহাজের যাত্রীও কমে গিয়েছে। আলো জ্বলে গিয়েছে বেশ খানিকক্ষণ আগেই। জাহাজের আলো, নৌকোর আলো, ওপারে কল-কারখানার আলো, এ পারের পথ-ঘাটের আলো—নিচে গঙ্গা বহমান, কম্পমান আলোর মালা দুলিয়েও যেন বিষণ্ণ অন্ধকার। 'ওঠো', কে একজন বললে, 'ফিরতে হবে।' উপেনই প্রথম বললে, 'দেখলে তো, এক-একটা জাহাজে কত ওরা আসছে।' তারপর একটু হতাশ ব্যঙ্গে, 'আর তোমরা ভাবছ ওদের তাড়াবে।' অনেকেরই মনে এই হতাশা। নিজেদের মন থেকে তা ঝেড়ে ফেলা যাবে না। কিন্তু চাপা দেওয়া যাক লঘু রঙ্গ-রসিকতায়। বললাম,—'অমনি করেই জাহাজ বোঝাই তুলে দেব ওদের সবাইকে এই ঘাট থেকে—সাহেব, মেম, আণ্ডা-বাচ্চা সুদ্ধ।' উপেন তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলে, 'কখনো না! মেমসাহেবগুলোকে রেখে দিতে হবে—না হলে স্বরাজের কী মূল্য থাকবে?' সকলেই হেসে উঠলাম। আবহাওয়া লঘু হল। কে বললে, 'তোর তাতে লাভ? তুই তো 'ওদের' দেশেই চলে যাবি।' 'আমার জন্য আমি বলছি নাকি? তোদের জন্যই বলছি—ওদের নিয়ে তোরা একটু ফুর্তি করবি—ওদের সঙ্গে লাইফটা এন্‌জয় করতে শিখবি।'

হাস্য হোক পরিহাস হোক,—এই বন্ধুদের সঙ্গে ওই গঙ্গার ধারে বসে, চৌরঙ্গীর ধারে হেঁটে হেঁটে, পথে ঘুরে ঘুরে, সূর্যাস্ত ও সন্ধ্যায় কলকাতার এই গঙ্গা-বিধৌত রূপ দেখতে দেখতে, এই নদী-পালিত বাঙাল রক্তধারা অজ্ঞাতে এই গঙ্গার সঙ্গে, কলকাতার সঙ্গে, আত্মীয়তার বন্ধন খুঁজে পেয়েছিল কিনা কে জানে —কিন্তু কলকাতায় প্রথম এই গঙ্গার পারের কলকাতা আমার ভালো লেগেছিল। আর সেই সঙ্গে তার মাঠ-ময়দান, তার পথঘাট, চৌরঙ্গীর উজ্জ্বল শ্রী, তার উল্টো দিকে গাছপালার আলো-ছায়ায় বোনা থিয়েটার রোড পর্যন্ত বিস্তৃত ময়দানের ধারের লাল শুরকির নির্জন 'লাভার্স লেন', আমাদের ডাফ স্ট্রীটের কৃষ্ণচূড়ার একান্ত শ্রী, তখনকার হেদুয়া-বিডন স্ট্রীট অঞ্চলের নাতিপ্রখর স্বচ্ছন্দ স্বচ্ছল রূপ—এসবও ভালো লেগেছিল। সত্য কথা, মিউজিয়াম ভবনের অচঞ্চল আত্মমর্যাদা, হাইকোর্ট, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, চৌরঙ্গীর বিলিতী-বৈভবের উদ্ধত দৃষ্টি, সাহেব পাড়ার সযত্ন পালিত পার্ক, পথঘাট, বাগান ঘেরা বাড়িঘর,—যতই এ সবে মিলিত থাক আমাদের জাতীয় পঙ্গুতার সাক্ষ্য,—অথবা বাঙালিপাড়ার শোভাবাজার বা পাথুরিয়াঘাটা জোড়াসাঁকো পাড়ায় কোম্পানির দাক্ষিণ্য-মাখা বাড়িঘর—পথে তখনকার তেজীয়ান ওয়েলারের জুড়ী গাড়ি, বা নতুন হাওয়া গাড়ি,—এ সবের দিকেও চোখ মেলে কৌতূহলে চেয়ে থেকেছি।—না, আজব নয় তবু মনোরঞ্জক। কিন্তু গঙ্গাপারের পটে যে কলকাতাকে প্রথম

থেকেই আমার পদ্মাপারের চোখে আপনার মনে হয়েছে—সেও কি একটু মনের মায়ায় মাখা নয় ? হেদুয়া, গোলদিঘি, সিনেট হাউসের কলকাতা, সংস্কৃত কলেজ, হিন্দু কলেজ, ডেভিড হেয়ার, মধুসূদন, বিদ্যাসাগরের স্মৃতিসুরভিত কলকাতা, যেখানে মনুমেন্টের মাথায় ত্রিবর্ণ পতাকা উড়িয়ে দিয়েছে ১৮৩২-এ ইয়ংবেঙ্গল ; যেখানে স্বদেশীর জন্ম, রাখিবন্ধনের সূচনা, ভারতীয় জাগরণের বোধন, উত্তর-দক্ষিণ পূর্ব-পশ্চিম সকল জাতির ভারতীয় মানুষের পদপাতে যার পথে পথে ভারতীয় মহাজাতির পদধ্বনি বাজে—সেই ধূলিধূসরিত দেশী পাড়ার কলকাতা, তারই জন্য গোপন আশা মনে নিয়ে ও আত্মীয়তা বহন করে আমি এসেছিলাম। একটু একটু করে ক্রমে সে আশা একদিকে পরিণত হয়ে গেল মমতায়। এই কলকাতার পুরানো বই-এর দোকান, এলবার্ট হলের ও নানা গ্রন্থাগারের পাঠব্যবস্থা, তার মাঠের খেলা ও রাজনীতির সভার মত তার বিদ্যাসাগরের গ্রন্থ-সংগ্রহে গৌরবান্বিত সাহিত্যপরিষদ, বিজ্ঞান কলেজ, বজ্রচূড় বসু বিজ্ঞান মন্দির, আর সমবায় ম্যানসনের ওরিয়েন্টাল আর্ট সমিতি—যে কলকাতার হেদুয়ায় দেখি সত্যেন দত্তকে, ডাফ্ স্ট্রীটে ঠিকে গাড়ি ভাড়া করতে দেখি ব্রজেন্দ্রনাথ শীলকে—কলেজে যাবেন. পথের ধারে কলের তলায় করুণানিধানকে দেখি স্নান সেরে ভেজা কাপড়ে অদূরের ভাঙা বাড়িতে ফিরছেন, যেখানে সত্যেন বোস সুনীতি চাটুজ্জেদের মতই হঠাৎ রামানন্দ চাটুজ্জেকেও দেখি কর্নোওয়ালিস্ স্ট্রীটের সামনে,—এই মনে মনে চেনা কলকাতা প্রতিদিনকার পরিচয়ে-পরিচয়ে আমাকে তার সঙ্গে ক্রমে ক্রমে মমতায় বেঁধে ফেলল। অন্যদিকে সেই কলকাতাতেই আমি আবিষ্কার করলাম আমার আজন্মের বাঙাল সত্তাকে। আমার যে-সত্তা পদ্মার বুকে—ঢাকা-বিক্রমপুর-নোয়াখালির মেঘনার কোলে দোল খেয়ে-খেয়ে পুলকিত, ঘনশ্যাম গাছপালা, ঝাউ-নারকল-হিজল-সাঁপলা-বাঁশঝাড়-বেতবনের সঙ্গে মিলেমিশে অচেতন আনন্দে বাল্য-কৈশোরকে আপন গন্ধে মুগ্ধ কস্তুরী মৃগের মতই ছুটে ছুটে নিয়ে এসেছে যৌবনের দিকে—একবারের মতও ইতিপূর্বে সচেতন হয়ে বুঝতে পায় নি সেই বাঙাল 'বাঙলার রূপকে'—পূর্ববঙ্গের নিসর্গ-সত্তার মধ্যে আমার যে-সত্তা তখনো ছিল নিমজ্জিত, আমারই নিকট অনাবিষ্কৃত—এই কলকাতাই গঙ্গার নাতিপ্রখর প্রবাহ ও তার পৌর-পরিবেষ্টনের মধ্যে আমাকে গ্রহণ করে, মমতাময় হাতে আমার চোখ খুলে দিল আমার সেই পূর্ববাঙলার জন্মগত প্রকৃতি-পরিবেশের দিকে। এই কলকাতার প্রথম পাঠ-অনুভূতির এই উত্তরণ। সেই পদ্মা-মেঘনার দুর্বার বিস্তৃতি ও গর্জন, মেঘবৃষ্টি মুখর বাঙলার সকাল-সন্ধ্যা ঝিঁঝিঁ-ডাকা, জোনাকি-ফোটা বনজঙ্গল, বাঁশঝাড়ের গা ছম ছম করা শব্দ, ঝাউগাছের মাথায় মাথায়

বাতাসের ক্রন্দন—সাঁপলা-ফোটা বিক্রমপুরের খালবিল, জোয়ারে পরিস্ফীত নোয়াখালির নদীর যৌবন-মদমত্ততা, পদ্মা-মেঘনার মিলন-উল্লাসের উদ্দাম ঐশ্বর্য, নোয়াখালির বিস্তৃত খোলা মাঠে দ্বিপ্রহরে চক্রাকারে ওড়া চিলের ছায়ায় অনুক্রমণ, আর সামান্য শহরের লাল সুরকির পথের দুধারে ঝুঁকে-পড়া ঝাউ-গাছের সেই মিলন-বিরহের অনন্ত আলাপ—এসব আবাল্যের দেখা সেই সঙ্গীদের মন দিয়ে গ্রহণের মত অনুভূতিও আমাকে দিল কলকাতা—কলকাতা আমাকে দিনে দিনে দৃষ্টিদান করলে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

লাগ্‌ল না—লাগ্‌ল না

আমার কলেজ-জীবন মাত্র ছয় বছরের (১৯১৮-১৯২৪)। কলকাতাতেই তা কাটে। অবশ্য, তারও একটা বড় অংশ আবার ছুটিতে নোয়াখালির জীবন। আর সে সময়ে এক-আধবার পাটনা, দিল্লী প্রভৃতি ভ্রমণ। কলকাতার বাইরের কলেজ-জীবন, কতকটা কলকাতার উল্টো জীবন। যৌবনের জোয়ার দুই পার ছাপিয়ে বান ডেকে আসছিল তখন দেশের জীবনে, ও যুগের জীবনে—তার মধ্যে আমার যৌবন নিজেকে না হারিয়ে স্থির হতে পারত না। সে কথাটা বুঝেও যেন বুঝবার দরকার বুঝতাম না তখন। ঘটনার পরম্পরায় ভাবতে গেলে তার ঠিক পরিমাণ হয় না। কলকাতাই তো একটা ক্রমপ্রকাশিত অনুভূতি, আর ক্রম-বিকশিত উপলব্ধি—অন্তত আমার কাছে। গত প্রায় পঞ্চাশ বৎসর তা বুঝতে গিয়েছে। সেই প্রথম পাঁচ-ছয় বৎসরে যারা আমার মনের কলকাতা জেনে না-জেনে গড়ে তুলেতে সাহায্য করেছেন * তাঁদের অনেক মুখই এখনো আমার চোখে প্রত্যক্ষ—অনেকে তাঁরা আমার প্রথম বয়স থেকেই আত্মীয়-বন্ধু—চারুলাল মুখোপাধ্যায়, উপেন সেন, অনুতোষ সেনগুপ্ত, উপেন রায়, দীনেশ গুহ আর আমার ভাই প্রফুল্ল হালদার (সাধু) প্রভৃতি নোয়াখালির তখনকার বন্ধুরা। আরও অনেকে আমার কলকাতায় পাওয়া ছাত্রাবাসের সতীর্থ, অগ্রজ বা অনুজ সহযাত্রী—সজনীকান্ত দাস, বিমলাকান্ত সরকার, সতীন্দ্রনাথ বসু, শিবদাস রায়, সুধেন্দু ঘোষ, লালা গোপালপ্রসাদ, বিভূতি দত্ত, সুধাকান্ত দে, শিবশরণ চৌধুরী, পরিমল রায়, গিরিধর চক্রবর্তী প্রভৃতি। আর হার্ডিং হোস্টেলের অন্তত একজন—বিনয় মুখোপাধ্যায়। কলেজের সহপাঠীদের মধ্যে অবশ্য রবীন্দ্রনাথ বসু, ধীরেন্দ্রনাথ পাল, অন্নদা দাশগুপ্ত, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, সুধীর সেনগুপ্ত প্রভৃতি ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্রদের কথা সর্বাগ্রে মনে পড়ে। আমাদের বৎসরের প্রেসিডেন্সি কলেজের কেউ কেউ কম সুহৃদ ছিলেন না—পতঞ্জলি ভট্টাচার্যের ও বিজয় ভট্টাচার্যের সঙ্গে দেখা-শোনায় সে সৌহার্দ্য অক্ষুণ্ণ ছিল, কিন্তু দেখা-শোনার অভাবেই কি অসিতারঞ্জন মুখোপাধ্যায় কিম্বা হরি-প্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে এককালের সম্পর্ক কিছুমাত্র খর্ব হয়েছিল? তা ছাড়া, বন্ধুদের বন্ধুরাও তখন অপরিচিত থাকতেন না—এমন কি, দাদার বন্ধুরাও না।

---

*এঁরা অনেকেই নেই—অনেকে পূর্বেই গিয়েছেন। তবু অনেকে লেখার সময়ে ছিলেন। প্রকাশের পূর্বে, প্রায় সকলেই বিদায় নিয়েছেন।—লেখক।

আর যৌবন-জল-তরঙ্গ কি দুটি কলেজীয় সমাজেই আবদ্ধ থাকার মত ? অবশ্য সহপাঠী বা সমকালীন সে-সব ছাত্ররাই সে জীবনের প্রধান জিনিস। তবে ছাত্র-জীবনের প্রধান আশ্রয় অধ্যাপকরা, তাঁরাই সে জীবনের শিল্পিকার—'ইঞ্জিনীয়ারস্ অব্ ইয়ং সোল্স্'।

"ছাত্র আর অধ্যাপকের যেখানে মিলন সেখানেই বিশ্ববিদ্যালয়।" সিনেটের এক সভায় কথাটা বলেছিলেন আচার্য জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ ! সে বোধ হয় ১৯৫৩ সাল বা '৫৪ সাল। তিনি তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধ্যক্ষ, আমি সিণ্ডিকেটের সদস্য। তাঁর মত সুযোগ্য ভাইস্-চ্যান্সেলর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও বেশি লাভ করে নি। এ বিশ্ববিদ্যালয় 'স্যার আশুতোষের বিশ্ববিদ্যালয়।' আমাদের ছাত্র-জীবনে স্যার আশুতোষকেও ভাইস্-চ্যান্সেলর রূপে আমরা কিছুদিন দেখেছি—তিনি তো নর-শার্দূল, 'বেঙ্গল টাইগার', তাঁর সঙ্গে অন্য মানুষের তুলনা করা সহজ নয়। জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের ঠিক পরে অধ্যাপক নির্মলকুমার সিদ্ধান্ত হন ভাইস্-চ্যান্সেলর। ও দু'জনার তুলনা তাই অনিবার্য। তাঁদের বৈশিষ্ট্যও অনস্বীকার্য। দু'জনাই এখন নেই। নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য সহ দু'জনাই আমার চোখে এখনো ভাস্বর। এ প্রসঙ্গে সে কথা অনাবশ্যক। শুধু ভুল বুঝবার মূল না থেকে যায় ভেবেই তবু কথাটা বলা। এখানে প্রাসঙ্গিক হচ্ছে জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের উদ্ধৃত কথাটা—ছাত্র ও অধ্যাপক নিয়েই বিশ্ববিদ্যালয়। ইমারত, ফার্নিচার গৌণ। —কিন্তু বিজ্ঞানের ল্যাবরেটরি ও লাইব্রেরীও কি চাই না ? সে-প্রসঙ্গও আপাততঃ থাক ; —একালের শিক্ষায়োজনে আরও অনেক উপাদানের প্রয়োজন। তবে সকল কালের বিশ্ববিদ্যালয়েই অপরিহার্য ছাত্র ও অধ্যাপকদের পারস্পরিক যোগাযোগ। গুরুগৃহ-বাসের তাৎপর্য সেখানেই। তা না থাকলে একালের 'ইউনিভার্সিটি কেম্পাস্'-মহারণ্য, মেদবাহুল্যে। আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়কে ডিগ্রির কারখানা, বা কলেজ পাশের পশারী বলাই ভালো।

আমি বিজ্ঞানের ছাত্র নই—সে খেদ জীবনে রয়ে গেল। ছাত্র-জীবনে কিন্তু তা বুঝি নি। সাহিত্য ও ইতিহাসে ছিল রুচি—ঝোঁক ছিল আরও অনেক দিকে। হিউম্যানিটিজ্-এর দিকেও মন উৎসুক হত। কিন্তু বুঝতাম, বিজ্ঞান দুর্গম, গণিতের বুদ্ধি আমার নেই, ইস্কুলে তাকে অবজ্ঞা করেছি ভুল জেদের বশে। গৃহে শুনতাম গণিতে আমাদের 'আস্য' বা পারিবারিক ঐতিহ্য নেই। স্কুলের শেষ দিকে তার প্রসাদ লাভ করেছিলাম, কিন্তু তা কপালে ছুঁইয়েই দূরে রেখে দিই। আমাদের ছাত্র-জীবন-কালে বিজ্ঞানের শতবর্ষ-মন্দির এদেশে মুক্ত হয় নি। মাত্র

দু'টি দুয়ার একটু ফাঁক হয়েছে—একটা ইঞ্জিনীয়ারিং-এর, দ্বিতীয়টা ডাক্তারির। ইঞ্জিনীয়ারিং-এর প্রবেশের পথ পেত এক-আধ ডজন ছাত্র। কাজেই সে দুয়ারে ধর্না দেবার কথা মাথায় আসতো না। মেডিক্যাল বিদ্যার অবশ্য তখন সমাদর দেখা দিয়েছে। দু'টি কলেজের দুর্বার কৌলীন্য—প্রধানত, বৈষয়িক কারণেই, এমন কি, বিয়ের বাজারেও। ও-বাজার ছাড়া অন্য কোন বাজার বাঙালী ছেলেদের কাছে খোলা ছিল? নিজের নির্বুদ্ধিতার জন্য পরে অনুশোচনা করা চলত। তখন সে বুদ্ধি হয় নি। যাই হোক, ইঞ্জিনীয়ারিং-এর রুদ্ধ-প্রায় পথ ও মেডিক্যালের ভিড়ে-ভারী পথে পা বাড়াতে না পারলে আমাদের কালে বিজ্ঞানের ছাত্রেরও গতি ছিল—সেই ওকালতি, মাস্টারি কিংবা কেরানিগিরি। শিক্ষার খোলা বাজারে সব একদর। এত সব কথা বিচার করি নি. বিচারে মতিও ছিল না, তাগিদও ছিল না। যা বাড়ির সকলে পড়েছে আমিও তাই পড়তে গেলাম। 'হিউম্যানিটিজ'-এর পথ চেনা-জানা পথ—'লিবারেল এডুকেশন' কথাটা অর্থ-শূন্য মনে হত না।

কলেজের পাঠ

স্কটিশ্‌ চার্চেস্‌ কলেজে আর্টস্‌ বিভাগে ভর্তি হই। সুযোগ পেয়েও আর প্রেসিডেন্সি কলেজে যাই নি। সায়েন্স না পড়ার মতই কি তা আরেকটা ভুল? পরে সে কলেজের সমসাময়িক ছাত্রদের সংস্পর্শে এসে তা মনে হ'ত। তথাপি স্কটিশের বন্ধুগোষ্ঠীকে পরম লাভ না মনে করে এখনো পারি না। সে কলেজ তখন প্রেসিডেন্সির প্রায় প্রতিযোগী। কলেজের পক্ষে তা গৌরবের কথা, ছাত্রদের পক্ষে আবার সেইজন্য দুর্যোগেরও কারণ। সে বছরই বোধ হয় স্কটিশ থেকে প্রেসিডেন্সির বিতাড়িত ছাত্র সুভাষচন্দ্র দর্শনের অনার্স পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে হন প্রথম। এই একটি কারণেই ভারতবর্ষের ইতিহাসে স্কটিশ চার্চেস্‌ কলেজের গৌরব শাশ্বত হতে পারে। অবশ্য অতটা তখনো কারও মনে হয় নি। সুভাষচন্দ্র তখনও 'নেতাজী' নন, স্বনামধন্য ছাত্র মাত্র। ওটেন্‌-বিরোধের 'দাগী' ছাত্র। তখনও শুনতাম আসলে তিনি নিরপরাধ। অনবনত মস্তক বলেই 'লাঞ্ছিত'। এখন জানি, সে সংঘাতেই তাঁর আত্মাবিষ্কার। সম্প্রতি নানা প্রামাণিক লেখায় অনঙ্গ দাম, কমল বোস প্রভৃতির নামও উল্লেখিত গিয়েছে। আমাদের দিনেও তা একেবারে চাপা ছিল না। তবে একটা কথা এখন স্মরণীয়—তখন ওটেন-চরিত্র ছিল অজ্ঞাত। সুভাষচন্দ্রের সম্বন্ধে ওটেনের লেখা সুন্দর সনেটটি ওটেনের সেই ব্যক্তি-স্বরূপের স্বাক্ষর। আরেকটি কারণে

সনেটটি মূল্যবান—সাম্রাজ্যবাদের কৃত্রিম পরিবেশে সহজ ব্যক্তি-সম্পর্কও আপনার অগোচরে কিরূপ অভাবনীয় দুর্যোগের বাহন হয়ে পড়ে। সুভাষ-ওটেন ব্যাপারটা আমাদের ছাত্র-জীবনের শুধু প্রেক্ষাপট নয়—সেই পরিবেশের মূল লক্ষণ-নির্দেশক। স্কটিশ চার্চেস কলেজ অবশ্য সে তত্ত্ব জানত না। পরীক্ষায় সুভাষের কৃতিত্বে তাঁরা সে বৎসর সন্তুষ্ট। কিন্তু সুভাষই শুধু সে বার তাঁদের মান বৃদ্ধি করেন নি। সে বৎসর পরীক্ষায় ওরূপ জয়টীকা পেয়েছিলেন স্কটিশের আরও কয়েকজন ছাত্র। দু'জনার কথা আমার এখনো মনে আছে—সুশীল মজুমদার, অনেক-দিন পরলোকগত। বছর ত্রিশেক পূর্বে তাঁকে শেষবার দেখেছিলাম—ভবানী-পুরের একটি স্কুলের খ্যাতিমান্ হেড্‌মাস্টার। খ্যাতিমান্ এবং দ্যুতিমান্। কিন্তু, বি. এ.-র ফার্স্ট ক্লাশ ফার্স্ট সুশীল মজুমদার আর এম. এ. পড়া শেষ করেন নি। ত্রিশ বৎসর পরে তাঁর পাশের খ্যাতি অল্পাধিক বিস্মৃত। মনের দ্যুতি অম্লান দেখলাম, ঝোঁকটা তখন ভারতীয় ঐতিহ্য-আশ্রয়ের দিকে। দ্বিতীয় কৃতী ছাত্রটির পক্ষেই সে ঝোঁক স্বাভাবিক হত। কারণ তিনি ইতিহাসের ছাত্র, সেবার স্কটিশ থেকে ইতিহাসে ফার্স্ট ক্লাশ ফার্স্ট। তিনিও এম. এ. পড়া শেষ করেন নি। পরে যখন তাঁর পরিচয় পাই (১৯২৬-২৭), তখন শুনেছি এম. এ. পরীক্ষার বছরটা তিনি ঘরে বসে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ নানা নৌযুদ্ধের মডেল তৈরী করছিলেন। বলেছিলেন, সে-সব যুদ্ধের মহড়া দিচ্ছিলেন নিজের পড়ার টেবলে। বন্ধুগোষ্ঠীতে সেই ১৯২৬-২৭-এ তিনি বিদ্যায় বাক্-তীক্ষ্ণতায় অনন্য; কলকাতা সমাজের অন্যত্র প্রায় অপরিচিত ও অলক্ষিত, আর আজ চল্লিশ বৎসর পরে ('৬০-এর দশকে) বোধ হয় ইংরেজী ভাষীদের নিকটে সর্বাধিক পরিচিত 'ইণ্ডিয়ান'; স্বদেশীয়দের কাছে বহু বিতর্কিত বাঙালী-বিদ্বেষী বাঙালী; কিন্তু বিদ্যায়, বাক্‌নৈপুণ্যে, লেখার উজ্জ্বল খরধারে সর্বজনস্বীকৃত—নীরদ সি. চৌধুরী। তাঁর কথা আরও আসতে পারে, এখানেই তবু বলে রাখি —জীবনে যে-অযাচিত অকুণ্ঠ সাহচর্য ও লেখাপড়ায় যে-অকৃপণ সহায়তা, আলাপ-আলোচনায় যে-বুদ্ধিতীক্ষ্ণ পরিহাস—আমি বহুকাল শ্রীযুক্ত নীরদচন্দ্র চৌধুরীর কাছ থেকে লাভ করেছি সে কথা দু'-এক পৃষ্ঠায় কেন, দু'শ পৃষ্ঠায়ও লেখা অসম্ভব। কেবল একটি আশ্চর্য ব্যক্তি নন—একটি আশ্চর্য phenomenon বা প্রায় প্রাকৃতিক প্রকাশ! সামান্য আধারে অসামান্য আধেয়ের বিষম উদ্ভাস, স্ফুরণ ও-বিস্ফোরণ।

মনে রাখার মত স্কটিশ চার্চেস্ কলেজের ছাত্র আরও ছিল। তবে আমাদের কালেই বোধ হয় সে কলেজের খ্যাতি ছায়াচ্ছন্ন হচ্ছিল; অবশ্য অস্তমিত হয় নি। আমাদের বি. এ. পরীক্ষার বৎসর (১৯২২) আমাদের

মধ্যে জন তিনেক স্কটিশের ছাত্র ইংরেজীতে, জন দুই ইকোনমিকস্‌-এ, জন দুই ইতিহাসে, অন্ততঃ একজন ফিলসফিতে এবং সায়েন্সের নানা বিষয়েও কেউ কেউ ফার্স্ট ক্লাশ পান—এক-আধজন প্রথমও হন। পরে দেখেছি—জন দুই হাইকোর্টের মহামান্য বিচারপতি, আরও জন কয় চাকরিতে উচ্চ চক্রেই চক্রবর্তী—চক্রাসীন, এবং চক্রাধীন। আমাদের বছর তিন আগেই 'চাকরির পরীক্ষা' প্রবর্তিত হয়েছিল। তাই ভালো ছেলেরা সে চক্রান্তে পড়ে যায়। ব্যুরোক্রেসির দেশে চাকরি পরম সৌভাগ্য, কারণ ব্যুরোক্রাটরাই তো তখন ভী-আই-পি, অন্যরূপ ভী-আই-পি আবির্ভাবের যুগ তখনো বহু দূরে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফরমানে যারা বিশিষ্ট, তারা অনেকেই পরে কোথায় যে কীভাবে হারিয়ে যায়, —অনেকের আর খোঁজই পাওয়া যায় না। ইউনিভার্সিটির মার্কাটাকে আমরা ভাবি চূড়ান্ত। অবশ্য একেবারে অকারণ নয়। রবীন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র পালকে দেখিয়ে কি মার্কাটাকে বাতিল করা যায়? বঙ্কিমচন্দ্র থেকে আরম্ভ করে অনেক কৃতী বাঙালীর শিক্ষা-জীবনটা বিপরীত সাক্ষ্য দেয়—পরীক্ষার কষ্টিপাথরেও সত্যই উজ্জ্বল রেখায় তা চিহ্নিত। তা ছাড়া, পরীক্ষার 'বাজারদরও' আছে। অন্ততঃ ছিল। রো ও নীলকণ্ঠ মুখুজ্জের 'মডার্ন এসেজ্‌' বইখানা বাজারে এখন দেখি না। আমাদের ইস্কুল-জীবনে তার সাহায্যে ইংরেজী রচনা লেখা রপ্ত করার চেষ্টা ছিল প্রশংসনীয়। ফলাফল যা আমরাই তার প্রমাণ। কিন্তু সে কথা নয়। সে বইতে একটি রচনা-বিষয় ছিল 'এডুকেশন' বা শিক্ষা, বোধ হয় রো সাহেবেরই তা লেখা। কলকাতায় এডুকেশনের চরম রূপ তিনি বুঝিয়েছেন একটি জিজ্ঞাসায়। বাঙালী যুবকের শিক্ষা না হলেই নয়, কারণ নবপরিণীতা বাঙালী বধূর বাসরেও প্রথম স্বামী-সম্ভাষণ—'এই—কটা পাশ?' আগাগোড়া ইংরেজী লেখার ও রোমক হরফের মধ্যে ইটালিকসে বা বক্র হরফে লেখা ওই বাঙলা শব্দ দুটি—'কটা পাশ'? যেন বক্রহাসি. পরীক্ষা পাশই পরিণয়-প্রণয়-পাশের সূত্র। কিন্তু আমাদের কালে আমরা আরো একটু বেশি বুঝতে বাধ্য হয়েছিলাম—পরীক্ষায় পাশ চাকরির পাশের প্রথম সূত্র, আর চাকরির পাশই পরিণয়-পাশের প্রধান সূত্র। কিন্তু এখনকার দিনে চাকরি যতই দুর্লভতর, ছাত্রছাত্রী পিতামাতা শুদ্ধ আমরা ততই তত্ত্বটার আরও গভীরে প্রবেশ করেছি। পাশের ছাড়পত্রটি কিছুতেই ছাড়া নয়। এখনো ডিগ্রিলাভ অত্যন্ত জরুরী। তবে এখন পরীক্ষা-পাশের প্রধান সূত্র—ম্যাস কপিয়িং. ম্যাস্‌ মুভ্‌মেন্টের তা এখন এক 'দৃপ্ত পদক্ষেপ'। সেদিনে প্রেমটা ছিল পাশের পুরস্কার। সেদিনে, এবং এদিনেও, বাঙালীর কাছে জীবনটা পাশের পরিশিষ্ট।—অন্যদেশে যা সূচনা, আমাদের দেশে তাই সমাপ্তি। তবে দু'-দশজন এই পরীক্ষার রত্নাকরে একেবারে

ডুবে যান নি, দেখা যায়। আমাদের দিনেও দেখেছি পাশবদ্ধ দু'-একজন উড়ে চলেছেন নিজের ডানার জোরে। স্কটিশে আমার বছরের অন্ততঃ দু'জন সহাধ্যায়ীর কথা স্মরণীয়—সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও সজনীকান্ত দাস। কলেজে তাঁরা ছিলেন পরস্পরের কাছে অপরিচিত, পরে সাহিত্যের দুই মেরুবাসী। কলেজের লেখাপড়ায় তাঁদের কারও একেবারে বিরাগ ছিল না, আবার ভক্তিও ছিল না। পরীক্ষার খাতায় নিজ নিজ নাম তাঁরা স্পষ্ট করেই সই করেছেন, কিন্তু বাঙ্‌লা সাহিত্যের পাতায় সে নাম তাঁরা লিখে গিয়েছেন সোনার জলে! কলেজেও তাঁরা লক্ষণীয় ছিলেন—সহপাঠী-গোষ্ঠী তাঁদের সঙ্গসুখ পেয়েছে। কিন্তু, কয়জন অধ্যাপকের সাহচর্য পেয়েছিলেন—এই সুলক্ষণ ছাত্রদ্বয় নিজ নিজ পথে পদযাত্রায় ?

ছাত্র ও অধ্যাপক নিয়েই ইউনিভার্সিটি, তা নিয়েই কলেজ। সত্য। কিন্তু আরও একটা কথা আছে মাঝখানে—'দু'য়ের যোগাযোগ'। মফঃস্বলের জীবনে তা ছিল স্বতঃসিদ্ধ ; কলকাতায় বোধ হয় কষ্টসাধ্য। ইদানীং অসাধ্যও বলা যায়। দশ বছর আগে স্কুলের ছেলেরা পরস্পরে কথা বলছে ; শুনেছি--

ডি. কে. বি. কিন্তু 'বুঝলে কিনা'—এ কথাও বলে না। এম. সি. সি. বলে 'বাড়ীতে বুঝে নিও, বইতে আছে।'

কৌতূহল তখনো মরে নি। জিজ্ঞাসা করি, ডি. কে. বি. কে ?

ম্যাথমেটিক্‌সের 'স্যর'।

নাম কি ?

ডি. কে. বি.।

পুরো নামটা কি ?

জানি না।

এম. সি. সি.—তাঁর পুরো নাম ?

জিওগ্রাফির 'স্যর'। পুরো নাম কে জানে ?

সুয়েজের ওপারের ওঁরা

খেলোয়াড় বা চিত্র-তারকার পুরো নাম, গোষ্ঠী-গোত্র মুখস্থ ; ডাকনাম, প্রেম-প্রণয়-বিবাহ-ছেদ-বিচ্ছেদ—ঠোঁটস্থ না থাকা লজ্জার বিষয়। কিন্তু মাস্টার মশাইদের পরিচয় খর্বিত, রক্ষিত তাঁদের স্বাক্ষরে। ওরূপই খর্বিত কলকাতার স্কুলের ছাত্র-শিক্ষকের যোগাযোগ। স্কুলে যতটা সংক্ষিপ্ত কলকাতার কলেজে স্বভাবতই তার চেয়ে যোগ সংক্ষিপ্ততর ; এবং অযোগই নিয়ম। শ' দেড়েক-

দুয়েকের এক-একটা ক্লাশ ; অধ্যাপনার নাম 'লেক্‌চর' ; তা 'ম্যাস মিটিং'য়ের গলাবাজি ; হয় দায়সারা, নয়তো ফাঁকিবাজি। স্কটিশ চার্চেস্‌ কলেজের ক্লাশ তখনো ম্যাস্‌ মিটিং নয়—দুয়ারবন্ধ ঘরে 'লেক্‌চর', মোটামুটি কর্ণস্পর্শী ; কিন্তু ছাত্র ও অধ্যাপক সকলেই দূরত্ব সম্বন্ধে সচেতন। বড় অধ্যাপকেরা জাতে স্কটিশ—তাঁরা সে বিষয়ে সচেতন। তাঁদের ও তাঁদের ছাত্রদের মধ্যে যোগ পাঠ্যপুস্তকের—তা'ই যোজক বা সুয়েজখাল। ছাত্রেরা চারদিকে অনুভব করে—সাত সমুদ্র তের নদী। কলেজে অবশ্য বাঙালী অধ্যাপকেরাও ছিলেন। অধর মুখুজ্জে প্রমুখরা অবসর নিয়েছেন। যুদ্ধের দিনে সে কলেজে ইণ্ডিয়ানাই-জেশন তখন অনেকটা অনিবার্য বলেই প্রারব্ধ। ভারতীয় অধ্যাপকরা বয়সে বা যোগ্যতায় যাই হোক, সাহেবদের 'জুনিয়র' সহযোগী ; তাঁরাও জানতেন—'ওঁরা ওঁরা, আমরা আমরা।' ভদ্রতার সম্পর্ক, এমন কি সমধর্মিতার সম্পর্কেও সে-বোধ বাতিল হয় না। বঙ্কিমের আমলের 'জাতিবৈর' স্বদেশী যুগের পরে বোমা পিস্তলের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় তখন অগ্নিগর্ভ। জালিয়ানওয়ালাবাগ ঠিক তখনি তার ঢাকনিটা আরো খুলে দিল। নন্‌-কো-অপারেশন এসে জানিয়ে দিল, ধামা-চাপা দেওয়ারও দিন গিয়েছে।

অথচ, ওই সাহেব অধ্যাপকেরা মানুষ হিসাবে মন্দ ছিলেন না। প্রিন্সিপাল জেম্‌স ওয়াট-এর মত কর্তব্যনিষ্ঠ, দক্ষ পরিচালক দুর্লভ। আমি অন্ততঃ দেখি নাই। দর্শনের অধ্যাপক আর্কুহার্ট সর্বসমস্যায় তাঁর পরামর্শদাতা ছিলেন। আর্কুহার্টের মত ধীর, স্থির-বুদ্ধি ও অধ্যাপনাকুশল অধ্যাপক তখন কলকাতায় বিরল। ওয়াটের নিকট ছাত্রদের অবারিত দ্বার, কিন্তু তা নিয়ম-বাঁধা। ছাত্ররা সবাই দেখা করতে পারে। পড়ার ঘণ্টার ফাঁকে ফাঁকে কলেজে ৫ মিনিট করে বিরতি। লাইন দিয়ে সে-সময় প্রিন্সিপালের ঘরের সামনে দাঁড়াবে ; যথাক্রমে ডাক পড়বে, ভব্যভাবে—কিন্তু সোজা হয়ে—দাঁড়াবে। সোজা হয়ে না দাঁড়ালে ওয়াট মনে করিয়ে দেবেন,—"সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে নিজের বক্তব্য জানাও।" তিনি উত্তর দিবেন হয় তখনি, নয় পরে। কিন্তু অকারণে কথা একটুও না বাড়িয়ে চলে এসো। কারণ তোমার পরেকার ছাত্র-বন্ধুটিকে মুখ তুলে ওয়াট ততক্ষণে ইঙ্গিতে ডাক দিয়েছেন। কলেজে কোনো ক্লাশে কি দু'দিন অনুপস্থিত ছিলে ? নির্ঘাত ওয়াট নিজে ক্লাশে এসে তোমাকে জিজ্ঞাসা করবেন, কেন ? সাফ্‌ উত্তর না পেলে বলে যাবেন—দেখা করো আমার ঘরে। অথবা, সাব্‌মিট রিটন এক্‌স্‌প্ল্যানেশন্‌—লিখিত কৈফিয়ৎ চাই। ক্লাশ ফাঁকি দেওয়া অসম্ভব। থার্ড ইয়ারের আর্টস ছাত্রদের তাঁর বাইবেল পড়াবার কথা। সকল ক্লাশের জন্যই প্রতিদিন আধ ঘণ্টা বাইবেল ক্লাশ নির্দিষ্ট। ওটা বাধ্যতামূলক নয়।

ওয়াটের বাইবেল ক্লাশে সে আধ ঘণ্টায় সবই শুনতে পারবে—একমাত্র বাইবেল ছাড়া। শুনতে পাওয়া যেত—ইউনিভার্সিটিতে (সিনেটে) কী কথা হচ্ছে ; কলেজের কোথায় কী ঘটেছে ; ছাত্রদের জন্য গ্রীষ্মে পানীয় জলের বিশেষ কী ব্যবস্থা হল, কলেজ লাইব্রেরীর কোন্ সুযোগ তারা পেয়েও নিচ্ছে না। 'অনেক টাকা দিয়ে কলেজ মানিকতলার খালের ওপারে নতুন খেলার মাঠ কিনেছে, তোমরা কেন তাতে আরও বেশি করে খেলতে যাও না ? কলেজের মধ্যেই তো ব্যায়ামশালা। জিম্‌নাস্টিকে তোমাদের আরও উৎসাহ থাকা উচিত ইত্যাদি।' শুধু কি তাই ? 'তোমরা কেন সংস্কৃত অনার্স পড়ছ না ? সংস্কৃতে বিদ্বানরা তো তোমাদের দেশের অলঙ্কার, তবে তোমাদের কেন যথেষ্ট আগ্রহ নেই সংস্কৃত পাঠে ?' 'শহরে বসন্ত হচ্ছে, টিকাদার আসছে কলেজে। প্রত্যেকের টিকা নিতে হবে ; টিকা না নিলে কেউ কলেজে ঢুকতে পাবে না'।—'ওই একটা রোগের ভয় আমার আছে। কলেরাকে ভয় করি না, জল ফুটিয়ে খাই। কিন্তু, বসন্তের বীজ যে হাওয়ায় ছড়ায়।' কখনো কখনো নীতিকথাও হত—দেহচর্চা, ফ্রি নাইট্ স্কুল ইত্যাদি। প্রিন্সিপালের এসব কথা শেষ হতেই ছাত্ররা কেউ বলে উঠত, 'হিয়ার', 'হিয়ার'। সহাস্যে একটু 'বো' করে ওয়াট্ আবার আরম্ভ করতেন নিজের কথা। ক্লাশ থেকে বেরিয়ে যাবার মুখে পিছন থেকে কে একবার বলে উঠল বাঙলায়, 'ওয়াট্ খুড়ী' ! ওয়াট ফিরে হেসে বললেন, 'মাই বয়েজ, জেম্‌স্ ওয়াট্ 'সি' নয়, 'হী'।' ভয়টা এ ভাবে কাটত, এক-আধটুকু যোগাযোগও দু'-এক অধ্যাপকের সঙ্গে গড়ে উঠতে পারত, কিন্তু ব্যবধান তো কাটবার নয়। পাঞ্জাব ও জালিয়ানওয়ালাবাগ কি ভুলবার মত ? নন-কো-অপারেশন তা ভুলতে দিত না। শেষে একটা গোলযোগও ঘটল, নন-কো-অপারেশনের দিনে। গান্ধীজীর কলেজ বয়কটের ডাকে ছাত্ররা বিচলিত, সাহেবরা তখন নানা ভাবেই বিড়ম্বিত। ছাত্ররা ফটকে ফটকে শুয়ে পড়ে পিকেটিং করছে—কেউ যেন না ঢোকে। ওয়াট্ নিকটে দাঁড়িয়ে—হয়তো বিড়ম্বনায় বিরক্ত। একটি শায়িত পিকেটরকে নাকি তিনি মাড়িয়ে যান অথবা জুতোর চাপ দেন। অধ্যাপক ভোলানাথ রায় তখন নতুন অধ্যাপক, ব্যাপারটা দেখামাত্র প্রতিবাদে তিনি উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। ওয়াট্ বলেন, না, তিনি কাউকে স্পর্শ করেন নি। অধ্যাপক রায় বলেন, 'আমি দেখেছি।' প্রতিবাদে ভোলানাথবাবু পদত্যাগ করলেন। দেশী সংবাদপত্রগুলি মওকা ছেড়ে দিলে না। ওয়াট্ যেন মুষড়ে গেলেন—তাঁর কথা কেউ বিশ্বাস করছে না।

স্কটিশ চার্চেস্ কলেজের হোস্টেলগুলি সমস্ত রকমেই আদর্শস্থল। চে

থেকে ৭০।৮০টি ছাত্রের ছাত্রাবাস। প্রায় প্রতি ছাত্রের একা একটি ঘর—প্রয়োজনানুযায়ী যথেষ্ট আসবাবপত্র, পরিচ্ছন্নতায় অতুলনীয়। পড়াশোনা ও খেলাধূলা হোস্টেলের ছাত্রদের দুই-ই কিছু কিছু না করলে নয়। একজন সাহেব অধ্যাপকের ওপর থাকত হোস্টেল-পরিচালনার চূড়ান্ত ভার—তাঁর সহকারী থাকত বাঙালী প্রাক্তন ছাত্র বা নতুন অধ্যাপক। আমাদের হোস্টেলে অধ্যাপক জে. সি. কীড্ ছিলেন তখন সুপারিণ্টেডেণ্ট। বছর ত্রিশের মত বয়স। দোতলায় তাঁর সপরিবারে স্বতন্ত্র বাস-ব্যবস্থা ; তা নেপথ্য-স্থান। সপ্তাহে এক-আধ দিন কীড্ সাহেব ছাত্রদের মহলে পরিদর্শনে আসতেন, তখন গল্প করতেন। খেলাধূলার নানা কথা হ'ত—বেশ মানুষ। যোগাযোগ ঘটত বৈ কি। কিন্তু কলেজে গেলে কি জানি কী হয়—ওই কীডই ভিন্ন মানুষ। তিনি ইকোনমিকস্-এর প্রোফেসর, পড়াতেন মন্দ নয়। কিন্তু সব যেন নিয়মে বাঁধা, দূর, সুদূর, সংযোগ-সহযোগহীন,—যেন শত্রুপুরী-শাসক। নন-কো-অপারেশনের শেষ দিকে—বোধ হয় ১৯২১-এ—কীড্ সাহেব বাইবেল ক্লাশ নিচ্ছেন। তিনি বোর্ডে কী লিখছেন—ছেলেদের মাথায় এল দুষ্টোমি বুদ্ধি। মেজেতে পা ঘষতে লাগল। প্রথমে দু'চারজন, তারপর অনেকে। কীড্ ফিরে তাকালেন,—অমনি সব চুপচাপ, শান্ত, নিরীহ ভালোমানুষ। বোর্ডে আবার লিখতে গেলেই অমনি পা-ঘষার শব্দ। বার বার তিন বার এই খেলা। কীড্ সাহেব এবার ফিরে তাকিয়ে কঠিন এক মন্তব্য করলেন, 'সামনে সাহস নেই—পিছন থেকে কেন।'—তারপর, 'এ জাতিরই ওই গুণ।' তৎক্ষণাৎ ক্লাশ নিস্তব্ধ। কী করবে, নিজে নিজে কেউ ঠিক করতে পারছে না। সব থম্ থম্—তা তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া। পরদিন স্ট্রাইক্—কীড সাহেবের ক্লাশ শূন্য। কারণ অসঙ্গত নয়, নিশ্চয়ই। পরের দিনও তাই। তৃতীয় দিনে, প্রিন্সিপাল ওয়াট্ এসে ক্লাশ-ঘরের বাইরে ছেলেদের ধরলেন—'আমার সঙ্গে চলো, ক্লাশে বসো।—একজন মানুষের কথায় কোনো জাতি ছোট হয়ে যায় না, জাতির অপমানও তাতে হোতে পারে না। দেখবে কীড্ও দুঃখিত।' ব্যাপারটা ওভাবে মিটে গেল। কিন্তু কলেজে কীড্-এর সঙ্গে যোগাযোগ আগেও ছিল না, পরেও হয় নি। অথচ, হোস্টেলে ওই কীড্-এর সঙ্গে আমাদের তখনো সম্বন্ধ ঘটত, হাসি-গল্পও হত। একটু তা মামুলী। প্রকাশ্যে বিরোধ কাটত, কিন্তু নাতিপ্রচ্ছন্ন ব্যবধান কাটত না।

ছাত্র ও অধ্যাপক একই কলেজে, একই ছাত্রাবাসে একত্রিত—কিন্তু কোথায় দু'য়ের যোগাযোগ? কদাচিৎ এক-আধটি ছেলে কোনো কোনো সাহেব অধ্যাপকের নিকটস্থ হয়ে উঠতে পারত। সে ছাত্ররা মিশুক প্রকৃতির। কেউ

কেউ শুশুক প্রকৃতির—ভেসে উঠতে চায়। সায়েন্স-পাঠী ছেলেরা বরং কিছুটা অধ্যাপকদের পরিচিত হয়ে উঠত। ল্যাবরেটারিতে সান্নিধ্য অনিবার্য। বিজ্ঞানের অধ্যাপকরা সকলেই বোধ হয় তখন ভারতীয়। সংস্কৃত ও বাঙলার অধ্যাপকরা বরাবরই ব্যতিক্রম। বিশেষতঃ দু'জনা—মন্মথ বোস মশায় (ইয়াঁকি নয়, বাঙলাদেশের সর্বপরিচিত নাম 'মোনা মাস্টার') ও তাঁর ছাত্ররাও সাদরে তাঁকে গ্রহণ করত। আর আত্মীয় ছিলেন কালী পণ্ডিত মশায়।

কলকাতার কলেজীয় দ্বীপের বাইরে ছাত্র-অধ্যাপকে সাক্ষাৎ দুর্ঘট। কিন্তু তখনো অধ্যাপকরা নামের হরফ হয়ে যান নি—ডি. কে. বি. কিম্বা এক্স, ওয়াই, জেড। কিম্বা হয়ে ওঠেন নি 'শ্রেণী-শত্রু'। দূর হলেও মুখ দেখাদেখি চলত।

স্কটিশ চার্চেস্ কলেজের অধ্যাপকরা কেউ কেউ পড়াতে জানতেন, সকলেই পড়াতে চাইতেন। ক্লাশে ফাঁকি দেওয়া অধ্যাপকদের পক্ষে তখন লজ্জাজনক, কলেজের শৃঙ্খলায় তা দুঃসাধ্যও। কারও কারও নাম আগেই শোনা,—যেমন, ফিলসফির আর্কুহার্ট, ইংরেজির স্ক্রিমজার। আর্কুহার্ট পরে কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলরও হয়েছিলেন। তাতেও সুনাম বজায় রেখে গিয়েছেন। ফিলসফি পড়ি নি, আর্কুহার্টের কাছে পড়ার সুযোগ পাই নি। কিন্তু স্ক্রিমজারের কাছে পড়েছি। জে. আর. স্ক্রিমজার শেক্স্পীয়র-বিশেষজ্ঞ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে দিয়ে সম্পাদনা করিয়েছিল "কমেডি অব এরর্স্।" তা 'বাউডলারাইজড্' বা অশ্লীলতা-বর্জিত সংস্করণ। মোট ব্যাপারটাই প্রহসন। শেক্স্পীয়রের অত নাটক থাকতে কেন পড়ানো 'কমেডি অব এরর্স্'? বিশ্ববিদ্যালয় বলতে পারত—বিদ্যাসাগর তাঁর উত্তর দিতে পারতেন, আমরা না। অত নাটক থাকতেও বিদ্যাসাগর কেন লিখতে গেছলেন 'ভ্রান্তিবিলাস'? একদিক থেকে ভালোই হয়েছিল। ক্লাশের পাঠ্য ও পরী-ক্ষণীয় বইগুলিতে আমার ঘোর অরুচি। কিন্তু বিপদ ছিল—শেক্স্পীয়রের কমেডি ভিন্নও একখানা ট্রাজেডি আমাদের পঠনীয় হত। আর সে বছর সে পঠনীয় ট্রাজেডি 'ওথেলো'। পাঠ্য বই হয়ে তা আমার কাছে কিছুটা ভক্তি-চন্দন লাভ করলে, ভালবাসা সে পরিমাণে পেল না। পরে এম. এ. ক্লাশে পাঠ্য হয় 'হ্যামলেট্', আমার প্রিয় নাটক। তার আগেও আমি বার কয় তা পড়েছি—এখনও পড়ি—মুগ্ধ আনন্দে, প্রীতিতে, বিস্ময়ে। 'ওথেলো'-ও পড়ি শেক্স্-পীয়রের অন্যান্য কয়টি ট্রাজিডির মত। তখন কিন্তু পরীক্ষা একেবারে ঘাড়ের ওপর এসে না-পড়া পর্যন্ত আমি ওথেলো ও হ্যামলেট্ হাতে নিতেও ছিলাম অনিচ্ছুক। কারণ, তখন যে-পরীক্ষার জন্য সে-নাটকের শব্দের অর্থ ও ব্যাখ্যার

কচকাচি আয়ত্ত করা প্রয়োজন—হাড় চর্বণ করে তার সার নিষ্কাশিত করা চাই। আর ওসব ভাবতেই আমার মন বিরস হয়।

তবু বি. এ. ক্লাশে স্ক্রিম্‌জারের কাছে শেক্‌স্‌পীয়র পড়তে গেছলাম অনেক আশা নিয়ে। স্ক্রিম্‌জার শেক্‌স্‌পীয়র-উৎসাহী, ক্ষ্যাপা মানুষ—লম্বা, রোগা, আপন উৎসাহে আপনি মত্ত। পড়াতে পড়াতে সশব্দে আপনি হাসেন, আপনি মাতেন, আপনি প্রায় নাচেন। কখনও দুঃখ পান, ব্যথিত হন। মাঝেমধ্যে ছাত্রদের মনে করে দু'-একটি মন্তব্য করেন। অনুচ্চ নাতিস্পষ্ট। স্কচ্‌ ছাঁদের উচ্চারণ অনভ্যস্ত কানে ধরতে পারি না। মনে মনে দুঃখ পাই—'হে বাঙাল, তুমি জানো না তুমি কি হারাইলে।' শেক্‌স্‌পীয়রের ছোঁয়াচ তাই স্ক্রিম্‌জার সাহেবের থেকে পাই নি। তাঁর উৎসাহে আমার উৎসাহ বাড়ত না। নামী অধ্যাপকের কাছে পড়েও প্রত্যাশিত সৌভাগ্য অনর্জিত থেকে গেল। অন্য সাহেব অধ্যাপকের কথা নিষ্প্রয়োজন। চতুর ক্যামেরন, মৃদু স্বভাব ওয়ারেন অধ্যাপক হিসাবে চলনসই। ক্লাশ করেন ক্লাশ করি, কখনও শুনি, প্রায়ই শুনি না। কানে যদি বা যায়, মনে যায় না।

এপারের এরা

স্কটিশ চার্চেস্‌ কলেজের তখনকার দু'জন যুবক অধ্যাপক আমার স্মরণীয়। তাঁদের প্রথম বৎসর পেয়েছিলাম, দ্বিতীয় বৎসর থেকে পাই নি। তাঁরা তখন বিলেত যান—'পারঙ্গম' না হলে কে মানে?

অধ্যাপক নির্মলকুমার সিদ্ধান্ত—অধ্যাপনায় তখনও নতুন। তিনি স্কটিশের প্রাক্তন ছাত্র, তখন আদৃত অধ্যাপক ও চশমার অন্তরালে বুদ্ধিদীপ্ত চক্ষু, সুস্থির শান্ত মুখশ্রী, স্বচ্ছন্দ বাচনভঙ্গী। তিনি গদ্য-সাহিত্য পড়াতেন—মেকলের ইংলণ্ডের ইতিহাসের প্রথম অধ্যায়। মেকলে গদ্যশিল্পী; কিন্তু প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর বাঙালী ছাত্রের পক্ষে তাঁর 'এসে'-গুলির মত তাঁর ইতিহাস তত সরস নয়। তবু আকর্ষণীয় হয়েছিল সে ক্লাশ। অধ্যাপক সিদ্ধান্তের পড়ানোতে বাক্‌-চাতুর্যে চমকিত করার চেষ্টা থাকত না, থাকত পাঠ্যবিষয়কে সহজগ্রাহ্য করে তোলার মত সরল, প্রাঞ্জল, অনাবিল বাক্‌-প্রবাহ, অনায়াস স্বচ্ছন্দ বাচন ভঙ্গি। ভালো লাগত ক্লাশটা। অনেক পরে তিনি যখন ভাইস্‌-চ্যান্সেলর—আমি তখন সিনেট সিণ্ডিকেটের সদস্য—আমার নাম ও মুখ—কিছুই আর তখন তাঁর মনে নেই—দাদার পরিচয়ে ('রঙ্গীনের ভাইর') তখন পাই সুস্মিত সম্মান—তখন দেখেছি, আমাদের সেই প্রিয় অধ্যাপকের প্রত্যাশিত পরিণত প্রৌঢ় রূপ—বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, সৌজন্যে, কর্তব্যবুদ্ধিতে, এমন কি

সময়োচিত সাহস ও কৌশলের প্রয়োগেও সুযোগ্য পুরুষ। সেই পঞ্চাশের দশকের দু-একটা কথা এখানে পারি বলতে—দ্বিতীয় দশকের প্রথম কলেজ-জীবনের কথার ক্রম ভঙ্গ করে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শতবার্ষিকী উৎসব (১৯৫৭ ইং) ভাইস্-চ্যান্সেলর সিদ্ধান্ত মশায়ের উদ্যোগে সাফল্যমণ্ডিত হয়। উৎসাহী সহযোগী অনেকেই ছিলেন। রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদের অভিভাষণে উদ্বোধন হয়, আর যখন সমাপ্তি-সম্ভাষণ তখন একবার নিজের অজ্ঞাতেই বলে ফেললাম, ওয়ার্দি অফ্ গ্রেট ইউনিভার্সিটি এ্যাণ্ড ইটস্ গ্রেট ভাইস্-চ্যান্সেলর।

গ্রেট কথাটি দ্বিতীয় স্থলে কি অতিশয়োক্তি ? 'গুড' বলাই ঠিক হ'ত ? না। নিশ্চিত হবার মত কারণ ছিল। দুটি গল্প বলি—যা আমার জানা ছিল।

কলকাতার একটি কয়েক হাজারি কলেজ। তার সত্ত্বাধিকারী ও পরিচালকরা বিত্তবান মানুষ—men of property, কলেজও তাদের একটা প্রোপার্টি। বছরের পর বছর ইউনিভার্সিটির নিয়মানুযায়ী কলেজকে ট্রাস্ট সম্পত্তি করবার প্রতিশ্রুতি দেন, বছরের পর বছর সে সব নিয়ম অমান্য করেই কলেজ-মালিকরা কলেজটি কুক্ষিগত করে থাকেন। কলেজ তাঁদের কলকাতার একটা রিয়াল প্রোপার্টি ; ছাত্র ও অধ্যাপক সেখানে একত্র হলেই বা কি, না হলেই বা কী ? নিজেদের সম্পত্তি নিজেরাই 'ম্যানেজ' করবেন। ছাত্রদের অভিযোগ 'ইটের আলমারি' তুল্য বাড়িটায় ছাত্রদের লভ্য সুযোগ নানাদিকে খর্বিত। পড়াশোনা, খেলাধূলা, চলাফেরা সবকিছুর জন্য মাসিক দক্ষিণা ছাড়াও ছাত্রদের অতিরিক্ত দক্ষিণা দেয়। সে দক্ষিণা আদায় হয়, কিন্তু প্রসাদ মেলে না। পরিচালনায় ছাত্রদের প্রতিনিধি কেউ কোথাও নেই। এদিকে না আছে পঠন-পাঠনের যথোচিত সুবিধা। অথচ ছাত্র বেড়েছে, আয় বেড়েছে, মালিকদের হাতে মুনাফা জমছে। বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের তথ্য জানতে চান, কলেজের কর্তারা সে কথা এড়িয়ে যায়। কখনো জানান—আয়ের কথাটা ভুল, সব ঘাটতি। কখনো আশ্বাস দেন—ছাত্র ও অধ্যাপকদের বক্তব্য সুবিবেচনা করে দেখছেন। এই 'লোকসানের ব্যবসাটা' বিষয়ে সিণ্ডিকেট বরাবরই সংশয়ী। ভাইস্-চ্যান্সেলর সিদ্ধান্ত মশায় সেদিকে দৃষ্টি দিলেন। সিণ্ডিকেট একটা সাব কমিটি নিয়োগ করলে, আমিও তার সভ্য। হঠাৎ একদিন সিদ্ধান্ত মশায় বললেন, 'ও গোপালবাবু, আর কিছু করা যাবে না।' একজন তখনকার গোদা কংগ্রেস মন্ত্রীর নাম করে তিনি বললেন, তাঁকে (মন্ত্রীকে) কলেজ করছে পরিচালকমণ্ডলীর ভাইস্-প্রেসিডেন্ট। তারপরে সিদ্ধান্ত মশায়ের মন্তব্য ইংরাজীতে। —'যে কলেজেই যখন গলদ তখনই সে কলেজে দেখি এই মন্ত্রী মশায়ের উদয়'। এ মন্তব্য অবশ্য জনান্তিক।

কিন্তু সিণ্ডিকেটের সাব্‌-কমিটির বৈঠক বসল, কলেজের খোদ মালিকরা তাঁদের বক্তব্য বলতে এলেন। আমি মনে মনে উদ্বিগ্ন। লোকগুলির ফাঁকি ধরিয়ে দিতেই হবে, তথ্য আমার হাতে আছে। কিন্তু উত্তেজনার মুখে কাজ যদি ভণ্ডুল করে ফেলি! মুখ খুলতে হবে সাবধানে। ভাগ্যক্রমে ঘটল তাই। প্রথমেই কথা পাড়লেন ভাইস্‌-চ্যান্সেলর অত্যন্ত অমায়িক সৌজন্যে (suavity), যাকে ম্যাথু আর্নল্ড বলতেন, সুইট রিজনেবলনেস। বললেন—আপনাদের অধ্যাপকদের দেখছি গ্রেড্‌ নেই। গ্রেড্‌ করছেন না কেন?

কলেজ-কর্তার উত্তর ঃ কলেজের ভয়ানক ঘাটতি।

কেন? ছাত্র তো আপনাদের ৭ হাজার।

হ্যাঁ। এবারের ভরতি মিলে ওরকমই।

তবে?—হিসাবপত্র সিদ্ধান্ত মশায়ের মুখস্থ। হিসেব করে বললেন, ছাত্র-বেতন মাসে হচ্ছে অত হাজার; মাসে বেতনে খরচ অত হাজার, অন্য খরচ অত হাজার। উদ্বৃত্ত মাসে ৫ হাজার, না?

কর্তার উত্তর ঃ না। খরচ আরও কিছু বেশী আর আয়ও কম। কারণ যারা ভরতি হয় তারা অনেকে পরে পড়া ছেড়ে দেয়। মিঃ সিদ্ধান্ত আগেই ভেবে রেখেছেন,—কত? অন্যান্য কলেজে গড়ে ছাড়ে শতকরা ৯ জন। তা আপনাদের কলেজে? না হয় ১২% ছাড়ুক। তাতেও আপনাদের বার্ষিক উদ্বৃত্ত থেকে যায় ৪০।৫০ হাজার টাকা। ব্যয়—কি করে তা হলে বেশি? কথা বেশি দরকার হল না। অর্ধেক মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখলাম অত্যন্ত সৌজন্যের সঙ্গে সিদ্ধান্ত মশায় সত্যটা প্রতিষ্ঠিত করে ফেলেছেন। মালিকদের মুখ দিয়েই নীরবে কবুল করিয়েছিলেন বছরে সত্যই ৫০।৫২ হাজার টাকা উদ্বৃত্ত থাকার কথা। সব দিকেই রহস্য ফাঁস হয়ে গেল—আমার মুখও খুলতে হয় নি। আমার বিবেচনায় এ হচ্ছে সুযোগ্য লোকের কৌশল।

দ্বিতীয় গল্পটি কিছুটা আমার পরোক্ষে ঘটে, কিছুটা প্রত্যক্ষে; কতকটা চাক্ষুষ জানা, কতকটা বাচনিক শ্রুত। সমগ্র কাহিনীটা পশ্চিম বাঙলার ইতিহাসেরও একটা অনুচ্ছেদ। পরিচ্ছেদটার যথোচিত সার-সংক্ষেপ এরূপ দাঁড়ায়।

মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায় ঘোষণা করে এলেন বঙ্গ-বিহার সংযুক্তি ঘটাবেন—জনমতের বালাই নেই। সাধারণের দুর্ভাবনা—কী করে তাঁকে নিরস্ত করা যায়। ইউনিভার্সিটির ক্ষেত্রেও আমরা চেষ্টা করি। নোটিশ দিলাম—'সিনেট বাংলা-বিহার সংযুক্তি অনুমোদন করে না'। বাঘা বাঘা সিণ্ডিকেটররা আমাকে বোঝাতে চাইলেন নোটিশ প্রত্যাহার করা উচিত। আমি অনড়। সিনেটের

বৈঠকের দিন এল। প্রথম দিকেই ভাইস্-চ্যান্সেলর সিদ্ধান্ত মশায় জানতে চাইলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে এ আলোচনা বিধি-সঙ্গত ('ইন্ অর্ডার') কী করে, কোন্ ধারায় ? প্রস্তুত ছিলাম। 'ইউনিভার্সিটি অ্যাকটের প্রথম ধারায়।' সে ধারাটা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জুরিডিকশান সম্বন্ধে। সমগ্র পশ্চিম বাঙলা রাজ্য সেই আইনের অধিকারভুক্ত। কিন্তু বঙ্গ-বিহার সংযুক্তিতে এই পশ্চিম বাঙলা থাকবে না। রাজ্য-সীমানা উঠে যাচ্ছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকারও বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তার অ্যাকটের মূলধারাই অর্থহীন হয়ে যায়। সিদ্ধান্ত মশায় অ্যাক্ট খুলে ১ম ধারা পড়লেন এবং পড়ে স্বীকার করলেন—হ্যাঁ, ঠিক। আলোচনা বিধিসঙ্গত।

তিনি সভাপতি। নিরপেক্ষতা ও বিচক্ষণতার সঙ্গে সভা চল্‌ল। প্রত্যেককে তিনি নিজ বক্তব্য বলতে দেবেন। প্রথম দিন সভার অনেকে বললেন। আমি প্রস্তাব তুলে বললাম প্রয়োজন হলে সর্বশেষে আমার বক্তব্য পেশ করব। সে দিন অধিবেশন বেশিক্ষণ চললে সকলের বক্তব্য পেশ হতে পারত—প্রস্তাব নিঃসন্দেহে গ্রাহ্য হত। কিন্তু ডক্‌টর রায়ের পক্ষীয়রা তা বুঝে ৭ দিনের জন্য আলোচনা মুলতুবির প্রস্তাব করলেন। সিদ্ধান্ত মশায় জানতে চাইলেন আমি তাদের প্রস্তাবে সম্মত কিনা ? অনুভব করছিলাম ডঃ রায়ের প্রস্তাব সিনেটের বারো আনা সদস্যেরই অনভিপ্রেত। ভোট হলে জয় আমাদের সুনিশ্চিত। কিন্তু সিনেট তো দেশের কর্তা নয়। আসল কর্তা আইনসভা। ডঃ রায় ওজর তুলবেন, সেনেটে তাঁর পরাজয় আকস্মিক ঘটনা। স্নাপ ভোট—সিনেট-সদস্যের সুচিন্তিত অভিমত নয়। ওই ওজরেই ডঃ রায় আইনসভাকে বলবেন সিনেটের মতামত অগ্রাহ্য করতে। কিন্তু ৭ দিন পরে অধিবেশনে আমাদের জয় হলে শুধু আমাদের পক্ষে ভোটের আধিক্যই প্রমাণিত হবে না, হবে আমাদের সর্বস্বীকৃত জয়। ডঃ রায়কে আমাদের মত অগ্রাহ্য করতে হবে ক্ষমতার অপব্যবহার করে। আমি ঝুঁকি নিয়ে বৈঠক মুলতুবিতে সম্মত হলাম। অনেক সত্যকার সুহৃদ আমার নির্বুদ্ধিতায় অবাক হলেন। জয়লক্ষ্মী আমি পায়ে ঠেললাম। কারণ সাত দিন সময় পেলে ডঃ রায় যা করবেন তাতে সিনেটের অনেকেই আর এদিনকার মত স্বমত প্রকাশে সাহসী হবেন না। আশঙ্কা অমূলক ছিল না ;—অমূলক নয় আমিও জানতাম ; কিন্তু সিনেটরদের আপত্তি সত্যই প্রবলতর, এই ছিল আমার ধারণা। সাত দিন পরেকার অধিবেশনে যা ঘটেছিল তা সুবিদিত। মুখ্যমন্ত্রী কোন চেষ্টাই বাদ রাখেন নি, নিজেই ব্যস্ত ও তৎপর হন। প্রায় জনে জনে প্রভাবিত করার চেষ্টা হয়। সজনীকান্ত দাসের মত সুচতুর কোন কোন সদস্য বুঝেছিলেন সভায় ভোট

দিলে দেশের কাছে মুখে দেখানো দুঃসাধ্য হবে। সজনী ঠিক সেদিনকার সভার সময়ে তাই সবান্ধবে ডাঃ রায়ের দরবারে গিয়ে সিনেটের এই কমিউনিস্টদের মুণ্ডপাত করাটা বুদ্ধিমানের কর্ম মনে করলেন। ডাঃ রায় কিন্তু গূঢ় অর্থ বুঝালেন ঃ 'তুমি তো সিনেটের মেম্বর। ভোট দিতে না গিয়ে এসেছ কেন?' ওরকম ওখানে আরও দু'-একজন মেম্বর উপস্থিত ছিলেন, সজনী একাই চতুর নন। এক সপ্তাহ পরে যখন বৈঠক বসল, সকলে সেদিন উৎকণ্ঠিত। ভাইস্‌-চ্যান্সেলর সিদ্ধান্ত সেদিন আরও শান্ত আরও স্থির। অবিচল নিরপেক্ষতায় প্রত্যেককে বলতে দেবেন। কিন্তু দু'বার বলবার অনুমতিও কাউকে দিলেন না। ডঃ রায়ের প্রধান সমর্থককেও না। আমি প্রথম দিনেই প্রস্তাব উত্থাপন করার সময়ে না বলে, পরে উত্তর দানেব সময়েই বক্তব্য বলবার অধিকার নিয়েছিলাম ; ভেবেছিলাম শেষ কথা বলতে সকলের উত্তরও দিতে পারা যাবে। কিন্তু সভার শেষে তাও মনে হল নিষ্প্রয়োজন। বলা বাহুল্য, বিরোধীদের বক্তব্য মোটেই সভার পাত্তা পাচ্ছিল না। কথা বাড়িয়ে কী কাজ? ভোটের সময় যখন এলো তখন আমাদের প্রস্তাব বিনা বাধায় গৃহীত হ'ল। ট্রেজরর সতীশ চন্দ্র ঘোষ মশায় জন্মসূত্রে বাঙাল, আমাদের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে একা হাত তুলেছিলেন প্রথম, তারপর অপ্রতিভ হয়ে হাত নামিয়ে ফেললেন, বাঙালত্ব ঘোচালেন। মূল প্রস্তাবটা আমার, আমার তাই সৌভাগ্য বটে, কিন্তু জয় হ'ল তো বাঙলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের সুস্থ বুদ্ধির ও সৎ সাহসের।

কথা হবে, এর মধ্যে ভাইস্‌-চ্যান্সেলর সিদ্ধান্ত মশায়ের কৃতিত্ব-অকৃতিত্ব কোথায়? সে তথ্যটি আমার পক্ষে পরোক্ষপ্রাপ্ত, কিন্তু সম্পূর্ণ বিশ্বস্তসূত্রে। মুখ্যমন্ত্রীর মুন্সিখানার অনুচরদের কারো কারো দ্বারা উক্ত ও সমর্থিত।

প্রথম সভা ৭ দিন মুলতুবী হতেই ডাঃ রায় প্রথমেই ভাইস্‌-চ্যান্সেলরকে তলব করলেন 'নির্মলকে ডাকো।' যথাসময়ে ভাইস্‌-চ্যান্সেলর সাক্ষাৎ করতে এলেন মুখ্যমন্ত্রীর কক্ষে। চিরদিনের মতই মিঃ সিদ্ধান্ত শান্ত সুস্মিত মুখ, সুপরিচ্ছন্ন বেশবাস ; সমুজ্জ্বল পুরুষ।

অবিলম্বেই শোনা গেল ডাঃ রায়ের উচ্চকণ্ঠ, ক্ষুব্ধ স্বর—তুমি ও-প্রস্তাব তুলতে দিলে কেন সিনেটে? শান্ত কণ্ঠের উত্তর শোনা গেল—কী করা? ইউনিভার্সিটির অ্যাক্ট অনুসারে তা বৈধ, 'ইন্‌ অর্ডার' যে—। আরও ক্ষুব্ধ কণ্ঠ ও তিরস্কার,—ইন্‌ অর্ডার হ'ল তো কী হ'ল? তুমি রুল আউট করলেই তো হ'ত।

।—সে কি করে সম্ভব?

উত্তর প্রায় ভৎ'সনাসূচক।—এজন্য তোমাকে লক্ষ্ণৌ থেকে এনেছি?

অন্য পক্ষ নিরুত্তর, স্তব্ধ, গম্ভীর। ডাঃ রায় উচ্চকণ্ঠ। সেই উচ্চ গ্রামে মিনিট পনের তা চলল। শেষে—'আমি দেখছি সিনেটে কী হয়।' ভাইস্-চ্যান্সেলর প্রায় নীরবে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এলেন। শান্ত মুখশ্রী বিষম গম্ভীর, মর্যাদাময় স্থির গতিভঙ্গি আরও সুস্থির, কারও দিকে দৃক্‌পাত নেই—মুন্সিখানার বা বারান্দার কারও দিকে।

এই নেপথ্য-তথ্য জানলে বোঝা যায় নির্মল সিদ্ধান্ত শুধু বুদ্ধিমান, সযত্ন সুবেশী পরিমিতমনাঃ কৃতী বাঙালি নন। সাহসী আত্মমর্যাদাসম্পন্ন মানুষও। স্বতঃস্ফূর্তভাবেই তাই শতবার্ষিকী উৎসবে বলে ফেলেছি গ্রেট শব্দটাই বিশ্ববিদ্যালয়ের গর্ব করার মত তার ভাইস্-চ্যান্সেলর। আমার ঠিক পাশেই তখন ছিলেন মিসেস্ সিদ্ধান্ত, তাঁর চোখের উৎফুল্ল কৌতূহলী দৃষ্টি আমার মুখের দিকে। জানালাম প্রোফেসর সিদ্ধান্ত আমার প্রথম কলেজ জীবনের অধ্যাপক। 'উই আর প্রাউড অব আওয়ার প্রোফেসর।' জানাতে হ'ল—তাঁকে এক বৎসরই মাত্র স্কটিশে পেয়েছিলাম—সে সময়েই তিনি বিবাহ করেন। মিসেস্ সিদ্ধান্তও কৌতূহলী মানুষ—আমার পরিচয় সংগ্রহ করলেন। না জানিয়েও পারলেন না, 'আপনাদের সঙ্গে তা হলে আমার দু'পুরুষ পরিচয়।' সবিনয়ে বল্‌লাম আমি আবাল্য তা জেনে এসেছি। কিন্তু অধ্যাপক-ছাত্রে কলেজ-জীবনে পরিচয় গড়ে উঠে নি। সে সময়ে অধ্যাপক নির্মল সিদ্ধান্তের সঙ্গে পরিচয়ের সূত্র ক্ষীণ ছিল। পরীক্ষা-সূত্রে একবার পরিচয় হতে-হতে হয় নি। আমি ক্লাশে সেদিন ছিলাম না।

ওরূপ সূত্রেই ডঃ কালিদাস নাগের সঙ্গে তখন পরিচয় হয়েও যোগ হয় নি। তিনিও তখন চলে যান বিলাতে। ছাত্র-অধ্যাপকে যোগ ঘটেছিল—কলেজে নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ে নয়—আট বৎসর পরে 'প্রবাসী' অফিসে। তিনি তখন ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ডঃ কালিদাস নাগ, আমি ঐ অফিসের আংশিক কর্মী, 'শনিবারের চিঠি'র চক্র-প্রান্তিক সদস্য। সে সময় পরিচয় হলে সবিনয়ে জানালাম, 'আমি আপনার ছাত্র ছিলাম'। তৎক্ষণাৎ ডঃ নাগ স্নেহ সুস্মিত মুখে বল্‌লেন, 'তাই বলো, মুখচেনা মনে হচ্ছিল।' চেনার মত মুখ আমার নয়—এটি আবাল্য জানা। তা হলেই বা কি ? ডঃ নাগের কাছে কার মুখ অচেনা ? সে মুখ মনে থাকার দরকার হয় না। বছর দুই পরে আমার ভাই সাধুর (প্রফুল্ল হালদারের) সঙ্গে ডঃ নাগের দেখা। সে জানাল আমিও স্কটিশের ছাত্র। মুখের কথা শেষ হবার আগেই ডঃ নাগ বললেন, তাঁই দেখেছি—মনে হয়। সাধু বলতে পারল না—সে যখন সে কলেজে পড়তে

আসে (১৯১৯-এর মধ্যভাগ) ডঃ কালিদাস নাগ তখন বিলাতের পথে বা বিলাতে। দেশে থাকলেও কি সত্যই যোগ ঘটত ?

কালিদাসবাবু প্রসন্ন সদাশয়তায় সকলকেই চান স্নেহ-সৌহার্দ্য বিতরণ করতে। তা করতেও তিনি পারেন। দলগত মত তর্ক ওসব নিয়ে খোঁজা-খুঁজি তাঁর স্বভাব-বিরুদ্ধ। অমায়িক বাক্যে সকলে স্বীকৃত, সকলে স্বচ্ছন্দ ; স্নেহেও সকলেই অনুগৃহীত। অন্ততঃ আমি। যারা তাঁর সাক্ষাৎ পেয়েছি, তারা দেখেছি কালিদাসবাবু দূরত্বরক্ষী মানুষ নন। এমন কি, পরিশীলিত আলাপ-আলোচনায়ও কাউকে অপাঙ্‌ক্তেয় মনে করেন না। কেউ দেখবে না তাঁর বাক্যালাপে প্রকাশ-কুণ্ঠা, কিম্বা আচরণে গর্বের গন্ধ। ব্যক্তিগত সম্ভাষণে কেউ থাকবে না অনাদৃত। কথা ও কল্পনায় সরসিত বক্তৃতা সভাক্ষেত্রে শুনে সবাই ঘরে যাবে এক পকেট উৎসাহ নিয়ে। অবশ্য বাড়ি ফিরতে ফিরতে সে পকেট খালি হয়ে যেত। সাংস্কৃতিক ভাষণের তাই তো নিয়ম—তা যে নৃত্য-নাট্য নয়। ভালো বক্তৃতা উপভোগ্য, কিন্তু তা সঞ্চয়-উপযোগী নয়। কালিদাসবাবুর ক্লাশে আমরা পড়েছিলাম গ্রীক্ ইতিহাস। তিনি এক বৎসর কাল পড়ান,—আসলে তা কয়েক মাস। সে ইতিহাসের প্রারম্ভ-পর্ব নিয়ে তিনি বক্তৃতা দিয়ে চললেন। তা ছিল প্রাক্-হেলেনিক ইজিয়ান অধ্যায়ের কথা। শুধু কি তাই ?—গ্রীক ইতিহাসের সেই সল্‌তে পাকানোর কথাই শুধু নয়, সেই সঙ্গে ভারত-ইতিহাসের প্রাচীন পর্বের কথাও। তখনও মোহেন-জো-দড়ো, হরপ্পা অনাবিষ্কৃত। না হলে কালিদাসবাবু অন্ততঃ তাঁর ছাত্রদের সে বার্তাও সোৎসাহে বিবৃত করে চমৎকৃত করতেন। কোথায় থাকত তা হলে গ্রীক্ ইতিহাস একপাশে জমা হয়ে। শুধু ইতিহাসই বা কেন ? তাঁর ক্লাশে কি না শুন্‌তাম ? রবীন্দ্রনাথ, প্রাচীন ভারতীয় শিল্প-সভ্যতা, গান্ধার আর্ট, অজন্তা, ইলোরা, যুদ্ধান্তের (১৯১৮) পাশ্চাত্য সভ্যতার 'রিবারবারি জেশন'—কথাটা তাঁরই মুখে প্রথম শুনি ; তখন থেকেই তা কানে গাঁথা, মনে গেঁথে রাখতেও কম চেষ্টা করি নি। আশ্চর্য হয়ে শুনতাম। তবে ইতিহাসই শুনেছি কম, গ্রীসের ইতিহাস উপলক্ষ মাত্র। অবশ্য কল্পনার রঙে ক্লাশ জমত। বর্ষশেষে আমরা অ্যাথেন্সের অভ্যুত্থানের কাছাকাছি পৌঁছেছিলাম কিনা মনে নেই। পেরিক্লিসের নাগাল পাই নি, তা বলতে পারি। পরীক্ষার পড়া হিসাবে বিশেষ কিছু হ'ল না। আমার তাতে আপত্তি নেই, শোনা হ'ল অনেক কিছু—মন যা জানতে চায়। তার চেয়েও, একজন প্রাণবান, উৎসাহী, সুশিক্ষিত মানুষের কল্পনা-কুশল ইতিহাস-কথনের সূত্রে ষোল বছরের কল্পনাপ্রবণ যুবক মন উৎসাহের স্পর্শ পেয়ে ধন্য হয়।

উৎসাহ জিনিসটা কালিদাসবাবুর স্বভাবগত। 'গ্রেটার ইণ্ডিয়া সোসাইটি' জেঁকে উঠেছিল তাঁর মত মানুষের উৎসাহে,—অবশ্য তা জন্মে ১৯২৫-এর পরে। তিনি তার প্রথম সম্পাদক ; সদস্যদের মধ্যে ছিলেন তাঁদের দিনের দিকপাল যুবক পণ্ডিতেরা—সুনীতি চাটুজ্জে, হেম রায়চৌধুরী, প্রবোধ বাগচি, সুবোধ মুখুজ্জে প্রভৃতি। শীর্ষে বোধহয় রবীন্দ্রনাথ—যিনি একালের গ্রেটার ইণ্ডিয়ার মহা-উদ্গাতা। উনবিংশ শতাব্দীতেও গ্রেটার ইণ্ডিয়ার একটা ব্যভিচার-বিলাস হয়েছিল—সাগরপারে ভারতীয় কুলী চালান দিয়ে। ইংরেজ তার স্রষ্টা ছিল—নিজের গ্রেটার শোষণের প্রয়োজনে। বিংশ শতাব্দীতে আমরা জাতিস্মর হয়ে উঠলাম। ভারতীয় মৈত্রী-ভাবনার স্মৃতি-স্বপ্ন তখন রচনা করেন প্রথম বিশ্ব-ভারতীর কবি-প্রতিষ্ঠাতা। গ্রেটার ইণ্ডিয়া সোসাইটির বাঙালি অধ্যাপকরা সে স্বপ্ন-পথের সন্ধান পান একদিকে রবীন্দ্রনাথ থেকে, অন্যদিকে ফরাসি ওলন্দাজ ইংরেজ প্রভৃতি প্রাচ্যবিদ্ পণ্ডিতদের মধ্যএশিয়ায় ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় পুরাতাত্ত্বিক গবেষণায় ; তাতে তাঁরা আবিষ্কার করলেন ভারতের প্রসার। তাঁরাই সে পথ আবার পরিচিত করে তোলেন অন্য ভারতীয়দের কাছে, অবশ্য রবীন্দ্রনাথই পুরোধা। সে সময়টাতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতির আলোচনায় উৎসাহের হাওয়া জাগল ; কিন্তু আমাদের ছাত্রজীবন তার পূর্বে ঝরে পড়ে ধূলায় লুটোচ্ছে। প্যারিস-ফেরতা কালিদাসবাবু তখন উৎসাহের উচ্ছ্বসিত উৎস। তাঁরই এক সহযোগী বন্ধুর সরস ভাষায়—"কালিদাসবাবু আমাদের জয়ঢাক বাজিয়ে যাবেন।" কিন্তু ওস্তাদ ঢাকী। ঢাকের বাদ্যে ত্রাহি ত্রাহি ডাক না ছাড়িয়ে আগ্রহী করে তোলা কি কম ওস্তাদি ? বিশের দশকের আমরা কলেজ-ছাড়া বাঙালি যুবকরা তাতে রীতিমত নেচে উঠতাম। একদিকে দেখি—বীণাহস্তে রবীন্দ্রনাথ 'সাগরজলে সিনান করা' রূপসীর দ্বারে স্বাগত ; অন্যদিকে ডঃ কালিদাস নাগ-প্রমুখরা ভারতীয় সংস্কৃতির জয়ঢাক নিয়ে কখনো জাভায়, কখনো চীনে। এভাবে ভারতীয় জাতীয়তার সঙ্গে সাংস্কৃতিক ও আন্তর্জাতিক দুই ভাবসূত্রের গ্রন্থিবন্ধন করেছিল কবি ও বাঙালি গবেষকরা। তাতে ভারতীয় জাতীয়তায়ও সাংস্কৃতিক ছোপ পড়েছিল।

পরে দেখেছি, কালিদাসবাবু (১৯২৬-২৭ ?) রম্যাঁ রলাঁকে লম্বা লম্বা পত্র লিখছেন ; উত্তর আসছে 'প্রবাসী' অফিসের ঠিকানায়। কালিদাসবাবু তা তর্জমা করে আমাদের শোনাতেন। রলাঁ তখন 'মহাত্মা গান্ধী' লিখছেন। এর পরে লিখতে চান 'বিবেকানন্দ' ও তাঁর গুরু 'রামকৃষ্ণ'।—'আধুনিক ভারতের শ্রেষ্ঠদান কিন্তু যুগস্রষ্টা রামমোহন'—কালিদাসবাবুরা এই বলে রলাঁর

দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন। উত্তরে রলাঁ তাঁর কথাটা স্বীকার করেন। কিন্তু রলাঁর চোখ বিবেকানন্দ ও রামকৃষ্ণেই নিবদ্ধ। পরে তা চলে যায় গাঁকির দেশে, সে অন্যপর্বের কথা। কালিদাসবাবুর উৎসাহে ভাঁটা পড়ত না। পৃথিবীর চোখ তিনি ফেরাবেন ভারতের প্রতি, রামমোহন রবীন্দ্রনাথের ঐতিহ্য—উৎসে, তা পেরিয়ে বুদ্ধ অশোক দীপঙ্করের দিকে।

ডঃ কালিদাস নাগের উদয়-ছটাও ক্রমে কত দিকে প্রসারিত হয়ে গেল। চীন ছাড়িয়ে তুর্কি, জাপান ও সুদূর প্রাচ্যএশিয়ার আত্মীয়-গোষ্ঠীতে তা ছড়িয়ে যায়, আর শুধু সেই প্রাচীনকালে নয়, আধুনিক কালের বাস্তব আদান-প্রদানেও তাঁর আগ্রহ-উদ্যম। জেল ফেরত (১৯৩৮) আমাকে সুদূর প্রাচ্যের তৎকালীন ব্যাপারে গবেষণার জন্য তিনি ডেকে পাঠান। জাপানের 'কো-প্রোস্‌পারিটি তত্ত্ব' বোঝা দরকার। কিন্তু আমার চোখে তখন অন্য নেশা—ভারতের স্বাধীনতার সঙ্গে আধা-লালরঙে চোখ রঞ্জিত। মাঞ্চুরিয়ায় ও চীনে জাপানীদের কাণ্ডে ভারতবর্ষে আমরা তখন জাপানের প্রতি বিরুদ্ধতায় ক্রুদ্ধ। রবীন্দ্রনাথের জাপানী প্রীতিও নোগুচির ন্যাকামি সহ্য করে না। আর আমরা উষ্ণ মস্তিষ্ক মানুষরা এ সময়ে জাপানের তত্ত্ব ব্যাখ্যা করব ? তবু যুদ্ধকালে চমকে উঠলাম। ব্রিটিশ সরকারের কি ডঃ নাগের মত এমন রাজনীতিতে নিষ্কলঙ্ক মানুষকে আবদ্ধ না করলে চলছিল না ? সরকার জমকালো কারণ দেখাত নিশ্চয়—যা যম-কালো। কিন্তু এসবে বিপরীত ফলই ফলে ; এ ক্ষেত্রেও ফলল। বছর কয় পরে ডঃ নাগও তখন নতুন স্বাধীনতার হাওয়ায় রাষ্ট্রপতির মনোনয়নের পাল তুলে রাজ্যসভার যাত্রী হলেন। তখন দস্তুরমত তিনি পলিটিক্যাল ম্যান। দেশের পণ্ডিতেরা আরও অনেকেই তখন হঠাৎ পলিটিক্যাল লীডারশিপ্ রপ্ত করতে উদ্যোগী। সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ সকলের পুরোধা। নতুন শাসকগোষ্ঠীর পক্ষে সুবুদ্ধির কাজই হয়েছিল, শিশুরাষ্ট্রে, জ্ঞানীগুণীদের সৎপরামর্শ প্রয়োজন। রাজনীতির সেই শিরোপা পণ্ডিতদের মাথায় তেমন খাপ খেয়েছে মনে হয় নি। রাজনীতিতে তাঁদের দেবার মত কিছু কি ছিল ? না, তা নেবার মতও সেখানে কেউ ছিল ? দেখে-শুনে আজ তো তা মনে হয় না। কালিদাসবাবুর সম্বন্ধেও এ কথা মনে হয়েছে। তিনি রাধাকৃষ্ণণ নন, তবু কতকগুলি দরবারী গুণ কালিদাসবাবুর ছিল। প্রিয়দর্শন, প্রিয়ভাষী, সর্বজন-সুহৃদ—সকল বিষয়েই ভাষণকুশল। আমরা কিন্তু জানতাম—দেখেছিও—তার চেয়েও বেশি আরও সহৃদয়সম্মত গুণ—স্নেহ-প্রীতি-অমায়িকতা। সকলের জন্য তাঁর প্রীতি, সকলের কথায় তাঁর সহজ সম্মতি। কালিদাসবাবু আমাদের কাউকে কখনও 'না'বলেছেন মনে পড়ে না। কারও ঝোঁক গুপ্ত রাজনীতিতে—,—কালিদাসবাবুর তাতেও অন্ততঃ মুখে 'না'

নেই। আবার মুক্ত রাজনীতিতে যাঁরা প্রথম পক্ষের বিরোধী, তাঁদেরও বলবেন 'হ্যাঁ'। সমাজতন্ত্র চাই? ঠিকই তো। সাম্রাজ্যবাদী জাপানের সঙ্গে চাই কি বৈষয়িক কাম্ সামাজিক আদান-প্রদান? ঠিক কথা। বাধা দেওয়া একটা মূঢ়তা, এবং মূঢ়তাও, কে মানে কার বাধা? কিন্তু তাই বলে তিনি নিরুদ্দেশের যাত্রী নন—দিগ্‌বোধ ঠিক আছে। ঊনবিংশ শতকের বাঙালি লিবরেলদের তিনি বিংশ শতকীয় উত্তরসূরী এবং রাবীন্দ্রিকী কস্‌মোপলিটান।

'রাবীন্দ্রিক'—মনে পড়ে, ১৯১৮ সালেও কিন্তু ও ভাবটা সর্বগ্রাহ্য নয়। স্কটিশ চার্চেস্ কলেজে সংস্কৃত ও বাঙলার অধ্যাপক কালী পণ্ডিতমশায় আমাদের তা জানিয়েছেন। বোধ হয় বাঙলা টিউটোরিয়াল বা সাময়িক পরীক্ষা হয়েছিল। আমি তাঁর কাছে প্রথম হয়ে যাই। ক্লাশে খাতা হাতে নিয়ে পণ্ডিতমশায় দেখতে চাইলেন ছেলেটি কে? মোটেই দেখবার মত ছাত্র নয়; দৃষ্টি-দাক্ষিণ্যে সঙ্কুচিত, বাক্‌কুণ্ঠ। তাঁর কাছে ডাকলেন, কী নাম, কী ধাম, ইত্যাদি জিজ্ঞাসা। সবিনয়ে জানালাম, আমি বাঙাল, স্যার।

বাঙাল! তাতে হয়েছে কি?—

পণ্ডিতমশায় ভাবলেন তুচ্ছদর্শন ছেলেটার ইনফিরিয়ারিটি কমপ্লেক্স। আসলে দুষ্টবুদ্ধি ছেলেটার কিন্তু ওটা লেগ্‌পুলিং। সস্নেহ কণ্ঠে পণ্ডিতমশায় পরিচয় নিলেন। পরে বললেন, যাও, সীটে বসো গিয়ে।

ক্লাশে এবার লেখাটার প্রশংসা করে শেষে বললেন, 'কিন্তু'—। কিন্তু কী? সকলেই জিজ্ঞাসু। 'রবীন্দ্র-গন্ধী'; তা'ই সম্পূর্ণ তিনি খুশি নন্। মজা করেই বলেছিলেন কথাটা, ক্লাশ মজাও পেল। কিন্তু তাদের সায়ও ছিল পণ্ডিতমশায়ের সে মন্তব্যে, তা বুঝলাম। নিজের লজ্জার কারণ দেখলাম না। সে সুযোগও হ'ল না। বছর পার হতেই এল পাঞ্জাবের ওপর ও'ডায়ারের জঙ্গী নাচন; জালিয়ানওয়ালাবাগ-এ দেখলাম জেনারেল ডায়ারের মানুষ শিকার; আর সঙ্গে সঙ্গে বেরুল কবির নাইট্‌হুড ফিরিয়ে দিয়ে সেই চিরস্মরণীয় প্রতিবাদ-পত্র। রবীন্দ্র-দর্শনের স্বরূপ কখনো তো দুর্জ্ঞেয় ছিল না,—আমার মত অপরিণত যুবকেরও তো অনুভব-গম্য হয়েছিল 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম', ছোট ও বড় 'বাতায়নিকের পত্র'। পণ্ডিতমশায়রা হয়তো তবুও ভাবতেন, 'ঠাকুরবাড়ির মাপা হাসি ও মাজা কথাই' বুঝি রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে কতখানকার এবং রবীন্দ্রনাথ যে কত রবীন্দ্রনাথ, অথচ আবার আমাদেরই লোক, তা তাঁদের বুঝবার অবসর ছিল না।

কালী পণ্ডিতমশায়ের ছাত্র-বাৎসল্য ও মন্মথ বোস মশায়ের তিন-যুগ ব্যাপ্ত ছাত্র-সৌহার্দ্য আমাদের তখনকার ছাত্রজীবনকে সিঞ্চিত করত। তাঁরা

পড়াতেন বাঙলা—তাই বোধহয় ক্লাশটা হ'ত শিক্ষক-ছাত্রের যোগাযোগের ক্লাশ। কিন্তু বাঙলা তখনো পড়া অপেক্ষা না-পড়ারই বস্তু। শিক্ষণীয় নয়, কারণ তা মাতৃভাষা ; মাতৃভাষার তাতেই তো পরিচয়, তা শিখতে হয় না। আমরা ছাত্ররাই কি অন্য রকম মনে করেছি ? তখন তো ভারতীয় আধুনিক ভাষার এম. এ. ক্লাশ খোলা হয়েছে (১৯২১-এ)। স্বয়ং শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সে ক্লাশে ভর্তি হয়েছিলেন, বাঙলায় এম. এ. পাশ করেন, তাতে ক্লাশটার মর্যাদাও বাড়ে। বাঙলায় এম. এ.-দের তখন মুরুব্বির অভাব হ'ত না। ডঃ দীনেশ সেন ও স্যার আশুতোষ তাঁদের মুরুব্বি। তবু আমরা মনে মনে জানতাম বাঙলা জীবিকার জিনিস নয়—জীবনের জিনিস। সত্যই। বিশেষত ! যদি বাঙলার শ্রীবৃদ্ধি চাই তা হলে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের ও শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-সম্পদের সঙ্গে বাঙালির আরও পরিচয় প্রয়োজন। নিজেরা তাতে পুষ্ট হলেই লাভ হতে পারে বাঙলা ভাষাকে পুষ্ট করার যোগ্যতা। আমার তাই ইতিহাস পড়তে যাওয়া হ'ল না, বাঙলাও না। বি. এ. অনার্স পড়লাম ইংরেজিতে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছত্রচ্ছায়া

এম. এ.-র বেলা নতুন করে নতুন কিছু পড়া সম্ভব নয়। অনার্সের ফলটা তা আরও সুস্থির করে দেয়। *ইংরেজিতে পড়ব এম. এ.। কে জানত কলেজের বাইরে জীবন-নিয়ন্তা তখন হাসছিলেন—কে জানে তার ছলাকলা ? সাহিত্য থেকে ভাষাতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব থেকে সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব থেকে সমাজতত্ত্ব,* সমাজতত্ত্ব থেকে সমাজতন্ত্র,—কার্যক্ষেত্রে দেখলাম ইংরেজি ছাড়িয়ে কোথায় নিয়ে যায় যুগের জিজ্ঞাসা। বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনটাই অধিগত করা চলত না —ইংরেজিই পড়ি আর বাঙলাই পড়ি। কী হ'ত যদি বা পড়তাম বিজ্ঞান বা অর্থশাস্ত্র ? তবে আমরা ইংরেজি পড়েছিলাম কতকটা জীবিকার দায়েও। তখন ইংরেজি ভারতবর্ষে জীবিকার সকল দুয়ারের চাবি, ইউনিভার্সেল কী। আরও একটু গোপন কারণও ছিল—প্রেম। স্বীকার করতে লজ্জা কী—ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গে প্রেমে পড়ে গেছ্‌লাম।

ইংরেজি সাহিত্য পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্য, তবে আমার মুখে কথাটা হাস্যকর। পৃথিবীর কয়টা ভাষা ও সাহিত্য আমি জানি ? কিন্তু কথাটা বিশ্বাস করি। বছর দশ আগে (১৯৫৮ ?) নীরদচন্দ্র চৌধুরী একদিন দেখা হতেই বলেছিলেন "গোপালবাবু, ইংরেজি লেখা ছেড়ে দিলেন ? —লেখেনই যদি লিখুন সে ভাষায় যে ভাষায় পাবেন শ্রেষ্ঠ পাঠক-সমাজ, আর যে ভাষা দিতে পারে আপনাকে

উপযুক্ত দক্ষিণা।” কথাটা অকাট্য সত্য—কিন্তু সেই ভাষা লিখতে জানা চাই। ইংরেজিকে প্রেমের জোরে জয় করা আমার পক্ষে সাধ্যাতীতও। প্রেম কম ছিল না, কিন্তু ইংরেজি এই বঙ্গ-সন্তানের প্রেমে বশ হবার মত ভাষা নয়—বড়জোর, তিনি করুণাবশে—অবজ্ঞায় নয়—মোহমূঢ়কে দু-এক মুঠো দাক্ষিণ্য ভিক্ষা দিতে পারেন। কারণ, প্রেম নয় শুধু, তার প্রতি আমার ছিল শ্রদ্ধা-সম্ভ্রমও। উৎকর্ষে বৈচিত্র্যে বিশালত্বে সত্যই ইংরেজি রাজেন্দ্রাণী। ইংরেজিতে এম. এ. পড়তে গিয়ে সেই শ্রদ্ধা ও সেই সম্ভ্রম-বোধ না খুইয়ে যে বেরিয়ে আসতে পেরেছি—এ কথাটা সামান্য নয়। অন্ততঃ আমার পক্ষে তা সহজ ছিল না।

অধ্যাপক-স্মৃতিরেখা

এখনকার কথা জানি না—তখনকার (১৯২২-১৯২৪) আমাদের এম. এ.-র ইংরেজি অধ্যাপকরা ছিলেন সুপণ্ডিত ও সুবিখ্যাত। খ্যাতির চেয়ে বিদ্যাই কি তাঁদের কম ছিল? না, বিদ্যার থেকে কম ছিল তাঁদের বিদ্যাদানের চেষ্টা?

হেনরি স্টিফেন ঃ হেনরি স্টিফেন ছিলেন ইংরেজির মুখ্য অধ্যাপক। ঋষিতুল্য পুরুষ। তখন তিনি বৃদ্ধ। আগে ছিলেন সেদিনের স্কটিশ চার্চেস্ কলেজের দর্শনের খ্যাতনামা অধ্যাপক। প্রাচীন বলে অধ্যাপনা থেকে অবসর গ্রহণ করছিলেন, দেশে ফিরবেন। তাঁর বিদায় সভা, স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সেখানে উপস্থিত। তিনি সে সময়ে ইউনিভার্সিটির এম. এ. ক্লাশ পত্তন করছেন। বৃদ্ধ অধ্যাপককে আশুতোষ বললেন, ‘যাবেন কোথায়? আমরা ইউনিভার্সিটিতে ক্লাশ খুলছি। আপনাকে যেতে দোব না—সেখানে পড়াবেন।’ রাজী হতে হ’ল অধ্যাপক স্টিফেনকে—তবে দর্শন আর তিনি পড়াবেন না, অন্য কোনো বিষয়। ‘তথাস্তু’—স্যার আশুতোষ স্থির করলেন স্টিফেন্ পড়াবেন ইংরেজি। এক পরিচারকের সেবাধীন স্টিফেন রয়ে গেলেন কলকাতায়। ক্রমেই চলচ্ছক্তি কমে আসছে, কিন্তু মনঃশক্তি নয়—কলেজে আসেন, পড়ান, নিজের মাইনে থেকে কিছু যোগ্য ও সাহায্যার্থী ছাত্রদের বেতন জুগিয়ে যান—আরও কিছু মাইনে হয়তো যায় ওরূপ করেই।

আমাদের কয়েক বৎসর পরে এ দেশেই ডঃ স্টিফেন দেহরক্ষা করেন। আমরা যখন তাঁকে পাই তখন তিনি বেশ বৃদ্ধ, তবু সচল। এক কালের সুগঠিত দীর্ঘদেহ পুরুষ, বেশভূষায় অমনোযোগী, বেয়ারার সেবাধীন। ক্ষীণ-

দৃষ্টি, বার্ধক্যসীমিত চোখ সলজ্জ, সস্নেহ। দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিং-এর করিডোর দিয়ে আসেন 'পিশেল হলে', যেন কারো চোখে না পড়লেই ভালো—থপ্‌থপ্‌ করে আসেন। সরল, সসঙ্কোচ অথচ সুস্থির। এমন মানুষকে দেখেও ধন্য হতে হয়।

অধ্যাপক ডঃ স্টিফেন ক্লাশেও কথা বলেন না—তাঁর কথা ও উচ্চারণ ছাত্রদের দুর্বোধ্য হতে পারে। ক্লাশে এসেই চক্‌ নিয়ে বোর্ডে যান, সুস্পষ্ট সুন্দর হস্তাক্ষর, দিনের পড়া পড়ান তিনি বোর্ডে লিখে। কদাচিৎ মুখে দু-একদিন বলেন—'বলো না—বড় বড় ভাপ্‌সা কথা।' 'ক্রিটিক্‌দের উদ্ধৃতি চাই না।' 'ডোণ্ট রিড্‌ বুক্‌স্‌ অন বুক্‌স্‌।' এমনি দু-একটি উপদেশ। তাঁর পাঠন পদ্ধতি অবশ্য লিখিত। ভাবে ভাষায় একেবারে নিরলঙ্কার, বাহুল্য-বর্জিত, বিশ্লেষণাত্মক। মূল কথাগুলি এই—এক, দুই, তিন ইত্যাদি। তারপর 'দিস্‌ ইজ্‌ গুড্‌', 'দিস্‌ ইজ্‌ ব্যাড্‌', 'এ ঠিক নয়—ও আধা-ঠিক'। আমরা তাঁর কাছে পড়তাম—১৭৯৮ থেকে ১৮৩২ পর্যন্ত (রোমাণ্টিক রিভাইভেল-কালীন), ইংরেজি সমালোচনা সাহিত্য। কোলরিজ, ওয়াড্‌সওয়ার্থ প্রভৃতির সাহিত্যাদর্শ তার অন্তর্ভুক্ত। বই পড়ে তাঁদের কথা মোটেই সরল মনে হ'ত না। স্টিফেনের লেখা নোট পড়ে তাই মনে হ'ত, বা সন্দেহ হ'ত, 'তাই তো, এতই কি সরল? না, অধ্যাপক বাঙালি অশ্বত্থামাদের পিটুলি গুলে খাইয়ে তাদের দুধের পিপাসা নিবৃত্ত করছেন।' যাক, পাশের পিপাসাও তো তাদের কম নয়। অধ্যাপকের মূল দৃষ্টিভঙ্গী তাই মনে রাখতাম, সে অনুসারেই দু' বৎসর পরে উত্তরও লিখেছি, আর মনে আছে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে। কিন্তু তার আগে সাহিত্য পড়তে এসে কেবল দিনের পর দিন এক, দুই, তিন করে নোট টোকা,—তাতে বিষয়টা বুদ্ধিগোচর যত হোক মনের মধ্যে একটু সন্দেহ দেখা দিত, একি সাহিত্যের ক্লাশ, না দর্শনের ক্লাশ? স্টিফেন সাহেবের দর্শনের নোট নাকি দর্শনের ছাত্রদের প্রধান অবলম্বন। সত্যি, তাঁর নোট কতখানি স্বচ্ছ-মানসের পুষ্টিকর ফল তা পরে বুঝেছিলাম—ওই পর্বের (১৭৯৮-১৮৩২) 'পোয়েটিক্সের' উপর (বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপানো) ডক্টর স্টিফেনের ক্ষুদ্র শতখানেক পৃষ্ঠার পুস্তকটি তখন বেরোয়। সারল্যে, স্পষ্টতায়, দৃষ্টির স্বচ্ছতায় চমৎকার একটি কাব্য-জিজ্ঞাসা। স্টিফেন যেন বোঝাতে চাইতেন—সাহিত্য ধোঁয়ার কারবার নয়। হয়তো বহুদিন দেখে দেখে তাঁর এই ধারণা হয়েছিল, বাঙালি ছাত্রদের এ কথাটা বোঝানো দরকার। হয়তো তাঁর নিজের মনও ছিল বিশ্লেষণের অনুরাগী, ভাবের গ্যাসের বিরোধী, বাক্যের ভুঁড়িতে উদাসীন। মোটের উপর, স্টিফেন চমকপ্রদ নন, আলোকপ্রদ।

জয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় যখন ক্লাশে এসে বসলেন, তখন সচকিত

হলাম। তিনিই দ্বিতীয় অধ্যাপক—প্রবীণ ছোটখাট মানুষটি। ধোপদোরস্ত ইস্ত্রি-করা ধুতি-চাদরে এমন সযত্ন পরিচ্ছন্নতা যে, তাতেই সচকিত হতে হয়। তারপর যেই অধ্যাপক মুখ খুললেন, ক্লাশ চমকিত ও চমৎকৃত। রোমান্টিক রিভাইভেলের মর্ম অনুভব করাই শুধু নয়, মনে হয়েছে সে মর্ম প্রকাশে ভাবে ভাষায়, কল্পনায়, বাগ্‌বিভূতিতে তিনি অনন্য। অনুভব করতে পারি আরেক জগতে যাত্রা করেছি। চোখে-মুখেও সেই ভাব। এ স্টিফেনের জগৎ নয়—সে তো মাটির পৃথিবী, স্টিফেন নিজেও মাটির মানুষ। জয়গোপালবাবুর জগৎ পৃথিবী পেরিয়ে আকাশের আঙিনায়। মুগ্ধ চমৎকৃত মনের উপর দিয়ে ক্লাশের এক ঘণ্টা যেন এক ফুঁয়ে মিলিয়ে গেল। হ্যাঁ, সাহিত্যের ক্লাশ বটে। এম.এ.-ই পড়ছি। সত্যিই রোমান্টিক সাহিত্য-প্রেরণার মর্মস্পর্শী ক্লাশ। একদিন, দু'দিন, এক সপ্তাহ, এক মাস,—ও তারপর? ভাবের ভাবুকতায়, জার্মান দার্শনিকদের রহস্যবাদী শূন্যতায় আর ভারতীয় কল্পনার রঙীন হাওয়ায় উড়তে উড়তে সেই বর্ণবিচ্ছুরিত আকাশে চোখ তখন বদ্ধ, না হয় দৃষ্টি নিরুদ্দেশ। তারপর পৃথিবী-ছাড়া লঘু হাওয়ায় মানুষের হৃদ্‌যন্ত্র শ্রান্ত ও স্বস্তি-প্রত্যাশী। শুধু সাত দিন অমন অধ্যাপনার আস্বাদনে যে-কোন দেশের ছাত্র পুলকিত হবে। বড়জোর, দু-চার মাস চলতে পারে—ভারতীয় কল্পনাপ্রবণ ছাত্রদের পক্ষে তাও গ্রাহ্য।

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের সহযোগী ছিলেন কোচ-বিহার কলেজে—তিনি তখন ইংরেজির অধ্যাপক, আচার্য শীল প্রিন্সিপাল। সার্থক হয়েছে তাঁর আচার্য-সাহচর্য। আমাদের অগ্রজ ছাত্ররা একটা কথা চালু করে রেখে দিয়ে গিয়েছিলেন—"জয়গোপালিয়ান্ ভেগ্‌নেস্।" আমরা তা মানি না। আমরা বলি অধ্যাপনায় এ রোমান্টিক সাব্‌জেক্টিভিজম্, যেমন স্টিফেন-এর অব্‌জেকটিভ এনালিসিস।

স্টিফেন-এর স্থির বিশ্লেষণের পদচারণা এক মেরুতে, আর জয়গোপালের ভাব-কল্পনার আকাশচারিতা বিপরীত মেরুতে। মাঝখানে আর একজন ছিলেন—অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু মাঝখানকার কি? প্রেসিডেন্সি কলেজের বন্ধুদের কাছে এতকাল তাঁর অধ্যাপনার সুখ্যাতি শুনেছিলাম, উদ্‌গ্রীব হয়েছিলাম প্রত্যাশায়। ইংরেজি বাক্যের ঝড় বইছে, বিস্ময়েরও অবধি রইল না। বোধহয় শেলিই পড়াতেন। জয়গোপালবাবুরই শেলী প্রিয় কবি, আমারও এম. এ. অবধি শেলী তাই ছিলেন। জয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের বায়বীয়তায় শেলী তাঁর স্কাইলার্কের মতই উড়তে উড়তে ঊর্ধ্ব থেকে আরো ঊর্ধ্বে শূন্যলোকে শূন্য হয়ে যেতে থাকতেন। শ্রীকুমার

বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্য-বোধে সেই গীতিমাধুর্যের আলেখ্য স্বীকৃত। কিন্তু তাঁর বিশ্লেষণ-কলা সেই 'unbodied voice'-এর প্রতিটি অবয়ব খণ্ডে খণ্ডে চাক্ষুষ করে তুলতো। ডানা, গ্রীবা, মাথা, সবই প্রত্যক্ষ, শেলীও দুর্নিরীক্ষ্য নন। শ্রীকুমারবাবুর পাঠন-পদ্ধতি ডক্টর স্টিফেনের রীতিতে নয়, অন্য রীতিতে। তাঁর আলোচনায় ফুল নিশ্চয়ই সুন্দর, কিন্তু ফুল নিশ্চয়ই ফুলও। আবার, শুধু ফুলও তা নয়, মাটি ও মূল কাণ্ডেরও প্রফুল্ল প্রকাশ। শ্রীকুমারবাবু কাব্যদেহের মাটি, মূল ও কাণ্ড সম্বন্ধেও সম্পূর্ণ সতর্ক। শাখা-প্রশাখা সম্বন্ধে আরও তিনি সচেতন। জড়াজড়ি-করা ডালপালা সরিয়ে বের করা চাই ফুলকে। পাতার পর পাতা সরিয়ে তুলে ধরা চাই—এক-একটি ফোটা, আধ-ফোটা, ফুটে না-ফোটা কুঁড়ি। সেখানেই কি শেষ? ফুল দেখা হ'ল কই? —এক এক করে দেখানো চাই পাপড়ির পর পাপড়ির বিন্যাস। মোহ ছাড়িয়ে বিশ্লেষণ না করলে হ'ল কী? কিন্তু এই কর্মে সাধারণ-গ্রাহ্য শব্দগুলি শ্রীকুমারবাবুর অভিধানে অপাঙ্‌ক্তেয়। তাঁর শব্দ-প্রবাহ তাঁর নিজস্ব। শ্রীকুমার-বাবুর অধ্যাপনায় ঘনঘটার ও কলাকূটের অপসারণ একান্তই তাঁর নিজস্ব। সে সবের কোনো আভাস অন্য কারো পক্ষে দেওয়া অসাধ্য। কাব্য-সাহিত্যের এমন সফল তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ অন্য কারো দ্বারা দুঃসাধ্য। এমন অভিধান-ছাঁকা অজস্র শব্দবিন্যাস দুর্লভ, আর অভিনব উপমা-প্রত্যুপমা প্রভৃতিতে বিধৃত এমন দুর্দান্ত বাগ্‌-বিভূতি সংস্কৃত গদ্য কাব্যেও লোভনীয়। শ্রীকুমারবাবুর পরিণত দিনের সেবায় আমাদের বাঙলা ভাষা পরে নানাভাবে ঐশ্বর্যবতী হয়েছেন। শ্রীকুমারবাবুরও তাতে ফল লাভ হয়েছে। কিন্তু ছাত্র সাধারণ তখনো সেই শব্দাবর্তে স্বস্তিলাভ করতে পারে নি। সকাতরে দুঃখ করেছে, "আহা! বাঙলার অধ্যাপক একটু যদি বাঙলা ভাষায় বাঙলা লিখতেন।" জানি না, তাঁর ইংরেজি অধ্যাপনা শুনলে ইংরেজি-বিলাসীরা কি ভাবতেন।

আমাদের ছাত্রজীবনে ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের অধ্যাপনার ঘনঘটায় আমরা হতচকিত হতাম. পদাড়ম্বর-বিভ্রান্ত হলেও তাঁর বক্তব্যে উদাসীন থাকতে পারতাম না। বিশেষতঃ দেখেছি ছাত্রার্থেই উদ্দিষ্ট ছিল শ্রীকুমারবাবুর অমন কাব্যবিশ্লেষণ, পরীক্ষা-সাগরে তা ফলদায়ক পাথেয় হত।

পরবর্তী কালে অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার আরও বেশি পরিচয়ের সৌভাগ্য হয়েছে। অযাচিত ভাবে তিনি নিজে থেকে আমার লেখা "একদা"র প্রচুর প্রসংশা করেন 'তাঁর বাংলা উপন্যাসের ইতিহাসে'। বইখানার দিকে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন শুনেছি, তাঁর প্রিয় ছাত্র ও পরে সহযোগী অধ্যাপক সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাঙলা উপন্যাসের

ইতিহাস'-এ সেই আলোচনা এখনো সুরক্ষিত। যে-কোন ছাত্রের পক্ষে কাম্য হ'ত গুরুর অমন আশীর্বাদ, যে-কোন লেখকের পক্ষে ওরূপ সযত্ন সমালোচনা শ্লাঘনীয় পুরস্কার। আজ তিনি নেই, কিন্তু অকপটে বলতে পারি—কি বিধান পরিষদ, কি সাহিত্য-সভায়—বাঙলায় বা ইংরেজিতে—কোথাও দেখি নি তিনি প্রস্তুত না হয়ে আসেন, অবান্তর কথা বলেন। এমন কথা কোথাও তাঁকে বলতে শুনি নি যাতে বস্তু নেই। সাহিত্যালোচনায় দেখেছি—সাহিত্যের দৃষ্টিতেই সাহিত্য তাঁর প্রধান আলোচ্য। এমন কি, যে-বিষয়বস্তুতে তাঁর অনুমোদন নেই, তাকেও সাহিত্য-দৃষ্টিতেই বিচার করতেন। তবে, জীবন-জিজ্ঞাসায় তা অনুধাবন করতেন বাঙালি বর্ধিষ্ণু ভদ্রলোকের রাজনীতিক শ্রেণী-বুদ্ধি দিয়ে। সে সময়ে অনেকখানেই তখনো আমরা তাঁর বিরোধী পক্ষ, কিন্তু সবখানেই ব্যক্তিগত স্নেহের পাত্র। আর ব্যক্তিগত ভাবে আমি বরাবর বুঝেছি—বলবার মত কথা তাঁর আছে, শুনবার মত কথা তাঁর মুখে শুনতে পাব। অনেক সাহিত্যরথীর কাছেও সে আশা দুর্লভ। আরেকটা কথাও বলতে পারি, আমরা স্কটিশের ছাত্র। কলেজ-জীবনে তাঁর সঙ্গে পরিচিত নই, কিন্তু তা সত্ত্বেও পরীক্ষায় তাঁর কাছে সুবিচার পেয়েছিলাম—বাধা হয় নি। একথা প্রেসিডেন্সির সকল অধ্যাপকদের সম্বন্ধে বলতে পারলে সুখী হতাম।

এম. এ. ক্লাশে প্রেসিডেন্সির আরো দুজন অধ্যাপকের কাছে পড়বার সৌভাগ্য হয়। শ্রীকুমারবাবু বরং তাঁদের জুনিয়ার। সিনিয়র ছিলেন অধ্যাপক হোম। ইংরেজির ইংরেজ অধ্যাপক স্টার্লিং সাহেব তখন অবসর নিয়ে চলে যাচ্ছেন। হোম সাহেব পরে সে বৎসরেই চলে যান। হোমকে মনে হ'ত খাঁটি ইংরেজ। মিশুকে নন, গম্ভীর প্রকৃতির সভ্য মানুষ—অবশ্য নন-কো-অপারেশনের পরে কোনো সাহেবেরই বোধ হয় ইচ্ছা থাকলেও ছাত্রদের সঙ্গে সম্বন্ধ পাতানো সাধ্যে কুলোত না। কিন্তু, স্টার্লিং-এর মত দেশীয় ছাত্রদের কথায় ও লেখায় হোম সাহেবের ব্যঙ্গবোধ জাগত না। তিনি ছিলেন ভদ্র ধীর-চিত্ত অধ্যাপক। এবং স্বতঃসিদ্ধ ইংরেজ যখন, তখন তিনিই পড়াবেন শেক্‌সপীয়ার, এবং আমাদের পড়াতেন হ্যামলেট। হোম পড়ে যেতেন, আমরা শুনতাম ; পড়াতেন মানে, পড়তেন।—মন্তব্য মনে করতেন দুঃসাহস, ব্যাখ্যা বাড়াবাড়ি। বোধ হয় ভাবতেন, শেক্‌সপীয়ার কি নিজের বক্তব্য বলতে জানতেন না যে, তাঁর উপর আবার কথা বলা ? তবে ভারতীয় ছাত্রদের পক্ষে অজানা বা দুর্জ্ঞেয় কোনো উক্তি বা ইংরেজ-জীবনের কূট বিষয় কোথাও থাকলে তা বলে দেওয়া চলে। তাও স্বল্পতম কথায়। বাক্যব্যয় না করে এই হ্যামলেট পড়ানো, বাক্যব্যয় না করেই আমরাও গ্রহণ করেছিলাম। আর

হ্যামলেট—সেই যে এম. এ. ক্লাশে আমার কাছে হারিয়ে গেল, ছাত্রজীবন শেষ না হতে তাকে আর ফিরে পাই নি, যেমন পাই নি বি. এ. অনার্সের পাঠ্য ওথেলোকেও। তবে পরে পেয়েছি, পরীক্ষা পাশের মত করে নয়—আমার মত করে ; আর তাই সান্ত্বনা—ক্লাশের পাঠ্য হ্যামলেট ওথেলোও চিরদিনের জন্য হারাই নি।

প্রেসিডেন্সির সহপাঠীরা যাঁর নামে উচ্ছ্বসিত হতেন তিনি **অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ**। সহপাঠীরা কেন, অগ্রজরা এবং অনুজরাও তাঁর নামে প্রশংসা-মুখর। পার্সিভেলের নামে যেমন পূর্বজরা, মনোমোহন ঘোষের নামে যেমন আমাদের অগ্রজরা, প্রফুল্ল ঘোষের নামে তেমনি তাঁর ছাত্ররা কৃতজ্ঞতায় উদ্বেলিত। সে কলেজে তখন প্রফুল্ল ঘোষ নিজে থেকেই ছাত্রদের অতিরিক্ত ক্লাশ করে পড়াতেন শেক্‌সপীয়ার। সাহেবরা থাকতে বোধ হয় শেক্‌সপীয়ারের নিয়মিত ক্লাশ তাঁর হাতে সমর্পিত হ'ত না। তাতে তাঁর ক্ষোভ ছিল না—যেমন তাঁর ক্লান্তি ছিল না ছাত্রদের প্রয়োজনে যে-কোনো বিষয় পড়াতে ; আর পড়াতে হলে সে পাঠনীয় বিষয়ের সমস্ত বই কিনতে, সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় পড়ে তৈরী হতে ; তারপর নিজের মনের-প্রাণের সমস্ত সম্পদ পাত্র-নির্বিশেষে ছেলেদের কাছে উজাড় করে দিতে। আসলে প্রফুল্ল ঘোষ সাহিত্যে শুধু আনন্দ পেতেন না, সাহিত্য পড়াতেও তিনি মেতে উঠতেন ; আর তাতেই মেতে থাকতেন। বন্ধুবর নীরেন রায়ের মুখে শুনেছি, নীরেনবাবু প্রথম অধ্যাপনা-কর্ম (বঙ্গবাসী কলেজে) গ্রহণ করলেন, তাঁর চিরহিতৈষী অধ্যাপক প্রফুল্ল ঘোষ পরামর্শ দিয়েছিলেন, "তোমার সব শক্তি (best) দিয়ে পড়াবে (give your best)—মান খাটো করো না"। বঙ্গবাসী কলেজের ছাত্র সে অধ্যাপনার কি বুঝবে ? "বুঝুক না বুঝুক, তোমার কাজ দান।" ছাত্র নীরেন্দ্রনাথ নিজের অধ্যাপনা-জীবনে এ উপদেশ বিস্মৃত হন নি, আর গুরু প্রফুল্লচন্দ্র ছিলেন তাঁর অধ্যাপনার জীবন্ত প্রেরণা।

প্রফুল্ল ঘোষ মশায় ছাত্রদের শিথিলতা সইতে পারতেন না, আর সম্ভবতঃ নির্বুদ্ধিতাও না। প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রদের কাছে শুনেছি—তাঁদের এক ইংরেজ অধ্যাপক বাঙালিদের (এমন কি, নিজ কলেজের বাঙালি অধ্যাপক ও ছাত্রদের) ইংরেজি লেখা নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করতে সর্বদাই তৎপর ছিলেন। আর সেই সাহেবের ব্যঙ্গরসের সমজ্‌দার ছিলেন তাঁর সহকারী বাঙালি অধ্যাপক ঘোষ। প্রফুল্ল ঘোষের মত বুদ্ধিমান অধ্যাপকেরও বাঙালির মুখে বা লেখায় খারাপ ইংরেজি দেখলে ব্যঙ্গপ্রিয় হতে বাঁধত না কেন ? আমরা ভুলে যাই আমাদের পক্ষে ইংরেজির মত বিদেশী ভাষা লেখা একটা বিড়ম্বনা।—আমরা

তা লিখি জীবিকার দায়ে—পড়ি হয়তো অনধিক তৃপ্তির জন্যও। কিন্তু, উল্‌টে যদি ওই সাহেবকে জিজ্ঞাসা করি, তাঁর মত ইংরেজ পণ্ডিতরা কি ২০।৩০ বৎসর এদেশে থেকেও বাঙলা লিখতে পারেন,—যেমন তেমন করে এক-কলমও? অবশ্য, তাঁরা কেন শিখবেন। বিলাত থেকে তাঁরা অনেকেই এদেশে আসতেন সুখ-সুবিধার জন্য—টাকা লুটবেন, দেশে ফিরে যাবেন। ক'জন সত্যকারের গুণী লোক নিজ দেশ ছেড়ে বিদেশে যান—দেশে যদি থাকে তাঁর গুণের কিছুমাত্র কদর? দেখি তো, কলকাতা ছেড়েই তো যেতে চান না আমাদের বাঙালি অধ্যাপকরা। যে-ইংরেজের দেশে ঠাঁই নেই সে যায় প্রথমে শাদা ডোমিনিয়নে, তা-ও না জুটলে কালা আদমির দেশে—ভারত সাম্রাজ্যে। ভারতে আগত ইংরেজ (ইদানীং মার্কিনও) প্রথম নয়, দ্বিতীয় নয়, তৃতীয় শ্রেণীর বিশেষজ্ঞ। সে দিনের ইংরেজ অধ্যাপকরা তার বেশি ইংরেজির বিশেষজ্ঞ ছিলেন, এমন প্রমাণ স্বদেশে, বিদেশে কোথাও রেখে যান নি। অবশ্য এদেশে হয়তো মুরুব্বিয়ানা ফলিয়েছেন—আমাদের মনোমোহন ঘোষ, প্রফুল্ল ঘোষদের ওপরেও। শুধু ইংরেজির না,—জানি, ইংরেজি তাঁদের মাতৃভাষা, সে ভাষায় তাঁরাই কর্ণধার হবেন কলোনির কলেজে। কিন্তু বিজ্ঞান বিভাগে জগদীশচন্দ্র-প্রফুল্লচন্দ্রদেরও ওপর তখন অজ্ঞাত-পরিচয় তৃতীয় শ্রেণীর শ্বেতাঙ্গ প্রভুরা কম ওস্তাদি করে যান নি। তবে নন্‌-কো-অপারেশনের শেষের দিকে ওসব ইংরেজের থোতা মুখ ভোঁতা হয়ে আসছিল। অন্য দিকে ব্রিটিশ সরকারও বিলিতী মার্কাধারী দেশী লোকদের দু'-একজনকে সরাসরি সেদিনের ইম্পীরিয়াল এডুকেশন সার্ভিসে এনে বসাচ্ছিলেন। তা কতকটা নিজেদের মুখ-রক্ষা, কতকটা দেশীয় লোকদের মুখ বন্ধ করা। যাক্, সে-সব কথা। স্কটিশ চার্চেস্ কলেজে স্কটিশ সাহেবদের নিকট ওরূপ পাকা ইংরেজী ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ সইতে হয় নি—ইউনিভার্সিটিতেও না। সে কলেজের স্টিফেন ভুলে গিয়েছিলেন তাঁর চামড়া সাদা। আমরাও ভুলে যেতাম। ছাত্রদের সাহায্যে তিনি ছিলেন মুক্তহস্ত। হোম্ সাহেব বিদেশী হলেও খাঁটি ইংরেজ, শিক্ষিত ভদ্রলোক—মনে যাই হোন্, আনুষ্ঠানিক রীতিনীতিতে ভদ্রলোক।

অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষকে দেখেছি পঠন-পাঠনেই উৎসাহী মানুষ, চলা-ফেরা সব বিষয়ে প্রাণে-মনে অধ্যাপক। প্রথম পড়াতেন তিনি চসার,—ক্যাণ্টারবেরি টেল্‌স্-এর 'প্রোলোগ' বা কথামুখ। এই একটি বিষয় পাঠ্য হয়েও নীরস হতে পায় নি,—আমার কাছেও না। তার এক কারণ চসার স্বয়ং; আর, দ্বিতীয় কারণ, অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের অধ্যাপনা। ক্যাণ্টারবেরি টেল্‌স্-এর ব্যঙ্গ ও রসিকতায় তিনি নিজেও হয়ে উঠতেন উৎফুল্ল, আমাদেরও সঙ্গী করে নিয়ে

যেতেন চসারের রঙ্গ-কৌতুকের অন্তঃপুরে। বছরের পর বছর প্রফুল্ল ঘোষ মশায়ের কাছে চসার পড়েছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা। দলের পর দল এই সানন্দ অভিযান উপভোগ করেছে। আর আমরা? কলেজ-জীবনে তাঁর পড়ানোতেই পেয়েছি অপূর্ব আনন্দ। তাতে মনে আরো আফ্‌শোস জাগত—"যদি প্রফুল্ল ঘোষের কাছে শেকস্‌পীয়ার পড়তে পেতাম।" কিন্তু সে অসম্ভব! প্রেসিডেন্সি কলেজ ছাড়া অন্য কলেজের ছাত্রদের পক্ষে সে দ্বার রুদ্ধ। অধ্যাপক নিজেও অকরুণ, অন্য কারো প্রার্থনায়ও কর্ণপাত করবেন না। অন্য কলেজের ছাত্ররা তাঁর নিকট অপাঙ্‌ক্তেয়। অমন যিনি অধ্যাপনার আনন্দে মজে যান—সব ছাত্রকে সমদৃষ্টিতে দেখতে তিনি অক্ষম। তিনি হেন্‌রি স্টিফেন্‌ নন—সকলের বন্ধু নন, শুধু প্রেসিডেন্সির মার্কাধারী ছাত্ররাই তাঁর অধ্যাপনার যোগ্য।

চসারের পরে প্রফুল্ল ঘোষ মশায় পড়ালেন দান্তের 'ভিটা ন্যুভা', অথবা রোসেটির অনুবাদে সেই ভিটা ন্যুভা। এবার আরেক রকমের অভিজ্ঞতা। ব্যাগ ভরতি .ই ব্যক্তিগত অর্থব্যয় ও পরিশ্রমের তা মূর্তিমান সাক্ষ্য। টীকা-টিপ্পনী, ভাষ্য সব মজুদ, অধ্যাপক ঘোষও মুখর, তেমনি অধ্যাপনায় মশ্‌গুল; তাঁর পাণ্ডিত্য সদা উৎসারিত। আমরা কিন্তু তাতে প্রথম ব্যাকুল, তারপর বিমূঢ়, তারপর ক্লান্ত। শেষ দিনের ক্লাশে—প্রায় শেষ পাঁচ মিনিটে—ঘুম পেল। ধরা পড়ে গেলাম—ঝিমুচ্ছিলাম। বাঘা অধ্যাপক প্রফুল্ল ঘোষ। কিন্তু কপাল ভালো, অধ্যাপকের চোখে দেখ্‌লাম কৌতুকের দৃষ্টি, ব্যঙ্গ নয়, সরস ভাবে একটি সরস কথা—'এই যে ঘুমিয়ে পড়ছ? ভিটা ন্যুভা শেষ হতে একটু দেরী আছে যে।' লজ্জা পেলাম, ক্ষমা চাইলাম। তার দরকার ছিল না, আগেই ক্ষমা করেছেন নিজ গুণে। প্রেসিডেন্সির ছেলে নই, তবু হয়তো ক্লাশের শেষ দিন বলেই এ ক্ষমা অনায়াস-লভ্য হ'ল।

একটা সংশয় রয়ে গেছে—প্রফুল্ল ঘোষ মশায়ের 'ভিটা ন্যুভা' পড়ানো বিশেষ জম্‌ল না কেন? চসারে ক্লাশ উজ্জ্বল, সব কৌতুক সরস। তার একটা কারণ চসারই কৌতুকোজ্জ্বল, মুখ্যত প্রোলোগ্‌ সরস। অধ্যাপক প্রফুল্ল ঘোষের সহৃদয়তার আমি নিজেই প্রমাণ, তা এই মাত্র বললাম। আমাদের সহপাঠী সুধীন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গেও তাঁর একটা সংঘাত ঘটেছিল, পরে তাও বলছি। তাতেও শেষ পর্যন্ত মনে হয়, অধ্যাপকের ক্ষমাগুণেরই পরিচয় পাওয়া যায়, যদিও আমরা ভাবছিলাম, অধ্যাপক প্রফুল্ল ঘোষ প্রেসিডেন্সি কলেজ ছাড়া অন্য কলেজের ছাত্রদের ক্ষমা করতে জানেন না। অবশ্য সুধীন দত্ত স্কটিশের আর কতটুকু ছাত্র? তার চেয়ে (তখনো) তাঁর পরিচয়—হীরেন দত্তের পুত্র—কলকাত্তাই ঘোষ-বোস্‌দের স্বজন। না হলে, কোনো-কোনো কারণে অধ্যাপক

প্রফুল্ল ঘোষকে তো আমাদের ভয় করাই স্বাভাবিক। তাঁর দক্ষিণ মুখ প্রেসিডেন্সি কলেজের তাঁর প্রিয় ছাত্রদের ত্রাণ করার জন্য অসাধ্য সাধন করতো। আমাদের কিছুপূর্বে একবার এম. এ.-তে ইংরেজি সাহিত্যে আঠারো জন ফাস্র্ট ক্লাশ পায়—অভাবনীয় কাণ্ড। তা ভাবনীয় ছেড়ে ঘটনায় পরিণত হয় প্রফুল্ল ঘোষ মশায়ের জন্য। তাঁর একটি প্রিয় ছাত্র না হলে সেকেণ্ড ক্লাশে বাঁধা থেকে যায় অষ্টাদশ-পদে। কাজেই উপায়—তার উপরকার সব ছাত্র শুদ্ধ ছাত্রটিকে টেনে তুলে ব্রাকেটে সবকে ফাস্র্ট ক্লাশ করা। শুনেছি সেই প্রিয় ছাত্রটি সত্যই কৃতী ছাত্র, তিনি ফাস্র্ট ক্লাশেরই যোগ্য। পরীক্ষার খাতার প্রমাণের থেকে অধ্যাপকদের দু'বৎসরের সাক্ষাৎ-অনুভবের প্রমাণ এ ব্যাপারে নিশ্চয়ই বেশি গ্রাহ্য; অন্ততঃ আমি তা মনে করি। অধ্যাপকদেরও যদি সত্যই সেরূপ মত হয়, তা হলে ছাত্রটিকে ফাস্র্ট ক্লাশ দিয়েই যথার্থ সুবিচার করেছেন। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে—পরীক্ষা-প্রথার অমন অটল মাহাত্ম্য তাঁরা তথাপি রক্ষা করেছেন কেন? এক মার্ক, দু'মার্ক হিসাব করে ছাত্রদের উত্তরের গুণাগুণের অমন সূক্ষ্ম নির্ণয়ের যে-ব্যবস্থা, তা নিশ্চয় তাঁদের তুলে দেওয়া উচিত। এ, বি, সি, ডি, করে গুণ বাচক নির্দেশই সমুচিত। পরীক্ষা চালাবেন সেই অটল নিয়মে, আর পশ্চাৎ-দুয়ার দিয়ে চালাবেন ক্ষমতাবানদের মর্জি মত প্রিয়পাত্রদের উচ্চস্তরে ঠেলে তুলে দেওয়া—এটা বিচারের খুব সুপথ নয়। সম্মানের কথাও নয়,—অধ্যাপকদেরও নয়, তিলকধারী ছাত্রদেরও নয়। এরূপ অপকীর্তি আরও দেখতে পাই নি তা নয়। স্কটিশ চার্চেস কলেজের একটি ছাত্র একবার এম.এ.-তে একমাত্র ফাস্ট ক্লাশ হচ্ছিল, তাই ফাস্র্ট'ও হবে। ফল বেরোয় নি। কথাটা জানাজানি হতেই প্রেসিডেন্সির অধ্যাপক মশায় পরীক্ষকদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে যা করলেন, তাতে শুধু অন্য দু'জন পরীক্ষার্থীর মার্ক বাড়ানো নয়, স্কটিশের ছাত্রটির মার্ক জোর করে কমানোও হ'ল। শেষ অবধি অধ্যাপকদের সর্বাধিক দাক্ষিণ্যভাজন যিনি তিনিই হলেন ফাস্র্ট ক্লাশ ফাস্র্ট, আর দ্বিতীয় কৃপাভাজন প্রেসিডেন্সির ছাত্রটির সঙ্গে স্কটিশের মুরুব্বি-বঞ্চিত ছাত্রটি হ'ল ব্র্যাকেটে ফাস্র্ট ক্লাশ সেকেণ্ড। মানি, তিন জনাই তাঁরা যোগ্য, অধ্যাপকের ছাত্র-বাৎসল্যও অনিন্দনীয়। কিন্তু সে-বৎসর পরীক্ষার্থীদের মধ্যে আর সকলেই যে বাৎসল্যের অযোগ্য, কি করে তা অধ্যাপক-মশায়রা ঠিক করেছিলেন?—ছাত্র-অধ্যাপকে যে মুখ-দর্শন হ'ত না—শিক্ষা-ব্যবস্থায়। থাক না হয় সে প্রশ্ন। কিন্তু, যোগ্যতমকে টেনে নামানোটাও কি বাৎসল্যের পরিচয়?

প্রশ্নপত্র রচনা থেকে আরম্ভ করে পরীক্ষক-অধ্যাপক, কর্তৃপক্ষ প্রভৃতি মান্যবরদের কৃপায় পরীক্ষা-প্রথা ছাত্র-বাৎসল্য, পুত্র-বাৎসল্য, কন্যা-বাৎসল্য,

জামাতৃ-বাৎসল্য, শ্যালক-বাৎসল্য, শ্যালিকা-বাৎসল্য ইত্যাদি বিচিত্র বাৎসল্য রসের বাহুল্যে, এবং সখ্যরস (ও এখন ঝাণ্ডারসের) প্রচলনে এমন স্তরে অবনত যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে রৌদ্ররসের ওইরূপ আবির্ভাব অনিবার্য হয়ে উঠেছে, হয়তো বা প্রয়োজনীয়ও। অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের দক্ষযজ্ঞের তাণ্ডব শিবের অনুচরদের নয়, তা তাঁর 'গণের' উৎসব। যাই হোক, বিশ্ববিদ্যালয়ের মন্দিরে এখন স্যর আশুতোষের মূর্তি ধূলোয় গড়ায়। প্রেসিডেন্সি কলেজও সেই কলেজের সেই পরম ছাত্র-বৎসল অধ্যাপক প্রফুল্ল ঘোষ মশায়ের আবক্ষ মূর্তি প্রেসিডেন্সির আধুনিক ছাত্রদের দ্বারা বিচূর্ণিত হয়। আমরা যেন শুনতে পাই, শেক্‌সপীয়র-বিশেষজ্ঞ প্রফুল্ল ঘোষ—জুলিয়স সীজারের সিনার মত—উদ্দণ্ড ছাত্রদের বলছেন, 'আমি মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর প্রফুল্ল ঘোষ নই, আমি শেক্‌সপীয়র পড়িয়ে অধ্যাপক প্রফুল্ল ঘোষ।' উত্তর উঠছে—"মারো, শা—কে, মারো, মারো। 'রেড বুক অফ্‌ মাও' পড়াও নি কেন ?" হায়, অধ্যাপক ! এ'দেরই পিতৃ-পিতামহদের জন্য ছাত্রবাৎসল্যে আপনি কী না করেছেন। এ'রা আপনার সেই মানসপুত্রদেরই উত্তরসূরী। আমরা যাঁরা ছিলাম আপনার 'পুয়র রিলেশনস' তাঁরা কিন্তু জানি—যা হয় হোক, এম. এ. ক্লাশে আপনি অধ্যাপক ঘোষ সকলকেই সাগ্রহে পড়িয়েছেন, এমন কি, আমাদেরও। আপনার সেই অধ্যাপনার স্মৃতি আমাদের মনের ধূলোয় লুটোবে না, অটুটই থাকবে। যদি আপনার কাছে শেক্‌সপীয়র পড়তে পেতাম !

অধ্যাপক রবি ঘোষ তখনো এম. এ. ক্লাশে পড়াতেন না—আমাদের দুর্ভাগ্য। তবু ভালো পাশ-করা অধ্যাপকদের কাছেই তো পড়েছি—কেউ স্মৃতি থেকে হারিয়ে যায় নি। কৃতবিদ্য পুরুষ কিরণ মুখুজ্জে গ্রীকে পণ্ডিত, 'অল্‌ সোল্‌স্‌'-এর ফেলো। এ মানুষ পড়াতেন প্লেটো—"সক্রেটিসের বিচার ও মৃত্যু।" ধোপদুরস্ত পরিচ্ছদ বিষয়ে যেন চিরদিনই সচেতন কিন্তু ক্লাশ সম্বন্ধে অচেতন। তিনি শুধু বিদ্যায় বিশিষ্ট নন, তার চেয়েও বড় কথা তিনি কলকাতার অভিজাত বংশের জামাতা। নিম্ন কণ্ঠ, নিজে নিজেই প্লেটো পড়েন ও শোনেন, দু'-এক সময়ে একবারে চুপ। একটু মৃদু হেসে হয়তো বলতেন—ডক্টর জাওয়েটের অনুবাদটা ঠিক হয় নি। তারপরে আবার পড়বেন নিজে নিজে। —তাঁর অধ্যাপনার আর কিছুই মনে নেই। তবে, বি. এ.-তে, এম. এ.-তে কিছু সোফোক্লিস্‌, ইস্কাইলাস্‌ পাঠ্য ছিল বলে আমরা নিজে থেকেই পড়ে ফেলেছিলাম ইংরেজি অনুবাদে বেশ কিছু প্লেটো ও গ্রীক ট্রাজিডি। জীবন ধন্য হয়েছে তার রসাস্বাদনে। অথচ ইস্কাইলাস কে পড়ালেন আজ মনে পড়ছে না। এমনি অনেক কথা এখন ফাঁকি দিয়েছে। একজনের কথা কিন্তু মনে

আছে ; আর এখনো মনে করি—যদিও তাতে 'গমিষ্যামি উপহাস্যতাম'। তিনি ওয়ার্ডসওয়ার্থ পড়াতেন। হেরম্বচন্দ্র মৈত্রই সেই অধ্যাপক। যা তাঁর সম্বন্ধে গাল-গল্প, সত্যই তার অধিকাংশ আমরা তাঁর শ্রীমুখ থেকেই ক্লাশে শুনতে পেতাম—ডিরেক্ট ফ্রম্ দি হর্সেস্ মাউথ্। যেমন, (১) ন্যাশন্যাল থিয়েটারের (এখন যা "গ্রেস্ সিনেমা")—না স্টার থিয়েটারের পথ কোনটা বলে দেবেন কি ?—হেরম্ববাবুকে জিজ্ঞাসা করেন কেউ হ্যারিসন রোডের মোড়ে। তাঁর প্রসিদ্ধ উত্তর, "জানি, কিন্তু বলব না।" (২) "ইউনিভার্সিটি কমিশন এসেছেন আমার কলেজে (সিটি কলেজ)। ছাত্রদের টিফিন ঘর দেখবেন। আমি সেখানে কোনদিন যাই নি। তাঁদের সঙ্গে যেতে হ'ল। কী দেখলাম ? ছাত্ররা খাচ্ছে কী ?—'ডেভিল্ !' " ব্যঙ্গবিকৃত হাসি অধ্যক্ষ মহাশয়ের মুখে। (৩) উপন্যাসে আছে, কিন্তু উপন্যাস আমি পড়ি নে। তবে দু'-একখানা ভাল উপন্যাস আছে, যেমন রমোলা।" (৪) এমার্সন—কার্লাইলের নানা কথা। (৫) তাঁর আমেরিকার অভিজ্ঞতা। (৬) বিদ্যাসাগর মহাশয়েরও দু'-একটি গল্প বাদ যেত না, তা সত্য। এসব বাজারে প্রচলিত গল্প মিথ্যা নয়। 'মর‍্যালিটি'র মাত্রাধিক্য নিশ্চয়ই হাস্যকর। তাই মনে মনে মজা পেতাম। কিন্তু কিছুদিন ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ পড়ানোর পর আরেকটা কাণ্ডও ঘটে গেল। মার্জিত, অনবদ্য ইংরেজিতে অনবদ্য অন্বয় (প্যারাফ্রেজ) আমাকে ওয়ার্ডসওয়ার্থের দুয়ার থেকে ধরে এনে তাঁর কবিতার গর্ভমন্দিরে পৌঁছে দিল। তার পূর্বে ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ আমার চিত্তজয় করতে পেয়েছিলেন বলতে পারব না। হয়তো অপেক্ষা করছিলেন, এই অর্বাচীনের সাবালকত্বের জন্য। ওয়ার্ডসওয়ার্থ নাবালকের ভাবাবেগের কবি নন। হোক বয়সের গুণ, কিন্তু মুক্তকণ্ঠে বলব—হেরম্বচন্দ্র মৈত্র সুনিশ্চিত গতিতে আমাকে ওয়ার্ডসওয়ার্থের ভাবজগতের দিকে এগিয়ে নিয়ে যান—যে-জগৎ বাল্যে বাবার মুখে শুনতাম—অলোক-সামান্য। কিন্তু বাবার আশ্বাসেও পূর্বে তাতে এগুবার প্রেরণা পাই নি তখন। 'ট্রু টু দি কিন্ড্রেড্ পয়েন্ট অব হেভন এণ্ড আর্থ'-এর প্রবক্তা কবিদের জন্য আমার তেমন কোন মানসিক দৌর্বল্য এখনো নেই। এমন কি ওই 'জ্ঞানী' বুর্জোয়াদের জন্য অবজ্ঞাই ছিল। কিন্তু, যতই হেরম্ব মৈত্র মশায়ের পিউরি-টানিজম্ বাঙলাদেশের (আমারও) সহজ হাসির উপকরণ হোক, তাঁর অধ্যাপনাকে আর তুচ্ছ করা যায় নি। তাঁর দান স্বীকার্য—ওয়ার্ডসওয়ার্থের গভীরতা উপলব্ধির মত নয়নাঞ্জন শলাকা তাঁর হাতে ছিল।

অধ্যাপকদের কারও নামই বিস্মৃতির অন্ধকারে হারিয়ে যায় নি। কিন্তু প্রথম থেকেই হারিয়ে ফেলেছিলাম তাঁদের অধ্যাপনার আকর্ষণ। অবশ্য চল্লিশ-প[ঞ্চা]শ

বৎসরে নামগুলি হারিয়ে যাওয়াও আশ্চর্য নয়। সেই ছয় বৎসরেও মনে অধ্যাপকদের সঙ্গে মনের দেনাপাওনার বিশেষ দাগ পড়ে নি। তাই পঠন-পাঠন পদ্ধতির তুলনায় সেই মানুষদের মুখই যা একটু মনে আছে। সেই ছ' বছরের সবচেয়ে বেশি দাগ পড়েছে কলেজ-জীবনের অন্য জিনিসসমূহের—কলেজ বন্ধুদের, কলেজ লাইব্রেরীর, পাঠ্য-অপাঠ্য নানা বই-এর, আর কলেজের বাইরের অন্যান্য জিনিসের, আর সেই সঙ্গে কলকাতার রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের; এবং তার সঙ্গে ছুটিতে-কাটানো আমাদের প্রথম যৌবনের (১৬ থেকে ২২) দুর্দান্ত উৎসবের দিনগুলি,—হাসিতে-গল্পে, খেলায়, নাট্যাভিনয়ে, সাহিত্য-সংস্কৃতির নব-নব আয়োজনে—সর্বোপরি বেপরোয়া হৈ-চৈতে মেঘনার ভাঙন-ধরা নোয়াখালি শহরের বুকে আমার দাদা রঙ্গীন হালদারের নেতৃত্বে সবুজের বাঁধন-ছেঁড়া উৎসবে যে-দিনগুলি বইয়ে দিয়েছি বেহিসাবী মানুষের মত—সে এক অদ্ভুত ব্যাপার। অবশ্য, অন্যরূপ বিরুদ্ধ কারণও ছিল যাতে কলেজী পড়াশুনায় মন বসল না। একদিকে সোভিয়েত রাষ্ট্রের জন্ম, জার-কাইজার, হাবস্‌বুর্গ ও তুর্ক সুলতানের বিলোপ, যুদ্ধান্তের পাশ্চাত্য জীবন-বিপর্যয়, অন্যদিকে রৌলট বিল, জালিয়ানওয়ালাবাগ, নন-কো-অপারেশন (১৯২২), দেশজোড়া উদ্দাম আলোড়ন তখনি আমাদেরও জীবনের উপর ভেঙে পড়ছে। দেশের এবং পৃথিবীর সমস্ত জীবনটাই ওলট-পালট হচ্ছে। ওসবে প্রকাশ্যে ফুলে ফুলে উঠছে আমাদের যৌবন বিদ্রোহে। গোপনে গুমরে গুমরে পাক খেয়ে উঠছে বিক্ষোভ-অধীরতা! এমন সময়ে ক্লাশে বসে পড়া ছাত্রদের পক্ষে অসম্ভব, অধ্যাপকদের পক্ষেও পড়ানো দুঃসাধ্য। কলেজের লেখাপড়াই যেন অবান্তর। তার কোনো দাগ যদি কারো মনে না পড়ে—সে দোষ কার? নিশ্চয়ই অধ্যাপকদের শুধু নয়—কালের। তবে সেই সঙ্গে মানতে হবে—কতকটা দোষ আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের অ-মানবীয় শিক্ষা-পদ্ধতির, যাতে ছাত্র ও শিক্ষকের একত্র হওয়াই যথেষ্ট—যোগাযোগ নিষ্প্রয়োজন।

প্রাঙ্গণের প্রান্তে

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে তাই 'আলমা মেটর' বলা দুঃসাধ্য। তবে 'স্টেপ মাদার' বলাও অসম্ভব। এখনো ভারতবর্ষের তা শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়। সেখানে দেশের শ্রেষ্ঠ অধ্যাপকদের তখন সমাবেশ হয়েছিল। আর ঠিক আমাদের কালের পরেই (হয়তো স্বাধীনতা-আন্দোলনের ফলেও) এই বিশ্ব-বিদ্যালয় অনেকটা জাতীয় সম্পদ হতে পেরেছিল—ভারতবর্ষের আর কোনো বিশ্ববিদ্যালয় তা হয় নি।

যে-কয়জন মহান অধ্যাপকের সান্নিধ্য আমি লাভ করেছি, তা করেছি কলেজের ও ইউনিভার্সিটির দিন পেরিয়ে যাবার পরে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছত্র-ছায়ায় নয়। দু-তিন জনের উল্লেখ আগে করেছি। আরও দু-চার জনার উল্লেখও প্রয়োজনীয় এবং এখানে শুধু উল্লেখই করব, পরিচয় সম্ভব হবে না। আয়ুতে কুলোলে তাও একদিন করব, এখানো সে আশা রাখি। ডঃ সুশীল কুমার দে বিলাত থেকে ফিরে এসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবার আগে মাস কয়, বোধ হয় তিন মাস কিম্বা আরো কম—ইউনিভার্সিটিতে পড়িয়ে ছিলেন। ১৯২৮ সালে সে কথা তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিতে তিনি বললেন, 'মনে নেই। তোমারই বা মনে রাখবার কী দরকার? এখানে আমরা 'শনি-চক্রের' সতীর্থ, সাহিত্যের সহযাত্রী'। ডক্তর সুশীল দে'ও একই কালে সংস্কৃত ও বাঙলার সুপণ্ডিত গবেষক, আর সাহিত্যের রসগ্রাহী সমালোচক। যে-কোনো অধ্যাপক অমন ইংরেজি দূরের কথা, বাঙলা লিখতে পারলেও চিরপূজ্য হবেন। একদিকে অভিজাত সৌজন্যে মর্যাদাময়, অন্যদিকে সাহিত্যের আসরে প্রীতিতে সৌহার্দ্যে অকুণ্ঠিত। অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় কিন্তু একদিনও আমাদের ক্লাশে পড়ান নি। তিনি ১৯২২-পর্যন্ত ছিলেন বিলেতে গুরুগৃহে; ১৯২৩-এ দেশে ফিরেন কলকাতার গুরুকুলে। তখনকার বিদায়মুখী সিক্সথ্ ইয়ারের আমাদের পড়ানোর ভার গ্রহণ করলেন না। যখন ১৯২৬-এ তাঁর গৃহে ভাষাতত্ত্বের গবেষণার প্রার্থনা নিয়ে উপস্থিত হলাম, তখন থেকেই তাঁর সহৃদয় সঙ্গ লাভ করেছি। তারপর থেকে রাজনীতি-সমাজনীতি ব্যতীত, তিনি বহু বিষয়ে আমার গুরু, সর্বসঙ্কটে অগ্রজ, প্রাণময় রসিকতার সুহৃদ! রাজনীতিতে যে তাঁকে অনুসরণ করি নি তার কারণ, আমার ধারণা, রাজনীতির ঘূর্ণী তাঁর দুর্বোধ্য। তাই নানা সূত্রে যখন তিনি রাজনীতিতে গিয়ে পড়েন তখন তিনি বাঙালী ভদ্রলোকের মন ও প্রবণতা নিয়ে জড়িয়ে পড়েন গতানুগতিক রাজনীতিতে। কলেজের শেষে এসে এ'দের মতো যাঁদের পেলাম তাঁরা আমার ছাত্রজীবনের অনেক অতৃপ্তি মিটিয়ে দেন। সত্যই কি মেটান? না, আরও মনে করিয়ে দেন—কলেজে কী পাই নি।

অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মার্কসবাদ বা কমিউনিজমের ব্যাপারে আমার অনাত্মীয়। কিন্তু তিনি আমার কাছে বিদ্যায় বিস্ময়, আন্তরিকতায় অপরিমেয়, আর মানবিকতায় (তাঁর সকৌতুক ভাষায়) "সু. কু. চ.", সু-এবং কু-ও। আমাদের কলেজ-জীবনের ধূসরতার কথা উঠলে একবার তিনি আমাকে বলেছিলেন—"আমাদের মত আপনারা (সুনীতিবাবুর কাছে প্রায় ৫০ বৎসরের ঘনিষ্ঠতায়ও ছাত্ররা 'আপনি', 'তুমি' নয়) যে প্রোফেসর পান নি। যেমন,

বিনয়েন্দ্র সেন, পার্সিভাল, মনোমোহন ঘোষ।" আমরা যাঁদের পেয়েছিলাম সেই অধ্যাপকরাও ফিরে আমাদের বলতে পারতেন—'বাপু হে, আমরাও এম. ঘোষ, পার্সিভাল নই, তোমরাও নও সুনীতি চাটুজ্জ্যে, সুশীল দে, সত্যেন বোস।' কথাটা সত্যি। সেই বিদ্যালাভ ও বিদ্যাদানের মহালগ্নটা আমাদের কালের আগেই নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল ডঃ মেঘনাদ সাহা, সত্যেন বোস, সুনীতি চাটুজ্জেদের সঙ্গে। নির্বাপিত হয়ে এল জ্যোতির্ময় টীকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ললাটের।

সবশুদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে তাকিয়ে দেখি—পাঠ্য বইতে আমার অরুচি ঘুচল না। বরং পরীক্ষার পড়া ও মামুলীপনায় তা পাকা হ'ল। আমার প্রাথমিক প্রত্যাশাও সেই কারণে অচিরেই ঝিমিয়ে পড়ল। বাস্তবিকই ঝিমিয়ে কাটিয়েছি দিনগুলি। প্রফুল্ল ঘোষ মশায়ের ক্লাশে শেষ দিনে ধরা পড়ে গেছলাম। না হলে আমি তো ফার্স্ট ইয়ার থেকেই সেই শেষদিন পর্যন্ত বহু ক্লাশে বরাবর ঘুমিয়ে আসছি। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে আহারান্তে ঝিমুনি পায়, পাখার বাতাসের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অধ্যাপকরা কেউ কেউ কিছু না কিছু শোনাতে চাইতেন, তা ঠিক। কিছু হয়তো শোনার মতও ছিল। যাই হোক, কী পাঠ্য বই, কী ক্লাশের পড়া, কী অধ্যাপনা—কিছুতেই আমার মন লাগ্‌ল না।

স্কটিশ চার্চেস্ কলেজ ও ইউনিভার্সিটির অধ্যাপকরা সবাই বিদ্বান, ভদ্র, সহৃদয়। বিশেষতঃ, আশুতোষ-লিটন কলহে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরা স্বেচ্ছায় স্বল্পতর বেতন নিতেও স্বীকৃত হয়েছিলেন। তাঁদের সান্ত্বনা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মটো 'Advancement of Learning'। আর তখনো কলেজের পাঠ্যবই রচনার ব্যবসায় তাঁদের অচেনা ছিল ; জানা নেই এ যুগের মন্ত্র advancement of earning। আসলে বিশ্ববিদ্যালয়ের দানে আমার অঞ্জলি ভরে যায় নি। দোষ কারও নয়, আমার স্বভাবেরই। তাই অদ্ভুত নেশায় তখন কত 'বাইরের বই' পড়েছি, কত পুরনো দোকানে বই খুঁজেছি, পেয়েছি, দেখেছি, কত আনন্দ পেয়েছি ; কিন্তু কলেজের লেখাপড়ায় আমার মন লাগ্‌ল না। ক্লাশে গিয়েছি, পরীক্ষাও দিয়েছি, তত আগ্রহ কোনটাতেই ছিল না। পরীক্ষার দেউড়িগুলি পেরিয়ে গিয়েছি—ভালো-মন্দ যেমনই হোক ঠেকে যাই নি। শেষ অবধি মন্দই হয়েছে, তার ফলও ভোগ করছি। এম্.এ. পরীক্ষাটা আমার তখন অসহ্য হয়ে উঠেছিল। জানতাম খারাপ হচ্ছে, তবু যে-করেই হোক ও বোঝা মাথা থেকে নামাতে পারলেই যেন বাঁচবো! বাঁচলাম কি? বাঙালির ছেলে পরীক্ষায় ভালো না করলে আর রক্ষে আছে? পড়ে পড়ে কেবল মারই খেতে হবে।

পিঠের সেই দাগ এখন পিঠে ঢাকা থাকে জামা-কাপড়ে, কিন্তু মিলিয়ে যায় না। পিঠ থেকেও না, মন থেকেও না। এখনো বছরে দু'চারবার করে আমি স্বপ্নলোকে চলে যাই—সেই শেষ পরীক্ষার একটা বিশেষ দিনে যা কবে ফুরিয়ে গিয়েছে, তবু ফুরোয় না স্বপ্নে। দেখি ঘড়ি হাতে নেই, সময় দেখা হয় নি—লেখা শেষ হয় না। উত্তপ্ত হতাশ মস্তিষ্কের ভুল বাসা নেয় কলমের ডগায়। আর ক্রমে ফেলের অসহ্য বিভীষিকা বুক চেপে ধরে, দম বন্ধ হয়ে আসে, প্রাণপণে বাঁচতে চাই। অকস্মাৎ জেগে উঠে বুঝি সেই পরীক্ষার দানব বুকে চেপে ধরেছিল।—ছাত্রদের পক্ষে এমন পরীক্ষা-প্রথাকে কি বলব? ছোটখাটো এক-একটা ফাঁসি যাবার অভিজ্ঞতা।

আজ অবশ্য একালের ছাত্রদের সে বিভীষিকা নেই—পরীক্ষা এখন প্রহসন, তবে তা প্রয়োজন। তাপটা অসহ্য কিন্তু পাশের ছাপটা না হলেই নয়।

সতীর্থ-সঙ্গ

কালের স্রোতে কলেজের বিদ্যা এখন কোথায় ভেসে গিয়েছে। যা শুনেছি তা-ও এখন শুনি নি হয়ে গিয়েছে। তবু মনে আছে সেদিনের মুখগুলি। বিশেষ করে, যারা এসেছিল সেখানে পুণ্যলাভের সন্ধানে—সেই সতীর্থদের মুখ। এখনকার স্মৃতিস্রোতেও সে-সব দূরের মুখচ্ছায়া ক্ষণে ক্ষণে দুলে দুলে ওঠে। কারণ, তাদের সৌহার্দ্যের জন্যই কলেজের সেই দিনগুলি জীবনের বেলাশেষে এখনো তোলে মৃদুকলধ্বনি।

আমার সঙ্কোচকে সরিয়ে দিতে সহজেই বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল ক্লাশের একজনার সঙ্গে। কালের গতির সঙ্গে তা এখন আন্তরিকতায়, আত্মীয়তায় নিবিড়তর। সে ছিল ক্লাশে 'রোল নম্বর ১'। ওই সংখ্যাবাচক শব্দটা এক্ষেত্রে গুণবাচক হয়েছে। নামও জানা গেল—রবীন্দ্রনাথ বসু। রবিও জানে না—চশমাচোখে, উজ্জ্বল দৃষ্টি, ওই দীর্ঘ গৌরবর্ণ 'রোল নম্বর ওয়ান'কে তার সহপাঠীদের প্রথম দৃষ্টিতেই মনে হয়েছিল 'অগ্রগণ্য'—নম্বর ওয়ান ছাত্র। আজ এই জীবনের শেষদিকে এসে সাহস করে একটা কথা বলতে পারি। আমার [illegible] অধিকাংশ [illegible] ছাত্রের সঙ্গে, পূর্বে ও পরে, আমার পরিচয় হয়েছে। এ সৌভাগ্য আমার। দু-চারজন [illegible]

ছিল শ্রেষ্ঠতম ?' উত্তরে আমি আমার দাদার কথা স্মরণ করব—'রবীন্দ্রের মতো ক্ষুরধার বুদ্ধি আর কারও দেখি নি।' অথচ, বন্ধুসমাজে বাক্যমুখর হলেও রবিও আসলে একটু 'শাই'—সপ্রতিভ হয়েও সসঙ্কোচ। আত্মপ্রচার থাক, আত্মপ্রকাশেও কুণ্ঠিত। বাড়ির ছোট ছেলে সে—মনোবৈজ্ঞানিকরা বলবেন, সেই জন্ম-ছোটত্ব কি বৃথা হয় ? রবির বাবা বেঁচে ছিলেন, মা অনেক দিন নেই, দাদারা সুপ্রতিষ্ঠিত। আত্মনির্ভর হবার শিক্ষা তবু রবি পেয়েছিল ছেলেবেলা থেকে। কিন্তু আত্মপ্রত্যয়ী হবার সাহস বোধহয় সে পরিমাণে পায় নি। তার সঙ্কোচ আমার সঙ্কোচ, দুই সঙ্কোচের ওপর সেতু রচিত হয় প্রথম সেকেণ্ড-ইয়ারে। আমার নামীয় কার একটা লেখা সে ছাপার হরফে পড়েছে, জানাল তা আমাকে। মানুষটা কি আমি ? বি. এ. ক্লাশের শেষে 'তিন-বৎসরী আপনি' ঘুচে গেল তার একখানা পোস্টকার্ডে। তখন পরীক্ষার ফল বেরুচ্ছে ! সুখবর দিতে দু-জনার 'শাইনেস্' ঘুচে গেল, উচ্ছ্বসিত আনন্দে উৎসারিত হ'ল রবির 'তুমি' সম্ভাষণ। 'আপনি' ত্যাগের পরে আপন হতে দেরি হ'ল না। তাই সে হ'ল আমার অন্য বন্ধুদেরও বন্ধু ; তারপর আমার ভ্রাতা মা বাবা সকলের কাছেই আপনজন। সেই কারণেই আমি ও আমার আত্মীয়রা তাঁদের পরিবারেও পর থাকি নি। তার বৃদ্ধ পিতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কাছে সস্নেহ আদর পেতাম। শেষ পরীক্ষায়ও রবি অপরাজেয় ছিল, তবু কপালের লেখায় কিছু তা খণ্ডিত হয়। প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান তারই লভ্য ছিল, রবি সে স্থান থেকে শেষ মুহূর্তে বঞ্চিত হয়—কপালের লেখা। কপালের লেখায় তাকে কাজে যেতে হয়েছিল প্রথম পাটনায় দাদাদের কলেজে—এক বৎসরের মতো এক শ' টাকায় ইংরেজির অধ্যাপক হয়ে। কলকাতার বাইরে—বোধহয় বাড়ির বাইরেও—সেই তার প্রথম রাত্রিযাপন। দাদার কাছে সে সময় সে আমার মতোই আপনার হয়। তবে সেখানে ছিল মাত্র এক বৎসর। ইংরেজ ডাক্তাররাও তারপর আর তার পরীক্ষায়-পাশ-করা ডিপুটিত্ব ঠেকিয়ে রাখতে পারল না—এক বছর আগে কিন্তু তা করেছিল। যাক, তারপর রবিও সরকারী চাকরির হাওয়ায় ত্রিশ বছর জেলায়-জেলায় ঘুরে চলে। মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে তখন সাক্ষাতে ছেদ পড়ত। কিন্তু আমার ভাই-বন্ধুদের সঙ্গে নয়। মায়ের সঙ্গে নয়। লক্ষ্মীর সঙ্গে নয়। আমিও বাদ যেতুম না। কর্তৃপক্ষের ভ্রূকুটি আশঙ্কা সত্ত্বেও বেনামীর লেখায় গান্ধীবাদী জিজ্ঞাসা তখনো চালাত। [illegible] সরকারী [illegible] অফিসার রূপে সে তখনকার মুসলিম লীগ [illegible] সে অন্যায়ভাবে [illegible]

গ্রহণের আগে রবি এসে ঠেকল 'কমিশনার অব লেবর'-রূপে কলকাতায়। ত্রিশ বছর সরকারি চাকরি ও হাকিমের মেজাজ যে-কোনো মানুষকে হাসি কমাতে, কথা কমাতে এবং বন্ধুত্ব কমাতে অভ্যস্ত না করে ছাড়ে না। কিন্তু একটা মানুষ অন্তত দেখলাম, যে সেই চাকরি-চক্রের রাজপথ হালকা পায়ে, হালকা দেহে, হালকা মনে পরিক্রমা করে বেরিয়ে এল। আর বেরিয়ে এল হাসিতে মুখর হয়ে, কথায় কৌতুকসরসতা নিয়ে, আর প্রাণে নিয়ে অভিজ্ঞতার আশীর্বাদ-প্রসন্নতা, বিশ্বজিজ্ঞাসার ঔৎসুক্য ও গভীরতা। যতদূর বুঝি বিষয়কর্মে তবু রবি পেয়েছিল একটু স্বচ্ছন্দ আশ্রয়, অন্তঃপুরেও রবি পেয়েছিল একটি নিভৃত পরিবেশ। আর তার নিজের গুণ ও স্ত্রী-পুত্রকন্যাদের বুদ্ধি ও চরিত্রের প্রীতি তাতে জাগিয়েছে সুস্থ শ্রী। কিন্তু নিজের মধ্যেই ছিল তার নিজস্বতার উৎস। সে এক অদ্ভুত জিনিস। মানুষের সবচেয়ে বড়ো পরীক্ষা —নিজের ব্যাপারে। নিজেকে নিয়ে যে হাসতে পারে, পৃথিবীতে সে-ই আত্মজ্ঞানী। রবি বেশ হাসতে পারে নিজের সবলতায়-দুর্বলতায়ঃ 'ছেলেবেলা থেকেই তো জানো ঝোঁক। শেয়ারের বাজারেও তাই বরাবর ছাত্র-বয়স থেকে খেলেছি। হারলে সামলাতে পেরেছি, জিতলেও বেসামাল হই নি। স্কলারশিপের টাকায় পড়েছি, তা বাঁচিয়ে শেয়ারেও খেলেছি—মুঠো থেকে সিকিটা-আধুলিটাও কি সহজে গলে বেরুতে দেখেছ?' এজন্যই আমি তাঁর থেকে একবার পাঁচ টাকা ধার নিয়ে ফেরত দিই নি। বলেছি, ওজন্যই 'আমাকে তোমার মনে থাকবে।' মনে রয়েছে কিন্তু সেজন্য নয়। নানা কারণে রবি আমাকে মনে করে—ভালো খাবার হলে তো নিশ্চয়ই, ভালো বই পেলেও, আরও দশটা কাজেও। ওর সহধর্মিণী ও পুত্র-কন্যা পুত্রবধূদের রন্ধন-কলার আমি স্থায়ী সাক্ষী। ওব্যাপারে আমাকে বাদ দিতে পারে না। অন্য অতিথিদের আদর-আপ্যায়নেও রবি আমাকে বাদ দিতে চায় না। আর শুধু আমাকে যে সে ভোলে নি, তাও নয়। মাকেও সে মনে করে রেখেছে বরাবর। আর মা-ও মৃত্যুশয্যায় তাঁর কথা জিজ্ঞাসা করেছেন, জানতে চেয়েছেন তাঁর পারিবারিক কুশল। মারও ভুল হয় নি মানুষ চিনতে। শেয়ার মার্কেটে যদি বা চোখ থাকে, রবির চোখে তবু সর্বদা উজ্জ্বল কৌতুক, সরসতা, এবং যা অবিশ্বাস্য—একটু দার্শনিক অনাসক্তি। হাকিমী করেছে, লেবর কমিশনার হয়েছে, শেয়ারের বাজি ধরেছে ; তবু জ্ঞান-বিজ্ঞান-সাহিত্য, শিল্প, রাজনীতি-সমাজনীতি-সংস্কৃতির সর্ববিষয়ে রবি আজীবন সর্বভুক পাঠক। তারপর কমিউনিজম্ সোস্যালিজম্ সকল ইজম্‌কে মেনেও প্রধানতঃ ভক্ত গান্ধীজীর। তা নিয়ে আমরা 'ক'ভাই কম কৌতুক-পরিহাস করি না। সেও

সমানে কৌতুক করতে পারে। সে কৌতুক থেকে গান্ধীবাদও বাদ যায় না—অন্য 'বাদ'ও না। বলা বাহুল্য, নিজেকেও সে বাদ দেয় না, আমাকেও না। 'তুমি তো আজ হয়েছ কমিউনিস্ট্। কিন্তু তোমার থেকেই তো শুরু—তুমিই দিয়েছিলে রাজেন্দ্রপ্রসাদের সঙ্কলিত গান্ধীজীর ওই লেখ-সংগ্রহ—আর আজও তো তা থাকে আমার হাতের কাছে।' কথাটা মিথ্যা নয়। কিন্তু গান্ধী-সাহিত্য সে বহু যত্নে পড়ে। সে একদিকে লেখে শ্রমিক আইন সম্বন্ধে বই, আর দিকে আবার লেখে গান্ধীজীর শ্রমিক-সমস্যা সম্বন্ধে সমাধান-বিষয়ক আলোচনা। তার সবচেয়ে বড় আকর্ষণ গান্ধী-দর্শন, আর জীবনের শেষ রহস্যের স্বরূপ সন্ধান। মানতে হবে, যা'ই লিখুক, সে লেখা চমৎকার। আর, তার অনেক কথাই সত্য, তাই প্রায়ই তা মালিকদের কাছে অনুপাদেয়। মুনাফার শিকার যে মানুষ শিকার, একথাটা সত্যকার গান্ধীভক্তির জন্যই রবি এক-আধটুকু না বলে পারত না। আশ্চর্য নয় যে, এমন লেবর কমিশনারে মালিকদের অরুচি। একজন দিকপাল তো মুখ্যমন্ত্রী ডঃ রায়কে রবির মুখের সামনেই বলেন: 'ওঁকে কেন লেবর কমিশনার করেছেন? ইউনিভার্সিটিতে পাঠিয়ে দিন প্রফেসর করে।" তাঁর এ কথাটায় আমিও সায় দিই। ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বৎসর আগে সে ব্যবস্থা দেশ করতে পারে নি। এসব কৃতবিদ্‌দেরও অধ্যাপনাকাজ দুর্লভ ছিল। এখনো কি তা হয়? একেবারে শেষদিকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যানেজমেণ্ট্ ক্লাশের অধ্যাপনারও তার ডাক পড়েছিল। রবীন্দ্রের বিদ্যাবুদ্ধি, কৌতুকবোধ, সাহিত্যবোধ, জীবনবোধ,—আর আলোচনার প্রসাদগুণ, যা বিদেশী ভাষায়ও অকুণ্ঠিত—এসবের সব কিছু পরিচয় যদি দেশ পেত। কিছু পেয়েছে—কিন্তু বড় আকারে পেলে কি পেত মানুষটির সম্পূর্ণ পরিচয়? মানুষটার মধ্যে রয়েছে অতলস্পর্শী গভীরতা।*

রবি বসুকে দেখে যেমন ক্লাশের '১ নম্বর' বলে মনে হয়েছিল, আরেকজন সহপাঠীকে দেখেও তেমনি মনে হয়েছিল 'অদ্বিতীয়'। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত তা প্রমাণিতও করেছেন। স্কটিশের সজনী দাস ছাড়া আমার আর কোনো সহপাঠী তাঁর মতো কৃতিত্বের অধিকারী হন নি। অবশ্য একদিক থেকে সজনীর কৃতিত্ব অধিকতর। সুধীন্দ্রনাথের মত সৌভাগ্যের উত্তরাধিকার নিয়ে সে জন্মায় নি; সজনীকে আপন ভাগ্য অর্জন করতে হয়েছে। সেই 'ছল বল কৌশল' সুধীন্দ্রনাথের কিছুই প্রয়োজন হয় নি। ব্যক্তিত্বের ওরূপ স্বাভাবিক রাজমহিমা

---

*সম্প্রতি প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথ বসুর গান্ধীজী ও রবীন্দ্রনাথ বিষয়ক দু-খানি ইংরেজি ই দেশ ও বিদেশের গুণী ও জ্ঞানীরা সমাদর করছেন; আমার দুঃখও কতকটা দূর য়েছে। কিন্তু একটা দুঃখ আরও বেড়েছে—রবিকে বাঙলা লেখায় নামাই নি কেন?

সজনী কেন, আর কারও ছিল না। সে মহিমা সুধীন্দ্রনাথকে অদ্বিতীয় করেছে, শুধু তাঁর সাহিত্যের কীর্তি নয়। তার প্রমাণ আমরা তাঁর সহপাঠীরা। তাঁর সাহিত্য-জীবনের সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ পরিচয় সে তুলনায় অল্প। সে পর্বের কথা অন্যেরা বলেছেন, বলবেন। আমার বিশেষ পরিচয় ছাত্রজীবনের সুধীন্দ্র-নাথের সঙ্গে। পাঁচ বৎসর আমরা একসঙ্গে পড়ি। তখনো তিনি সাহিত্যে প্রকাশিত হন নি; কিন্তু তখনি তিনি আপন ব্যক্তিত্বে স্বপ্রকাশ।

স্কটিশের নিয়ম—ক্লাশে ছাত্রদের রোল নম্বর অনুযায়ী একাদিক্রমে বসা। অধ্যাপক হাজিরা-খাতা খুলতেন, এক-দুই করে ছাত্রদেরই নিজ নিজ নম্বর হেঁকে জানাতে হয়। সেই ধারাবাহিকতার মধ্যে পিছন থেকে একটি নম্বর ধ্বনিত হল ইংরেজিতে 'ওয়ন্ এটটি থ্রি' (?)। ইংরেজসুলভ উচ্চারণভঙ্গি, তদপেক্ষাও আত্মপ্রত্যয়-সমৃদ্ধ কণ্ঠ, যেন গভীর এক ঘোষণা। অধ্যাপক চমকিত হলেন, তাকালেন মুখ তুলে, আমরাও তাকালাম পিছনে। প্রায় শেষের বেঞ্চে উপবিষ্ট সেই '১৮৩' দেখবার মতোও। সুচিক্কণ ধোপ-দুরস্ত ধুতি-পাঞ্জাবী আরও অনেকের ছিল, তা কিন্তু এমন বিশিষ্টতা আর কারও অঙ্গে লাভ করে নি। সুসম্পন্ন ঘরের লক্ষণযুক্ত সুবেশ ও সুরূপ ছাত্র আরও ক্লাশে আছে। বরং রূপের দিক থেকে সুধীন্দ্রনাথ তখন ত্রুটিহীন ছিলেন না। প্রথম যৌবনে সুধীন্দ্রনাথকে ধনী ঘরের স্নেহ-পালিত সন্তানের মতো কমনীয় স্থূলকান্তি যুবকের মতো দেখাত। ছাত্রজীবনের শেষে একবার তিনি বেশ কিছুদিন অসুস্থ হয়ে পড়েন। মাথার চুল পাতলা হয়ে আসে, মেদ-মাংস ঝরে যায়, গোল মুখের ছাঁদ হয়ে দাঁড়ায় দীঘল। সুধীন্দ্রনাথ তখনি হন প্রকৃত সুপুরুষ—দীর্ঘদেহ, পরিণত সুন্দর মুখমণ্ডল, বুদ্ধিতে-ভাবনায় চক্ষু মৃদু-উজ্জ্বল। তবু কলেজে প্রথম দর্শনেও তাঁকে যে মনে হয়েছিল অদ্বিতীয় তার কারণ, তখনো তাঁর মুখে ছিল সেই স্বাভাবিক মহিমা—যা চোখে না পড়ে পারে না। আর তাঁর কণ্ঠস্বর, শব্দোচ্চারণ, বাগ্‌ভঙ্গি কৃত্রিম হলেও মনে হ'ত ব্যক্তিত্বব্যঞ্জক। ক্লাশের পড়ায় সুধীন্দ্রনাথের উৎসাহ ছিল না, ছিল রঙ্গমিশ্রিত নিস্পৃহতা। কোনোদিন উৎপাত করেন নি, অধ্যাপনার সময় নীরবে কাটাতেন। পিছনের উঁচু গ্যালারিতে বসে আপনার মনে একের পর এক বাইরের সাহিত্য নিঃশেষ করতেন। এইটুকুই ছিল তাঁতে আমাতে মিল। আর সেই সূত্রেই পরিচয় হয়—তবে একটু পরে। অবশ্য পরিচয় জেনেছিলাম প্রথম দু-চার দিনেই—সুধীন্দ্রনাথ হীরেন্দ্রনাথ দত্তের জ্যেষ্ঠপুত্র। আর হীরেন্দ্রনাথ দত্ত যে কে, বাঙালীর সাংস্কৃতিক রাজনীতিক জীবনে তিনি কী, তা তখনকার দিনের সকলেই জানতেন —[illegible] আসার পর্ব থেকেই। [illegible]

ও বাস্তববুদ্ধি, সাহিত্য-পরিষদ ও জাতীয় শিক্ষা পরিষদ এবং বিভিন্ন স্বদেশীয় সংগঠন—এমন বিচক্ষণতার সঙ্গে সকলের সমন্বয় ও পরিচালনা—বিচিত্র মনীষা দ্বারাই সম্ভব হ'ত। শুনেছি, সুধীন্দ্রের প্রথম শিক্ষা মিসেস্ বেসান্টের কাছে। তাই সুধীন্দ্রনাথের বৈদগ্ধ্যবিলাসেও পিতা বাধা দিতেন না। উত্তরাধিকারে যে সুধীন্দ্রনাথ অনন্যসাধারণ, কুলগত,—পিতার মনীষার সঙ্গে ও পিতৃব্যের অভিনয়পটুতা তাতে যুক্ত—এই ধারণাই প্রথম হয়েছিল। ধারণাটা একেবারে মিথ্যা নয়। কিন্তু শুধু ধারণা নয়, তার পূর্ণ রূপও দেখা গেল অচিরে।

দিনের পর দিন দেখতাম এই সুদর্শন যুবকের হাতে এক-একখানা নতুন বই। সে-সব বই বা লেখকের নামে আমাদের চোখ লোভে চকচক করে উঠত, মনে সম্ভ্রম জাগত। কিন্তু সঙ্কোচবশে থাকতাম দূরে। সঙ্কোচের সঙ্গে আরও একটি জিনিসও যুক্ত ছিল—একটু আত্মসচেতনতা। ক্লাশের বাইরে সুধীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব অচিরেই বহু সহপাঠীকে আকর্ষণ করে। কেউ কেউ তাঁরা বুদ্ধিমান, নতুন নতুন বই পাঠে কৌতূহলী ও কৃতজ্ঞ। অনেকেই তবু ব্যক্তি-মহিমায় আকৃষ্ট, তাঁর বাক্-মহিমায় উৎফুল্ল, সেই আভিজাত্য-অভিমানের আনুষঙ্গিক পার্শ্বচর। সুধীন্দ্রনাথ রাজা, রাজার বোধহয় পারিষদ না হলে চলে না। কিন্তু সে পদের প্রতি আমার লোভ ছিল না। দূর থেকে তাঁদের কল-কোলাহল, স্তুতি-প্রশংসা যা কানে পৌঁছত তাতে অবশ্য সুধীন্দ্রনাথের পক্ষে অখ্যাতির কিছু ছিল না। সুধীন্দ্রনাথ ইংরেজিতেই কথা বলতেন বেশি। মিসেস্ বেসান্টের নিকট বাঙলা শিক্ষার অবকাশ ছিল কম। সংস্কৃত ও ইংরেজি-ফরাসি প্রভৃতিতে সুধীন্দ্রনাথের তখন থেকেই বিশেষ অধিকার। শুনেছি বাঙলাই তিনি পরে শেখেন। কথাবার্তায়, আলাপ-আলোচনায় ইংরেজিই ছিল তাঁর স্বাভাবিক ভাষা। বিশুদ্ধ উচ্চারণে কোনো ভাষা বলা হলে সে ভাষার যথার্থ রূপ বোঝা যায়। সুধীন্দ্রনাথের মুখে ইংরেজির সে গৌরব সুরক্ষিত হ'ত। শ্রোতারা পুলকিত হতেন। আর, সেই সপ্রশংস দৃষ্টি-ও-কণ্ঠ পরিবেষ্টিত পারিষদমণ্ডলীতে সুধীন্দ্রনাথও মঞ্চ-অভিনেতার মতো তৃপ্ত হতেন। নিজেকে মনে করতেন পরিচ্ছদে বাগবৈদগ্ধ্যে অস্কার ওয়াইল্ডের জুড়ি! কখনো সুধীন্দ্রনাথ পরিহাসচ্ছলে বলতেন নিজের ভাবী কীর্তির কথা,—অবশ্য ইংরেজিতে—"আমি যে-বৎসর ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট হব—", কিংবা "আমি [illegible] পাব—" [illegible] এই দুই [illegible] দু-দিকেই ছিল তাঁর [illegible] পারিষদ [illegible] না [illegible]

অপরিহার্য। একটু অভিনয়ও চাই, রাজোচিত বেশভূষাও চাই,—শুধু রাজটীকায় রাজাকে চিনতে পারে ক'জন ? শুধু ব্যক্তিত্বের মহিমায় অন্ততঃ ওরূপ সমাজ অভিভূত হয় না। আর এসব ধারণাতেই দূরে ছিলাম। কিন্তু ক্লাশে আসন দূরে নয়। পরিচয় সাধনার জন্য মাঝখানে রবি বসুর মতো বন্ধুও ছিলেন। তা ছাড়া, আমাদের হাতেও যে নতুন নতুন বই প্রায়ই থাকে, সুধীন্দ্রনাথেরও তা চোখ এড়ায় না। একদিন নিজেই চেয়ে বসলেন একটা সস্তা দামের সেরূপ বই—'জন বুল্‌স আদার আয়লণ্ড'। আমারও সূত্র হয়ে গেল তারপর বই চাইবার। বই-এর বন্ধনে পরিচয় সহজেই বাড়ে। দেখলাম—সুধীন্দ্রনাথ জন্ম-অভিজাত। অভ্রান্ত প্রমাণ তাঁর শালীনতা. সতীর্থের সঙ্গে তাঁর স্বচ্ছন্দ আলাপ-আলোচনা এবং তার চেয়ে বড়ো কথা, নিরভিমান অভিজাত ব্যবহার। নেই দলপতির চাল। সেই সচেতন মহিমা প্রকাশের নামগন্ধও আমাদের সঙ্গে কথা-বার্তায় সুধীন্দ্রনাথের থাকত না। সাহিত্য বা সাংস্কৃতিক ঔৎসুক্যে দেখেছি তিনি সমধর্মীর মতো সুহৃৎ। পারিষদ-প্রিয় রাজা নন, আলোচনা-প্রিয় সতীর্থ। তাঁকেই আমি বলি অভিজাত শালীনতা, সহজাত স্বাভাবিক সৌজন্যের জন্যই যাকে অনুভব করতে হয় সম্ভ্রান্ত। আমার এই ধারণাটা ক্রমেই সুদৃঢ় হয়, পরে নির্ভুল হয়ে ওঠে। ছাত্রজীবনের শেষের একটি বছর কাটে এম.এ. ক্লাশে ও ল-ক্লাশে। আমরা ক'জন স্কটিশের ছাত্র, আপনা থেকেই পরস্পরের একটু বেশি আপনার। দিনের পর দিন এক বেঞ্চে বসেছি, সকল রকম কথা, মন্তব্য, আলোচনা সবই অন্তরঙ্গের মতো হ'ত—পাঠ্য বই, অপাঠ্য বই, অধ্যয়ন-অধ্যাপনা, রাজনীতি-সমাজনীতি, কোনো কিছুই অনালোচ্য থাকত না। সুধীন্দ্রনাথ অবশ্য এম.এ. ক্লাশে এক বৎসরের বেশি পড়েন নি—ল-ও না! যথাসময়ে ক্লাশে আসা, রীতিমতো ক্লাশ করা, তাঁর পোষাত না। এম.এ. ছেড়ে দেবার পক্ষে আরও একটা কারণ ঘটে।

ক্লাশে সুধীন্দ্রনাথ প্রায়ই আসতেন বেশ বিলম্বে। সেই সযত্ন মাজা-ঘষা প্রসাধন, শুভ্র-পরিপাটি বিলাসী পরিচ্ছদ, স্থির নিশ্চিন্ত পদক্ষেপে অধ্যাপকের পাশ দিয়ে দেরিতে এসে ক্লাশে আমাদের পাশে বসতেন এমনভাবে যেন এইটাই তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক এবং শোভন। অধ্যাপক প্রফুল্ল ঘোষ মহাশয়ের ক্লাশে সুধীন্দ্র এরূপেই সেদিনও এসেছিলেন যখন অধ্যাপকের হাজিরা নেওয়া শেষ হচ্ছে। অধ্যাপক মহাশয়ের সুধীন্দ্রের দিকে চোখ পড়ল—মুখে ফুটল স্মিত হাস্য। আবার হাজিরার রোল নম্বর বলার উচ্চারণভঙ্গিতে কানও খাড়া হ'ল, চোখের কোণ দিয়ে তিনি ছাত্রটিকে দেখে নিলেন। তারপর পড়া শুরু হতেই তিনি সুধীন্দ্রের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বেশ, তুমি পড়ো।'

'আমি !' সুধীন্দ্র চমকিত হলেন। তারপর হেসে দাঁড়ালেন।

অধ্যাপক ঘোষও সহাস্যে বললেন, 'হাঁ, পড়ো দেখি।' বেশ কৌতুকের হাসি ও দৃষ্টি তাঁর।

'পড়ব ?—আমার যে বইও নেই।' সুধীনও সকৌতুকে বললেন।

চসারের ক্যান্টারবেরি কাহিনীধারার "প্রোলোগ" পড়া হচ্ছে। আমরা তাড়াতাড়ি নিজেদের বই সুধীন্দ্রকে দিলাম।

অধ্যাপক তখনো হেসে বললেন, 'বই নেই! ভালো কথা। এই যে, পেয়েছ বই ? বেশ আরম্ভ করো—'

'কোথায় আরম্ভ হবে ?'—কুণ্ঠাহীন কৌতুকে সুধীনও 'ক্যান্টারবেরি টেলস'-এর 'প্রোলোগ' খণ্ডের পাতা এমনভাবে ওল্টাচ্ছেন যেন সবই হাসির কাণ্ড। হাসির কাণ্ডই ছিল। কিন্তু হঠাৎ অধ্যাপক ঘোষের ভাবান্তর হ'ল। গম্ভীর হয়ে উঠলেন তিনি ঃ 'তার অর্থ ? বই নেই, পড়া কোথায়, কিছুই জানো না' ক্রুদ্ধ রুষ্ট হলেন অধ্যাপক, 'ক্লাশে এসেছ।' একটু থেমে বললেন, 'এমন ছাত্র আমার ক্লাশে আমি চাই না' (কথা চলছিল ইংরেজিতে, আই ডোন্‌ট্‌ ওয়াণ্ট্‌ টু হ্যাভ্‌ সাচ্‌ স্টুডেন্টস্‌ ইন মাই ক্লাশ)।

সুধীন্দ্রও ইংরেজিতে উত্তর দিলেন নিরুত্তাপ বেপরোয়া কণ্ঠে, 'আমাকেই বা চান কেন তবে ?' (দেন, হোয়াই হ্যাভ মি ?)

একেবারে রঙ্গ থেকে অগ্ন্যুৎপাত। অধ্যাপক আগুন হয়ে বললেন—'চলে যেতে চাও ? যাও—যাও—' ইত্যাদি।

'নিশ্চয়'—সুধীন্দ্র স্থির গম্ভীরভাবে সামনের উঁচু বেঞ্চ সরিয়ে বের হলেন, জুতোর ঠক্‌ ঠক্‌ শব্দ তুলে সুস্থির সদর্প দীর্ঘ পদক্ষেপে ক্লাশ থেকে অধ্যাপকের পাশ দিয়ে বের হয়ে চললেন।

অধ্যাপক তখন ক্রোধে অস্থির। 'কী স্পর্ধা, কী স্পর্ধা'। হাজিরা খাতা নিয়ে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন, 'কত রোল নম্বর ?' ডাক দিয়ে বললেন, 'কত রোল নম্বর তোমার ?'

সুধীন্দ্র এক পা ক্লাশের বাইরে দিয়েছিলেন। সেভাবেই মুখ ফেরালেন, এক পা ক্লাশের ভেতরে—সেখান থেকেই অদ্ভুত সুস্পষ্ট উচ্চারণে বললেন রোল নম্বর। আর অদ্ভুততর সব্যঙ্গ উচ্চারণে ঘাড় বাঁকিয়ে অধ্যাপককে, 'থ্যাঙ্ক ইউ।'

সমস্ত অঙ্গ, পদক্ষেপ, কণ্ঠস্বর, ভঙ্গিতে যেন অধ্যাপককে নস্যাৎ করে দিয়ে সুধীন্দ্রনাথ রাজোচিত মহিমায় দ্বারভাঙ্গা ভবনের পশ্চিম বারান্দা দিয়ে জুতোর শব্দ তুলে বেরিয়ে গেলেন।

আমরা পরে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেছি—পিতা হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

কি বলবেন জানি না, কিন্তু পিতৃব্য অমরেন্দ্রনাথ দত্ত নিশ্চয়ই বলতেন—'ক্যাপিটেল !'

অধ্যাপক প্রফুল্ল ঘোষের মতো মানুষও সেদিন অধ্যাপনায় আর স্বচ্ছন্দ হতে পারলেন না। তারপরে এল এ-ব্যাপারের দ্বিতীয় অঙ্ক। স্যর আশুতোষের সামনে সুধীন্দ্রের ডাক পড়ল—বিচার হবে। আমরাও ভাবিত হলাম। হীরেন্দ্রনাথ দত্ত কিছুদিন পূর্বে স্যর রাসবিহারী ঘোষের সমস্ত সঞ্চয় 'জাতীয় শিক্ষা পরিষদ'-এর জন্য সংগ্রহ করে নিয়েছেন—সেই অর্থে কিছু পরে মানিকতলা ছেড়ে এখনকার যাদবপুরে সেই কারিগরি বিদ্যালয়ের পত্তন সম্ভব হয়। সে-সম্পত্তি না পেয়ে স্যর আশুতোষের ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তখন বিশেষ আশাভঙ্গ হয়েছে। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্তের প্রতি তাঁরা অসন্তুষ্ট। সুধীন্দ্রের পরিচয় কি স্যর আশুতোষ জানতে পারবেন না ? সুধীন্দ্রকে বললাম, 'যাই হোক, পিতাকেও ঘটনাটা বলে রাখুন।' জানতাম পুত্রের আত্মবিকাশের পথে পিতা কখনো বাধা দেন না। কিন্তু এ-আচরণ তিনিও সমর্থন করবেন না। তবু তিনি বিচক্ষণ লোক, তাঁকে জানানো উচিত। যথা দিনে যথাসময়ে সুধীন্দ্রনাথ পাকা সাহেবী পোশাকে বিশ্ব-বিদ্যালয়ে স্যর আশুতোষের ঘরে উপস্থিত হলেন। আমরাও ফলাফল জানবার জন্য উৎকণ্ঠিত ছিলাম। পরদিন শুনে নিশ্চিত হলাম, স্যর আশুতোষ—আশুতোষ। একটু আলাপেই সুধীন্দ্রকে মনে ধরল। সুধীন্দ্রের থেকে ভবিষ্যতে যথারীতি পড়াশুনোর প্রতিশ্রুতি পেয়ে তাঁকে এবার সস্নেহে নিষ্কৃতি দিয়েছেন। সুধীন্দ্রের অবশ্য প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে হয় নি। কারণ, এর পরে একদিন মাত্র তিনি সে-ক্লাশে আসেন। শুধু অধ্যাপক প্রফুল্ল ঘোষের ক্লাশে। তারপর পড়া ছেড়ে দেন, এম.এ.ও, ল'-ও ; পরে এর্টর্নির শিক্ষানবিশীও।

নাটকের এই শেষ অঙ্কটার পাঠভেদও আছে। সুধীন্দ্রনাথ যখন 'পরিচয়'-এর পত্তন করে সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আসর গড়েছেন,—আমি অবশ্য তখন জেলে—বহু গুণিজনের তখন সুধীন্দ্রের গৃহে সমাগম হ'ত। নামকরা সেই দেশী, বিলিতী অতিথিরা সে স্মৃতি রেখে গিয়েছেন। অধ্যাপক প্রফুল্ল ঘোষ ছিলেন তাঁদের অনেকের শ্রদ্ধেয় ও প্রিয় অধ্যাপক। তাঁদের একজনার মুখে শোনা—অধ্যাপক ঘোষের সঙ্গেও সুধীন্দ্রের সেখানে সাক্ষাৎ-সম্বন্ধ ছিল। প্রসন্ন মনে সুধীন্দ্রকে দেখিয়ে অধ্যাপক তাঁদের বললেন—'বাবু, বই ছাড়া আসতেন ক্লাশে।' সুধীন্দ্রও সলজ্জ সম্ভ্রমে অনুযোগ দিতেন—'ক্লাশের পাঠ্য বইতে কারও মন বসে ?' সেই বন্ধুদের ধারণা—ক্লাশের সেই ব্যাপারটারও

নিষ্পত্তি হয়ে গিয়েছিল স্যার আশুতোষের সঙ্গে সুধীন্দ্রের সাক্ষাৎকারের পূর্বেই—অধ্যাপকের সঙ্গেই ছাত্রের সাক্ষাতে। তাঁদের অনুমান—তা ঘটে থাকবে পিতা হীরেন্দ্রনাথের নির্দেশেই। কারণ ত্রুটিটা নিশ্চয়ই ছাত্রের। আর অধ্যাপকের কাছে ত্রুটি স্বীকার না করা সাহসের কথা নয়, বেয়াদবি। একথা সেদিন শুনলে এ ভাষ্যটা আমাদের তত তৃপ্তি দিত না, আমাদের বয়স তখনো মাত্র একুশ-বাইশ। আজ কিন্তু এই দ্বিতীয় ভাষ্যটা মিথ্যা হলেই লজ্জিত বোধ করব। সুধীন্দ্র সৌজন্যে অপরাজেয়। অধ্যাপক প্রফুল্ল ঘোষকেও ক্ষমাশীল উদার বলতে হবে। তবু মানি—সুধীন্দ্রনাথের সেদিনকার সেই ক্লাশ ত্যাগ, সেই 'থ্যাঙ্ক ইউ' বলার ভঙ্গি, যে-কোন শ্রেষ্ঠ অভিনেতার কাম্য হ'ত।

অবশ্য সুধীন্দ্রনাথের এই অভিনয়-শক্তি তাঁর অতিসচেতন শিল্পিসত্তারই আরেক দিক। এই শিল্পিসত্তার অনুশীলনই তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া ছেড়ে মুখ্যকর্ম বলে গ্রহণ করেন, তাই তাঁর সাহিত্যসাধনা। ছাত্রজীবনের শেষদিকে জানতাম—তিনি কবিতায় খাতা ভরাচ্ছেন; কিন্তু তা প্রকাশে কুণ্ঠিত। একদিন শুনলাম তিনি রবীন্দ্রনাথের সকাশে আপনার শক্তির পরীক্ষা দিচ্ছেন—বুঝলাম, কবির বিষয়ে যে-ঔদাসীন্যের ভাব পূর্বে তিনি দেখাতেন তা-ও ছিল অভিনয়। কে বলবে তাঁর রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে শেষ প্রবন্ধটাও তেমনি অভিনয়ের দুর্বুদ্ধি কিনা, না, প্রমত্ততা? একটা কথা: কবির সুপারিশে হঠাৎ তাঁর একটি কবিতা প্রকাশিত হ'ল 'প্রবাসী'তে (?), নাম 'কুক্কুট'। শোনা যায়—কবিকে সুধীন্দ্র বলেন, কবিতা যে-কোনো বিষয়ে লেখা যায়। কবির হাতে ছিল বৃহৎ মুর্গী-আঁকা সে-মাসের 'শনিবারের চিঠি'। তিনি বললেন—'তাই নাকি?' ছবিটা দেখিয়ে বললেন, 'লেখো দেখি এ-বিষয়ে কবিতা।' তারই ফল 'কুক্কুট'। তার শেষ কথা 'বাণী দে, বাণী দে'—রাত্রির অন্ধকারের প্রার্থনাপূরক। এই বোধহয় ছাপার অক্ষরে সুধীন্দ্রের প্রথম প্রকাশ। প্রবাসীতে এ কবিতা ছাপা হলে তার আভিধানিক শব্দ-আড়ম্বরে সকলেই চমকিত হয়। 'শনিবারের চিঠি'তে তাই শ্রীযুক্ত জীবনময় রায় তার ব্যঙ্গানুকরণে লিখলেন কবিতা—'মৎকুন'—তার শেষ কথা 'পানি দে, পানি দে'—মাথা ঠাণ্ডা হোক কবির। উভয় কবিতাই বিস্মৃত; কিন্তু উপভোগ্য সেই স্মৃতি।

সুধীন্দ্র নিজের মতো করে যে-সাধনা উদযাপন করেন, তা সামান্য নয়। আমার বিশ্বাস মাইকেল (এবং বিষ্ণু দে) ভিন্ন আর-কোন বাঙালি কবি এতটা বিশ্ব-সাহিত্যের মনোযোগী পাঠক ছিলেন না। সে সাধনার শেষে, সুধীন্দ্র যখন 'পরিচয়' প্রতিষ্ঠিত করতে থাকেন তার কিছু পূর্বে, তাঁর সঙ্গে একবার দেখা হয়। তখন ত্রিশের রাজনৈতিক আন্দোলনে দেশ টলমল। সুধীন্দ্র কথায়-

কথায় বললেন, 'তিনি দেশের ও-উদ্দীপনায় কোনো আগ্রহ বোধ করেন না।' এ কথাটাও কিছুটা অভিনয়মূলক। 'পরিচয়'-এর পৃষ্ঠায় তার সাক্ষ্য রয়ে গিয়েছে —পৃথিবীর ভাঙা-গড়ায় তিনি যে-পক্ষেই যখন থাকুন—নিরপেক্ষ বা উদাসীন থাকেন নি। 'পরিচয়'-এর সেইটা প্রধান গৌরবের কথা। পুরাতন পরিচয়গোষ্ঠীও অবশ্য তাঁর সেই বিশ্ববীক্ষার সাক্ষী। একান্তভাবে সুধীন্দ্র সাহিত্য-চর্চাই করেছেন, এমন নয়। সাংবাদিকতা করেছেন, জীবিকার্জনের দায় না থাকলেও ব্যবসায়িক বৃত্তি গ্রহণ করেছেন ; সাহিত্য-শক্তির মতোই নিজের বৈষয়িক বুদ্ধি-বিচক্ষণতারও অবহেলা করেন নি। 'পরিচয়'-এর হস্তান্তর ব্যাপারে যাঁরা তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা চালিয়েছেন তাঁরাও এরূপ মনে করতেন। তাঁর সহপাঠী হলেও সে কথাবার্তায় আমার যোগ ছিল না। ঘটনাক্রমে তারপরে 'পরিচয়' পরিচালনার দায়িত্ব আমার ওপর পড়ে—আজও (১৩৭২ বাং) তা থেকে মুক্ত নই। এ-কথা সত্য—সুধীন্দ্রনাথ যে আদর্শ ও পদ্ধতিতে ত্রৈমাসিক 'পরিচয়' পরিচালনা করেছিলেন তা বিশেষ কৃতিত্বসূচক। দেশের শিক্ষিত মানুষেরাও একবাক্যে তা অভিনন্দিত করে। আমরা জেলে ও জেলের বাইরে তা সাগ্রহে তখন পাঠ করতাম। কিন্তু সেখানে—সেই আদর্শে, সেই পদ্ধতিতে—অটল থাকা মাসিক 'পরিচয়'-এর পক্ষে অসম্ভব হয়। কালান্তরের মুখে সুধীন্দ্রনাথও তার হাল ধরতে অক্ষম হয়ে পড়েন। সে অধ্যায়ে 'পরিচয়'-এর রূপান্তরও তাই অনিবার্য ও স্বাভাবিক। তা'ই ঘটে। শুনেছি সুধীন্দ্রনাথ তাতে খুশি ছিলেন না ; আর নূতন পরিচালকদের উপরও খুশি হন নি। খুশি আমিও হই নি—কারণ, নানা ঘাত-প্রতিঘাতে সেই প্রথম ত্রৈমাসিক দু-বৎসরের গৌরব 'পরিচয়'-এর আর সুস্থিররূপে আয়ত্ত হ'ল না। সে অকৃতিত্ব আমার মতো তার পরিচালকদের,—অবশ্য কারো একার নয়। কিন্তু এ আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক। সুধীন্দ্রনাথের সাহিত্য-জীবনের বিকাশের পক্ষেই বা তাঁর সেই ছাত্রজীবনের প্রসঙ্গ কতটা প্রাসঙ্গিক ? এইটুকু যে, শুধু অভিনয় নয়, আভিজাত্যও সুধীন্দ্রনাথের স্বভাবগত। এই আভিজাত্য শুধু বৈষয়িক নয়, সাংস্কৃতিক 'স্নবারি' নয়, সুস্থ আভিজাত্য-চেতনা। এবং সত্যিকার অভিজাতের মতোই তিনি সাধারণ্যের থেকে সুদূর, কিন্তু যে-মানুষ আত্মমর্যাদাবান্ তাঁর নিকট মর্যাদাবান্ সুহৃদ।

পরবর্তী জীবনে বহু বহু ক্ষেত্রে সুধীন্দ্রনাথের সঙ্গে যখন সাক্ষাৎ হয়েছে তখনো মুগ্ধ হয়েছি—তাঁর স্বাভাবিক সৌজন্যে ও পুরাতন সুহৃদ-সম্মত আচরণে, আলোচনায়। সাহিত্যক্ষেত্রেও তিনি আপনার ব্যক্তিত্বের মহিমাকে আপনার কবি-কৃতিত্ব যোগে সুচিরস্থায়ী করেছেন। এখানে সে-বিচার নিষ্প্রয়োজ -

বাঙলা কবিতার আধুনিক ধারা যাঁরা সৃষ্টি করেছেন তিনি তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তাতে ভাবাধিক্যের বদলে মননশীলতার ও ললিত মাধুর্যের বদলে গাঢ় ঘননিবদ্ধ দার্ঢ্যের প্রয়োজন ছিল। তিনি বাঙলা কবিতার দৃষ্টি সেদিকে ফিরিয়েছেন। মালার্মে ছিলেন তাঁর কাব্যাদর্শের পথিকৃৎ। সে ফরাসী পথটা আমি চিনি না—তা বাঙলায় এসে ঠেকেছে কিনা জানি না। তবে বাঙলা সাহিত্যের অপেক্ষা পাশ্চাত্য সাহিত্য ও সংস্কৃতির ভাবসঙ্কট ছিল সুধীন্দ্রের কাছে অনেক বেশি সত্য। বরং বাঙালি জগৎটা সে পরিমাণে তাঁর আপনার হয় নি, বাঙলা ভাষাও নয়—বাঙলা গদ্যে তাই তিনি অস্বচ্ছন্দ যাত্রী। সহজাত কবি-কৃতিত্বের সঙ্গেই তাঁর গদ্যে মিশে আছে কৃত্রিমতা—আভিজাত্যের সঙ্গে অভিনয়।

সুধীন্দ্রের সঙ্গে পরিচয়েই আরেকজন গুণীলোকের সঙ্গে আমাদের এম. এ. ক্লাশে ও ল-ক্লাশে পরিচয় হয়। তিনি স্বর্গীয় অরুণ চন্দ বার-অ্যাট-ল। আমাদের চেয়ে তিনি ক্লাশে ও বয়সে একটু বড়। আমাদের বছরের ছাত্র ছিলেন বোধ হয় তাঁর অনুজ অশোক চন্দ। দু' ভাই-ই ১৯২১-২২-এ নন-কো-অপারেশনে পড়া ছেড়ে দিলেন। অশোক চন্দ মহাশয় বোধ হয় অল্প পরেই বি. এস-সি. পরীক্ষা দেন। আর পাশ করে মনোনীত হয়ে ফিন্যান্স সার্ভিসে যোগ দেন। সেখানে তাঁর কৃতিত্ব এখন সর্বত্র বিদিত, রাজনীতিকদেরও একটু চক্ষুশূল। কিন্তু ছাত্রজীবনে তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয় নি তখন। পরিচয় হয়েছিল শেষদিকে তাঁর দ্বিতীয় ভ্রাতা অরুণ চন্দ মহাশয়ের সঙ্গে। তিনি তখন ইউনিভার্সিটির অসমাপ্ত পড়াটা আবার শেষ করতে এসেছেন। আলাপী, বুদ্ধিমান, নানা বিষয়ে ওয়াকিবহাল অরুণ চন্দ আমাদের কয়জনার বেশ নিকট সতীর্থ হয়ে যান। পরে তিনি ব্যারিস্টার হয়ে এসে শিলচরে বসেন, আসাম আইনসভায় তিনি ছিলেন কংগ্রেস দলের নেতা। স্বভাবতই বার বার দণ্ডভোগও তাঁর ঘটে। ১৯৩৮ সনের ডিসেম্বরে যখন তাঁর সঙ্গে আবার সাক্ষাৎ হয়েছিল—আমি তখন কারামুক্ত—তখনো দেখলাম তিনি সেই মুক্ত-মন হৃদয়বান সতীর্থই আছেন। সমাজে রাষ্ট্রে তিনি তখন বিখ্যাত ও সুযোগ্য নেতা। দুর্ভাগ্য যে, কিছুকাল পরেই তিনি পরলোকগত হন। আসামের রাজনীতিতে একটা প্রয়োজনীয় স্থান তাতে শূন্য থেকে যায়; আর তার ফলটা এখনো দেখতে পাই। আসামে বাঙালির যোগ্য নেতা আর বিশেষ নেই।

রাজনীতির ঘূর্ণাবর্তে আমাদের সময়কার আমরা অনেকেই পাক খেয়েছি। সাহিত্য ও সংস্কৃতিতেই বরং সে তুলনায় আকর্ষণ ছিল কম। তবু যখন এখনকার

রাজনীতির ক্ষেত্রে দৃষ্টিপাত করি—তখন আমার মানতে হয়, বেশিদিন রাজনীতিতে আগ্রহ কেউ বড় দেখাতে পারেন নি। এখন তো সে সমাজে সহপাঠীদের মুখ দেখি না। কী হলো কার? সে হিসাব থাক, কী হবে তা দিয়ে? তবে সতীর্থদের সংবাদ এখনো মন ছাড়তে চায় না।

আমার মতোই শ্যামবর্ণের একহারা একটি ছেলে বসত স্কটিশ চার্চেস্ কলেজে আমার পাশে। সতীন বসুর ও আমার রোল নম্বর পরে পরে, বসতাম তাই পাশাপাশি—পড়তামও একরূপ বিষয় আর থাকতামও এক হোস্টেলে কাছাকাছি ঘরে। এত দিকে যাদের মিল তাদের মিলও হ'ল স্বাভাবিকভাবে। সতীন এসেছিল শান্তিনিকেতন থেকে পাশ করে। সতীনের চাল-চলনে, কথায়-আলাপে কোথাও সেরূপ কৃত্রিমতার চিহ্ন ছিল না। সতীন বোধ হয় আমার থেকেও বেশি 'শাই' ছিল। মুখ খুলত না সহজে; বেশি বাড়াবাড়ি ছিল না কিছুতে, কিন্তু বন্ধুগোষ্ঠীতে ছিল স্বচ্ছন্দ। আলাপে-পরিচয়ে শান্ত, পোশাকে-পরিচ্ছদে পরিচ্ছন্ন রুচিবান্। পাশ করে আর দেখা হয় নি। নওগাঁতে সে উকিল হয়েছিল জানি, দেশ-বিভাগে সেও কলকাতার অধিবাসী। তার জন্যে প্রীতি জেগে রয়েছে মনে। এরূপ প্রীতি ছিল আমার পাশের ঘরের বিমলের জন্য—যক্ষ্মাতে অকালেই তাকে আমরা হারাই। আশুতোষ শ্যামও ছিল ওরূপ বন্ধু, সিলেটে সে করত ডাক্তারী। হোস্টেলের সহপাঠীদের মধ্যে যার সঙ্গে পরিচয়-সৌহার্দ্য তাদের মধ্যে একজন 'বি-বাবু' বা বিমলাকান্ত সরকার, অন্যজন সজনীকান্ত দাস। সজনীর কথা বাঙলা সাহিত্যে লেখা থাকবে, আমার লেখার প্রয়োজন নেই। তবে আমার মতো করে তা আমি লিখেছি 'শনিবারের চিঠি'র সজনী স্মৃতিসংখ্যায়। তবু বলার আছে আরও অনেক।

বি-বাবুর কথাও বলার মতো, যদিও বেশি তা বুঝবার। সব রকমেই বি-বাবু ছিলেন আদর্শ ছেলে। এমন কি, অবস্থার দিক থেকেও। পিতা (ভবতারণ সরকার) তখন পুরুলিয়ার বড় উকিল, পশার ভালো, উদার-প্রকৃতি। তাঁর বাড়িতে অভাবগ্রস্ত ছাত্রদের থাকবার-খাবার অবারিত ব্যবস্থা। পরিবারের মধ্যে পিতা-পুত্রে, দুই সহোদরে, (এ-বাবু ও বি-বাবুতে) পরম ঘনিষ্ঠতা। অবশ্য বি-বাবু একটু একান্তে পালিত। শৈশবে মাতৃহীন, তাকে স্কুলে পড়তে পাঠানো হয় নি, বাড়িতে লেখাপড়া করেছে। কিন্তু লেখাপড়ায় সে মনোযোগী। পরীক্ষা পাশেও কৃতী। স্বাস্থ্যবান্ এবং স্বাস্থ্য রক্ষায় যত্নবান;—আমাদের উল্টো অভ্যাস। সত্যই সে 'ভালো মানুষ', আদর্শস্থানীয়। তবু আমার মতো অ-ভালো মানুষের সঙ্গে বি-বাবুর সম্পর্কটা

বিরাট বন্ধুত্বের। এই সৎ ও সহৃদয় বন্ধুটির কর্মজীবন মোটেই মসৃণ হয় নি ; শেষ পর্যন্ত জানি, তিনি মফঃস্বলের একটি বেসরকারী কলেজের ইকোনমিক্‌সের অধ্যাপক। ভাগ্যচক্রের ও ঘটনাচক্রের আবর্তনে-বিবর্তনে নানা ভাবেই সে প্রতিহত হয়েছে, আমাদেরও তার সম্বন্ধে আশা অসম্পূর্ণ থেকে গিয়েছে। অদৃষ্ট বলব কি ? অথবা ভাগ্য ? চাকরির পরীক্ষায় তাকে কর্তারা প্রথমবার স্বাস্থ্যে ফেল করে ; দ্বিতীয়বার উঁচু থেকে নামিয়ে স্বাস্থ্যবান স্বীকার করলে। চাকরিতে নানা ভাবে এল দুর্যোগ বার বার—শেষে পুত্রবিয়োগ, ভবানীপুরে পদ্মপুকুরে সাঁতার কাটতে গিয়ে ছেলেটি আর উঠল না। অবশ্য কতকটা এ কথাও সত্য—অতটা ভালোমানুষ হওয়াও ভালো নয়। গুণ হয়ে তা বরং দোষ হয়ে যায় ভাগ্যের চক্রান্তে। যাই হোক্‌, পৃথিবীকে খুব সুগৃহিণী বলতে পারি না। সংসার তিনি মোটামুটি চালান বটে, তবে বড়ো ফেলিয়ে-ছড়িয়ে। বি-বাবু তার একটা প্রমাণ।

অথচ সজনীর বেলা এ কথা খাটবে না। বরং বলতে পারি, পৃথিবীর সাধ্য ছিল না তাকে ঝেড়ে ফেলে। তার বেলা দোষও শক্তিতে-সাহসে গুণ হয়ে উঠেছিল। কিন্তু সে আরেক তত্ত্ব। তাতে-আমাতে পরিচয় কলেজে বছর দুই পরে। সে পরিচয় সহজেই জমে ওঠে সাহিত্য-প্রীতির সূত্রে ; আর কর্মসূত্রে নর্ম-সূত্রে তা বেড়ে যায় ক্রমাগত। ছিঁড়তে পারত ; কিন্তু ছিঁড়ে নি শেষ দিন পর্যন্ত।

ছোট হোস্টেলে সাহিত্য, বইপত্র, লেখাপড়া প্রভৃতি নানা উপলক্ষে কারও কারও সান্নিধ্যলাভ করেছিলাম প্রথম থেকেই। তাঁরা অনেকেই আমার বড়ো, কলেজে ওপরে পড়তেন। তখন র‍্যাগিং-সয়ে বড়দের স্নেহ ছোটদের লাভ করতে হত না। তাঁরা অনেকেই এখন নেই। তবু নাম ভুলতে পারছি না কারো কারো। যেমন, গোপালদা। ১৯১৪ থেকে ১৯৫৮ লালা গোপাল প্রসাদের নামটা অন্ততঃ স্কটিশের তখনকার ছাত্র-জগতের কাছে সব থেকে বেশি আপনার ছিল, আর ওই মানুষটিও ছিলেন তাই। আমাদের কালে তিনি ছিলেন ও-হোস্টেলের ছাত্র ; আর নতুন-পুরনো সকল ছাত্রের সকল কাজের ভরসা। মেধাবী ছাত্র, কিন্তু সময় যেত সেবায়, গল্পে, আড্ডায়। শেষ পর্যন্ত তাঁর এম. এস-সি. পাশ করাও হল না—অধ্যাপকরাও দুঃখ করতেন। তাঁরাই তাঁকে করে নিলেন কলেজের ফিজিক্‌সের ডিমোনস্ট্রেটর। আমাদের পরে বৎসরে বৎসরে কলেজে নতুন ছাত্র এসেছে। নতুন জীবন ও নতুন পরিচয়ে গোপালদার কাজের তালিকা বেড়ে গিয়েছে। এক কথায়, সকলকে নিয়ে যে-মানুষ গড়িয়ে চলেন, তেমনি মানুষ গোপালদা,

—কাউকে তিনি ছাড়তে পারেন না ; এমন কি, অ-কাজও ছাড়তে পারেন না কাজের প্রয়োজনে,—ছাড়েন শুধু নিজের কাজ, নিজের নানা জনের গরজে। কাঠিন্য ছিল না ব্যক্তিত্বে, কিন্তু দৃঢ়তার কি অভাব ছিল ? না, উচ্চাকাঙ্ক্ষার অভাব ? এমন মানুষ যে আমাদের বাড়িরও সবার আত্মীয় হয়ে যাবেন তা আশ্চর্য কিছু না। আমিও তাদের পরিবারের কতকটা কাছাকাছি গিয়েছিলাম। একবার আমি কলকাতার বাইরে কি কাজে গিয়েছি,—কি করে জানব গোপালদা হঠাৎ হৃদরোগে মারা যাবেন ?

আমার থেকেও গোপালদা'র বেশি নিকটের ছিলেন বোধহয় সুধেন্দুমোহন ঘোষ। আমারও তিনি কম নিকটের নন। আমার থেকে তিনি দু'বৎসর ওপরে পড়তেন। ময়মনসিংহ জামালপুরের তাঁরা অবস্থাপন্ন লোক, সুধেন্দুবাবু মানুষ হয়েছিলেন স্বচ্ছল অবস্থায়। গৌরবর্ণ, নাক-মুখ-চোখ সুন্দর। সুধেন্দু ঘোষ সুপুরুষ। কিন্তু তার চেয়ে বেশি তিনি সে জাতের মানুষ যাঁরা আড্ডায়, গপ্পে, আনন্দে জমে থাকেন, অন্যদেরও জমিয়ে রাখেন। প্রাণভরা স্ফূর্তি। ছাত্রজীবন ছাড়িয়ে তা বয়ে চলে কর্মজীবনে। তিনি আমাদের নোয়াখালির গ্রীষ্মাবকাশের উৎসবের আনন্দে গিয়ে যোগদান করেছিলেন। আমিও রাজনীতির ঘূর্ণীচক্রে পাক খেতে খেতে যখন তখন জামালপুরে গিয়ে তাঁর বাড়িতে আস্তানা গেড়েছি—তাঁর স্ত্রী-পুত্র-কন্যা সকলে আমাকে আপনার করে নিয়েছেন। একবার তো নেত্রকোণার সেই বিরাট কৃষক সম্মেলনের (১৯৪৫) শেষে আমরা সমস্ত দলটা তাঁর গৃহে ক'ঘণ্টার মতো উৎপাত করেছি। জানতাম, বাধা নেই, কারণ শুধু সুধেন্দু ঘোষ নন, তাঁর স্ত্রী ও পুত্র-কন্যারাও। সৌহার্দ্যে, উদারতায় স্বচ্ছন্দ আন্তরিকতা বাঙালি মেয়েদের মধ্যে কম দেখা যায় না। সুধীনবাবুর স্ত্রীও ছিলেন ঠিক স্বামীর জুড়ি। অমন হৈ-চৈ, অমন কলরব, অমন নিশ্চিন্ত উল্লাস অবশ্য তাঁর স্বভাবে ছিল না—মেয়ে-স্বভাবে তা মানাতও না। কিন্তু তাঁর স্বামীর সেই আনন্দ ও সারল্যের প্রতি আন্তরিক মমতা ছিল আর সেই সঙ্গে স্বামীর স্বজন-বান্ধব সকলের জন্য সহজ প্রীতি ও সহজ সেবা, নিজের আচার-আচরণে সারল্যের সঙ্গে সম্ভ্রমবোধ। তাঁদের অকৃত্রিমতা সার্থক হয়েছে ছেলেমেয়েদেরও মধ্যে। দেশ-বিভাগের বিপর্যয়ে সুধেন্দুবাবুর স্বচ্ছলতা চিড় খায় চল্লিশের দিকে। তা চৌচির হয়ে যেতে থাকে পাকিস্তানের পত্তনে। কলিকাতায় এসে তাঁকে নতুন করে জীবিকালাভের চেষ্টা করতে হয়। দিনের পর দিন অসুবিধা বাড়ে। তখনো *দেখেছি তাঁর মনের স্বচ্ছতা, সহজ আনন্দসম্ভার।* শুধু বন্ধু-বান্ধব নয়, নিজের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে করতে পারেন প্রাণখোলা হাস্য-পরিহাস। তখনো তাঁর

স্ত্রীর মনে-মুখে হাসি লেগে ছিল ; পুত্র-কন্যারা পিতার শুধু নয়, মায়েরও গুণ পেয়েছে।

বড়োদের মধ্যে হোস্টেলে আরও ছিলেন—**বিভূতি দত্ত ও শিবশরণ চৌধুরী।** **শিবশরণবাবু** ইংরেজির অধ্যাপক ছিলেন হেতমপুর কলেজে, আর বিভূতিবাবু পুরুলিয়ার সুপ্রতিষ্ঠিত উকিল, খেলায় কুশলী আর অভিনয়েও নিপুণ। শিবশরণবাবু আমাকে হোস্টেল লাইব্রেরিতে তাঁর সহকারী করে নেন—তাতে সঙ্কোচ কাটিয়ে কতকটা ওক্ষেত্রে স্বচ্ছন্দ পরিক্রমার সুযোগ পেয়ে যাই, আর বই-এর আস্বাদনের জন্য পাই তীব্র উৎসাহ। শেষ বয়সেও তিনি আমাকে বিস্মৃত হন নি—নানা অসুবিধার মধ্যেও স্মরণ করছেন। বিভূতি দত্ত ছিলেন মাতাপিতৃহীন। মাতাপিতৃহীন হলেও বিভূতিবাবুর মাঝে মাঝে চল্‌ত পিতার বার্ষিক শ্রাদ্ধ বা মাকে হাবড়া স্টেশনে রাত্রির গাড়িতে তুলে দেওয়া,—থিয়েটার দেখার ওটা ওজর। বিভূতিবাবু ভালো খেলোয়াড, আচার আচরণেও সকলের প্রিয় ও সহৃদয়। শ্যামবর্ণ ছিপছিপে গঠন, পাতলা ঠোঁট দু'টিতে থাকত সকৌতুক হাসি। কণ্ঠস্বরে সরসতা। তাঁর উৎসাহেই প্রথম আমরা দু'ভাই হোস্টেল পালিয়ে থিয়েটারে যেতে সাহস পাই। তাঁর সাহচর্যে আমার খেলার উৎসাহটাও আবার জীইয়ে ওঠে—খেলা নয়, খেলা দেখা। হার্ডিং হোস্টেলে যখন যাই এম. এ. ও ল পড়ি, তখন তিনি ল-কলেজের খেলার সেক্রেটারি। তেতলার আমার ৭৫ নং ঘরে বসে তিনি ল কলেজের খেলা চালনা করতেন। বড় বড় চার-পাঁচজন নামকরা খেলোয়াড় তখন ল কলেজের টিমে খেলে। উমাপতি কুমার ছাড়া আশুতোষ দত্ত প্রভৃতি ছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রধান। এসব খেলোয়াড়দের মধ্যে অখেলোয়াড় হয়েও আমি নীরবে এক কোণে ঠাঁই করে নিতেম। ৭৫নং ঘরটা যে আমার, খেলার সেক্রেটারির নয়, তা কেউ জানত না। কলেজ বা হোস্টেল কেউ বিভূতিবাবুকে ছাড়তে চায় না। পরেও বিভূতিবাবুর সঙ্গে অনেকবার আমার দেখা হয়েছে। তিনি তখন পুরুলিয়ায় উকিল। পশার জমিয়েছেন, সংসারে সুপ্রতিষ্ঠিত, পূর্বেকার মত হৃদয়বান মানুষ।

হোস্টেলে আমার বড়ো ছিলেন আরেকজন সুধানলিনী কান্তি দে, পরে **সুধাকান্ত দে**। তিনি ডাঃ নরেন্দ্র লাহাদের কর্মাধ্যক্ষ হন। সব শেষে হন—রাধানগরের রামমোহন কলেজের প্রিন্সিপাল। তিনি একটু আশ্চর্য মানুষ। মূল বাড়ি ঢাকা জেলায়, কিন্তু আসামের সুদূর মরিয়ানী অঞ্চলে মানুষ হয়েছিলেন। সেখানে বাবা ছিলেন বন-বিভাগের কর্মচারী। বোধ হয় বাল্যে তাঁরা বাঙালির মুখ বেশি দেখেন নি—বাবা-মা, আর ভাই-বোন দু'জনা ; এ'রা ছিলেন পরস্পরের সঙ্গী ও সুহৃদ। আর সঙ্গী ছিল আসামের প্রাকৃতিক দৃশ্য। এ পরিবেশটার

সবাই মনে হ'ত। কারণ আশ্চর্য রকমের কল্পনা-প্রবণতা, নির্মল চরিত্র ও মধুর স্বভাবের সমাবেশ দেখেছি সুধাবাবুর মধ্যে। তিনি ছিলেন কবিমনের মানুষ। তাঁর চোখে পৃথিবীর সকল জিনিসই স্বপ্ন-মাখা, অথচ তা মায়া নয়। সুধেন্দুবাবু ওঁর নাম রেখেছিলেন 'বিমানবিহারী'। আশ্চর্য কথা এই যে, এই মানুষটিরও বিশেষ অধীতব্য হ'ল ধনবিজ্ঞান। পাশ করে তিনি অধ্যাপক বিনয় সরকার মহাশয়ের সঙ্গে 'আর্থিক উন্নতি'র পরিচালনায় লাগেন। দেশের আর্থিক উন্নতিতে তাঁর তখন ঝোঁক। সেই পত্রে দেশের অর্থনৈতিক জীবনের বিবরণ তিনি লিখতেন, তা যেমন সুপাঠ্য তেমনি তথ্যসুন্দর ফিল্ড-ওয়ার্ক। তখনো এদেশে রিপোর্টাজ লেখার ধারার বিকাশ ঘটে নি—বিশ বৎসর দেরী ছিল। আমি তো আর্থিক উন্নতিতে সুধাবাবুর সে-সব বিবরণী পড়ে এক কালে ওদিকে পথ হাতড়িয়ে বেড়িয়েছিলেম, কিন্তু সন্ধান পাই নি। কারণ অমন করে দেশের সাধারণ বাস্তব জীবনধারাকে চিত্রিত করতে হলে দৃষ্টি-শক্তিও চাই, সৃষ্টিক্ষমতাও চাই। সুধাবাবুরও কিন্তু লেখা-পড়ার পথটা প্রশস্ত করার অবসর বেশি হ'ল না। একমাত্র সেই যৌবনে আরব্ধ রিকার্ডোর অর্থশাস্ত্রের বাঙলা অনুবাদ সম্পূর্ণ করেন, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ তার প্রকাশক। এরূপ সুস্থ স্থায়ী কাজ বাঙালির মধ্যে করে কে? কিন্তু সুধাকান্ত দের সাহিত্য-বোধের কথা তাতে জানা যাবে না। কলেজ-জীবনে দেখেছি, সাহিত্যের দুয়ারটা তাঁর চেনা। তা তিনি অন্যের সামনে খুলে ধরেছেন। তাঁর চেয়েও বড়ো কথা অবশ্য ওঁর স্বভাবের অকৃত্রিমতা ও মাধুর্য। আমাকে কেন, আমাদের অনেককে তা মানতে বাধ্য করেছে—অকৃত্রিম মাধুর্যেই মানুষের মানবিক শ্রী।

হোস্টেলে আরও দু'জনা ছিলেন একটু বড়। সাধু (আমার ভাই প্রফুল্ল) ও উপেনদের (উপেন রায়) তাঁরা সহপাঠী। কিন্তু আমার পক্ষেও ভুলবার মতো মানুষ নন। একজন ডাঃ পরিমল রায়, অন্যজন অধ্যক্ষ গিরিধর চক্রবর্তী। ডাক্তার রায় প্রসিদ্ধ লোক। যাঁরা তাঁকে জানেন তাঁরা দেখেছেন তিনি সুবক্তা; আর বক্তৃতা-প্রিয়ও। ছাত্রজীবনেও তিনি ছিলেন বাক্‌পটু। তবে তখন দেখেছি তিনি অশনে-বসনে সংযত, স্বদেশী চেতনার মানুষ, বাক্যে-আলাপেও তা ভুলবার সুযোগ কেউ পেত না—অথচ উগ্রস্বভাব নন, সহজ স্বচ্ছন্দ, আর তর্কে সর্বদা প্রস্তুত। আমরা ভাবতাম তিনি হবেন বামপন্থী বাগ্মী রাজনৈতিক নেতা। নন-কো-অপারেশনের স্রোতে অনেকের মতো ভেসে যেতে যেতে শেষ পর্যন্ত মাটিতে পা রাখতে পেরেছিলেন তিনি। কোনোমতে বি. এ. পাশ করে যান ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে। সেখান থেকে এম. এ. পাশ করে তিনি অধ্যাপক হন সেখানে। তখনো তাঁর রাজনীতি চরম না হোক, গরম

—আপোস-রফায়ও তিনি উদাসীন বা অস্বীকৃত। লণ্ডনের পি. এইচ-ডি. হয়ে পরে ডাক্তার রায় সরকারী চাকরির চক্রে পড়েন। পাটনাতে যুদ্ধের সময়ে তিনি ছিলেন ন্যাশনাল ওয়ারফ্রন্টের কর্ণধার। তাই পাটনার রঙ্গীন হালদার ও তাঁর বন্ধুদের বন্ধু হন। আমাদের বন্ধুরা দাদারও বন্ধু। ডাক্তার রায় ও আমার দেখা হ'ত সেখানে। তখন কৃতী রাজপুরুষ ; চাল অনুরূপ। তারপরে স্বাধীনতার পরে আবার দেখা। তিনি তখন পশ্চিমবঙ্গ ডিরেকটর অব্ পাবলিক্ ইনস্ট্রাক্‌শন। আনন্দ হ'ত। কারণ, *যে-সব শাদা মুখ চিরদিন শিক্ষার অভিভাবকত্ব* করেছেন এদেশে তাঁদের ক'জন ডাক্তার পরিমল রায়ের মতো বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, বক্তৃতায়, আলোচনায় সুপটু ছিলেন? কিন্তু ডিরেকটর হিসাবে সিনেটে সিণ্ডিকেটে সরকারী সকল শাসন-নীতির তিনিই মুখপাত্র। আমরা প্রায়ই সে-সব নীতির সমালোচক। মনে হ'ত, অনেক দিকে আপোস-রফায় সিদ্ধকাম হয়েছেন ডাক্তার রায় চাকরি-চক্রের নিয়মে। এই বুদ্ধিমান, বিদ্বান্ ও বাক্‌নিপুণ লোকটির দেশবাসীকে আরও কিছু দেবার মতো শক্তি ছিল—সে শক্তি চাকরিতেই ফুরোয় নি বলে মনে করা চলত।

তাঁদের সহপাঠী **গিরিধর চক্রবর্তী** অন্য ধরনের মানুষ। পলিটিক্যাল সায়েন্সের ছাত্র হিসাবে বোধহয় তাঁর মতো মেধাবী ছাত্র কম হয়। অথচ আড্ডায়, গল্পে, তাস খেলায়, দাবা খেলায়ও ঝোঁক কি কারও চেয়ে তাঁর কম? বক্তৃতায় প্রবৃত্তি নেই, কিন্তু আলোচনায় সুনিপুণ। আর বলতে দাঁড়ালে স্বচ্ছন্দ সচেতন অথচ চমক-বিরোধী। কোথায় তাঁর মধ্যে একটা সহজ নির্লোভতা ও প্রসন্নতা ছিল। বিষয়-বিরাগী নন ; বৈষয়িকতার ও পদপ্রতিষ্ঠার প্রতি একটা আন্তরিক অনাসক্তি। প্রথম জীবনে তিনি একবার অধ্যাপনা করতে এসেছিলেন ফেণী কলেজে। সেখানে নিজের বেতন থেকে একটা শিল্ড দিয়ে যান ফুটবল খেলার প্রতিযোগিতায়—ছাত্ররা তাঁর নাম সেই শীল্ডের সঙ্গে গেঁথে রেখেছিল। বিহারেই তিনি বরাবর অধ্যাপনা ও অধ্যক্ষতা করেছেন। নানা উপলক্ষে পাটনায় আসতে হ'ত। তাই দাদার কাছে তিনি অনুজ আর তাঁর কাছেও দাদা অগ্রজ। দাদার মতে গিরিধরের মতো গভীর দৃষ্টি ও জীবন-বোধ, সাহিত্য-বোধ, রাজনীতি-বোধ, সমাজ-বোধ দুর্লভ। এই মত আমারও গ্রাহ্য। তাঁর সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় পরম লাভ, বিশেষ তা আনন্দদায়ক। গিরিধরের স্নেহভাজন ছিল সজনী। সজনীর প্রতিক্রিয়াশীলতার দিকটা তিনি পরিচ্ছন্ন দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করতেন, আর স্পষ্ট বাক্যে প্রকাশও করতেন। তবু তাঁকে দিতেন তাঁর যোগ্যতার পুরস্কার—পোষণ করতেন তাঁর জন্য অন্তরের শুভাকাঙ্ক্ষা। স্নেহে অন্ধ হন নি—মূল্যবোধও আচ্ছন্ন হতে দেন নি। বিহারের

কলেজের অধ্যক্ষ-জীবন তাঁর পক্ষে সঙ্কটসঙ্কুল হ'ত। কারণ, অন্যায়ের সঙ্গে গিরিধর চক্রবর্তীর আপোস-রফা করা অসম্ভব। অশোভনতার সঙ্গে তাঁর স্বাভাবিক অসহযোগ। বিনা দ্বিধায় একবার তিনি হঠাৎ অধ্যক্ষপদ ত্যাগ করেন। দাদা বললেন, 'গিরিধর, একটা কিছু আগে জোগাড় করে নিলে না?' গিরিধর বললেন, 'কি দরকার, দাদা? আমরা বিদ্যাসাগরের দেশের মানুষ।' তার অর্থ, ওসব দেশের কলেজী 'মুখীয়ারা' বুঝবে না। এক কথায় স্ত্রী বিনি পয়সায় হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারী করছেন। কিছু না জোটে, এখন দু-চার আনা করে নিয়ে চালিয়ে যাবেন সংসার। মাঝে মাঝে ভাবি—হয়তো বিদ্যাসাগরের ঐতিহ্যটা আমরা যা মনে করি, ততটা উবে যায় নি। দু-এক পয়সার তেজ কারও কারও মধ্যে আছে।

হোস্টেলে অবশ্য আমাদের পরে যাঁরা আসেন তাঁদের মধ্যে নামকরা ছিলেন শান্তিনিকেতনের **শিবদাস রায়**। এক বৎসর পরে এলেন কলেজে। আর এসেই সকলের মন কেড়ে নিলেন গানে, সপ্রতিভ ব্যবহারে; স্বচ্ছন্দ আলাপে-সৌহার্দ্যে। শুনেছি, কবিরও বিশেষ স্নেহপাত্র ছিলেন এজন্য শিবদাস। শান্তিনিকেতনের ছাত্রদের তখনকার উৎসবে শিবদাস থাকতেন গানের দলের একজন প্রধান। শান্তিনিকেতনের সঙ্গে আমাদের হোস্টেলের ছাত্রদের তিনি প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটান। সেখানে খেলার আয়োজন হয়। কবির দর্শনও সেই উপলক্ষে আমার মতো অনেকেরই প্রথম—জীবনে তা ভুলবার সাধ্য নেই—শিবদাসকে তাই ভোলা সম্ভব হ'ত না। অনেকদিনের অদর্শনেও বন্ধুদের সঙ্গে সম্পর্ক যে ম্লান হয় না তার একটা প্রমাণও পেয়েছিলাম। শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায়ের উদ্যোগে শান্তিনিকেতনে সাহিত্য-মেলা হয়েছিল ১৯৫৪ (?)। মনে রাখবার মতো সেই আয়োজন, আমারও নিমন্ত্রণ ছিল। সেখানে গিয়ে যা জানলাম তাও কম গবেষণার বিষয় নয়। সেখানকার দায়িত্ববানদের কারও কারও কাছে আমার একমাত্র পরিচয় আমি কমিউনিস্ট। শান্তিনিকেতনেও অনেকের পক্ষে 'মানুষ' যেন গৌণ পরিচয়। শান্তিনিকেতনে তখনো আমার বন্ধু ছিলেন কেউ-কেউ, এখনো আছেন। কিন্তু আমি সেখানে তবু সহজে পা দিই নি—আমার উপস্থিতিতে পাছে বন্ধুদের বিব্রত করি, কিম্বা কেউ হয়ে পড়েন সন্দেহভাজন দুর্জন। সেবার অন্নদাশঙ্কর রায় মহাশয়ের নিমন্ত্রণ পেয়ে তবু নিমন্ত্রণ স্বীকার করি। 'মেলায়' যেতে ভাবনা কি? মেলায় তো জাত-বিচার নেই। কিন্তু মেলার কর্মকর্তাদের ব্যবস্থা ছিল—এক-একজন অধ্যাপক এক-একজন অতিথির ভার নেবেন। আমাকে নিয়ে মুস্কিল। এমন দুর্নামা লোককে স্থান দেবেন কে? শিবদাস রায় শান্তিনিকেতনেই থাকে, সে

অঞ্চলে তারা ছিল জমিদার। কবির আমল থেকে সেখানে সে নতুন করে গৃহ নির্মাণ করেছে, পূর্বেকার ভদ্রাসন রয়েছে অজয়ের পারে। অনেকের মতো শিবদাসকেও বলা হয় কোনো একজন অতিথির ভার নিতে। শিবদাস বললে 'নিশ্চয়'। কার ভার নেবেন? অতিথির তালিকা দেখে সে বললে "এই তো 'গোপাল হালদার' আছে দেখছি। বেশ, তাঁকে দিন।" গোপাল হালদার! সকলে অবাক! শিবদাস গান নিয়ে থাকে এবং শান্তিনিকেতনের রাজনীতিতেও নেই, দেশের রাজনীতিতেও নেই। তাতে আবার জমিদার শ্রেণীর মানুষ। কী বলছে হয়তো জানে না। "জানেন, গোপাল হালদার কে?—মশায়, কমিউনিস্ট।" শিবদাস শুনলেন সব। তারপরে বললেন "সে কমিউনিস্ট হয় যা হয় আমি বুঝব। তাঁকে আমার গৃহে রাখতে চাই।" কর্তৃপক্ষ তো বেঁচে গেলেন। দায় ঘাড়ান্তর হ'ল। ছিলাম তাই শিবদাসের অতিথি। পরম আনন্দে, তৃপ্তিতে। শুনেছি তাঁর মুখে শান্তিনিকেতন, তার রূপান্তর, ভাবান্তর অথবা লোকান্তর, এসব বিষয়ে তাঁর নানা কথা। কিন্তু শুনলাম অত বৎসর পরে তাঁর গান। আশ্চর্য! আমার মনে হ'ল তাঁর গলা বয়সের সঙ্গে যেন আরও দরাজ, আরও সুরেলা হয়েছে। এসেছে সেই মধুর পুরুষ-কণ্ঠে জীবনের দান, শান্ত-বেদনা ও স্থির গভীরতা। শান্তিনিকেতনে পরে যখন রবীন্দ্রশতবার্ষিকী উৎসবে গেলাম (১৯৬২) তখন আমি কর্তৃপক্ষের অতিথি—ভয় ছিল না। আরামেই ছিলাম। কিন্তু একটু দুঃখ হ'ল—শিবদাস সেখানে নেই। সে মোটর-বাসের ব্যবসা করে, থাকে আমেদপুরে; দেখা হ'ল না, এই দুঃখ। বুঝলাম, কালান্তরে তার নির্ঝঞ্ঝাট জীবনেও এসেছে আর্থিক তাড়না।

একথা আরও অনেকের সম্বন্ধেই মনে হয়, যাদের সঙ্গে পরে হার্ডিং হোস্টেলে বন্ধুত্ব হয়েছে বা বন্ধুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। হয়তো আর দেখাও হয় নি এত বছরে। অকস্মাৎ এক-এক ঝলকে সে সম্পর্কটা ঝিকমিকিয়ে ওঠে। খেলার জগতের সঙ্গে আমার প্রায় সম্পূর্ণ অপরিচয় ঘটে যায় পরে। পঙ্কজ গুপ্তের সঙ্গে দেখা হয়েছে তবু দু'-একবার খেলার উপলক্ষে নয়, আত্মীয়গৃহে আলাপে। উমাপতি কুমারের সঙ্গে দেখাই হয় নি আর। দু-একটা মজার কথা তবু তাঁর সম্বন্ধে আমার মনে থাকবে চিরদিন। বি.এ. পরীক্ষা দিয়েছি। ফলটা জানাবার কথা বিভূতিবাবুর। তিনি তখন ছুটিতে হার্ডিং হোস্টেলে আইনের একটা পরীক্ষা দেবেন। আমার নিকটতম বন্ধু চারুলাল মুখোপাধ্যায়ও কলকাতায়। খবর নিতে গিয়ে তিনি বড় চিন্তায় পড়ে গেলেন। ইংরেজিতে ফেল করে গিয়েছি —আ[illegible] কিছুর জন্য। উত্তরপত্র পুনঃপরীক্ষিত হলে ফাঁড়াটা কাটতে পারে।

সেজন্য চেষ্টা করা দরকার। পত্রপাঠ যেন কলকাতায় আসি। আপত্তি ছিল, গেলাম না। দু'দিন পার না হতেই চাবুর তারে খবর এল—খবরটা ভুল। ইতিমধ্যে উমাপতিবাবু গিয়েছিলেন অন্য কার ফল জানতে বিশ্ববিদ্যালয়ের অপিসে। যে রোল নম্বর তিনি বললেন তা দেখে কেরানি ভদ্রলোক বললেন, এ রোল নম্বরের তো এ নাম নয়। এ রোল নম্বরের তো নাম দেখছি—'গোপাল হালদার'—ফলাফলটাও ভালো। উমাপতিবাবু শুনে বললেন, 'আবার দেখুন তো রোল নম্বর আর ওই নামটা।' কুমার নিশ্চিন্ত হয়ে নিলেন। মজাটা এই, বিভূতিবাবুর ভুল ধরা পড়ে কুমারের ভুলে। এমনি দু-'একটা আরও মজার খবর আছে। উমাপতিবাবুর আমাকে মনে না থাকবার কথা। কিন্তু আমার ভুলবার নয়, তিনি যে দেশের 'হিরো'—ফুটবলের 'কুমার।'

হার্ডিং হোস্টেলের সে বৎসর কয়টা ছিল আনন্দে-উৎসবে ভরপুর। যাঁদের তখন সেখানে নতুন দেখেছি তাঁরা কেউ কেউ নানা কারণে স্মরণীয়। বিভূতি দত্ত, আশু দত্তদের নিয়ে জমেছিল খেলার হাওয়া। অন্য একজন সঙ্গীত ও সামাজিকতার আবহাওয়া সৃষ্টি করেছিলেন। সকলের মধ্যমণি হিসাবে তাঁকে দেখতাম, তাঁর নাম শুনেছিলাম আগে দাদার মুখে। মুখে অখ্যাতিও জানতাম। হার্ডিং হোস্টেলে একটু একটু করে তাঁর সঙ্গে হ'ল সাক্ষাৎ পরিচয়, ক্রমে সৌহার্দ্য, আর শেষ পর্যন্ত অন্তরঙ্গতা। তিনি মৃত বিনয় মুখোপাধ্যায়। জীবনানন্দে ভরপুর ঐ মানুষের কথা একটা সমগ্র গ্রন্থ লিখলেও বলা শেষ হবে না। এই কথাটুকু বলেই শেষ করি, আমার 'আড্ডা' বইখানা বিনয়বাবু ও অনুতোষবাবুর স্মৃতিতেই উৎসর্গীকৃত, সেই দুই 'আড্ডারসরসিকেষু'।

এ পর্বটাও শেষ করি। তার আগে বলা দরকার কলেজের দু-একজন সহপাঠীদের কথাও। তাঁদের সঙ্গও তো কম সৌভাগ্য দান করে নি। স্কটিশের বন্ধুরা, যাদের সঙ্গে চার বৎসর একাদিক্রমে পড়েছি, তাঁদের কাউকে কাউকে দেখেছি কলকাতার পথে-ঘাটে, অফিসে-আদালতে; অনেকেই জীবনে প্রতিষ্ঠিত। কেউ কেউ গুণ থাকতেও আত্মগোপন করে রইলেন, কেউ কেউ গুণ নিয়েও প্রকাশিত। সহপাঠীদের মধ্যে যাঁদের সঙ্গে ইংরেজিতে অনার্স পড়েছিলাম বা ইংরেজিতে এম.এ. পড়েছিলাম, তাঁদের সঙ্গেই পরিচয়টা ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে; তারও মধ্যে বিশেষ করে মনে রাখবার কথা যাঁদের, তাঁদের দু'জন আজ নেই—ধীরেন পাল মারা গিয়েছেন অনেকদিন। এম.এ. পাশ করে তিনি অল্প বয়সেই তখনকার মেট্রোপলিটান্ কলেজিয়েট স্কুলের হেড্‌মাস্টার হয়েছিলেন। বরাবরই আমাদের মধ্যে তিনি জ্যেষ্ঠরূপে গণ্য। বয়সে কিনা কে জানে, সম্ভবতঃ স্থির বুদ্ধি, স্থির গতি, স্থির প্রকৃতি—এই জন্যই তিনি

"ধীরেনদা"—আমরা তাঁর কাছে 'তুই'—তিনি 'তুমি'। পড়াশোনায়ও তিনি উচ্চস্থানীয়, পরীক্ষায়ও ওসব গুণ চাপা পড়ত না। পরীক্ষার ব্যাপারে প্রয়োজন এক ধরনের কুশলতা—স্থির বুদ্ধি থাকলে তা করায়ত্ত হয়। ধীরেন পালের স্বভাবে সেরূপ স্থিরতার সঙ্গে অন্য আরও গুণ ছিল—সমাজসেবা। স্কটিশের ছাত্ররা পরিচালনা করত একটা নৈশ বিদ্যালয়। প্রথম বৎসর থেকেই ধীরেনদা তাতে স্বেচ্ছায় শিক্ষকতার ভার নেন। ক্রমে হয়ে পড়েন তার মেরুদণ্ড। মাসের পর মাস এসব কাজ করা শুধু স্থির বুদ্ধি নয়, স্থির চরিত্র না হলে সম্ভব হয় না। অবশ্য এ ছাড়াও তাঁর হাতে এরূপ দশের কাজ আরও ছিল। কিন্তু স্বদেশীর ভূত তাঁর কাঁধে বেশি চাপতে পারে নি কেন? হয়তো কাঁধ খালি পেলে সে ভূত যত জোর পায় খালি না পেলে ততই জোর হারিয়ে বসে। স্কুলের ভার পেয়ে তিনি নিজের মনের মতো কাজ পেয়েছিলেন। কলেজের অধ্যাপনায় তাঁর এত রুচি ছিল না। মানুষ-গঠনের ভূতটা বোধহয় ওঁর কাছে বশ মেনেছিল।

অন্নদা দাশগুপ্তকে হারিয়েছি পরে (১৯৬১)। দীর্ঘদিন সেও করেছে কেশব একাডেমিতে শিক্ষকতা, তবে হেডমাস্টার নয়। ধীরেনদার' বা জ্যোতিবিকাশের মতো মাস্টারও বোধহয় অন্নদা ছিল না। ধীরেনদ যেমন সহপাঠীদের অগ্রজ, অন্নদা তেমনি সহপাঠীদের অনুজ। সে বাড়িতে কনিষ্ঠ ভ্রাতা, ক্লাশেও। সেরূপ একটু সরল চাপল্য, স্নেহের জিদ, আ আন্তরিকতা তাকে সত্যই আমার কেন, আমার ভাই-বন্ধুদেরও অনুজ ক তুলেছিল। নানা সূক্ষ্ম দিকে ছিল তার ঝোঁক. বিশেষ করে ফটো তোলায় ও ব্যাপারে সে সত্যই কৃতী সৌখীন শিল্পী ছিল। সে আমাদের কত ফটো তুলেছিল তার ঠিকানা নেই। দু'-একটা নিদর্শন এখনো ঘরে আছে। স্বচ্ছপ্র বন্ধু ছিল অন্নদা। এখন তার কৃতী পুত্রকে নিয়ে আমরা গর্ব করতে পারি

কলেজের পড়াশুনায় আমি বেশি উৎসাহ পাই নি, স্বাদও পাই নি অধ্যাপকদের সঙ্গ পাই নি। পেয়েছিলাম সতীর্থদের সঙ্গ। এদের জন্য সম সার্থক হয়েছে। হোস্টেলে পেতাম বই-পড়াশুনায় রুচি ও রস। নন্‌-ক অপারেশনের দুর্দান্ত তরঙ্গ কলেজের পড়াশোনায় মন দিতে দেয় নি; কিন্তু জোয়ারও বাইরের পড়াশোনায় বিশেষ বাধা দেয় নি. পাঠ্যবই ও পরীক্ষা স তা আমাকে বীতস্পৃহ করেছিল। আই.এ.-তে আসে জালিয়ানওয়ালা রক্তস্নান, বি.এ.-তে নন-কো-অপারেশনের পুরো ঝড়। ঠিক করেছিলাম, প দেব না। কাজে নামলাম। কিন্তু বার্দোলীর সিদ্ধান্ত এল, আন্দোলন পা হ'ল,—আমারও কাজ ফুরোল। পরীক্ষার ঠিক এক মাস আগে পরীক্ষা

কলকাতা এলাম। সে এক মাস আমি দিনরাত পড়লাম—সত্যই দিন করলাম রাত, আর রাত করলাম দিন। পরীক্ষার কাগজেও কলমটা তেজে চলল,—পড়ার বোধ হয় জোর ছিল না, তাই কলমটাই জোর চালাতে হ'ল। কাজও হ'ল, সৌভাগ্য আমার। এম. এ. আর ল দুই ক্লাশেই আমি যোগ দিয়েছিলাম পড়ার চেয়ে বেশি খেলার আড্ডাতে ও নানা হৈ-চৈতে। দুটো বছর বেশ জমেছিল। রাজনীতি ও সাহিত্যের দুর্বায়ুও ছাড়ে নি, শেষ তিন মাসে বাধাও জুটেছিল অনেক। ভাগ্যও তাই রেহাই দিলে না।

পরীক্ষা চিরদিনই আসলে ভাগ্যপরীক্ষা, অনিশ্চিত এবং কৃত্রিম একটা কৌশল। তার চেয়েও বিশ্রী কিছু হতে পারে—ক্যানভাসিং-এর যোগ্যতার পরীক্ষা। কিন্তু ও বস্তুর অভাবে ব্যক্তিগত ভাবে আমার ক্ষতি তখন হয় নি—কিন্তু বন্ধুদের কারও কারও হয়েছে, যেমন, রবির। তখনকার মতো আমি বিশেষ ব্যাহত বোধ করি নি। অবশ্য পরে দেখেছি সে আঘাত মর্মমূল স্পর্শ করে আছে। মর্মমূলেও তার ক্ষতরেখা পড়ে থাকবে। শুধু আমার কেন, পরীক্ষার দুঃস্বপ্ন ঘুমে আরও অনেক বাঙালির বুকে চেপে বসে যায় শুনেছি। আমার তো এখন বদ্ধমূল ধারণা—আমাদের পরীক্ষা-পদ্ধতিতে কপালের পরীক্ষা আট আনা, উত্তর লেখার কুশলতার ও চাতুর্যের পরীক্ষা চার আনা, বাকী চার আনা পড়াশোনার, তার মধ্যে এক আনা বিদ্যাবুদ্ধির। কোনো পরীক্ষা-পদ্ধতিই ত্রুটিহীন হবে না, জানি। তাই বলে পরীক্ষা-পদ্ধতিটা কি এমন অমানুষিক হতে হবে? পরীক্ষাপাঠ্য না হলে ইতিহাস, সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতি নানা বিষয়ে বইপত্র পড়বার আগ্রহ আমার ছিল। সমাজ-বিজ্ঞানেও জিজ্ঞাসা ছিল। ভাষাতত্ত্বের গবেষণায়ও আনন্দ পেয়েছি। কিন্তু পরীক্ষা? কিম্বা ক্লাশের পড়া? নৈব নৈব চ।

আসল কথা সেই। 'লাগল না, লাগল না'—কলেজের অধ্যয়ন-অধ্যাপনার একটা আমার মনে লাগল না। রাজনীতির জোয়ার তখন; তা ছাড়াও পৃথিবীর বিভিন্ন বিষয়ে আমার ঔৎসুক্য। কলেজের সীমানায় পৌঁছতেই জীবন উজান বইতে চায়। পাঠ্যবই-এর বাঁধানো পাড়ের মধ্যে তা বদ্ধ হ'ল বইবার মত খাত হোস্টেলে ও কলেজে অন্যরূপ আয়োজন-অনুষ্ঠানেও কিন্তু দু'-একটা ছিল। ওগিলভী হোস্টেলের হাতে-লেখা পত্রিকায় কলম চালাবার জন্য উৎসাহ দিয়েছিলেন সুধাবাবু। বাঙলা ছেড়ে ইংরেজিও লিখেছি, নিঃসন্দেহে কাঁচা ও অপাঠ্য। উল্লেখ করছি এই জন্য যে, লেখার সঙ্কোচ ঘাতী হতে পারে নি। লাইব্রেরির সিনিয়র সুহৃদ আমাকে তাঁর সরকারী নিলেন প্রথম বৎসরেই, ক্রমে সে লাইব্রেরি হলো আমার দায়িত্ব। অর্থাৎ

বই বাছাই করা, বই কেনা প্রভৃতির ভার প্রধানত পড়ে আমার উপর। সে যে কী আনন্দের অধিকার, তা এখন বলে বোঝানো অসম্ভব। প্রথম যুদ্ধের পরে তখন নতুন বিলিতী বই আবার এদেশে আসছে। ইংরেজি ফরাসী জার্মান ছাড়া রুশ, নরওয়েজীয় ও সুইডিস প্রভৃতি কন্‌টিনেন্‌টাল সাহিত্যের আমদানির তখনি সাধারণভাবে সূচনা হয়। মাসে মাসে নতুন বই আসে, নতুন পৃথিবীর সঙ্গে হয় প্রতিদিন পরিচয়। নতুনের সন্ধানে মন উন্মুখ। আমার পড়ার নেশায়ও নতুন রঙ ধরে। অবশ্য স্কটিশ চার্চেস কলেজে লাইব্রেরির ভাণ্ডারও ছিল সমৃদ্ধ। বই পড়বার সুযোগও অবারিত। খোলা তাকেও মেলা বই। পৃষ্ঠা ছিঁড়ে তা নেবার ও বই-এর পাতায় মন্তব্য করবার সুবিধাও ছাত্রদের কি কম? তবু কর্তৃপক্ষ হার না মেনে খোলা তাকে বই রাখলেন। ছেলেরাই ক্রমশঃ হার মানল দেখলাম। সে কলেজের বিলিতী পত্র-পত্রিকার সরবরাহ মন্দ নয়। ক্লাশের অবসরে হলের স্ট্যাণ্ড-এ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তখনকার অ্যাথিনিয়ন, স্পেক্‌টেটর, স্যাটারডে রিভিয়্যু ও টাইম্‌স্‌ লিটারারি সাপ্লিমেণ্ট ঘণ্টার পর ঘণ্টা পড়া চলত। একটা কথা থেকে আরেকটা, সেটা থেকে তৃতীয় একটা, এরূপ সূত্র ধরে মন এগিয়ে যেত দূর-দূরান্তরে, বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে। আজও মনে পড়ে, একদিন ওরূপ একটি সাহিত্যপত্রে জানলাম—ইংল্যাণ্ডে ডান্‌-এর কবিতার নূতন সমাদর। আর একদিন—কোনো একটি লেখকের অপ্রকাশিত লেখার কথা পড়লাম। বই পাই নি, পড়ি নি। তাঁর নাম একেবারে ভুলে গেলাম না তাঁর রীতির অভিনবত্বের জন্য—জেমস জয়েস্‌। নিত্যকার অপেক্ষাও অভিনবের চমক চোখে বেশি লাগে—বিশেষত সে বয়সে। বয়সটারই বা দোষ কি? পৃথিবী-জোড়া যুদ্ধান্তের ভাঙা-গড়ার ঝড়, পুরানোর প্রতি উদ্ধত অনাস্থা ঘোষণা ও নতুনের জন্য চারদিকে অশান্ত আগ্রহ। শুধু সাহিত্যে নয়, রাজনীতিতে, সমাজনীতিতে-সর্বত্র সেই জিজ্ঞাসা তখন প্রচণ্ড। যৌবনের অভিযান দেশে দেশে-বিদেশে।

কলেজের পড়াটায় মন লাগল না, লাগত বরং বাইরের নানা দিকে বিশ্বব্যাপী নানা জিজ্ঞাসায়, যৌবনের অবুঝপনায়, কর্মোন্মাদনায়, আর কর্ম-হীনতার অশান্ত দংশনে। তাতেও কলেজের বিদ্যাটার প্রতি আস্থা ক্ষয় হ'ত। কিন্তু তাই বলে বাঙালির ছেলের ডিগ্রীর মোহ যায় না, লেখাপড়ার লোভও না। জীবনাগ্রহ, রাজনীতির উৎসাহ-উদ্দীপনা কলেজের বাইরেও আপনার প্রকাশ-ক্ষেত্র চায়। খুঁজে নেয়, গড়ে তোলে। জাতির দিক থেকে দেখলে রাজনীতির ক্ষেত্রটাই তখন প্রধান ক্ষেত্র। কিন্তু তাতে সকলের

উৎসাহ থাকে না, যাদের থাকে তাদেরও কারও প্রায় সর্বক্ষণ থাকত না। আমাদের নোয়াখালির বন্ধুমণ্ডলী রাজনীতির বাইরে আপনাদের প্রাণস্রোতের আবেগে ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। সেই প্রাণাবেগের নিয়মেই আমরা আবিষ্কার করতাম আমাদের প্রকাশ-পথ—ছুটির দিনের আমাদের শহর-মাতানো হাসি-হুল্লোড়. বেপরোয়া আলাপ-আলোচনা-আড্ডা, দুরন্ত কোলাহল, কলরব, ছুটোছুটি, লুটোপুটি, খেলাধূলা—সবে মিলে যৌবনের অভিযান তাতে দানা বেঁধে উঠল, জন্মাল সেই নোয়াখালি শহরের একটা আয়োজন। জন্মাল একটা প্রতিষ্ঠান। 'সবুজসঙ্ঘ' নোয়াখালির জীবনে একটা বিস্ময়—তার আদিও নেই অন্তও নেই। মনে হয়, বাঙলাদেশের জীবনেও তা ইতিহাসের একটা পদচিহ্ন—'সবুজের অভিযান।'

কিন্তু কলকাতার—কলেজের পাঠে কী পেলাম? পেয়েছিলাম কিছু সতীর্থ, তাদের কথা বলতে ভুলতে পারি নি। কিন্তু পাই নি কলেজের পড়ায় স্বাদ, পাঠ্যপুস্তকে রস, আর সে জিনিস যা নাকি বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন, সকল বিদ্যালয়ের আবশ্যকীয় অঙ্গ—অধ্যাপকদের স্পর্শ।

আমার বৎসরের অনেক শ্রেষ্ঠ ছাত্রের সঙ্গে আমার পূর্বে ও পরে পরিচয় হয়েছে। সংসারে পূজ্য হয়েছে এমনো অনেককে দেখেছি। কিন্তু আমার মনে হয় একালের ভালো ছেলেরা তাঁদের থেকে কম ভালো নয়, বরং বেশি, সুযোগও বেশি। তবে একালের সাধারণ ছেলেদের সম্বন্ধে ওরূপ কথা বলতে পারব কি? সুযোগ বেশি পেয়েও এ্যাভারেজ যেন মাপে খাটো হয়ে পড়েছে। সেদিন আমাদের সুযোগ ছিল পরিমিত। সরকারী 'পরীক্ষার চাকরি' তখন ভালোদের গ্রাস করে নিয়েছে, শ্রেষ্ঠদেরও সম্ভাব্য শ্রেষ্ঠতা সেই চক্রে সম্পূর্ণ পরিস্ফুট হতে পেরেছে বলতে পারি না। কথাটা বিশদ করা নিষ্প্রয়োজন। সে তুলনায় একালের শ্রেষ্ঠদের কাছে কিন্তু অনেক দুয়ার খোলা—মায় মার্কিন মুলুকের দুয়ার। কিন্তু তাঁরা কি নিজেদের সেই শ্রেষ্ঠতা বিকাশে উদ্যোগী, কিম্বা সেই দায়িত্ব-বিষয়ে সচেতন? না, আমাদের সমস্ত জাতীয়পরিস্থিতি এখন তাদের সেদিকে প্রেরণা দিতে অসমর্থ? আর সেদিনের জাতীয় পরিস্থিতি তাদের দিত সংকল্প, সাহস—স্বাধীনতার সংগ্রামে শ্রেষ্ঠই বলি, আর সাধারণই বলি—একালের ছাত্ররাও আমাদের সৃষ্টি। 'দে আর হোয়াট উই মেক্ দেম্'। আমাদের সামনে সে যুগ যৌবনের ও জীবনের (১৯১৭-১৯৪৭) যে চ্যালেঞ্জ নিয়ে এসেছিল আমরা যদি তার সার্থক উত্তর দিতে পারতাম ('৪৭-এ ও তার পরে) তা হলে ষাটের কোঠায় এসে এদেশের যৌবনের ও জীবনের এই বিপর্যয় ঘটবে কেন? সাতচল্লিশের স্বাধীনতা কেন

এদের জীবনে লাগ্‌ল না, লাগ্‌ল না ? সে দিনের যৌবন-জল-তরঙ্গে বৃদ্ধ অতীতের আবর্জনাকে ভাসিয়ে না দিয়ে আমরাও আপনার মধ্যে কি অসঙ্গতির ও আত্মপ্রবঞ্চনার বোঝা বহন করে চলেছিলাম ?—যাতে সাতচল্লিশের 'অসম্পূর্ণ বিপ্লবের' অভিশাপে এ কালের জীবন ও যৌবন আজ কর্দম-নিমজ্জিত হতে বসেছে। পিছনে তাকিয়ে আমাদেরও আত্মপরীক্ষা করা প্রয়োজন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

'স্বরাজ সাধন'

এক-একটা শব্দ যেন এক-এক যুগের বীজমন্ত্র। যতক্ষণ যুগটা জীবন্ত ততক্ষণ শব্দটাই তার পরিচয়পত্র। ১৯০৫-এ বঙ্গভঙ্গ জন্ম দিয়েছিল 'স্বদেশী' শব্দটাকে, কথাটা এখন আর বিশেষ শোনা যায় না, কিন্তু অন্ততঃ বিশ বৎসর স্বদেশী কথাটা ছিল প্রাণবন্ত। আজকের আমাদের রাজনৈতিক ভাষ্যকারদের ভাষায় যারা 'টেরোরিস্ট', সেদিন বিলিতী ভাষায় তাঁরা ছিলেন এনার্কিস্ট, আর দেশের লোকের কথায় 'স্বদেশী'। প্রসঙ্গত একটা কথা বলা দরকার। টেরোরিস্ট নামটা আংশিক সত্য, আর এনার্কিস্ট নামটা মূলতঃই অযথার্থ। 'স্বদেশী'দের ইংরেজিতে বল্‌লে ন্যাশনাল বিপ্লবী বা মিলিটাণ্ট ন্যাশনালিস্ট বলাই বোধ হয় ঠিক। বাঙলায় 'স্বদেশী বিপ্লবী' বলাই যথেষ্ট। ১৯০৫-এ স্বদেশী শব্দটা জীবন্ত ও ব্যাপক ছিল। ১৯২০-এর পরে এরূপ আরেকটা কথা সমস্ত দেশের চিত্তলোক থেকে উদ্ভূত হয়—"স্বরাজ"। গবেষকরা বেদ-উপনিষদের পাতায় খুঁজে পান 'স্বরাট্'। শুনেছি, ১৯০৭-এর কংগ্রেসের সভাপতির অভিভাষণে বৃদ্ধ দাদাভাই-নৌরাজীই নাকি শব্দটাকে রাজনৈতিক আসরে প্রথম উপস্থাপিত করেন। সেবারই (?) কি ঠিক হয় কংগ্রেসের লক্ষ্য 'স্বরাজ'? বোধ হয়, লক্ষ্য তখনো ছিল সেলফ্ গবর্নমেণ্ট বা স্বায়ত্তশাসন। তাই স্বরাজ কথাটা সে-সময় অপ্রতিষ্ঠিত থেকে যায়। সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ উদারতন্ত্রীরা তখনো চাইতেন 'সেল্‌ফ গবর্নমেণ্ট্'—স্বায়ত্ত শাসন। স্বদেশীদের গোপন প্রচারপত্রের নাম ছিল 'স্বাধীন ভারত' ও 'লিবার্টি'। 'স্বাধীনতা' বলা তখন রাজদ্রোহ—বেপরোয়াদের প্রচারিত শব্দ। তখনো আমরা 'মেড়া ইণ্ডিয়ান্', মহারানী ভিক্‌টোরিয়ার রাজভক্ত প্রজা, (হুতুমের ভাষায়)। প্রথম চেয়েছি 'গ্রেটার এসোসিয়েশন অব্ ইণ্ডিয়ান্‌স্ ইন দি এ্যাডমিনেস্ট্রেশন অব ইণ্ডিয়া'। ১৯০৫-এর সময়ে সাহস বাড়ল। আমাদের মনের কথা তখন 'স্বরাজ'। কিন্তু নরমপন্থীরা কথাটাকে একটু নরম করে বললেন 'সেলফ্ গবর্নমেণ্ট'। আর ১৯১৭-যে আবার মণ্টেগু আমাদের আশ্বাস দিলেন 'প্রোগ্রেসিভ রিয়ালিজেসন অব রেস্‌পন্‌সেবল্ গবর্নমেণ্ট ইন ইণ্ডিয়া'। ব্রিটিশ শাসনের উদ্দেশ্য তার আগেই আইরিশ কন্যা, ভারত-নেত্রী মিসেস বেসাণ্ট্ আরেক একটা শব্দে চালু করলেন, 'হোম্‌রুল'। পশ্চিম উপকূল লোকমান্য টিলক, জিন্না ও বাপ্‌টিস্টা দুই লেফ্‌টেনেণ্টকে

নিয়ে, গড়তে লাগলেন "ইণ্ডিয়ান হোম রুল লীগ্"। স্পর্ধার কথা তাও। নিশ্চয়ই ভারতীয় রাজনীতি—মুখটা প্রকাশ্যেও আইরিশ আদর্শের দিকে ফিরছে, অপ্রকাশ্যে ফিরছিল সিন ফিয়েনের দিকে। তাই দেখতে না দেখতে হোম রুল কথাটা বদলে গেল, সেই সঙ্গে নিজের ভাষায় ফুটল—'স্বরাজ'। প্রমথ চৌধুরী বিদ্রূপ-বিশারদ মানুষ—গান্ধীজীর স্বরাজ আন্দোলনকে তিনি ব্যঙ্গের বাণে বিদ্ধ করে বুদ্ধিমানদের বাহবা পেয়েছেন। কিন্তু বুদ্ধির সঙ্গে ভদ্রলোকের মন বস্তুটা ছিল—সে মন পেট্রিয়টিক, স্বদেশ-বৎসল। 'স্বরাজ' কথাটাকে তিনি 'সবুজ পত্র'-এ সম্বর্ধনা জানালেন এ ভাবে—আমাদের ভাষায় একটি নতুন শব্দ জন্মগ্রহণ করেছে, 'স্বরাজ'। সন্দেহ মাত্র নেই, শব্দটা দেশীয়, দেশের প্রাণ থেকেই কথাটা উদ্ভূত (ভাষাটা আমার, প্রথম চৌধুরীর কথা এত ভোঁতা নয়)। আন্দোলনটা তখনো মাত্র জন্মাচ্ছে। 'স্বরাজ' কথাটা দেখতে না দেখতে সকলের স্বভাষা হয়ে গেল। টিলকের মুখেও তা বসে গেল—"স্বরাজ ইজ মাই বার্থ রাইট।" গান্ধীজীর বই 'Indian Home Rule' ১৯২১ থেকে নাম বদলে হ'ল "হিন্দ স্বরাজ"। সে নামেই তা এখনো সচল—যতটুকু আছে তার চলচ্ছক্তি। যাক, ১৯২০-এর পরে ভারতের গ্রামে-শহরে একটা ধ্বনি উঠল 'স্বরাজ-সাধন কী জয়।' কোন্ এক লগ্নে যে ভারতীয় জাতীয় চেতনা হঠাৎ ঐ কথাটায় নিজের রূপ আবিষ্কার করল, তা বলা শক্ত। ১৯০৫-এর সময় থেকে নবজাত ছেলেদের নাম হ'ত 'স্বদেশ রঞ্জন'। এবার ১৯২০-২১ থেকে নব জাতকদের তেমনি আরেকটা বহু প্রচলিত নাম 'স্বরাজ' ('বিপ্লবী' 'বেদুইন' প্রভৃতি নামগুলি তখনো বহু দূরে)। ১৯২০ থেকে অন্ততঃ ১৯৩০-এর সমস্ত দশকটিই 'স্বরাজ-সাধনার যুগ'। কিন্তু ১৯৩০-এ লাহোর কংগ্রেসে লক্ষ্য স্বীকৃত হ'ল 'পূর্ণ স্বাধীনতা'। শুধু স্বাধীনতা শব্দে কুলোয় না। 'স্বরাজ' কথাটাও ধার খুইয়েছে দশ বৎসরে। 'স্বাধীনতা' শব্দটিরও সেই অবস্থা হতে বাধা নেই। বোঝা যায়, ফাঁকি জন্মেছিল। শুধু "স্বাধীনতায়" কুলালো না, বলতে হ'ল 'পূর্ণ স্বাধীনতা'—পিওর গোল্ড। আমাদের কৈশোর 'স্বদেশী'র অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা পেয়েছিল ; যৌবন 'স্বরাজ-সাধনে' পায় কর্মযোগের পাঠ—তাই কলেজের পাঠ হয়েছিল অবান্তর।

ইতিহাসে অবশ্য যুগাবর্তন ঘটে গিয়েছিল ১৯১৭-তেই, অক্টোবর বিপ্লবে। আধুনিক যুগের উদ্ভব ইউরোপের 'রিনাইসেন্স' মোটামুটি ১৪৫৪-১৬০০ খ্রীস্টাব্দ, প্রকাশ ফরাসী বিপ্লবে (১৭৮৯), কিন্তু আধুনিক যুগের যথার্থ প্রতিষ্ঠা ১৯১৭-র নভেম্বরে,—শোষণহীন সমাজ তার উদ্দিষ্ট। মনীষীরা কেউ কেউ বলেন, অক্টোবর বিপ্লব থেকেই মানুষের সভ্যতার এক নতুন যুগারম্ভ। কিন্তু এ কথা

তখন বুঝব কি করে ? ভারতবর্ষে আমরা 'বলশেভিক' শব্দটাও আগে শুনি নি। 'ম্যাক্সিমিস্ট' বলেই তারা প্রথম উল্লেখিত হ'ত ;—কেন ? ক্রমে বুঝি বলশেভিস্ট তারই প্রতিশব্দ, অর্থাৎ সংখ্যায় 'বড় দল' (সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টির মধ্যে)। সম্পূর্ণ অপরিচিত নাম, সম্পূর্ণ অজানা মতবাদ। লেনিন ট্রট্স্কির নামও একেবারে নতুন। কর্মপদ্ধতিও বিচিত্র। সে-ও এক বিচিত্র তরঙ্গভঙ্গ আমাদের জীবনে। তখনো কলেজে আসি নি, তবু সেদিনের বেঙ্গলী, অমৃতবাজার পত্রিকা ও স্টেটস্‌ম্যান, ইংলিশম্যান থেকে কম চমকপ্রদ খবর পড়ি নি। নানা সূত্রে শুনলাম 'বোল্‌শি'রা ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য বিলোপ করছে, মানুষে মানুষে সাম্য প্রতিষ্ঠা করবে, জার-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত পরাধীন জাতিদের তাই স্বাধীনতা দিয়েছে, এমন কি, মধ্য-এশিয়ার তুর্কিস্তানের জাতিদেরও দিয়েছে মুক্তি। সব অভাবনীয় ব্যাপার। আমাদের মনের ভাব এ সংবাদে কী হতে পারে ? আমার একটি অত্যন্ত নিরীহ বন্ধুও এ-সব শুনে বললেন, "তবে তো আমিও বল্‌শেভিক।" তিনি পরে হয়েছিলেন সরকারী সব্‌রেজিস্ট্রার। কিন্তু কথাটার অর্থ কী ? নানা খবরের রাজা আমার দাদা (রঙ্গীন হালদার)। 'বল্‌শেভিক' কথাটার অর্থ তিনিও জানেন না, জানেন না বল্‌শেভিক কারা। নোয়াখালির টাউন-হলে সন্ধ্যায় আমাদের ছোট-বড়দের আসর জমে। কখনো সভাও হয়। সেখানে দাদা একজন সুযোগ্য বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'বল্‌শেভিক কারা, কেন তাদের ও নাম ?' তিনি ইতিহাসের ফার্স্ট ক্লাশ, বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র ; কিন্তু 'কী যেন কোথায় পড়েছি, মনে করতে পারছি না।' —এর বেশি তাঁর থেকেও তখন জানা গেল না।

যা জানি না, ঘটনা ও রটনার মধ্য দিয়ে তা কিছুটা বুঝেছিলাম। যেমন, এদেশের শাসক ব্রিটিশ কর্তারা বল্‌শেভিকদের বিষম বিরোধী। তা হলেই হ'ল। আমাদের মন বললে, তা হলে বল্‌শেভিকরা নিশ্চয়ই মন্দ লোক নয়। প্রথমেই শুনলাম, ওরা শান্তি চায়, ওরা জমিদারদের জমি কৃষকদের মধ্যে বিলি করেছে। শোনা গেল, ধনী-দরিদ্রের ভেদও রাখবে না। সত্যি নাকি ? এর মতো ভালো কাজ তা হলে আর কী হতে পারে ? আমরাও কি স্বাধীনতা হলে চাইব না "সাধারণতন্ত্র" ? সাধারণদের নিয়েই তো দেশ, বড় লোকেরা দেশের ক'জন ? চিত্তরঞ্জন দাশের মুখ থেকে তখনো বেরোয় নি—স্বরাজ ফর দি নাইন্‌টি-ফাইভ পার্সেণ্ট ; আমাদের মন কিন্তু বরাবর মানত স্বাধীনতা হবে গরীবের স্বাধীনতা। তৃতীয়ত, বুঝলাম নিজেদের সাম্রাজ্য ভেঙে পরাধীন জাতিকে স্বাধীন করে দেয় যারা, তারা তো পৃথিবীর সকল পরাধীন জাতিরই পরমাত্মীয়। কাজেই, বোঝা যাচ্ছে, কেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্য তাদের শত্রু। আমাদের দেশের সংবাদপত্রগুলিও

এভাবেই এ কথা প্রথম থেকে বুঝেছিল, এবং স্পষ্ট করে বলতে না পারলেও ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বল্‌শেভিকদের স্বাগত জানিয়েছে। ব্রিটিশের প্রোপাগ্যাণ্ডায় ভোলে নি, বরং মজা পেয়েছে। শাসকদের ভ্রূকুটিকে ফাঁকি দিয়েছে। ঠারেঠুরে কথা বলে দেশের মানুষকে বুঝিয়ে দিয়েছে মনের নিগূঢ় ভাব। সম্প্রতি (১৯৬৮) 'কেশরী' থেকে 'বেঙ্গলী', 'অমৃতবাজার পত্রিকা' প্রভৃতি পত্রিকাগুলির তখনকার মন্তব্য ঘেঁটে এ তথ্য পুনরুদ্ধার করেছেন আমাদের গবেষক বন্ধুরা। ১৯১৭-এর নভেম্বর থেকে ১৯১৮ খ্রীস্টাব্দের শেষে পৌঁছুতে আমাদেরও বল্‌শেভিজম্‌-এর সম্বন্ধে জন্মেছিল সোৎসুক জিজ্ঞাসা ও শ্রদ্ধা—যদিও ইতিহাসের বিবর্তনপথ কী, তা তখনো ছিল অজানা, মার্কস্‌বাদ তো নিশ্চয়ই অপরিচিত।

শুনে হাসবার কথা, আমার মত কারও কারও মনে আবার এ শ্রদ্ধার বীজ বপন করেছিলেন আমাদের দেশের দু'জন ভিন্ন ভাবনার মানুষ। একজন বিবেকানন্দ, যিনি শূদ্রের যুগনেতৃত্বের জন্য আমাদের হৃদয়-মন তৈরী করেছিলেন। অন্যজন রবীন্দ্রনাথ, যিনি 'সবার পিছে, সবার নিচে, সবহারাদের মাঝে' কৈশোরেই আমাদের পথ-সন্ধানী দৃষ্টিকে চালিত করেছিলেন। এই পরম আস্তিক্যবাদীরাই দেখছিলেন ইতিহাসে, সেই নাস্তিক্যবাদীদের আবির্ভাবের অনিবার্যতা। হাঁ, এ-ও রাম না জন্মাতেই রামায়ণ রচনা—কেউ তা বোঝে না। অন্যদের মতো আমাদের কালচারের ও ঐতিহ্যের মধ্যেও আগামীর জন্য ছিল এই আয়োজন। উড্রো উইলসন্‌ও অবশ্য তখন সর্বজাতির 'আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার' ঘোষণা করেছেন। আমাদের কিন্তু তাতে বিশেষ আস্থা হয় নি। এখন তো জানতে বাকী নেই—তখনকার মার্কিন রাষ্ট্রদূতদের স্মৃতিকথা থেকে পরিষ্কার হয়েছে, বল্‌শেভিকরা যখন সকল জাতির স্বাধীনতার অধিকার ঘোষণা করেছে, পোল ফিন্‌ প্রভৃতি জারের পদানত জাতিদের স্বাধীন করে দিয়েছে, তখন যুদ্ধরত সাম্রাজ্যবাদী রাজনীতিবিদদের উষ্মারও শেষ ছিল না, আশঙ্কারও অবধি ছিল না। গেল তাদের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের অছিগিরি। ঐ সোভিয়েত ঘোষণার দশ দিনের মধ্যেই তাই মার্কিন রাজদূতদের পরামর্শ মতো উড্রো উইলসন্‌কে একাই তাড়াতাড়ি এ ঘোষণা করতে হ'ল—তাঁর যুদ্ধলক্ষ্য —'রাইট্‌ অব সেল্‌ফ্‌-ডিটারমিনেশন্‌ অব নেশন্‌স্‌।' এই ধারাটা যখন প্রচারিত হয়, তখনো কিন্তু ইংরেজরা চুপ। চেপে থাকো, যুদ্ধ তো জয় হয়েছে। উইল্‌সনের ও-সব কথা না মানলে কে কী করবে? ভারতের জনসাধারণকে মুষ্টিমেয় "সিডিশ্যানিস্ট" শিক্ষিতদের হাত থেকে বাঁচানোই তখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের 'মিশন'—যুদ্ধকালীন অনাহার বা যুদ্ধশেষের মহামারী থেকে নয়। পরে ১৯৪৩-৪৬-এও এ খেলা দেখা গিয়েছে।

১৯১৭-তে মণ্টেগু চেমসফোর্ড রিপোর্ট বের হয়েছিল। ১৯১৯-এ তার অনুশাসনে ভারত শাসন আইন পাশ হ'ল। 'ডায়ার্কি' চলবে প্রদেশ-গুলিতে। কালের স্রোতে ব্রিটিশ রাজনীতির এসব চাল আজ মিথ্যা। কিন্তু আমরা তখন তরুণ, দেশের জীবনে তো তা কম আবর্ত সৃষ্টি করে নি। সে-সব আবর্তের মধ্যে আমরাও আবর্তিত হয়েছি। দেখলাম মণ্টেগু চেমসফোর্ড রিপোর্ট বা সুপারিশ বেরুবার সঙ্গে সঙ্গেই এসেছিল রাউলাট রিপোর্ট। আর তার অনুসরণে এসেছিল রাউলাট এ্যাক্ট (মার্চ, ১৯১৯)। আমাদের জীবনে সেই সিডিশ্যান কমিটি-রিপোর্ট যে-আবর্ত সৃষ্টি করে তা এক বিষম সত্য। মনে পড়ে, ঐ রিপোর্ট বেরুতেই আমাদের হোস্টেলের লাইব্রেরির জন্য আমি এক কপি কিনে এনেছিলাম। ঘরে এনে সে বই এক নিঃশ্বাসে সেদিন পড়ে ফেলেছি। ভারতের সশস্ত্র জাতীয় আন্দোলনের (১৯০৮-১৯১৬) মোটামুটি একটা রূপরেখা দেখলাম। অবশ্য রিপোর্টটি রাজদ্রোহরূপ দুষ্কৃতির সরকারী ভাষ্য। সব কথা ছাপা হয় নি—গোপন তথ্য মাঝে মাঝে ফুট্‌কি দিয়ে বাদ-সাদ দেওয়া। তা হোক, ভারতের স্বদেশীস্তর বা বিদ্রোহ-চেষ্টার আয়তনিক রূপ তাতে মুছে যায় নি। মহারাষ্ট্র, বাঙলা, পাঞ্জাব, মোটামুটি উত্তর ভারত ও দক্ষিণ ভারত, এমন কি ব্রহ্ম পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। দেখলাম, ১৯০৫-১৯১৮ পর্যন্ত সেই সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামের চেষ্টা—নিছক দু'-চার শত বাঙালি যুবকের ভাববিলাসের ট্রাজেডি নয়। টেরোরিজম বা সন্ত্রাসবাদও নয়। স্বদেশে-বিদেশে তার জাল ছড়িয়ে পড়ে। অবশ্য, সে জাল ছিঁড়ে গিয়েছে। আয়োজনটা শত হলেও প্রয়োজনের তুলনায় সামান্য ; তথাপি অসামান্য তার ইঙ্গিত। আমাদের কৈশোরের 'স্বদেশী' সম্পর্ক তুচ্ছ করবার নয়। রিপোর্টের নতুনতর আলোকে তা উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। স্বাধীনতার যুদ্ধ একবার আরম্ভ হলে, শেষ হয় না, পুরুষের পরে পুরুষ ধরে তা চলে যতক্ষণ তা সফল না হয়। আর চলেও তা মাথা খুঁড়ে, আর পথ হাতড়িয়ে। সোজা পথ তার নেই, নানা বাঁকাচোরা পথে হাতড়াতে হাতড়াতে তার চলা। সব চলাই সামনে চলা না, বেঁকে চলে, কিন্তু স্রোতের গতি আসলে মোহনার দিকে। রাউলাট রিপোর্টের সুপারিশ মতো প্রণীত হ'ল "রাউলাট এ্যাক্ট"। দমন নীতির নতুন অস্ত্র। এই আইন উপলক্ষ করেই ঘটে গেল স্বাধীনতা যুদ্ধের পর্বান্তর। স্রোত এগিয়ে গেল, কলেজে পা দিতে না দিতে আমরাও তার মধ্যে গিয়ে পড়লাম। প্রতিবাদ-সভায় দেশ মুখর। আজকের মতো সভায় লক্ষ মানুষের সমাবেশ তখন হ'ত না, সমাবেশ হ'ত হাজারের সংখ্যায়, দু'-চার দশ জন বোমাবু বালক নয়, হাজার হাজার মানুষ চঞ্চল। আইন পাশ হয়

১৯১৯-এর মার্চ মাসে। তখনকার ভারতীয় আইনসভার সব কয়টি ভারতীয় সদস্য তার বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছিলেন। তাঁরা ভদ্র, শান্ত, পোষমানা প্রাণ মানুষ। মিঃ জিন্নাহই ছিলেন তাঁদের মধ্যে সব থেকে কড়া মেজাজের ক্রিটিক। দেশের মনও ক্রমেই চড়া সুরে বাঁধা হতে লাগল। বিল পাশ হ'ল। চারদিকে প্রতিবাদের ঝড় উঠল। মনে আছে, কলকাতায় টাউন হলের প্রতিবাদ-সভায় জনতার ভীড় হলের ভেতর ছেড়ে ছাপিয়ে তা বাইরে সিঁড়ি আর পথের মাঝে এসে নেমেছে। তখন মাইক অজ্ঞাত। নেতারা একবার হলের ভেতরে বক্তৃতা করেন, দ্বিতীয় দফায় বাইরে এসে সিঁড়ির উপরে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করেন। সেখানকার সভায় ফজলুল হক, আবুল কাশেম বল্লেন, বল্লেন ইংরেজিতে। বিপিনচন্দ্রও ইংরেজিতে বল্লেন, "আমরা এ আইন মেনে নেব না। বাধা দেব। দরকার হলে আমরা গুজরাট থেকে মিস্টার গান্ধীকে আনব বাঙলায়।" সঙ্গে সঙ্গে তুমুল হর্ষধ্বনি। চম্পারণ সত্যাগ্রহে জয়লাভ করে গান্ধীজী তখন দেশের সামনে বরণীয় নেতা, প্রতিরোধ-সংগ্রামের পথ-প্রদর্শক, সার্থক পরিচালক। দেশ তখন প্রতিবাদ ছেড়ে গ্রহণ করতে চায় প্রতিরোধের পথ।

প্রতিবাদ থেকে প্রতিরোধ

রাউলাট আইন যেদিন পাশ হয়—সমস্ত কলকাতায় ঘোষিত হ'ল প্রতিবাদ দিবস; ট্রাম বন্ধ, গাড়ি বন্ধ, (বাস তখন ছিল না)। ময়দানে মনুমেন্টের কাছে জনসভা—মনে হয় সে-সময় থেকেই আরম্ভ। বড় জনসভার স্থান তা—মনুমেন্টের তলাকার খোলা ময়দান। ঘরে সভা করতে হলে টাউন-হলে মিটিং হ'ত; মাঝারি মিটিংগুলি হ'ত কলেজ স্কোয়ারে,—অথবা মির্জাপুর (শ্রদ্ধানন্দ) পার্কে। সেদিনের মনুমেন্টের তলাকার সভায় ধীরেশ চক্রবর্তীর সঙ্গে গিয়েছিলাম খালি পায়ে। লোকে লোকারণ্য। মাইক তো তখনও নেই, খণ্ড খণ্ড করে একাধিক সভার ব্যবস্থা হয়েছে। ঘুরে ঘুরে নেতারা একটা থেকে আরেকটায় বক্তৃতা করছেন। তবু খোলা মাঠে বিপিনচন্দ্র ছাড়া আর কারো গলা বিশেষ শোনা যাবে না। বিপিনচন্দ্রের তো গলা নয়, যেন সিংহগর্জন, অথবা সেই পঞ্চতন্ত্রের 'বলীবর্দেন নর্দিতম্'। একটি বাক্য আমারও কানে পৌঁছেছিল—আর মনেও রইল গাঁথা। দূর থেকে শোনা চিত্তরঞ্জনের আবেগ-কম্পিত কণ্ঠের বক্তৃতা…"বিধাতার চরণে প্রাণের নিবেদন জানাও—"…অদ্ভুত কথা, কেমন যেন একটু কম্পন জেগেছিল প্রাণে। সারা দেশে তারপর যা

ঘটতে লাগল ইতিহাস তার সাক্ষ্য। কিন্তু শতসহস্রের মতো আমরাও তার উপকরণ। গান্ধীজী সত্যাগ্রহ-সভা গঠন করলেন। তাঁর বাজেয়াপ্ত বই 'ইণ্ডিয়ান হোম রুল' (হিন্দ্-স্বরাজ) বিক্রি করে সত্যাগ্রহ শুরু হয়। আগ্রহে আবেগে প্রতিদিন সকাল বেলার কাগজ খুলি। এদিকে (১৯১৯) ঈস্টারের ছুটি, বাড়ি যাচ্ছি—কাগজে দেখি পাঞ্জাব ফুঁসে উঠছে। যুদ্ধ-অত্যাচারিত হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণের মনে জমা ছিল ক্ষোভ ও রোষ। দিল্লীতে গুলি চলল—দিল্লীর জুমা মসজিদের বেদিতে মুসলমানেরা দাঁড় করিয়ে দিলেন স্বামী শ্রদ্ধানন্দকে—স্বামীজীর অভিভাষণ শুনবেন। অভূতপূর্ব। তিনশ বছরেও এমন কাণ্ড ঘটে নি—জুমা মসজিদের বেদির তলায় দাঁড়িয়ে উপদেশ দেবে অমুসলমান! হিন্দু-মুসলমানের অমন একাত্মতা ব্রিটিশরাজের স্বপ্নের অগোচর। এদিকে লাহোরে দু'জন ইংরেজ জনতার হাতে নিহত হয়েছে। আর একজন মিশনারি মহিলাও কিছুটা অপমানিত হন। অন্যায়—কিন্তু এতবড় দেশে, এমন বিক্ষুব্ধ কালে, তা সত্যই অস্বাভাবিক কিছু নয়, কিন্তু চেমস্‌ফোর্ড জালিয়ানওয়ালাবাগের পরেও তা ভুলতে পারেন কি? ব্রিটিশ রাজত্বের এমন অপমান! গান্ধীজী দিল্লীতে গিয়ে হিংসা বন্ধ করতে চান। তাঁকে পাঞ্জাবে প্রবেশে বাধা দিলে ও'ডায়ারের সরকার। নোয়াখালিতে বসে 'স্টেটসম্যান'-এ পড়লাম —'মার্শাল ল' ডিক্লেয়ারড্ ইন পাঞ্জাব।' উত্তেজনায় হাতের চাপে ডাক্তারখানার বড় শো-কেসের কাচ ভেঙ্গে গেল—অত বড় আস্ত কাচ ওখানে দুষ্প্রাপ্য, কিছুক্ষণের মতো তা ভেবে হতবুদ্ধি হলাম। কিন্তু, ভুলে যেতেও বেশি দেরী হ'ল না। কী ঘটছে লাহোরে, কী ঘটল গুজরানওয়ালায়—বিমান থেকে নিরস্ত্র মানুষের উপর মেশিনগানের গুলি চালানোতে; আর সত্যই কি রক্তাক্ত নৃশংসতার তাণ্ডব চলল জালিয়ানওয়ালাবাগে—তখনো এসব ঠিক জানবার-বুঝবার উপায় ছিল না। কিন্তু আমরা দেহমনে আলোচনায় উৎকণ্ঠিত, উদ্বিগ্ন, উত্তেজিত। এ্যাণ্ড্রুজ সাহেব পাঞ্জাব থেকে ফিরে এলেন, রবীন্দ্রনাথের প্রতিবাদপত্র বের হ'ল—নাইটহুড ত্যাগ করে তিনি দেশের সাধারণ মানুষের দুর্ভাগ্যের সমভাগী হবেন। তাঁর নোবেল প্রাইজ লাভ ভারতবর্ষকে জগৎসভায় স্বীকৃতি দিয়েছিল, তাঁর নাইটহুড ত্যাগে ভারতবর্ষের মাথা, "লাহোরের ক্রলিং" অর্ডারের সমস্ত গ্লানি ছাড়িয়ে উপরে উঠতে পারল। স্যার শঙ্করন নায়ার বড়লাট চেমস্‌ফোর্ডের একসিকিউটিভ্ কাউনসিলর, মডারেট মানুষ; কাউনসিলরের পদে তৎক্ষণাৎ ইস্তফা দিয়ে দেশে চলে গেলেন তিনিও। কম কথা নয়। তখনো সমস্ত কথা বের হয় নি, একেবারে গোপন করাও যায় নি। পরে হাণ্টার কমিশন ও কংগ্রেসের অনুসন্ধানী কমিটির পাঞ্জাব রিপোর্ট বেরুলে, তা ইতিহাসে স্থায়ী হয়ে

রইল। পণ্ডিত মালব্যের সেদিনের ইম্পিরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউনসিলে বক্তৃতাও ভুলবার মতো নয়—সাত ঘণ্টা এক নাগারে চলে বক্তৃতা—মাত্র এক গ্লাস জল পান করলেন মালব্যজী একবার। এসব তথ্য পড়েও ক্ষুব্ধ হতে হয়। এ-সবের মধ্যে কি মূল্য থাকতে পারে মণ্টেগুর সাধের 'ডায়ার্কির' উচ্ছিষ্ট ক্ষুদকণার? অমৃতসর কংগ্রেসে গান্ধীজীর নির্বন্ধাতিশয্যেই তবু ডায়ার্কিও গ্রহণীয় বলে স্থির করা হ'ল। টিলক চিত্তরঞ্জন উপায় দেখলেন না। আমরা ভাবি—গান্ধীজী কেমন মানুষ? ওদিকে ডায়ার-ও' ডায়ারকে কিছুমাত্র তিরস্কৃত করতে রাজী নয় ব্রিটিশ হাউস অব লর্ডস। অবশ্য চাকুরী থেকে তাদের দেশে ফিরিয়ে নেওয়া হয়েছিল, সেখানে বসে বসে ভারতবর্ষের দরিদ্র মানুষের রক্তক্ষয়ের জন্য ভারতীয়দের টাকায় তারা পেন্‌সন পেত। ও' ডায়ার আবার শঙ্করন নায়ারের বিরুদ্ধে বিলেতে মানহানি ক্ষতিপূরণের মামলা আনে, তাতে জয়ী হয় স্বভাবতই ও' ডায়ার। টিলক ও ভ্যালেণ্টাইন চিরলের মামলায় যা ঘটেছিল, এ মামলাতেও তাই ঘটে। খাশ ব্রিটিশ জজ ১২ জন ব্রিটিশ জুরীর সঙ্গে বসে শঙ্করন নায়ারকে দোষী বললে। ১২ জন জুরীর মধ্যে মাত্র একজন শঙ্করন নায়ারকে নিরপরাধ বলেন—শোনা যায়, তিনি অধ্যাপক হ্যারল্‌ড্ ল্যাস্কি। জজ ম্যাকরিডি অবশ্য বাকী ১১ জনের ওপরও টেক্কা দিয়েছিলেন উৎকট রায়ে ও মন্তব্যে। এই ব্রিটিশ জাস্টিস, রুল অব ল! অবশ্য এমন বিচার যা, তার উপযুক্ত উত্তর ডায়ার পায়, তবে তা বছর বিশ পরে (১৯৪০?)। তখন লণ্ডনে পাঞ্জাবের যুবক শিখ উধম সিং তাকে গুলি করে হত্যা করে। উধম সিং-এর প্রতিশোধ-সঙ্কল্প সত্যই আশ্চর্য। তবু ভাবি—একটা মানুষকে মেরে কি হবে? প্রতিশোধ তো প্রতিরোধ নয়।

'ডায়ার্কির' এক ইয়ার্কি—প্রাদেশিক শাসনে ভারতীয়দের জন্য উচ্ছিষ্টের এঁটো-কাঁটার নিমন্ত্রণ। আরেক ইয়ার্কি—ডায়ার-ও' ডায়ার, রাউলাট এ্যাক্ট এবং জালিয়ানওয়ালাবাগ। গান্ধীজী তা এবার বুঝলেন—'ডায়ার্কি' নয়, ওটা দু'ইয়ার্কি। তবে তাঁর চোখে পাঞ্জাবের "ডায়ারী" রাজ্যের মতোই গুরুতর হ'ল খেলাফৎ-এর খর্বীকরণ। গান্ধীজীর এ আরেকটা দুর্বোধ্য ব্যাপার। সত্য কথা, তখন মুসলমানদের কাছে খেলাফতের দুর্যোগ ভারতের পরাধীনতার থেকেও গুরুতর দুর্যোগ। কিন্তু গান্ধীজী কি করে তা মনে করলেন? তুর্ক-সাম্রাজ্যের স্বরূপ আমরা স্পষ্ট বুঝতাম না। মিশর, আরব, সিরিয়া, ইরাক এসব তো তুর্কদের দেশ নয়, আরবদের স্বদেশ। তারা তো পরাধীন, এ সত্যটা ১৯১৮-তে আমরা বুঝব কি করে? দেখতাম, ভারতের মুসলমানরা পর্যন্ত রুমের তুর্ক সুলতানের প্রতি ভক্তিতে প্রায় অন্ধ। তা হলে, মিশরের আরবের লোকেরা যখন মুসলমান

তখন খলিফার রাজত্বই তো তাদের স্বরাজ্য। কিন্তু দেখলাম তারাও চায় স্বরাজ—খলিফার তুর্করাজ নয়। নিশ্চয় এ কথাটা গান্ধীজীও বুঝতেন। ধর্মের প্রশ্নকে তিনি রাজনীতির সঙ্গে জড়াতে দিলেন কেন? যুদ্ধান্তে ইংরেজ-ফরাসীরা মিলে ওসব দেশ ভাগ-বাঁটোয়ারা করে কর্তা হয়ে বসল। আরবদের ও সকলের নিকট তা অসহনীয়, আমাদের কাছেও আপত্তিকর—ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদীরা পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলিকে অধীনতার শিকলে বেঁধে ফেলল। তাই ভারতবর্ষ থেকে যেমন আমরা ব্রিটিশের অপসারণ চাই, আরব দেশগুলি থেকেও তা চাই,—এ সকল জাতির স্বাধীনতা আমাদের কাম্য। কিন্তু খলিফার নাম করে খলিফার সাম্রাজ্যকে বহাল করার চেষ্টা করা তো ডবল অন্যায়—এক, আরব স্বাদেশিকতারও বিরুদ্ধাচরণ; দুই, ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যযুগীয় ধর্মগত ঝোঁককে রাজনীতিতে চাপিয়ে দেওয়া। মেনে নিই, গান্ধীজী হিন্দু-মুসলমানের প্রয়োজনে খেলাফৎকে পাঞ্জাবের মতোই তাঁর আন্দোলনের সমান লক্ষ্য করেন। তাঁর অসহযোগ প্রস্তাবও মুসলিম শাস্ত্রের তরখে মাওলাত-এর নীতিতে তৈরী করা। তখন এসব বিচার দেশের লোক করলে না। তারা চায় কিছু করতে। সক্রিয় একটা আন্দোলন, শুধু 'আপত্তি', 'প্রতিবাদ', 'আবেদন-নিবেদন' আর নয়। গান্ধীজী তাই তাদের সামনে ধরলেন—ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে অসহযোগ, বিদেশী বস্ত্র বয়কট, আইনসভা বয়কট, আদালত ফৌজদারী কোর্ট বয়কট, স্কুল-কলেজ বয়কট—যতক্ষণ খিলাফৎ উদ্ধার না হয়, আর পাঞ্জাবের অত্যাচারের প্রতিবিধান না হয়। তখনো সে আন্দোলনের লক্ষ্য স্বরাজ বলে ঘোষিত নয়। গান্ধীজীই তা করতে চান নি। স্কুল-কলেজ বয়কট করা প্রস্তাবও আমার মতো অধিকাংশ বাঙালিরই মনে গ্রাহ্য হ'ত না।

কলকাতায় আমাদের চোখের সামনেই ওয়েলিংটন স্কোয়ারের কংগ্রেসে তবু গান্ধীজীরই প্রস্তাব গৃহীত হ'ল। আমরা তো অবাক। বুঝতে বাধ্য হলাম বুদ্ধিজীবীরা আর নেতারা বুদ্ধি দিয়ে পরিস্থিতির থই পাচ্ছেন না। দেশের মানুষের মনে এসেছে মুক্তির বুদ্ধি—সক্রিয় কিছু করা চাই। গান্ধীজীর প্রতিশ্রুতি 'এক বছরে স্বরাজ' তাদের উদ্দীপ্ত করে তুলল। 'এক বছর, মাত্র একটা বছর',—আমরাও ভাবলাম, 'দ্যাখোই না দান ফেলে—হারলেও তো খোয়াবে মাত্র এক বছর।' কী যে ঘটে গেল, তা বুদ্ধি দিয়ে বুঝবার তাই উপায় রইল না। নাগপুরে গান্ধীজীর প্রোগ্রামকে স্বয়ং চিত্তরঞ্জন দাশের গ্রহণ করাই তার প্রমাণ। স্বদেশী দাদাদের ডাকে আমার বন্ধুরা নাগপুর কংগ্রেসে গিয়েছিলেন, চিত্তরঞ্জনের নেতৃত্বে গান্ধীজীকে বাধা দিতে হবে। ফিরে এলেন চিত্তরঞ্জনের পিছনে গান্ধীজীর নেতৃত্বকে স্বীকার করে—অন্ততঃ এক বৎসর তাঁরা দেবেন

অহিংস অসহযোগের জন্য তনমনধন। আবেগে-উৎসাহে সেই এক বৎসর চিত্তরঞ্জন দাশ দেশ মাতিয়ে বেড়ালেন। সে এক বৎসর কী এক বৎসর আমাদের যৌবনের, আজ তা বোঝানো অসম্ভব। কারণ, এখন তো বুঝি—মুক্তির বুদ্ধিতে মেতে উঠে বুদ্ধিকেও তখন মানতে চাই নি, মুক্তিও তাই সুদূর হয়ে রইল। অসহযোগের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা তাই সর্বাংশেই ছিল সত্য। কিন্তু তখন কে তা শোনে? যে-বন্ধুরা তখনকার মতো কলেজ-স্কুল ছেড়ে দিলে—তাদের আমরা রীতিমত মনে করেছি 'হিরো'। যাঁরা কলেজে পড়ছি তাঁরাও গান্ধীজীর নীতিকে শ্রদ্ধা করতে শিখেছি, অথচ অবিশ্বাসও করেছি। শ্রদ্ধা করেছি এই ভেবে—নীতির দিক থেকে স্বদেশী সমাজ ও গান্ধীজীর প্রোগ্রাম তো সেই আত্মশক্তির নীতি জনশক্তিরই নীতি। বিশেষ করে গান্ধীজীর ব্যর্থতার মধ্যেও কতকটা আপেক্ষিক সার্থকতা তো স্পষ্ট। প্রতিষ্ঠান হিসাবে কংগ্রেসে সে বছরই তার গণতন্ত্র, নির্বাচন প্রভৃতি শুদ্ধ যথার্থ প্রতিষ্ঠিত হয়। কোথায় বড়দিনের সে তিন দিনের সভা, আর কোথায় জেলায় জেলায় স্থাপিত একটা জীবন্ত প্রতিষ্ঠান। এক সক্রিয় কর্মনীতি (প্রোগ্রাম), একটা জনভিত্তিক (পপুলার) প্রতিষ্ঠান, আর সত্যি-কারের একটা জীবন্ত সংগঠন,—গান্ধীজীর আবির্ভাবের পরে এক বছরেই জাতীয় রাজনীতিতে এল এই বৈপ্লবিক পরিবর্তন। গান্ধীজীও কি এ অর্থে unconscious instrument of Revolution নন—যতই হোন তিনি conscious instrument of non-Revolution? দেশের তাপমাত্রাও বেড়ে গেছে—আমরা দেখেছি কী প্রচণ্ড সেই ধর্মঘট—পূর্ববঙ্গে চাঁদপুরে কুলীদের ওপর অত্যাচারের ফলে কংগ্রেসের নেতৃত্বে শ্রমিকের ধর্মঘট। ভারত গভর্নমেণ্টের উষ্মাটা খেলাফতীদের উপরই প্রবল—আর খেলাফৎ-প্রভাব পূর্ব-বাঙলায় কী প্রচণ্ড। আমরা কলেজ করি, তবু চোখ কংগ্রেসের দিকে, দেশবন্ধুর বাড়িতে,—সত্যেন্দ্র মিত্র তখন সেখানেই থাকেন। সে গৃহ তখন আলোচনায় সরগরম। সপ্তাহে সপ্তাহে সত্যেনদার সঙ্গে দেখা করতে যাই, সে সুযোগে শুনি দূর থেকে নেতাদের কথাবার্তা। কেউ আসছে, কেউ যাচ্ছে, সুভাষবাবু, কিরণশঙ্কর রায়, বীরেন শাসমল, আক্রাম খাঁ, শামসুদ্দীন আহম্মদ, বড়বাজারের কেউ—অথবা শ্যামবাজারের, কালীঘাটের, কিম্বা মফঃস্বলের। তাদের উৎসাহের অন্ত নেই, তার আঁচ আমাদেরও মনে লাগে। কিন্তু সত্যেনবাবু তাতে বড় উদ্দীপনা যোগান না—'পড়া ছাড়লে কি হবে? কাজের সময় অনেক পাবি সামনে।' করাচীতে আলী ভ্রাতারা ও সারদাপীঠের শ্রীশঙ্করাচার্য একসঙ্গে রাজদ্রোহে অভিযুক্ত হলেন। কঠোর কারাদণ্ড হ'ল। স্বামীর গ্রেফতারের সঙ্গে

সঙ্গে পর্দানশীন মিসেস্ মহম্মদ আলী বোরখাশুদ্ধ তৎক্ষণাৎ ওয়ালটেয়ারের জনসভায় এসে বক্তৃতা করতে দাঁড়ালেন। বৃদ্ধা মাতা 'বাই আম্মা' চললেন প্রচার সফরে, শহরে শহরে। খানদানী মুসলমান জেনানার পক্ষে অভাবনীয় এই পরিবর্তন। ঝড় যেন ফুঁসে উঠবে। বছরের প্রায় শেষ, বাকী দু'-এক মাস। এক প্রশ্ন সর্বত্র—কতদূর ? স্বরাজের রথ কতদূর ? গভর্নমেণ্ট সারা দেশে বছর শেষ না হতেই চালালো দমননীতির রোলার। ও'ডায়ারের এবং ডায়ারের পরে সেরূপ ক্ষিপ্ত হওয়ার মতো দুর্বুদ্ধি তাদের ছিল না, বরং প্ল্যান-করা ডাণ্ডা-চালনার নীতিতে চলল দমন। বাঙলার স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী বে-আইনী ঘোষিত হ'ল। রংপুরে অধ্যাপক বীরেন মুখুজ্জে শত শত কর্মী নিয়ে হলেন বন্দী। সঙ্গে সঙ্গে বের হ'ল দেশবন্ধুর অগ্নিবার্তা সংগ্রাম-আহ্বান। আরম্ভ হ'ল আইন অমান্য, দলে দলে সত্যাগ্রহ। তিনি সর্বাগ্রে পাঠিয়ে দিলেন বাসন্তীদেবী, ঊর্মিলাদেবী ও সুনীতি দেবীকে সত্যাগ্রহে। তাঁরা গ্রেফতার হতে না হতেই খবর শুনে সমস্ত কলকাতা যেন উত্তেজনায় আবেগে অস্থির হয়ে উঠল। রাত্রি বেশি না হতেই অবশ্য বাসন্তীদেবীদের তিনজনকে জেল থেকে মুক্ত করে পুলিশ বাড়ি পৌঁছে দেয়। কিন্তু ততক্ষণে সংগ্রামের তরঙ্গ দেশের পথঘাট ছাড়িয়ে অন্তঃপুর ছুঁয়ে গেছে। ব্রিটিশ সরকারই তা করল যা এক বছরেও করা অসম্ভব হ'ত—বাঙালি মেয়েদেরও করে তুলল সংগ্রাম-মুখী। আসলে এটাই তো বিপ্লবের মুখ্য প্রকৃতি। এমনি অদৃষ্টপূর্ব তার আবির্ভাব, একদিনে উত্‌রায় এক যুগের পথ। প্রায় তখনি দেশবন্ধু ও মুখ্য নেতারা বাঙলায় গ্রেফতার হলেন। সারা ভারতবর্ষেও তাই ঘটে। একমাত্র গান্ধীজীকে তখন সরকার স্পর্শ করলে না—তাঁকে ধরলে যে তুমুল জনউদ্বেলতার সম্ভাবনা। তার চেয়ে তিনি মুক্ত থাকলে ঝুঁকি অনেক কম—তিনিই আন্দোলনের রাশ টেনে রাখবেন অহিংসার লাগামে। ততক্ষণ দেশের সর্বত্র হাজার হাজার মানুষকে গ্রেফতার করতে বাধা নেই। শহরে শহরেও তাই জেল ছাপিয়ে গেল সত্যাগ্রাহীর অভিযানে। নোয়াখালিতে ও কলকাতায় আমার বন্ধুরা কেউ কেউ সে দলে এগিয়ে গিয়েছে। সপ্তাহের মধ্যে ভেঙে বিলুপ্ত হয়ে গেল ব্রিটিশ আইনের মর্যাদা। এক নিমেষের মধ্যে দেশের মন থেকে মুছে গেল জেলের ভয়, রাজদণ্ডের বিভীষিকা—১৯০৫-এর সময়ে যা দেশের মন থেকে স্বদেশী কর্মীরা মুছে ফেলতে চেয়েছে, কিন্তু মুছে ফেলতে পারে নি। জেলযাত্রা হয়ে যাবে বুঝি স্বরাজের জয়যাত্রা। অবশ্য জেলেও আগেকার কড়াকাড়ি আর সম্ভব ছিল না—জেল ছাপিয়ে যাচ্ছে জেলমুখী সত্যাগ্রহীতে—আর জায়গা নেই। নতুন জেল খুলেও কুলোয় না। তাই গ্রেফতার বন্ধ হ'ল। আইন-অমান্য-

কারীদের ধরে নিয়ে রাত্রির অন্ধকারে দূরে ছেড়ে দিয়েই সরকার আপনার মুখ রক্ষা করতে চাইল। অবশ্য বেছে বেছে হাজার কয় লোককে ছ'মাসের কারাদণ্ড দিয়ে জেলে আবদ্ধ করে রাখতেও ছাড়ল না। জেল হাল্কা করার জন্যই পরে ছ'মাসের স্থানে তা তিন মাস দণ্ডে নেমে যায়।

এমনিতর ঝড়ের মুখেই আসছিল আমাদের বি. এ. পরীক্ষা (এপ্রিল ১৯২২)। স্বরাজ তার আগে আসাই উচিত ছিল, ১৯২১-এর ৩১-এ ডিসেম্বর। এল না, মিরাকল ঘটে নি,—মিরাকলও ঘটাতে হয়, ঘটানো চাই। তবু ১৯২১-এর শেষে আহমদাবাদের বৈঠকে কংগ্রেস জানিয়ে দিল, স্বরাজ আসতে দেরী নেই—দৃঢ়পদে সুশৃঙ্খল স্পর্ধায় এগিয়ে চল। আগে চল, আগে চল। মন অস্থির। মাস তিন পরে পরীক্ষা। এ কি পরীক্ষার সময়? মুখ দেখাব কি করে—এমন বৎসরে স্বরাজের থেকে যদি মুখ ফিরিয়ে থাকি? ঠিক করলাম —পরীক্ষার দক্ষিণা দাখিল করি, তা হলে আগামী বছর দিতে পারব পরীক্ষা—১৯২৩-এ। দক্ষিণা দেওয়া থাকলে সে বৎসর কলেজে পড়া দরকার হবে না। একটা বছর আমার জীবনে—এই ১৯২২—থাক স্বরাজের জন্য উৎসর্গ করা।

চলে গেলাম নোয়াখালি। সজনী এসে শিয়ালদতে তুলে দিয়ে গেল। একেবারে বাবা-মায়ের সামনে দাঁড়াতে হ'ল। এ বছর পরীক্ষা দেব না। ব্রিটিশ সরকারের আইন অমান্য মোটেই দুঃসাধ্য নয়, কিন্তু বাবা-মা'র কথা অমান্য করতে অনেক বেশি মনের জোর চাই। ভেবেছিলাম, তাড়াতাড়ি জেলে পালিয়ে যাব। সম্মুখ সমরের থেকে ঝাঁপ দেব জেলের অন্তরালে। কিন্তু হ'ল বিপরীত। কংগ্রেসের নেতারা শহরে আমাকেই রাখলেন আপিস চালনার সহায়ক করে। জেলে যাওয়ার লোক তাঁদের অনেক আছে, আমাকে না হলেও চলবে, সেই সত্যেনদার কথা। সংগঠন গঠনের লোক বেশি দরকার। তার অর্থ—দিনের পর দিন মা-বাবার সামনে মনের বলের পরীক্ষা। আর নিজের বাড়ির সঙ্গে অবাধ্যতার দ্বন্দ্ব। আমাদের অগ্রজতুল্য সুহৃদ শ্রীসুরেশ চক্রবর্তী ও অনুতোষ সেনগুপ্ত স্কুলের চাকরীটা সদ্য বিসর্জন দিয়েছেন। শহরটা যেন উত্তেজনায় কাঁপছে। এঁদের সঙ্গ, যজ্ঞেশ্বর দত্তর মতো পুরানো বন্ধুদের সঙ্গ, আমার মানসিক আশ্রয়কেন্দ্র হ'ল। আমি আর কি? ওঁরা অনেক বড় ঝুঁকি কাঁধে নিয়েছেন। নিজ নিজ গৃহ-পরিবারের ওঁরাই নির্ভর। তাঁদের অন্নদাতা, তাঁদের আশ্রয়। আমার মতো একটা বছর স্বরাজের জন্য উৎসর্গ করা তো ওঁদের পক্ষে সম্ভব নয়—সে যে অসহায় পরিবারকে অনাহারে উৎসর্গ করা। আমি তো পিতৃগৃহে খাব-দাব, ঝিমুব, নির্ঝঞ্ঝাট—অন্নবস্ত্র গ্যারাণ্টিড, 'স্বরাজ সাধন' করে এক বৎসর পরে গিয়ে পরীক্ষাও দিতে পারব।

ওঁরা কি ফিরে পাবেন এক বৎসর পরে তাঁদের পদ বা জীবিকা? এসব কথা ভাবতে গেলে ওঁদেরও উপায় থাকে না। না ভাবতে হলে মন ও মাথা দুই-ই সর্বদা গরম রাখা চাই—স্বরাজ সাধনের স্বপ্নে। নিজেদের বন্ধুদের কর্মে ও সহযোগিতায় খুঁজতাম একটা নির্ভাবনার কোটর। আর অন্যদিকে নেশাও মিলে সহজে—সভা, বৈঠক, আলোচনা, লোকের সঙ্গে কথা বলা, গ্রাম থেকে কর্মীরা আসছে; কংগ্রেসের চিঠি ও নির্দেশ রচনা, তা গ্রামে গ্রামে পাঠানো।

দেখছিলাম তখনকার নোয়াখালিতে জনতার অদ্ভুত আগ্রহ, উত্তেজনা। জেলায় শতকরা ৮০ জন মানুষ মুসলমান, খেলাফতের নামে তারা ক্ষিপ্ত। হাজারে হাজারে তার জন্য জেলে যেতে চায়। কিন্তু জেলের দুয়ার খোলা পাওয়া যায় না। জেলায় প্রায় শ'আড়াই কংগ্রেস অফিস—এখানে-ওখানে, হাটে-বাজারে, গ্রামে-গঞ্জে, দূরে-নিকটে। প্রত্যেক আপিসের পাশেই আবার একটা খেলাফৎ কমিটির আপিস। দুয়েরই কাজ এক, একসঙ্গে চলে, চালায়ও কার্যত একই লোক। তবু দুটো আপিস চাই, মুসলমানরা খেলাফতের জন্যই বেশি উদ্বুদ্ধ, সেই সূত্রে তারা কংগ্রেসের সভ্য, স্বরাজের সৈনিক। কিন্তু দুটো সংগঠন কেন? প্রশ্নটা অনিবার্যভাবে তুললেন হিন্দুরা কেউ কেউ। দশ বছর ধরে মুসলিম লীগ যা চাইছিল খেলাফত কমিটি বুঝে না-বুঝে তা'ই আবার করতে চলেছে। কংগ্রেস জাতীয় সংগঠন হতে পারে, কিন্তু মুসলমানদের চাই নিজস্ব বিশেষ সংগঠন। সুরেশ চক্রবর্তী প্রশ্নটা তোলেন। উত্তর নেই, জানি। গান্ধীজীরই কি উত্তর ছিল? আমরা ভাবি, প্রশ্নটা এসময়ে না তোলাই ভালো। উপায় যখন নেই, সান্ত্বনা খুঁজি—আপাততঃ এই চলুক। পা মিলিয়ে একসঙ্গে চলতে চলতে এখন একত্র চলুক সংগ্রামের দিকে। তা হলেই একদিন একত্র থেকে একাত্ম হবে, শেষে এক হয়ে যেতে পারা সম্ভব হবে। অন্ততঃ এখন ভিন্ন সংগঠনও পার্থক্য না মানলে একসঙ্গেও চলবে না—হিন্দু-মুসলমান। মুখ ফিরিয়ে ভিন্ন পথে চলবে মুসলমান। খেলাফতের নামে এক পথেই চলতে শুরু করেছে—সেটাই কংগ্রেসের পথ। এই জোড়াতালির পথই ছিল প্রশ্নের উত্তর। আসলে উত্তর থেকে পালিয়ে কাজের মধ্যে আমরা প্রশ্নের উত্তর খুঁজছিলাম।

হাতের কাছে তো কাজের অভাব নেই। হাজার হাজার মানুষ কিছু করতে চায়। শত শত মুসলমান ও হিন্দু ছেলেরা স্কুল ছেড়েছে। কাজ চায়। জেলে যাওয়ার কাজটা দুর্লভ হচ্ছে—জেলে স্থানাভাব, পুলিশ গ্রেফ্‌তার করে না। তাতে সংগঠকদের বিপদ। এত কর্মীকে কাজ না দিয়ে বসিয়ে

রাখা যায় না। অন্য জেলাকে আমরা কর্মী ও 'সৈনিক' দিই না কেন? রাজশাহী থেকে লোক চাইলেন বোধহয় সেখানকার কংগ্রেস সেক্রেটারি (প্রভাস লাহিড়ী মশাই কি?)। ঠিক হ'ল, আমি ও শ্যাম (অতুল বন্দ্যোপাধ্যায়) যাব জন দশেক ছেলে নিয়ে। রওনা হলাম। কেমন যেন শরীর অসুস্থ বোধ করছিলাম। ক্রমশঃ তা বাড়ল—আমি ফিরে এলাম পথ থেকে। শ্যাম একা গেল,—সে আমার বন্ধু কালীর সহোদর—বিপ্লবী দলের বালক। দীর্ঘ দিন সেবার সে রাজশাহীতে নোয়াখালির আট-দশটি ছেলেকে দিয়ে কাজ চালায়। তখন কত তার বয়স? ১৭।১৮। কিন্তু দায়িত্ব নেবার মতো মনের জোর ও ব্যক্তিত্ব তার ছিল। সেদিকে ভাবনা ছিল না। তবু মনে একটা কাঁটা রইল—শ্যাম তো বালক—একা অত দূরে গেল। তা ছাড়া, ভাবতাম—আমি অন্যত্র কাজে যেতে পারলে অচিরেই সেখানকার জেলে স্থান পাব, মনের অনেক দ্বন্দ্বের হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভ হবে। আসলে তা জুটত না—শ্যামেরও জোটে নি, সেখানেও জেলে বোধ হয় জায়গা নেই। অপরিচিত রাজশাহীর গ্রামে-গ্রামে স্বরাজের ডাক ছড়িয়ে সে একটা বৎসর কাটিয়েছে—তেমন করে কাটিয়েছে—যেমন করে কাটিয়েছে সেদিনের কর্মীরা তখন সকল জেলায়। যখন ভাবি—যে-দেশের লোক মহারানীর নামে চিরদিন ছিল অনুগত—ইংরেজ রাজ্যের শান্তি-সুবিচারে মোহগ্রস্ত; কেমন করে তাদের মন থেকে সে মোহ দূর হ'ল? লক্ষ-লক্ষ গ্রামের কোটি-কোটি সহজবুদ্ধি নিরক্ষর মানুষের মনে কি করে জাগল ওই স্বদেশবোধের প্রথম চেতনা—দেশটা তাদের, মহারানীর নয়—তিনি তাদের খাওয়া-পরা যোগান নি। আমরা কি মনে রাখি সেই নাম না-জানা সহস্র সহস্র শ্যাম ও তার সঙ্গীদের কথা! গোড়ার কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে সেদিনের চেনা-অচেনা কত সতীর্থের মুখ—অনেকে যারা ফিরে এসেছে প্রথম কর্মীর অভিজ্ঞতা নিয়ে, আবার অনেকে যারা হারিয়ে গিয়েছে সেই গ্রামের মধ্যে Anonymous India-র সাগরে—শহুরে কর্মী থেকে তারা ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে দিতে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে গান্ধীবাদের নামে নিষ্ক্রিয়তায়। মনে পড়ে, অচেনা-অজানা শুধু ক্ষিতীশ দা নন,—সন্দ্বীপের কালীকেশব ঘোষ, নোয়াখালির হারাণ ঘোষচৌধুরী—এমন অনেকের কথা। যারা দেশে-গাঁয়ে রৌদ্রে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে, আধপেটা 'খেয়ে, অথবা না-খেয়ে, মাথা গুঁজবার ঠাঁই কখনো পেয়ে কখনো না পেয়ে—যত নির্বোধের মতো হোক, যত উন্মাদের মতো হোক—ঘুরে বেড়িয়েছে সেই ১৯২০ থেকে, দেশের মানুষের সাড়া না পেয়েও অসাড় হয় নি, নিজেরা দেশের মান্য-গণ্যদের অবজ্ঞায় হার মানে নি। বিদেশী রাজার দণ্ড-লাঞ্ছনার থেকেও যে

স্বদেশের স্বজাতির কাছে উপেক্ষা অনেক বেশি মর্মঘাতী—সেই উপেক্ষার, অবজ্ঞার, অভাবের, দুঃখের ভার মাথায় নিয়ে এসব কর্মীদের চলতে হয়েছে। পিতার বিরক্তিতে, মাতার ব্যথায়, আত্মীয়-বন্ধুদের নৈরাশ্যে, অনেক তিরস্কারে —রক্তাক্ত হয়েছে তাদের বুকের ভেতরের বুক। তখন এক-একবার মনে হয়—সত্যই আমরা বাঙালিরা শুধু রোমান্টিক, আবেগসর্বস্ব মানুষ তো নই। আবেগকে দৈনন্দিন কাজের কঠিন চক্রে বেঁধে আমরা স্বাধীনতার স্বপ্নকে রূপ দিতেও পারতাম। দুর্ভিক্ষ-বন্যায় নানা সেবা-প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে—সেই ১৯০৭-এর অর্ধোদয় যোগের দিন থেকে ১৯৪৩-এর মন্বন্তরের গ্লানির মধ্যেও—এ পরীক্ষাও তো আমরা কম দিই নি। ভারতের অন্য জাতিদের থেকে বেশিই দিয়েছি। দেশকে তো আমরা সেবার মধ্যে দিয়ে আপনার করতে কম চেষ্টা করি নি—যেমনটি চেয়েছিলেন বিবেকানন্দ, চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তবু কেন এ দশা হ'ল—দেশের মানুষকে এক করতে পারলাম না—বাঙালিই গেল দু'ভাগ হয়ে। ইতিহাসের কাছে আন্তরিকতা বুঝি যথেষ্ট নয়।

কিন্তু যাক এ ভাবনা,—অপ্রাসঙ্গিক। বি.এ. পরীক্ষা দেব না ঠিক করে এসেছি। অদূর সংগ্রামের আশায় নোয়াখালি জেলা উত্তাল। আইনভঙ্গের ডাকে সাড়া দিতে অনেক অঞ্চলেরই আগ্রহ। কিন্তু চরকা কাটার পরীক্ষায় ক'জন উৎরিয়েছে, তা দেখাতে হবে। জেলা-কংগ্রেসের কর্মীরা সে-সব শাখা-কংগ্রেস পর্যবেক্ষণ করেছেন। অঞ্চল ঘুরে দেখেছেন, সাধারণ মানুষের আগ্রহও লক্ষ করেছেন। অন্ততঃ দশ-পনরটি অঞ্চলে ব্রিটিশের শাসন নেই, আছে স্বরাজ শাসন। কিন্তু চরকা-খাদির পরীক্ষায় তারা পাশ করেছে কি? কেউ নয়। দু-একটি স্থানে চরকা-তাঁত বরাবর কতকটা সচল; যেমন, ফেণীর বিলোনিয়া, ফুলগাজী, পরশুরাম থানায়; পাহাড়ীতুলায় সেখানকার দরিদ্র-সাধারণ বরাবর চরকা কাটে; তাঁতও কিছু কিছু বোনে। কিন্তু ঠিক তাদের মধ্যেই রাজনৈতিক উদ্দীপনা স্বল্প, উৎসাহ সামান্য। তা হলে দেখা যাচ্ছে, চরকাতেই যে স্বরাজের প্রেরণা জাগে, তা মোটেই ঠিক নয়। আমরা তবু বুঝেছিলাম—দু'-একটা বাছাই করা অঞ্চলে যদি সত্যাগ্রহ চালিয়ে দিই, তা হলে কয়েক মাসের মতো ইংরেজ রাজত্বের চিহ্ন মুছে ফেলা যাবে। তারপর অবশ্য পুলিশ ও বন্দুক আসবে। সেই দাপটে সাধারণ মানুষও কিছু না হোক বের করবে দা, কুড়োল, টেঁটা, কোচ —বাধা মানবে না। আমরা অবশ্য কংগ্রেস নেতৃত্বের নির্দিষ্ট পথেই লোকদের অহিংস সংগ্রামে প্রস্তুত করব; অহিংস রাখতেও চাইব। কিন্তু সরকারই তাদের অহিংস থাকতে দেবে না। তখন যা স্বাভাবিক তা অনিবার্য হয়ে পড়বে। সংঘাত,—বেশি অস্ত্রের সঙ্গে সংঘাতে অহিংসার পক্ষে সংখ্যায় বেশিরা।

শাখা-কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের সম্মেলন ডাকা হ'ল শহরে। কী অবস্থা কোন্ অঞ্চলে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত দু'দিন ধরে রিপোর্টিং, তার আলোচনা। তারপরেও কিছু যে সিদ্ধান্ত করা যায় তা নয়, কিন্তু শুনি অনেক, জানিও কিছু। অভিজ্ঞতা বাড়ে। বিরাট সম্ভাবনার জন্য আয়োজন হচ্ছে কি ? আবেগ,—কতটা তা গভীর ? কতটা তার সীমা ? কতটা আছে ধৈর্যের সীমা ?—জেল বড় ক্ষতি নয়। বরং ঘর-দুয়ার বাজেয়াপ্ত হলে, গ্রাসাচ্ছাদনের উপাদান হারালে মানুষ কি তা সইতে পারবে ? গ্রামের প্রতিনিধিদের কথা শুনি—নানা মানুষ, বিচিত্র তাদের দৃষ্টিভঙ্গি, কথার ভঙ্গি, জীবনের চেতনা। আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সে-সব দেখে মজাও পাই। নতুন এক অভিজ্ঞতা। একেবারে নিঃস্ব এরা নয়—দরিদ্র মধ্যবিত্ত, জমিজমা এদের সকলেরই এক-আধটুকু আছে। লেখাপড়াও অবশ্য অনেকে জানে। সামান্য বাঙলার সঙ্গে কারও সংগ্রহ সামান্যতর ইংরেজি। স্কুল-কলেজ ছাড়া দুই-একজনার আছে ইংরেজি শিক্ষার উপরে গান্ধীজীর শিক্ষার দেশী পালিশ। ইয়ং ইণ্ডিয়া থেকে তাঁরা ঠিক উদ্ধৃতি করবেন—প্রত্যেকটি তর্কে। তাঁরা প্রায়ই হিন্দু—অবস্থাবান। এবং আদর্শবানও। তালুকদারি, জমিদারি আছে, টাকাকড়িরও ভাবনা নেই। ভারতীয় সভ্যতার অব্যর্থ-অধিকার তাঁদের। সে আদর্শ-গর্বে সচেতনতায় স্পষ্টভাষী, অথচ কটুভাষী নন ; বরং সহাস্য এবং সচেষ্ট বিনয়ী। হবেন না কেন ? গান্ধীজীর নীতি তাঁরাই বেশি বুঝবার অধিকারী, বোঝেন, মানেন। সাধারণের অবশ্য এই অধিকার নেই। আর সাধারণ মুসলমান তো অহিংসা-তত্ত্ব শুনলে হাঁ করে থাকে। 'অহিংসা'—সে আবার কেমন ? কেমন, সাধারণ হিন্দু অবশ্য কিছুটা বোঝে। কিন্তু তাও সন্দেহজনক।—অহিংসা কি সাধারণ মানুষের পক্ষে বোঝা ও পালন করা সম্ভব ?—হ্যাঁ, 'ধর্মের জয়, অধর্মের ক্ষয়'—তা ঠিক। এতো ধর্মযুদ্ধই—গান্ধীজী তো সেরূপ অবতার। শিক্ষিত ভক্তরা বোঝান—হ্যাঁ, 'যদা যদাহি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি, ভারত', আসেন ভগবান। আমাদের মতোই মানুষ তিনিও দেখতে। কিন্তু আমাদের মতো মানুষ নন আসল শক্তিতে। তাই সেই অবতার-মানুষকে কেউ চিনে, আবার কেউ চিনেও চিনে না। স্বরাজ তো একটা কথা নয়, তা ধর্মের পুনঃস্থাপন। এসব ব্যাখ্যায় আপত্তি করে না কেউ, নেতারা না, শ্রোতারাও না, হিন্দুরাও না, মুসলমানরাও না। তবে প্রত্যেকে বোঝে নিজের নিজের মতো করে। একদিকে হিন্দু 'রামরাজ্য' ; খেলাফতের 'মুসলিম জাহান্' অন্যদিকে ; তবু একই সাধনা —ঘাড়ের বোঝা দূর করা। তারা বোঝে—এবার অন্ন জুটবে, বাড়ি-জমিও : দেনার বোঝা, খাজনার বোঝা, এমনি যত বোঝা থেকে মুক্তি মিলবে।

শিক্ষিতরা অবশ্য এত স্থূল চক্ষে স্বরাজ-সাধনা দেখেন না। তাঁরা অনেক বেশি জানেন—'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পড়েন। বুদ্ধিমান মানুষ মনোরঞ্জন চৌধুরী—গান্ধীজীর ভক্ত। মনোরঞ্জনবাবু শান্ত মধুর হাস্যে মনে করিয়ে দিতেন, কংগ্রেস সুশিক্ষিত পরিবার, সকলে প্রস্তাবে কোথাও খাজনা বন্ধ, ঋণে সুদের বন্ধের কথা নেই। নো-ট্যাক্‌স তো নাই-ই। জমি, খাজনা, সুদ এসব থাকবে না কেন? —জমির খাজনা, দেনার সুদ এসব তো জমিদার-মহাজনের ন্যায্য পাওনা। তা না দেওয়াই অধর্ম, পরদ্রব্য অপহরণ, গান্ধীজী বলেছেন,—মালিকরা হচ্ছেন ট্রাস্টি—অপোগণ্ডদের রক্ষক, পালক, মা-বাপ। স্বরাজ অর্থ দেশের লোকের শাসন।—বিদেশীর হাত থেকে দেশের ধনী-গুণী-মানী লোকেরাই দেশের সকল লোককে রক্ষা করবে।

স্বরাজ কথাটা ভগবানের মতো, প্রত্যেকেই নিজের মতো করে দেখে তার রূপ। অত অস্পষ্টতা চান নি বিপিনচন্দ্র পাল ও অনেকেই। সংজ্ঞা না দিলেই স্বরাজ স্বীকৃত, সংজ্ঞায় গেলেই সাংঘাতিক বিপদ, কেউ কেউ বুঝতে চান আধ্যাত্মিক অস্পষ্টতা ছাড়িয়ে কথাটাকে রাজনৈতিক সুনির্দিষ্টতায় আনা চাই। এঁদের কাছে রাজনীতি ধর্মনীতি নয়। সেকুলারিজম্‌ কংগ্রেসেরও বরাবরকার দৃষ্টিভঙ্গি, তা secular প্রতিষ্ঠান। গান্ধীজী কিন্তু কংগ্রেস জয় করলেন ধর্মের আসন পাতবার জন্য। ধর্মের টানাপোড়েন না দিলে এদেশে কিছু চলে না। খেলাফতের মুসলিম জাহানী আবেগ আর হিন্দু-সমাজের রাম-রাজ্যের আদর্শ গান্ধীজী জুড়তে চাইছিলেন একসাথে। শুধু অহিংসা নয়, কথায়-আচরণে, কৌপীন-শিখায়ও অর্থোডোক্‌স্‌ হিন্দু ঐতিহ্য তিনি জাঁকিয়ে তুলে-ছিলেন। অস্পষ্টভাবে বুঝেছিলাম—বিষম হবে তার ফল। স্পষ্ট করে ভেবে দেখি নি, কিন্তু অন্তরে-অন্তরে অনুভব করছিলাম, অন্ততঃ নোয়াখালির মুসলমানদের ধর্মাশ্রয়ী রাজনীতিক চেতনা এপথে চললে যা ঘটবে—তাতে জিন্নাহর টু নেশনই পুষ্ট হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু তা অকল্পিত। সংগ্রামের মধ্যে এগিয়ে গেলে তার মধ্য দিয়ে হিন্দু-মুসলমানের অনেক অনেক আবর্জনা-সংশয় ধুয়ে মুছে যাবে, এই নিজেকে বোঝাই।

মনে মনে আশা করি, দু'একটা অঞ্চলে অচিরেই সম্ভব হবে শেষ সংগ্রাম—সত্যাগ্রহ। হঠাৎ উত্তর প্রদেশের চৌরিচৌরায় হিংসার আবির্ভাব হ'ল। এমন এক-আধটা ঘটনা ঘটা বিপুল দেশের বিশাল আন্দোলনে মোটেই অসম্ভব নয়। কিন্তু গান্ধীজী চান অসম্ভবকেই সম্ভব করতে—কায়মনোবাক্যে সামগ্রিক অহিংসা। গুজরাতের বর্দৌলি সত্যাগ্রহের জন্য যখন প্রস্তুত, তিনিই সেখানে সত্যাগ্রহের প্রস্তুতি বাতিল করলেন। জানালেন, দেশ অহিংসায় দীক্ষিত হয় নি।

স্বাধীনতার পরীক্ষার সমস্ত উদ্দীপনার উপরে জলভার ঢেলে দিয়ে তিনি সকলকে বিমূঢ় করে দিলেন। আমি অবশ্য মূঢ় নই। এসে বসে গেলাম পরীক্ষা দিতে। তখনো বি. এ. পরীক্ষার এক মাস সময় আছে।

আলো-আঁধার

বর্দৌলি প্রস্তাবের পরে আন্দোলন হিসাবে নন-কো-অপারেশন অচল হতে বাধ্য। হ'লও তাই। গান্ধীজীকে জেলে পুরতে ব্রিটিশ সরকারের আর কোনোই দ্বিধা রইল না। গান্ধীজী জেনে-না-জেনে তাদের চালকে সফল করেছেন। তার পূর্বেই খেলাফৎ সমস্যার অবশ্য সমাধান হয়েছে; খেলাফতের নামগন্ধও আর কামাল পাশা পৃথিবীতে রাখলেন না। অথচ 'খেলাফৎ রক্ষাই' ছিল ভারতের মুসলমানদের রাজনীতির লক্ষ্য। এ সমাধানের পরে সহজ ভাবেই তাদের স্বরাজ আন্দোলনে উদ্দীপনা কমতে লাগল; মুসলিম পৃথকত্ব বোধ বেড়ে চলল। আবুল কালাম আজাদের মত জাতীয়তাবাদীরা ক্রমেই প্রভাব হারাতে লাগলেন। নোয়াখালিতে থাকলে পরিবর্তনটা অনুভব না করে পারা যেত না। আর নোয়াখালি শুধু নয়। পাঞ্জাব থেকে উত্তর ভারতের সর্বত্র এই দুর্লক্ষণ দেখা দিচ্ছিল। আন্দোলনে ভাঁটা পড়লে যা অনিবার্য তা ঘটল—এখানে সেখানে কংগ্রেস রাজনীতির ঘোঁট ও কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি। নন-কো-অপারেশন কার্যক্ষেত্রে নিষ্প্রাণ, চিত্তরঞ্জন ও মোতিলাল নেহরু প্রভৃতি বিচক্ষণ নেতারা চাইছিলেন আইনসভায় গিয়ে সংগ্রাম চালাতে। বছর খানেক বাদে মহম্মদ আলী শেষ অবধি দিল্লী কংগ্রেসে একটা আপোস সূত্র গ্রহণ করলেন। কংগ্রেস আইনসভায় যাবে না, কিন্তু কংগ্রেস সদস্যরা যদি চায় যাক। এই অনুমোদনটুকু যথেষ্ট হ'ল, নির্বাচনে স্বরাজ্য পার্টি জেঁকে উঠল। ছ-সাত বৎসর স্বরাজ্য পার্টি জাতীয় রাজনীতির মুখপাত্র, অবশ্য জাতীয় রাজনীতি ও জাতীয় মতবাদ ততক্ষণে ঘায়েল সাম্প্রদায়িকতাবাদের হাতে।

আমরা বন্ধুরা তখন অনেকে দিল্লীর বিশেষ কংগ্রেসে গেছলাম। স্বদেশী-দাদারা চিত্তরঞ্জনের প্রধান কর্মী। আমি কলকাতায় এম. এ. পড়ি—দাদাদের ভক্তিহীন সঙ্গী। সেই আমার প্রথম কংগ্রেসের ডেলিগেট হওয়া। মৌলানা আজাদ ছিলেন সেবার সভাপতি। নেতাদের অনেককে দেখলাম। না, ভুল হ'ল, তার আগেই বিশিষ্টদের অনেককে দেখেছিলাম।

চিত্তরঞ্জন দাশের বাড়ির অঙ্গনে ছিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন। বেলা ২টা থেকে রাত্রি ৮টা-৯টা চার-পাঁচ দিন ধরে সভা। কলেজ পালিয়ে প্রতিদিন সেখানে জুটতাম। বিশিষ্ট দর্শকের কার্ড নিয়ে। দেশের জাতীয়

নেতাদের এমন সমাবেশ এত কাছে থেকে আগে দেখি নি। সবাই সদ্যমুক্ত জেল থেকে। আইনসভায় প্রবেশ উচিত কি অনুচিত—এই তখন প্রশ্ন। তার জন্যই অধিবেশন। সকলেই তর্কে মুখর। একমাত্র চিত্তরঞ্জন নীরব সভাপতি। তাঁর বিচার তো সুপরিজ্ঞাত। গয়া কংগ্রেসে তা জানিয়ে তিনি অপদস্থ হন। জওহরলাল এ সভায় ছিলেন না। মতিলাল নেহরু পুত্রবধূ ও কন্যাদের নিয়ে উপস্থিত—তারাও দর্শক এবং দর্শনীয়। অনেক পুরুষও তাই। কেউ বক্তৃতায় পিছপা নন। সংশোধনবাদীদের দলে অবশ্য বিচক্ষণ নেতারা। তাঁদের বিরুদ্ধ পক্ষও কম নয়—সে পক্ষের নেতাদের মধ্যে ছিলেন রাজেন্দ্রপ্রসাদ, বল্লভভাই, মিসেস্ সরোজিনী নায়ডু প্রভৃতি ;—আমাদের প্রফুল্ল ঘোষ, শ্যামসুন্দরবাবুরাও। তবে সে বৈঠকে গান্ধী দলের নেতা সালেমের প্রাক্তন ভকীল চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী। এ উপলক্ষেই তিনি অল-ইণ্ডিয়া লীডার হন। আগেই পড়েছিলাম, তাঁর জেলের খাতায় লেখা হয়েছিল—'আসামী নিরক্ষর'। সেই শান্তভাষী বিচক্ষণ মানুষ—চশমা-পরা, তীক্ষ্ণ নাসা, মাথা কামানো, গান্ধীজীর অনুসরণে কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত—শীত কালে গায়ে চাদর, বিতর্কে সদা সতর্ক। আরেকজনাও ছিলেন সে পক্ষে, মুখর-বাগ্-ব্যঙ্গে পট্টভি সীতারামাইয়া—বিদূষক-ধর্মী। অন্যপক্ষের যুক্তি অনেক, নামী নেতা বেশি। কিন্তু রাজাগোপালাচারীদের যুক্তি একটি, আর তা অখণ্ডনীয়। তাঁর হাতে 'ইয়ং ইণ্ডিয়া'র ফাইল। প্রতি কথায় গান্ধীজীর লেখা তাঁর নজির।—ছাপার অক্ষরে লেখা গান্ধীশাস্ত্রবচনের দাড়িকমা বদলানোও অমার্জনীয়। এ যুক্তির পরে আবার যুক্তি কী? বলা বাহুল্য, দিন চারেকের অধিবেশনেও কোনো সিদ্ধান্ত হয় নি—কিন্তু বোঝা গেল কংগ্রেসের নেতৃত্বের সঙ্কট। রাজাগোপালাচারীই তখন গান্ধীজীর অনুপস্থিতিতে গান্ধীবাদের মুখপাত্র। পরে ত্রিপুরী কংগ্রেসে যখন তিনি সুভাষ-গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে 'ফুটো নৌকো'র বক্তৃতা করছিলেন, আর শুনছিলাম তাঁর পুনঃ পুনঃ আবেদন 'গান্ধীজী রাজকোটে উপবাসী'—তখন বিশ বৎসর আগেকার সেই প্রথম দেখা রাজাগোপালাচারীকে মনে পড়ল—তিনি কংগ্রেসের ডিপুটি গান্ধী, গান্ধীজীর বৈবাহিক, এখনো সেই একই মোক্ষম যুক্তি। 'গান্ধীজী ইজ্ ইন্ জেল'—তখন কি আর কাউন্সিলে যাওয়া চলে? অবশ্য ত্রিপুরীতে রাজাজী অনেক প্রবীণ, আরও বিচক্ষণ, ১৯২২-২৩-এর লয়েন-ক্লথ্ ছেড়ে আবার ধরেছেন ধুতি-পাঞ্জাবী-চাদর। তারপর অনেক জল বয়ে গেছে নর্মদার উত্তর-দক্ষিণে গঙ্গায়-গোদাবরীতে। কিন্তু রাজাজী নিজের ডিঙি বাইতে সমান দক্ষ সর্বত্র। দেখলাম—কুইট ইণ্ডিয়া প্রস্তাবে তিনিই হলেন গান্ধী-বিরোধী। এখন (১৯৬৮) অবশ্য কমিউনিস্টরা রাজাজীর 'এনিমি

নম্বর ওয়ান্' ; কিন্তু সেদিন কুইট ইণ্ডিয়া প্রস্তাব পাশ হলে (১৯৪২) তিনি গরজ করে কমিউনিস্টদের ডেকে পাঠান। 'তোমরা বাধা দাও এ পাগলামোতে। বরং পণ্ডিচেরী থেকে অরবিন্দকে নিয়ে এস এজন্য।' তারপর এল আপোস-রফার দিন,—১৯৪৬-৪৭। তখন লীগের সঙ্গে রফায় রাজাজীর দেরী সয় না—বসন্ত যায় চোখের উপর দিয়া। 'বাঙলা যদি না থাকে না থাক্। আমরা দেরী করব না—বাঙলাকে বাদ দিয়েই চাই ব্রিটিশের হাত থেকে ক্ষমতা লাভ।' অবশ্য আরও পরে (১৯৪৮-৪৯) তিনি বিভক্ত বাঙলার রাজভবনে গবর্নর হয়ে আসেন। সেখান থেকে হলেন নয়াদিল্লীতে রাষ্ট্রপতি ভবনের প্রথম রাষ্ট্রপতি। পেন্সান-ভোগী সেই রাষ্ট্রপতি পোস্ট—৯০ বৎসরেও লেখায় কথায় সক্রিয়। প্রতি সপ্তাহে চলছে কংগ্রেস নেতৃত্বের সমালোচনা। আশ্চর্য তাঁর চিন্তাশক্তি। ততোধিক আশ্চর্য স্বচ্ছ ভাষাশৈলী। সর্বাধিক আশ্চর্য তাঁর বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা—হয়তো তামিল প্রতিভার এক শ্রেষ্ঠ নিদর্শন চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী। মনে মনে আশ্চর্য হয়ে দেখছি সেই প্রথম লয়েন্ ক্লথ-পরা রাজাগোপালাচারী যাঁর একমাত্র খ্যাতি 'ইয়ং ইণ্ডিয়ায়' গান্ধীজীর লেখা, 'গান্ধীজী ইজ্ ইন্ জেল'। মনে করি ত্রিপুরীর 'ফুটো নৌকার' কাহিনীকার সুভাষ-বিরোধী রাজাগোপালাচারীকে—যাঁর যুক্তি গান্ধীজী 'ইজ্ ইন্ ফাস্ট'। আরও কত কত নব নব ক্রম-আত্মপ্রকাশে রাজাজী। দেখতে দেখতে ভারতীয় রাজনীতির ভেতরের একটা দিকের পর্দা আমার সামনে থেকে সরে যায়। সঙ্গে সঙ্গে চোখে পড়ে সেই স্বরাজ-সাধনার ভেতরকার অলিখিত ফাঁক আর ফাঁকিও। কেমন মনে হয়—রাজনীতিতে গান্ধীজী অত ধর্ম ও চিত্তশুদ্ধির নীতি না ঢোকালেই ভালো হ'ত—ওসবের আড়ালে আত্ম-প্রবঞ্চনার ও জাতীয় প্রবঞ্চনার ক্ষেত্রই তৈরী হয়েছে। ক্ষমতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে তাই ১৯৪৭-এর জাতীয় বিগ্রহের খড় বেরিয়ে পড়তে থাকে।

থাক্ সে কথা। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে আমি কিন্তু চিত্তরঞ্জনের গৃহের পশ্চাৎ প্রাঙ্গণের সেই কংগ্রেস নেতাদের দর্শনে নিরুৎসাহ হই নি।—যুক্তি-তর্কে মাঝে মাঝে ক্লান্ত ও নিরাশ হয়েছি ঠিক। নাম বলা নিষ্প্রয়োজন—কিন্তু সে স্বরাজ্য যুগের কংগ্রেসের নেতাদের মুখে সেবার দেখেছি আগ্রহ, আন্তরিকতা। কারও কারও মুখে সেই সঙ্গে প্রসন্নতা। কারো কারো সবঙ্কিম কৌতুক হাস্যরেখা। কিন্তু অধিকাংশেরই মুখে দেখেছি বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্য। মনে হয়েছে, স্বরাজ মন্ত্রটা দেশে বুদ্ধির ও রূপের জ্যোতিও যেন জীইয়ে তুলেছে—শাস্ত্রবাদীদের বাধায়ও তা ক্ষুণ্ন হয় নি। তবে কেউ কর্মপন্থা বুঝছেন না। ক-মাস পরে দিল্লী কংগ্রেসে অবশ্য দেখলাম—দেশে কতটা এসেছে প্রাণচেতনার আলো আর কতটা এসেছে বিরোধের অন্ধকার। কংগ্রেসের মঞ্চ থেকে ঘোষণায় বলা

হল—'কানপুরে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার খবর ভয়ঙ্কর। কানপুরের কর্মীরা শীঘ্র কানপুর চলে যান। গণেশ শঙ্কর বিদ্যার্থী নিহত—তাতে সন্দেহ নেই।' কংগ্রেসের ওপরে পড়েছে ছায়া, দেশজুড়ে তব্‌লীল ও শুদ্ধির দ্বন্দ্ব। কোথায় 'স্বরাজ', কোথায় আর জাতীয় আন্দোলন ?

ফিরবার পথে আগ্রা স্টেশনে আমাদের এক পাঞ্জাবী (আর্যসমাজী ?) ভদ্রলোক ধরে বললেন—'তোমরা জানো না মূলতানে, শাহারানপুরে কী ঘটেছে'। —উত্তেজনায় তার কণ্ঠ রুদ্ধ। আমাদের গাড়ি ফেল হ'ল। তা না হলেও লাভ হ'ত না। দিল্লী, আগ্রা, মথুরা, বৃন্দাবন প্রভৃতি দেখে দেখে আমরা কলকাতায় ফিরি। উত্তর ভারতের কীর্তিমালার সঙ্গে সেই আমার প্রথম চাক্ষুষ পরিচয়। তার আগে বিহারে দেখেছি, অনেকখানেই দেখলাম—গোবিন্দজীর প্রাচীন মন্দিরের মত ভগ্ন মন্দির। আর ভগ্ন দেবমূর্তিতে গাঁথা মসজিদের সোপান। অনুভব করলাম মধ্যযুগের এই ধর্মবিদ্বেষের প্রমাণগুলি আগ্রা স্টেশনে দেখা সেই আর্যসমাজীর থেকে প্রতিবাদে কম মুখর নয়। তা ছাড়িয়ে উঠব আমরা কোন্ মন্ত্রের জোরে ? ছাড়িয়ে না উঠতে পারলে কোথায় বা স্বরাজ, কোথায় বা ভারতবর্ষ ? দেশ ধর্মধ্বজীদের প্রেতভূমি। পরের ক-বছর এই চিন্তা আমাকে ছাড়ে নি।

দিল্লী কংগ্রেসে আরেকটি জিনিসও দেখেছিলাম—সেখানে শরৎচন্দ্র, দিলীপ রায় প্রভৃতিও ছিলেন বাঙালি প্রতিনিধি। অর্থাৎ দলটা গানে-গল্পে খাঁটি বাঙালি। তখনকার হিন্দু কলেজে তাঁদের স্থান হয়। হাসি-রঙ্গ-আড্ডায়, তা স্বচ্ছন্দ। প্রথম দিনে সন্ধ্যা হতে দেখা গেল বিজলী নেই। হৈ-চৈ, সবাই নিরুপায়। ঘণ্টা দুই পরে দেখলাম মোমবাতি এল—ঘরে ঘরে নিজের হাতে আলো জ্বালিয়ে তা দিয়ে গেলেন সুভাষচন্দ্র—মুখে তাঁর কথা নেই—অন্ততঃ কেউ হৈ-চৈ করতে শোনে নি কখনো। নীরবে আলো জ্বেলে যাচ্ছেন একা। 'দীপ জ্বেলে যাই'—দৃশ্যটা মনে রইল।

স্বরাজের স্রোতস্বিনী অবশ্য এক সময়ে 'মরুপথে হারাল ধারা'। কিন্তু আমরা যারা এই আবর্জনায় ডুবতে বসেছি, তারা তবুও 'জানি হে জানি তা হয় নি হারা।' তার মধ্যে স্রোত না থাকলে এখানে এলাম কি করে ? তার মধ্যে ফাঁকি না থাকলে এত আবর্জনা স্বাধীন ভারতে এল কোথা থেকে ? সকল বড় আয়োজনের মতোই স্বরাজ আন্দোলনের মধ্যে ছিল নানা বিরোধী ধারার স্থান—আবর্ত। এত বড় কথা তো রাজনীতিতে কেউ

কোনো দিন কল্পনা করতেও সাহস করে নি, যা গান্ধীজী স্বরাজ আন্দোলনে প্রথম প্রয়োগ করলেন,—"সত্যাগ্রহ"। অস্ত্রবলে নয়, শুধু মনোবলেই শত্রুজয়। শত্রুজয় নয় শুধু, মিত্র লাভ ও শত্রুর হৃদয় জয় করে শত্রুকে মিত্র করে তোলা। নিশ্চয়ই গান্ধীজীরও পক্ষে এ দুঃসাহস। 'বুদ্ধ, খ্রীস্ট গেলেন তল, গান্ধী বলেন, কোথায় জল ?' দুঃসাহস কিন্তু তাঁর নয়, আমাদের তো মনে হয়, দুঃসাহসটা কালের।

ইতিহাসে অনেক মহাত্মা জন্মেছেন। এদেশেই শুধু জন্মেন নি, বিদেশেও জন্মেছেন। কিন্তু তাঁদের কাছে তখনো রাজনীতিতে এমন নিরস্ত্র প্রতিরোধের কথা ছিল অচিন্তিত, এ-কর্মকাণ্ড অকল্পিত। সত্য বটে, গান্ধীজীর কালেও পৃথিবীতে আরও মহাপ্রাণ মানুষ ছিলেন। সাধু-সন্ত নন, যোগী-সাধক নন, মানুষ, তবে মহাপ্রাণ মানুষ। সম্ভবতঃ আইনস্টাইন, রবীন্দ্রনাথ কম সত্যসন্ধ নন ;—তাঁদের এ দুঃসাহস হ'ল না কেন ? তাঁরা মূলতঃ কর্মযোগী নন। জ্ঞানযোগী—সেখানেই তাঁদের নিজ নিজ সাধনা। সেখানে সাফল্যের আনন্দ আছে ; এমন ব্যর্থতার দুঃখে লজ্জা নেই। কর্মযোগীর পদে পদে ব্যর্থতার সম্ভাবনা। কর্মযোগের সাধনায় সাফল্য যেমন সুস্পষ্ট, ফলাফলও তেমনি প্রত্যক্ষ। তাতেই দেখা যায়, এক পয়েন্ট-এ সফলতা তো, নিরনব্বই পয়েন্ট-এ ব্যর্থতা। গান্ধীজী ব্যর্থতার দুঃসহ বোঝা নিয়ে জীবন আহুতি দিয়েছেন। নির্মলকুমার বসুর সাক্ষ্য দেখুন, প্যারীলালের প্রমাণ-পত্র দেখুন। অথবা তার দরকার কি ? কংগ্রেস নেতৃত্বের ১৯৪৭-এর পরবর্তী কীর্তিকলাপ যথেষ্ট। একজন জুডাসের স্থলে গান্ধীজীর ভাগ্যে জুটেছে একপাল কংগ্রেসী শিষ্য। কর্মযোগীর পক্ষে এহেন দুর্ভাগ্য অস্বাভাবিক নয়। জ্ঞানযোগ অত গ্লানিতে গিয়ে পৌঁছে না, তবুও মানবীয় কর্মের মধ্যেই জ্ঞানেরও চরম গতি। তাই তো, আইনস্টাইন রবীন্দ্রনাথ আমৃত্যু 'দুঃখের তপস্যা' জীবনে বহন করেছেন। অসহ্য ব্যর্থতার বেদনা মহাজ্ঞানীরও নিয়তি। এই শ্রেষ্ঠ জ্ঞানীরা দেখেছেন গান্ধীজীর ব্যর্থতায় তাঁদের প্রত্যেকের ব্যর্থতা। সমগ্র মানব সমাজের হয়ে যাঁরা ভেবেছেন, কাজ করেছেন, মানুষকে ভালোবেসেছেন, তাঁদের এই ব্যর্থতা থেকে নিষ্কৃতি নেই। মহৎ ব্যর্থতা, মহান প্রাণের জীবন-টীকা। অথবা শুধু তাও নয়। যে-মহান্ আদর্শই কর্মে রূপান্তরিত করতে যাওয়া যায়, কার্যক্ষেত্রের আবর্তে পাক খেতে খেতে সে আদর্শের বিশুদ্ধতা আর থাকে না। বেঁকেচুরে সে মানুষের সমাজে মানুষের মতো হয়েই কতকটা সার্থক। তা দেখি খ্রীস্ট ধর্মের বেলা, তা দেখি বৌদ্ধ ধর্মের বেলা। আর তাই কি দেখি না পঞ্চাশ বছরেই গান্ধীজীর আদর্শের ইতিহাসে, কিম্বা মার্কস-লেনিনের আদর্শের বিবর্তনে ?

অথচ, এই ব্যর্থতাই কি চরম হিসাব—খ্রীস্টের, বুদ্ধের, গান্ধীজীর ? এমন কি, মার্কস-লেনিনের ?

ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে দেখি—সভ্যতার অর্থই হ'ল এই বাহুবল থেকে মনোবলের জোরে সমস্যা সমাধানের অপরিহার্য সাধনা। মানুষের ইতিহাস মানুষের এই স্বরাজ সাধনারই ইতিহাস—অবশ্য একটানা জয়ের কাহিনীতে নয়, বরং পরাজয়ে পরাজয়ে একটু একটু করে জয়ের সাক্ষী। ভবিষ্যদ্বাণী করতে গেলে গমিষ্যামি উপহাস্যতাম্,—ঠিকই হবে তা। কিন্তু বিংশ শতকের শোষণহীন সমাজের পরীক্ষা নিঃসন্দেহে একবিংশ শতাব্দীতে exploitation of man by man and nation by nation-কে 'বাতিল ব্যবস্থা' করে তুলবে। না হলে সভ্যতাই বাতিল হবে। তাই বলে কি তখন চোর থাকবে না, ফাঁকিবাজ থাকবে না ? আর থাকবে না ক্ষমতা-লিপ্সু 'নিউ ক্লাশ', শাসক-চক্র, অথবা 'এস্টাব্লিস্‌মেণ্টে'র যান্ত্রিকতা ? মানুষ তখনো মানুষই থাকবে —তার সংগঠনে আয়োজনেও অপূর্ণতা থাকবে। কারণ, পূর্ণতার থেকে পূর্ণতায় তার তপস্যা ; আর তার অর্থ অপূর্ণতা থেকে অপূর্ণতায়ও তার বারে বারে পতন। তবে সমাজ-ব্যবস্থাটা আর একটু যুক্তিসঙ্গত হবে। কিন্তু মানুষের জীবনের সঙ্গেই যে অযৌক্তিক রিপুগুলি আছে, তার শুভৈষণার সঙ্গেই জড়িত তার দুর্বুদ্ধি। আগামীকালের যুক্তিসঙ্গত ব্যবস্থার মধ্যেও দুর্বুদ্ধি এখানে সেখানে ফাঁক বের করবে। ফাঁকি দেবে তখনো তার শুভবুদ্ধিকে। কিন্তু তখন ফাঁকিটা হবে ব্যতিক্রম,—এখন কিন্তু ফাঁকিটা সমাজ-সম্মত নিয়ম। ইতিহাসে শুভবুদ্ধির পরাজয় বার বার হবে, সব পরাজয়ই তবু সাময়িক। মানুষ loses the battles to win the war,—কিন্তু, wins no peace permanently। যাক্ গে, সেই সুদূর ভাবনা।

এ ক্ষেত্রে আরও একটা কথা স্বীকার্য। ভারতের স্বাধীনতার আন্দোলনে 'অহিংসা'র জয় হয়েছে, এত সরলীকৃত সত্যকে আমি আরও মানি না। এমন কি, 'ভারতের জয় হয়েছে' একথা গান্ধীজী মনে করতেন না। ১৯৪৭-এর ১৫ই আগস্ট তিনি অবসন্ন চিত্তে নীরবে জানিয়ে গিয়েছেন, এ 'জয়' তিনি চান নি। তখন ভারতবাসীর ক্ষমতালাভ হয়েছে—সে যে শ্রেণীর ভারতবাসীরই হোক। কিন্তু অহিংসা-হিংসা অনেক মিলেই তা হয়েছে। যেটুকু 'জয়' তা নিরস্ত্র প্রতিরোধের, স্বদেশী বিপ্লব ও গণতান্ত্রিক বিপ্লবী চেষ্টায় হয়েছে ধরা যাক। তথাপি মহাযুদ্ধের শেষে নৌ-সৈনিকদের ও ভারতীয় সৈন্য বাহিনীর বিদ্রোহ, বিশেষতঃ তৎকালীন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি এবং ব্রিটেনের হৃতবল অবসন্নতা এসবকেও মুখ্য কারণ না বললে চলে না।

বিশেষ করে, 'অহিংসার' জয় হয়েছে বলা নিশ্চয়ই আত্মপ্রতারণা। অহিংসা সত্য-সত্য আমাদের হৃদয় স্পর্শ করলে আমরা হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গায় এমন দানবের মত বারে বারে মাতি কি করে ? তা সত্ত্বেও, আমার বিশ্বাস গান্ধীজী অহিংসার স্বপক্ষে এক পয়েণ্ট সাফল্য অর্জন করেছেন—স্বদেশে নয়, মানুষের সভ্যতার ধারায়। ভারতের স্বরাজ-সাধনায় যতটা পরাস্ত হয়েছেন তা হয়েছেন মুখ্যতঃ তাঁর শিষ্যদের হাতে। মানব-সভ্যতার জন্য এক পয়েণ্ট তিনি অর্জন করেছেন—তা সত্ত্বেও—নিজের শক্তিতে। হয়তো গান্ধীজীর পূর্বে, মার্কস লাভ করে থাকবেন ১ পয়েণ্ট, লেনিন—১ এক নতুন পয়েণ্ট, লীগ অব নেসন্স্ করেছে শূন্য। অবশ্য পাশের মার্ক পেতে হলে মানুষের চাই, অন্ততঃ মোট আরও ৩০।৪০ পয়েণ্ট লাভ। অহিংসা বা চরকায় তা হয় নি।

'এক পয়েণ্ট লাভ'—এটা আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস। কথা শুনে কেউ খুশি হবেন না, গান্ধীজীর শিষ্যরাও না, মার্কস্‌বাদী লেনিনবাদী বন্ধুরাও না, আর মাওবাদীরা আরও না। 'বন্দুকের নল থেকে ক্ষমতা বেরোয়'—একথা কি আমি জানি না ? নিশ্চয়ই মানি, এজন্যই তো বন্দুকের সামনে দাঁড়াই না। সংশয় নেই, বন্দুকের ক্ষমতা দুঃসহ। তা হচ্ছে অশেষে শেষ করবার ক্ষমতা। কথাটা বিচ্ছিন্ন একটা সূত্র নয়, তার মূল অন্যত্র ঃ মানুষের যে হাত ভাঙ্‌তে চায় বন্দুক তার চরম শরণ। কিন্তু মানুষের যে-হাত গড়তে চায় তার পরম হাতিয়ার—কাস্তে হাতুড়ি, অর্থাৎ পরিশ্রম : এবং ল্যাবরেটারির টেস্টটিউব ও ডাক্তারের স্কালপেল—অর্থাৎ বিজ্ঞান,—যে জিনিসে গান্ধীজীর বিশ্বাস ছিল না। এই কারণেই ব্যক্তিগত ভাবে আমার মন গান্ধীনীতিতে বশ মানতে চায় নি, আইনস্টাইন রবীন্দ্রনাথের দিকে বরং তাকাতে হয়েছে। তবু সেই স্বরাজ আন্দোলনের দিনে আমিও ছিলাম গান্ধীজীর অনুরক্ত। কার্যতঃ তাঁর অনুগামী নই, কিন্তু তর্কে আলোচনায় তাঁর আন্দোলনের অনুরাগী। কারণ নিরস্ত্র দেশের পক্ষে নিরস্ত্র সংগ্রামই সম্ভব। সংখ্যার আধিক্য ও নিরুপদ্রব দৃঢ় সঙ্কল্প, এ দুই একত্র হলে শক্তি কম হয় না। আসল কথাটা স্থিরতা ও চিত্তশুদ্ধি নয়। আসল কথাটা জনশক্তি, কতটা তার অস্ত্র চাই, কতটা অস্ত্র ছাড়াও কাজ চলে —তা নির্ভর করে বিশেষ পরিস্থিতির ওপরে। এই জনশক্তিতে গান্ধীজীর ছিল ভয়

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সবুজের অভিযান

ছাড়পত্র

'ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা
ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ,
আধমরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা।'

এ একটা আশ্চর্য ঘটনা—প্রমথ চৌধুরীর 'সবুজপত্রে'র এই ডাক একদিকে উড়িষ্যার কটক, অন্যদিকে পূর্ব প্রান্তের নোয়াখালিতে। গিয়ে পৌঁছেছিল—আর কোনো বাঙলা পত্রের কি এরূপ কিছু সাধ্য হয়েছে ? সে নোয়াখালি নেই, কিন্তু ওই ব্যাপারটা বাঙালি-জীবনে স্মরণীয়।

সবুজ মলাটে কালো রঙের তালপাতার ছাপ নিয়ে 'সবুজপত্র' বাঙালিকে এই ডাক দিয়েছিল ১৩২১-এর বৈশাখে (এপ্রিল, ১৯১৪)। আমার বয়স তখন বারোও নয়। কিশোর, তরুণও নই। অবশ্য, ১৩২১ সালেও 'সবুজপত্র' ছিল নোয়াখালি শহরে দুর্নিরীক্ষ্য। তার প্রকাশ অনিয়মিত, ততোধিক দুর্লভ তার দর্শন। তথাপি সেই প্রথম আবির্ভাবও আমার কাছে গোপন ছিল না, তার পাতায় যৌবনের এই আমন্ত্রণও অলক্ষিত থাকে নি। 'প্রবাসী'র 'কষ্টিপাথরে' প্রথম থেকেই তার উজ্জ্বল দাগ পড়েছিল। মাসে মাসে ঝলকে উঠ্‌ত স্থির বিদ্যুল্লেখা। আর 'প্রবাসী' শুধু আমাদের বাড়িতে গৃহদীপ নয়, আমার কৈশোরের প্রজ্ঞাপারমিতা। তবে সবুজের অভিযান প্রথমটা ওরূপ নেপথ্য দৃষ্টিতেই তখন দেখা। পরে অবশ্য প্রথম দিককার 'সবুজপত্র'ও কিনে নিয়েছিলাম—বয়সটা তখন সতের-আঠার। তখনকার তিন নম্বর হেস্টিংস স্ট্রীটের ক্যালকাটা উইক্লি নোট্‌স-এর ছাপাখানা ছিল তার ছাপাখানা—অবিক্রীত পত্র সেখানে গুদামে অপেক্ষা করছিল পুরনো কাগজের দরে বিদায় নেবার জন্য। অন্ততঃ এক বৎসরের 'সবুজপত্র' আত্মসাৎ করি কলকাতার একটি পুরনো বই-এর দোকানের অবজ্ঞাত ভাণ্ডার থেকে। দু'খণ্ড—ছ'মাস-ছ'মাস করে বাঁধান। আমার প্রয়োজনে সংগ্রহ করে দেয় আমার এক অনুজ বন্ধু। কিন্তু নিজের লাইব্রেরি গড়া আমার সাধও ছিল না, সাধ্যও না। কালের ও মানুষের হাত এড়িয়ে আমার সংগ্রহের 'সবুজপত্রে'র যা বেঁচে ছিল, তা শেষ অবধি আমার চেষ্টায় কয়েক বছর আগে এশিয়াটিক সোসাইটির ভাণ্ডারভুক্ত হয়ে আমাকে নিষ্কৃতি দিয়েছে। কিন্তু ভাবিকালের পরিহাস—

প্রবীণ ও পাকাদের বিরুদ্ধে সবুজের ঝাণ্ডা তুলে নবীন কাঁচাদের যুদ্ধে নামতে ডাক যা দিয়েছিল, আজ তা প্রবীণ ও পাকাদের পোকায় কাটা জীর্ণপত্রের সঙ্গে তালিকাভুক্ত, পণ্ডিত-পাড়ার বিশিষ্ট লাইব্রেরিতে ঝিমুচ্ছে।

সবুজপত্রের পত্রপুট

'সবুজপত্রে'র পাঠক ছিল অল্প, গ্রাহক, ক্রেতা আরও কম। অথচ তার সম্পাদক প্রমথ চৌধুরীর লেখার পাঠক ক্রমেই বৃদ্ধি পায়। তখন 'সবুজপত্র' অবশ্য অদৃশ্য হতে চলেছে। প্রমথ চৌধুরী মশায়ও আপনার গৃহের বিদগ্ধ সাহিত্যগোষ্ঠীর সীমা ছেড়ে 'বিজলী' 'আত্মশক্তি'র পাতায় সাংবাদিকতার পাড়ায় পদার্পণ করেছেন। পরে দৈনিকের পাতায়ও তাঁর পদচারণা হ'ল নিরন্তর। তা কি আজ কেউ খুঁজে দেখে? তবে বরাবর আসর জমানো ছোটগল্পের তিনি প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যশিল্পী। 'সবুজপত্রে'র প্রবন্ধের বিষয়-কৌলিন্য ও বাগ্‌বৈদগ্ধ কমিয়ে, তাঁর পাকা কলম দেখতাম বুদ্ধির সাদা রঙ ও কথায় বাঁকা ঢং-এ, সাময়িক সংবাদ ব্যাখ্যায় চমক লাগাতে চতুর। পাঠকসাধারণের তাতে পরম মজা। কিন্তু 'সবুজপত্রে'র প্রমথ চৌধুরী শুধু সাংবাদিক ছিলেন না—অর্থাৎ দ্বিতীয় শ্রেণীর সাহিত্যিক নন। কথায় বলে বটে A second class literary man is a first class journalist. কিন্তু কথা আরও আছে। পয়লা নম্বরের সাংবাদিকদের কাছে পত্র-পত্রিকা ব্যবসা নয়, দশজনের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার আসর। 'সবুজপত্রে'র আসরও আসর, তবে বাছাই করা দু-চার জনের। বাছাই হ'ত বুদ্ধির ও রসিকতার নিরিখে। পয়লা নম্বরের সাংবাদিক হলেও প্রমথ চৌধুরী 'সবুজপত্রে' ছিলেন সাহিত্যের বিদগ্ধ সারথি—যেমন নিজের গৃহে অকুণ্ঠ আলাপী। আপনা থেকেই সবুজপত্রের জুটত fit audiance though few. আপনা থেকেই বাছাই হয়ে পড়তেন তাঁর অতিথিরাও। উপস্থিতি অবাধ, আলাপ স্বচ্ছ ও স্বচ্ছন্দ। কথার ছটায় নয়, বুদ্ধির অনুগ্র আলোয় তা প্রীতি-সরস। 'সবুজপত্রে' সে আলোকই খেলত বাক্যের বিদ্যুতে এবং wit-এর তির্যক দীপ্তিতে। 'সবুজপত্রে' প্রমথ চৌধুরী 'বীরবলী ঢঙ'-এ ব্যঙ্গ বিদ্রূপে অপরাজেয়। কিন্তু প্রমথ চৌধুরী শুধু বীরবল নন—তিনি সম্পাদক; বুদ্ধিশাণিত আলোচনার বিদ্যাবিদগ্ধ গর্বিত সারথি। তা ছাড়া, সুমার্জিত সাহিত্যকার; সাজানো কথা আর বানানো গল্পের নিখুঁত রূপকার।

'সবুজপত্র' বাজারে চলবে না, তা জানা কথা। তিনিও জানতেন 'সবুজ পত্র' হবে চলার পত্র, বাঙালি জীবনে যৌবনের ছাড়পত্র। সবুজের অভিযান জীবনের জয়গান; বীজমন্ত্র ঃ ওঁ প্রাণায় স্বাহা।

'ওঁ প্রাণায় স্বাহা'—'সবুজপত্রে'র মতো বা বীজমন্ত্র। বাঙলায় এ মন্ত্রের স্রষ্টা অবশ্য রবীন্দ্রনাথ,—তাঁর মুখেও যে এই মন্ত্র 'সবুজপত্রে'ই প্রথম উচ্চারিত হ'ল তা নয়। প্রমথ চৌধুরীও তা আগেই গ্রহণ করে থাকবেন। চৌধুরী মশায় আবার আঁরি বের্গসঁ'র অনুরাগী—বের্গসঁর লেখার গুণে, ও 'এল'। ভিতেল'-এর মর্মজ্ঞ। তবে তিনি বোধ হয় রবীন্দ্র-প্রতিভার ঠিক সগোত্র নন; সমজদার সহকারী হলেও অনুকারী হন নি। মেজাজে স্বতন্ত্র। রোমাণ্টিক দুঃসাহসে ও আবেগ-উচ্ছ্বাসে যে-প্রাণের প্রধান পরিচয়, প্রমথ চৌধুরী মনে হয়, তা মানতেন না। তাঁর বিচারে, প্রাণের পরিচয় মনে;—বিশেষ করে বুদ্ধির মুক্তিতে, মনের স্বচ্ছতায়, সত্তার সচেতনতায়। রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি-সমারোহের পার্শ্বেই 'সবুজপত্র' এই সব্যঙ্গ বুদ্ধির উজ্জ্বল ও তির্যক চর্চাকে শিল্পরূপের সরসতা দিতে পেরেছিল। সে আসর যাঁরা আলো করতেন তাঁরা রবীন্দ্রনাথের শিষ্য, কিন্তু প্রমথ চৌধুরীরও সহকারী। অতুলচন্দ্র গুপ্ত, ধূর্জটীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, হারীত কৃষ্ণদেব, ওয়াজেদ আলী,—এঁরা স্বকীয়তায় প্রত্যেকেই বিশিষ্ট। আর সে বিশিষ্টতার জন্যই 'সবুজপত্রে'র নিজস্ব লেখক। ব্যক্তির বিশিষ্টতা 'সবুজপত্রে'র প্রধান ঘোষণা—আবির্ভাবের প্রথম থেকেই রবীন্দ্রনাথ সে বিষয়ে সন্দেহ রাখেন নি। প্রত্যেকের অকুণ্ঠিত আত্মপ্রকাশ প্রমথ চৌধুরীরও অভিপ্রেত। না হলে পণ্ডিচেরীর সুরেশ চক্রবর্তীর রোমাণ্টিক বর্ণ-বিমুগ্ধতা সবুজপত্রে সমাদৃত হ'ত না। সবুজপত্রের সঙ্গে তাঁর মেজাজেরও মিল ছিল না। আসলে, সব মিশিয়ে 'সবুজপত্রে'র প্রধান কাজটা হয়েছিল বুদ্ধির চাষ র‍্যাশানালিজম্ না হোক্, রিজিন্-এর অনুশীলন। জাতীয় জড়তা থেকে চিরন্তন জাতি-সত্তার উজ্জীবন (ন্যাশনাল রিনাসেন্স), সমূহের শাসন ছাড়িয়ে ব্যক্তির আত্ম-স্বাতন্ত্র্যলাভ (ইন্‌ডিভিজুয়ে-লিজম্), 'মানুষের অধিকারে' ('রাইটস্ অব ম্যান্') সকল মানুষের প্রতিষ্ঠা; এবং সর্বব্যাপী জীবনাগ্রহ (লাইফ-এফার্মেশন, Life Affirmation)। এ কি তা হলে ১৭৮৯-এর ফরাসী বিপ্লবের পুরনো বাণী? পুরনো কে বলে, অন্ততঃ এই সনাতন অচলায়তনের দেশে? এই সত্যের মূল কথা রূপে, রসে, সঙ্কল্পে, সাধনায় আমাদের দেশের মন্ত্রের স্বীকার—'ওঁ প্রাণায় স্বাহা।' 'গীতাঞ্জলি', 'গীতিমাল্য' ও রূপক নাটকের পর্ব পেরিয়ে রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা'র পর্বে প্রবেশ 'সবুজপত্রে'ই আরম্ভ হ'ল। 'বঙ্গদর্শনে'র পরে 'সবুজপত্র' বাঙালি সাহিত্য-ইতিহাসে একটা নতুন পথের চিহ্ন। 'হালদারগোষ্ঠী' থেকে 'গৃহপ্রবেশ' পর্যন্ত তখনকার ('গল্প সপ্তকে'র অন্তর্ভুক্ত) গল্প, 'ফাল্গুনী', 'ঘরে বাইরে', আর 'চতুরঙ্গ'!—একা রবীন্দ্রনাথ 'সবুজপত্র'কে প্রথম দু' বছরেই যে মহিমা দান করেন

তার আগে অন্য কোনো মাসিক পত্র তা পায় নি। অন্য কোনো সাময়িক পত্র এরূপ জীবনাগ্রহের ও জীবন-জিজ্ঞাসার মুখপাত্র হতে পারে নি। এ গণনায় 'বঙ্গদর্শন'কে ধরি নি, 'প্রবাসী'কেও ভুলি নি।

১৯১৪ থেকে ১৯২৬-'২৭ পর্যন্ত বাঙালি সাংস্কৃতিক জীবনের এই প্রেক্ষাপট পূর্ববঙ্গবাসীর এক সুদূর শহরের যুবকদের জীবনে তবু অজ্ঞাত প্রেক্ষাপটই থেকে যেতে পারত। কারণ—আমরা 'সবুজপত্রে'র সঙ্গে প্রথম দিকে সাক্ষাৎ সূত্রে পরিচিত হই নি, সচেতন হয়েছিলাম 'প্রবাসী'র দৌত্যে। কিন্তু সেই চেতনাকে সংগঠিত করে বৎসর দুই-এর মধ্যেই (১৯১৮-১৯) এসে গেল এমন একটা সময় যখন আমরা সকলে ও শহরে ঘোষণা করলাম—

'ওঁ প্রাণায় স্বাহা'

আর আমাদের বেপরোয়া কোলাহলে কলরবে, অকারণ উচ্চহাসি ও উল্লাসে ছোট নোয়াখালি শহরের নিরীহ গৃহপালিত মানুষ উচ্চকিত হয়ে শুনল আমাদের পরিচয় 'সবুজ সঙ্ঘ'।

"যৌবনের জয়গান"

অবশ্য একটা প্রস্তুতি আগেই আমাদের মধ্যে ছিল, শুধু আমাদের নয়, বাঙালি জীবনের মধ্যে। 'ওঁ প্রাণায় স্বাহা', এ মন্ত্রটা একেবারে সৃষ্টিছাড়া শোনাবার মত কথা নয়। জীবনের যৌবরাজ্যে অভিষেকের আয়োজনটা স্বদেশীর দিন থেকেই এক অর্থে এ দেশে সুস্পষ্ট। উদ্বোধন হয়ে থাকবে আরও আগে। 'ইয়ং বেঙ্গলে'র তো স্পর্ধার শেষ ছিল না। ১৮৩০-এ অক্টারলনি মনুমেন্টের মাথায় ফরাসী বিপ্লবের ত্রিবর্ণ পতাকা তুলে যারা বিপ্লবকে অভিনন্দন জানায়—তারা নিশ্চয়ই বেহিসাবী ও বেপরোয়া,—রাইটস্ অব্ ম্যান-এর নামে পাগল, আধুনিক যুগের প্রথম বাঙালি বিদ্রোহী। বুঝে না-বুঝে বঙ্কিমচন্দ্রের সন্তানেরা গাইছিলেন "এ যৌবন-জলতরঙ্গ রোধিবে কে?" নিশ্চয়ই বঙ্কিমের 'মহাপুরুষ'ও না, ইংরেজরাজও না। আমরা '১৯০৫-এর পরেকার' বাঙলাদেশে বেড়ে উঠেছি, বাঙালির বাচ্চা, বিনয় সরকারের কথাটা সাচ্চা কথা। নিজের গুণে না হোক, সেই সময়ের সূত্রে তের-চৌদ্দ বছরের কিশোরের মাথায়ও যোগাত রাজনৈতিক মুক্তির দুঃসাহসিক স্বপ্ন। চৌদ্দ বছরে পা না দিতেই পা দিয়েছি বিপ্লবীদলের পথে। মর্মে 'দুরন্ত আশা'—'ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুইন।' আমাদের কান তো ভুল শোনে নি, ভুল বোঝেও নি মন— "ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা, ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ, আধমরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা।' এ শুধু বুদ্ধির মুক্তির ডাক কেন হবে?—মুক্তির বুদ্ধিরও ডাক।

কিন্তু এ প্রস্তুতি কি উড়িষ্যায় কটকেরও ছিল? জানি না। তাঁদের 'সবুজ

সমিতি' থেকে ওড়িয়া সাহিত্যের এযুগের নতুন সূচনা। আরেকটা প্রশ্ন—যে প্রস্তুতি বাঙালির সকলের—তা পূর্ববাংলার অনাদৃত সেই নোয়াখালি শহরেই শুধু কেন জাগাল এই সবুজের স্বপ্ন ? কারণ, সম্ভবতঃ নোয়াখালিতে দু'জন বিশেষ মানুষের ব্যক্তিত্বের স্পর্শ। তাঁরা রঙ্গীন হালদার ও সুরেশ চক্রবর্তী।

ছোট শহর নোয়াখালি—সেখানে অঘটন কিছুই ঘটে না—আধঘুমের দেশ। তার আকাশের রঙ, মাঠের বিস্তার, বন-জঙ্গলের রহস্য, বান-ডাকা নদীর প্রবল উচ্ছ্বাস, কালবৈশাখীর উদ্দামতা,—এ সবের মধ্যে বুঝে না-বুঝেই তবু জেগে ওঠে বৃষ্টি-ভেজার অকারণ উল্লাস, ঝড়ের মাতনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মনের মাতন, —আর মাটি ও আকাশের সঙ্গে মিলেমিশে, কিশোর প্রাণের দুরন্ত তাড়নায়, যৌবনে উদ্ভিন্ন আমরাও তাই—

পাগল হইয়া বনে বনে ফিরি
কস্তুরী মৃগসম
আপন গন্ধে মম।

চেনা মুখের রাজ্য নোয়াখালি। নিম্নমধ্যবিত্ত শহর—পুরুষেরা আপিসে-আদালতে জীবিকার ফ্রেমে আঁটা। মেয়েরা রন্ধনশালায় অন্তরায়িতা। বেশি সচ্ছল না হোক, বেশ সহজ জীবনযাত্রা। স্বদেশীর যুগে তার এ জীবন একটু নাড়া খেল—সাড়া দিতে গিয়েও দিল নিম্নকণ্ঠে। তারপর চাপা গলায়—আড়ালে আড়ালে—সেই প্রবীণদের চোখের সামনেই। আমাদের যৌবন আমাদের পৌঁছে দিয়ে গিয়েছিল স্বদেশীর সাহসের ও সঙ্কল্পের মুখে। বঙ্কিমের রাজ্য পেরিয়ে বিবেকানন্দের রাজ্যসীমানায়ও সে পথ থামতে চায় নি। বুঝেছিল—দেশটা যাদের নিয়ে তারাই পড়ে থাকছে স্বদেশীর বাইরে —বিবেকানন্দের 'শূদ্র ভারতবর্ষ'ও অস্পৃশ্য। রবীন্দ্রনাথের 'স্বদেশী' সমাজ'ও অবজ্ঞাত।—ভদ্রলোকের গণ্ডীর মধ্যেই প্রাণ এখনো আবদ্ধ।—সেখানে তাই ওই আধমরাদের আত্মছলনা অনিবার্য। এ দুশ' বছরেও 'ইয়ং বেঙ্গলে'র বিদ্রোহ তাই রয়েছে নিষ্ফল।—মানুষকে আমরা মানুষের অধিকার দিই না, পৃথিবীই বা আমাদের দেবে কেন মানুষের অধিকার ? রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে আমরা শুনলাম এই 'সর্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্বে'র আহ্বান। তার থেকে যৌবন পেল ছাড়পত্র —বুদ্ধির রাজ্যে, মনের রাজ্যে, রূপের রাজ্যে, রসের রাজ্যে—ইংরেজের রাজ্য ছাড়া জীবনের সকল রাজ্যে। যৌবনের অভিযান 'সর্বাঙ্গীণ অভিযান'। চাই শুধু 'ভিসা', অভিজ্ঞান। 'সবুজপত্র' নিয়ে এল সেই 'ভিসা', দিল এই মোহরাঙ্ক 'যৌবনে দাও রাজটীকা'।—

১৩২১ বা ১৯১৪ইং-এ 'ইয়ুথ ম্যুভমেণ্ট' জন্মে নি, 'স্টুডেণ্ট পাওয়ার' স্বপ্নের অগোচর,—তবু 'যৌবনের জয়গান' গাইল সবুজপত্র।

এদিকে আমাদের প্রবীণদের পাড়ায়ও আরেকটা দুর্ঘটনা ঘটেছিল। অঘটন নয়, দুর্ঘটনা। শরৎচন্দ্র নামক একজন হঠাৎ-উদ্ভূত লোক দৌরাত্ম্য বাঁধাল মধ্যবিত্ত কেরানি জীবনের বাইরের আড্ডায় ও বাড়ির অন্দরে, ঘরে-বাইরে। রবীন্দ্রনাথকে ঠেকানো যায়—'গোরা', 'অচলয়াতন', কয়জনা বোঝে যে পড়বে? কিন্তু চরিত্রহীন, গৃহদাহ, শ্রীকান্ত দেবদাস, অভাগীর স্বর্গ, এসে বৈঠকখানা ছাড়িয়ে অনিবার্য গতিতে অন্তঃপুরে চলে গেল—সকলকেই ভাবনায় ফেলে দিলে। বাঙালি সাধারণ মধ্যবিত্ত নিজের মুখচ্ছবি দেখতে পেল। বাইরে সকলের তাতে সরব আপত্তি। মনে নীরব স্বীকৃতি তবু.—'এ যে আমাদের মুখচ্ছবি।' বাঙালি ভদ্রলোকের মনকে বছর বিশেকে শরৎবাবু যে ভাঙা-চোরা করেন—তাতে সন্দেহ মাত্র নেই। কারণ, মুখে যতই তাকে অচল বলুক না, মনে ততই তাকে মেনেছে—হাঁ,—না মানেই হাঁ, অজ্ঞাত মনের চক্রান্তে। সেই ক'া জানত না তার গভীরে মানুষের মূল্যের সঙ্গে বাঙালি মধ্যবিত্তের চেতনায় নীরব মূল্যও এক হয়ে যাচ্ছে। Man's man for a that—কী-ই বা মেয়ে, কী-ই বা পুরুষ। মানুষ তো মানুষ।

যৌবনের ছাড়পত্র

নির্দ্বন্দ্বে এ চেতনা উদ্ভূত হবার কথা নয়। এ দেশের জীবনে যৌবন সেই মূল্য পায় নি কোনো কালে, পুরুষ না, নারীও না। যুবশক্তি, সতীশক্তি বলে কোনো শব্দ তখনো জন্মায় নি। ইংরেজি শেখায় দেখা দিয়েছিল—ইয়ংম্যান, কিন্তু ইয়ং উমন নয়, 'যুবক'। যৌবন বস্তুটাই ছিল এ ভাষায় অজ্ঞাত। স্টুডেণ্ট ছিল, ছাত্র ছিল। বোধহয় জাতীয় জীবনে যুবকদের দামটা জ্ঞাত হ'ল স্বদেশী যুগ থেকে। ভলাণ্টিয়ার চাই। দেশের কাজে ছেলেরা ছাড়া খাটবে কে? মেয়েরা নিশ্চয়ই অন্দরে রইল, তবে নতুন নামের সঙ্গে যুবকরা গ্রাহ্য হ'ল। ছেলেরাও জেনেছিল দেশের দাবী বড় দাবী। কিন্তু তারা ছেলে, মিত্র বদাচরণীয় নয়। বিশিষ্ট শক্তিরূপে যুবকদের সচেতন হতে আরও বছর বিশেক দেরী ছিল। নিজেদের ওপর বিশ্বাস তাদের জন্মাতে দেরী হবারই কথা। কারণ যৌবনকে বিশ্বাস করা তো এদেশের শিক্ষা নয়, যৌবন এদেশে আসে—আপদ।

যখন নয় দশ বৎসর বয়স তখন আমাদের বাঙলা পাঠ্য পুস্তকে পড়েছিলাম 'যৌবন' অতি বিষম কাল। এই সময়ে ইন্দ্রিয়সমূহ প্রবল হয়, ইত্যাদি,

ইত্যাদি। 'যৌবন' শব্দটার অর্থ পেলাম—যৌবন বস্তুটার নয়। বয়স তখন নয়-দশ বৎসর, বারোও নয় নিশ্চয়। শব্দার্থ মুখস্থ করেছি, ক্লাশে পড়া দিয়েছি, 'যৌবন' শব্দটার বাচ্যার্থ বোঝার দরকার হয় নি, ব্যঙ্গার্থ থাকলে তা-ও নিরর্থক। জেনেছিলাম ষোল থেকে বত্রিশ পর্যন্ত বয়স যৌবনকাল। আজ তো বত্রিশ ছেড়ে কবে ডবল বত্রিশ পেরিয়েছি (এখন ১৯৬৮ ইং), জিজ্ঞাসা করতে পারি—ষোল থেকে বত্রিশ কালটার কী এত দোষ? চল্লিশ-পঞ্চাশোর্ধ্বদের হাতে পৃথিবী যত দুর্ভোগ ভুগেছে তার এক-শতাংশ কি সহ্য করেছে ওই ষোল থেকে বত্রিশের সন্তানদের থেকে? প্রত্যেক বয়সের একটা নিজ ধর্ম আছে। কৈশোরের, যৌবনের, প্রৌঢ়ত্বের, বার্ধক্যের—সেই সকল বয়সের সকল ধর্ম পেরিয়েও থাকে জীবন-ধর্ম। জীবন যেমন সকল বয়সের যোগফল মাত্র নয়,—হয়তো বা পূরণ ফল; কারণ জীবনেই বয়সের পূর্ণতা,—তেমনি সকল বয়সের সকল ধর্মের পূর্ণতা জীবন-ধর্মে। সবার উপরে জীবন সত্য, তাহার উপরে নাই। জন্ম, শৈশব, দেহপুষ্টি, পূর্ণতা, প্রজনন ও বংশবৃদ্ধি, প্রৌঢ়তা ও জরতা, এ রূপই জীবের স্বাভাবিক দেহযাত্রার ধারা। মানুষের বেলায়ও এই জৈব ধারাটা স্বাভাবিক।

কিন্তু ওই মন নামক বিচিত্র জিনিস এসে জুটে মানুষ নামক জীবটার জীবনে গুণগত পরিবর্তন ঘটিয়ে দিয়েছে। সেই মনও জন্মে। সদ্যোজাত শিশুর চেতনা আছে, মন আছে কিনা কে জানে? পাঁচ-সাত বৎসরে নিশ্চয় মন থাকে, তারপর বাড়ে; আবার এক সময় ক্ষয়ও হয়। কিন্তু মানুষের দেহযাত্রার সঙ্গে তাল রেখেও তাল রাখে না মানুষের মন-বুদ্ধি-চেতনা। জীবনটা তাই মানুষের বেলায় না হয় যোগফল, না, বিয়োগফল। একটা মিশ্র পূরণ-ভাগের এমন অঙ্ক যা প্রত্যেকের বেলায়ই বিচিত্র; এবং যার পরিণাম ফলও প্রত্যেকের বেলাই শেষ অবধি বিশিষ্ট। ইউক্লিদ ও আইনস্টাইন সকলেই ফেল, তাঁদেরও অসাধ্য জীবন-জ্যামিতি রচনা। তাই সমাজের গণিতকারও জ্যামিতিকারদের চিরদিন বিপদ। ইন্দ্রিয়সমূহ যদি প্রবল না হ'ত, অথবা তার প্রাবল্যের যদি একটা পাকা 'গ্রাফ' থাকত, তা হলে বোধহয় এই অনিশ্চয়তার মধ্যে তাদের সমাজকে বরাবর বেসামাল হতে হ'ত না। সমাজ চায় আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুনের একটা সাম্যাবস্থা, সমাজধর্মে বাঁধাই করে মানুষের জীবনের একটা 'ভদ্র' সংস্করণ তৈরী করা। প্রথমই তাতে গোল বাধায় যৌবন,—'এই সময়ে ইন্দ্রিয়সমূহ প্রবল হয়'। আর তার পরে অন্য সময়েও তা দুর্বল হতে চায় না—যতক্ষণ দেহ-মনে মানুষ থাকে জীবন্ত ঃ সে জন্যই 'যৌবন অতি বিষম কাল।' ওকে ছাঁটাই করে নিতে পারলে

জীবনটা সমাজের ভারবাহী বলদের কাজ ভালোভাবে দিতে পারে। অতএব বাল্যপাঠ বইতেই শেখাও, যৌবন অতি বিষম কাল। সনাতন 'তোতা কাহিনীর' এটা প্রথম পাঠ। খাঁচার পাখির চোখে বনের ছায়াও যেন না ফোটে।

একটা প্রশ্ন জাগে—আমাদের শিক্ষা-গবেষকরা কেউ কি আমাদের পাঠ্য-পুস্তকের এসব পাঠমালার একটা অনুসন্ধানমূলক ঐতিহাসিক গবেষণা চালিয়ে দেখবেন—কবে থেকে কী ভাবে, কী-কী পাঠ ছাত্রদের বইতে বাছাই ও ঝাড়াই হয়ে চলেছে? বাঙালি, ভারতীয় সমাজনীতির গবেষণার তাও একটা উপাদান হতে পারে। আর্য পিতামহদের কথা না তোলাই ভালো—তারা মদ, মাংস, জুয়া আর সম্ভোগ বিষয়ে নিরঙ্কুশ। সাদা চোখে দেখেছি—পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশে প্রাকটিক্যাল বুদ্ধিরই উপদেশ। রামায়ণ-মহাভারতে নীতিকথা যত থাক দেবতা ও মুনিদের ইন্দ্রিয়-দমনের দৃষ্টান্ত সে তুলনায় বেশি নয়। তবে সে আর্যতেজ ক্রমেই দেখি কম। গৌতম বুদ্ধ অনেক ঘাটের জল খেয়ে শেষটা সিদ্ধান্তে পৌঁছেন—মধ্যপথটাই প্রশস্ত। কিন্তু কে শোনে সে কথা? ভারতবর্ষের জলবায়ুতে বোধহয় মাত্রাবোধ অস্বাভাবিক। গ্রীক সভ্যতা পরিমিতিবোধকে মূল্য দিয়েছে—চরমে না ওঠাই তাদের পরম নীতি। সর্বমত্যন্তং গর্হিতং ওটা গ্রীক-আর্য অভীষ্ট। আমাদের উদ্দীষ্ট তেনাহং কিং কুর্যাম্ যেনাহং নামৃতা স্যাম্? চরম বস্তু না হলে নয়। চরম করাই আমাদের পরমতত্ত্ব। তাই একদিকে আমাদের অন্বিষ্ট 'সর্ববৃত্তি নিরোধ'। অন্যদিকে যযাতি যৌবন। ভর্তৃহরি আমাদের 'রিপ্রেজেন্টেটিভ পোয়েট'—প্রথম 'শৃঙ্গার শতক', আর তার পরেই 'বৈরাগ্য শতক'—জীবন শতক কোথাও নেই। কে একজন সুরসিক মানুষ মন্তব্য করেছেন—'সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যে নাও—যেখানেই হাত দেবে—হয় পয়োধর নয় নিতম্ব।' এ পাণ্ডি নেই। কিন্তু মানবীর আরও পরিচয় আছে। একালে আমরা তাও জানি। অন্ততঃ ইংরেজি সাহিত্য যখন থেকে হাতে নিয়েছি। তাই আরও অবাক লাগে ভেবে কোথা থেকে ঊনবিংশ শতকের সঙ্গে দেখা দিয়েছিল পাঠ্য-পুস্তকে এই নতুন যৌবন-জুজুর কথা? বিদ্যাসাগরী পাঠক্রমে 'বোধোদয়' পেরিয়ে আমরা হাতে পেতাম 'শকুন্তলা', 'সীতার বনবাস'। কিন্তু সে ব্যবস্থা চুকে গিয়েছিল।

যখন ক্লাশে পড়ি তখন বুঝিই নি, 'যৌবন অতি বিষম কাল'। তারপরে যৌবনের দিকে এগুতে এগুতে গিয়ে পড়লাম বিবেকানন্দের রাজত্বকালে—জীবনকালে নয়। আমাদের বিবেকানন্দ 'কামিনী কাঞ্চন'-বিরোধী শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য হলেও জীবন-অভিযাত্রী বিবেকানন্দ। তিনি যৌবনের রাজা বিবেকানন্দ, অভয়মন্ত্রের সেনাপতি বিবেকানন্দ। 'অভীঃ' মন্ত্রটাই আমাদের স্বদেশী-দলের

কানে বাজত। শুনেছি স্বদেশীরাও কেউ কেউ নাকি তবু মনে করত—ইন্দ্রিয় দমন যতই বাড়ানো যাবে, ইংরেজ-দমন ততই অগ্রসর হবে। কিন্তু আমি তা হলে দলছুট।

আমাদের যৌবন শুনছিল জীবনের ডাক। বয়োধর্মের উত্তেজনার মতোই জীবনধর্মের সংযমও ছিল স্বাভাবিক—প্রায় আনায়স, দেশ-কালের প্রেরণায় দুঃসাহসিক। ইন্দ্রিয়সমূহ প্রবল হ'ল, না সবল, হ'ল, তা নিয়ে কোনো দুর্ভাবনা ছিল না।

এল মহাযুদ্ধের সমুদ্র-মন্থন। অনুভব করছিলাম কালের মন্দিরা বাজে ডাইনে বামে। ডাইনে সর্বাঙ্গীণ মুক্তি, বামে সর্বজনীন মুক্তি। আমাদের কালের যৌবনের ছিল এই স্বপ্ন—এই মুক্তি।

গান্ধীজী আত্মশক্তির মন্ত্র নিয়ে এলেন। আমাদের যৌবন চমৎকৃত হয়। নিচের থেকে নির্মাণ শুরু করতে হবে, এবং সামনে অভিযান। এটা যৌবনের নতুন যাত্রা। কিন্তু বুদ্ধির মুক্তি গান্ধীজীর সাধনা নয়, মুক্তির বুদ্ধিও না, —হাজার বছরের হাজার নিয়মের বাঁধনেই বাঁধা তাঁর কর্মকাণ্ড। গান্ধীজীর 'সত্য' স্বাদ-গন্ধহীন নিষ্প্রাণ বিশুদ্ধিতা। রূপে-রসে-গন্ধে তাঁর অবিশ্বাস। 'সত্যাগ্রহ' কিছুতেই জীবনগ্রহের সঙ্গে এক হয়ে উঠতে পারে না। জীবনগ্রহও কি পারে? নিজেদের বোঝাতে চেয়েছি—পারতে হবে। নিজেকে বোঝাতে চেয়েছি আমাদের কালে 'যৌবন জলতরঙ্গ' গান্ধীজীই উদ্বুদ্ধ করেছেন। অথচ ক্রমেই বুঝি হিন্দ্‌ স্বরাজের সঙ্গে 'শিক্ষার মিলন'; ও 'সত্যের আহ্বানে'র বিরোধ মৌলিক। কৌপীন আর কামানো মাথার সঙ্গে অভিজাত জীবন-যাত্রার ও সুস্থ স্বাচ্ছন্দ্যের তফাৎ বাইরের তফাৎ নয়। 'আদ্দি'তে আকর্ষণ নেই, খাদিতেই রুচি গড়ে নিতে পেরেছি। কিন্তু সি. এফ. এ্যাণ্ড্রুজও এই দুই দৃষ্টি-ভঙ্গীতে মিল বের করতে পারেন না—শিক্ষার মিলনে আর শিক্ষা বয়কটে।

ছোট নোয়াখালি শহরে সেদিনের ভারতীয় যৌবনের আভ্যন্তরীণ মিলন-দ্বন্দ্বের পালাটার অভিনয় হচ্ছিল আমাদের আশ্রয় করে। আমরাই কি তা জানতাম, না, সব বুঝতাম? স্বরাজের নামে আমরা কেউ কেউ মেতে উঠি, আবার চরকা ও চিত্তশুদ্ধির তত্ত্বে বেঁকে বসি। সব নিয়মকে আমরা হেসে উড়িয়ে দিই। বাইরে থেকে কেউ সকৌতুকে বলে 'সবুজ সঙ্ঘ' দমকা হাওয়া। আমরা স্পর্ধাভরে বলি, 'আমরা চলি সমুখ পানে কে আমাদের বাঁধবে'? ভেতর ভেতরে তখনি কেউ কি ভাবতাম না 'এ দুয়ের মাঝে তবু কোনোখানে আছে কোনো মিল' 'সত্যাগ্রহে' আর 'সত্যের আহ্বানে'?

নীহারিকা ও নিউক্লাস

সেবার ম্যাট্রিকুলেশান পরীক্ষা তিনবার হয়েছিল। 'সেবার' মানে ১৯১৭ সালে, তখনো ইউনিভার্সিটি সে পরীক্ষার কর্তা; আর ইউনিভার্সিটির প্রত্যেকটি পরীক্ষা বৎসরে মাত্র একবারই হ'ত,—আই. এ., বি. এ. প্রভৃতি পরীক্ষাও। তাই 'সাপ্লিমেণ্টারি' বলে কিছু ছিল না। তখনকার পূর্ববাঙলার অনেক জিলার সদরেও পরীক্ষাকেন্দ্র ছিল না। গ্রামের হাজার হাজার ছেলেদের তা হলে কী দুর্ভোগ ভুগতে হয়েছে, বিশেষ করে ১৯১৭-তে। বার বার করে গ্রাম থেকে শহরে এসেছে, আবার বোকা বনে অর্থদণ্ড দিয়ে বাড়ি ফিরে গিয়েছে। ফৌজদারীর আসামী জামিনে আছে, মামলার তারিখে আসামীর খাঁচায় এসে দাঁড়াতেই হবে। তবে তৃতীয়বার পরীক্ষা যথারীতি সম্পূর্ণ হয়—প্রশ্ন চুরি হয় নি। নোয়াখালির সেই বিখ্যাত ছাত্ররা বুঝে উঠতে পারল না এখন কী করবে। তখনো যুদ্ধ চলছে, যুদ্ধান্তের রাজনৈতিক ঝড় ওঠে নি।

পরীক্ষার উত্তরকাণ্ড এ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে লঙ্কাকাণ্ডেরই পরিশিষ্ট। তখনো লেখাপড়ার পাতাল-প্রবেশ দূরে ছিল। হৈ-রৈ করে দিন কাটাতে কাটাতে সেবারের পরীক্ষার্থী ছাত্ররা শহরে লাগাল অন্যদের সঙ্গে ফুটবল খেলার প্রতিদ্বন্দ্বিতা, এবং একত্র হ'ল একটা নাটকের মহড়া অভিনয় করতে। প্রধান কারণ এসব উপলক্ষ করে গল্প জমল, আড্ডা জমল। হৈ-চৈ অব্যাহত রইল। সত্যই একটা নতুন কিছু তারা করল। পরের বছর আমাদের বছর। প্রশ্ন চুরি হ'ল না, পরীক্ষাও হয়ে গেল। নিতান্ত মামুলি ব্যাপার, আমরাও মামুলি ছাত্র। নতুনে-পুরাতনে মিলে আমাদেরও ওই পথে জোট পাকানো পছন্দ। সকলকার মধ্যে মিল শুধু কিছু না করার,—যার নাম নতুন কিছু করার উৎসাহ। আসলে মিলটা যৌবনের অস্পষ্ট ঔৎসুক্যের। সুখের খাঁচার অস্বস্তি। সবাই মিলে তবু একটা যৌবনের ঘূর্ণ্যমান নীহারিকাপুঞ্জ যার 'নিউক্লাস' না হলে নয়। নিউক্লাস তা পেল—রঙ্গীন হালদার। বয়সটা তেইশের দিকে—গ্রীষ্মাবকাশের শেষে তাঁর সে বৎসর এম. এ. পরীক্ষা। কিন্তু সে জন্য কিছু মাত্র ভাবনা-চিন্তা নেই। বাজে কাজে ও কথায় তার উৎসাহ। তাই তিনি যেখানে, সেখানে বরাবর তিনিই আকর্ষণীয়। কেন, তা বোধহয় তিনিও জানতেন না। বাইরের চালচলনে তিনি কিছুমাত্র উদ্যোগী, উৎসাহী, কর্মচঞ্চল নন। বরং আরাম-আয়াসেই ঝোঁক। পোশাক-পরিচ্ছদে ও আহারে বিলাসী কিন্তু রুচিবান। উৎসাহ ছিল তাঁর কথায়, আসলে মনে। স্কুল-কলেজের লেখাপড়া অপেক্ষা দেশ-বিদেশের নানা খবরে তাঁর উৎসাহ,

জীবনের ও জগতের নানা বিষয়ে তাঁর কৌতূহল। এই নিউক্লিউসের পাশে এসে জমে নীহারিকা রাশি। রঙ্গীন হালদার অকাজের অদ্বিতীয় কাণ্ডারী। বিশেষ করে তাঁর উৎসাহ দু'টি জিনিসে, রবীন্দ্র-চর্চায়, নাট্যাভিনয়ে; একটি প্রাচীন, অপশ্রুত ও অশ্রাব, শাস্ত্র যা আড্ডার অনিবার্য অঙ্গ। ছোট শহরে পুরনো দিনের 'চণ্ডীমণ্ডপের' ট্র্যাডিশন বহন করতেন কিন্তু অন্যেরা—উকিল, মোক্তার, ডাক্তার, কেরানি কেউ কেউ অর্থাৎ চিরদিনের সেই ভদ্রলোকরাই। স্মল টাউনের এই স্মল্ টক্ থেকে কিন্তু বাদামতলার বাবার বৈঠকখানা বরাবরই মুক্ত। পাড়ার বা মিউনিসিপ্যালিটির পলিটিক্সের ঘোঁট পাকানো ও জোটপাকানো, কোনোটারই সেখানে সন্ধান মিলত না। দেশের পলিটিক্স ও আন্দোলন ও বিদেশী রাজনীতি ও কূটনীতির সঙ্গে একালের ও সেকালের দেশী ও বিদেশী বইপত্র, লেখা-পড়া আর জিনিসের কর্মক্ষেত্রের ছোটোখাটো ঘটনার আলাপ-আলোচনায় বাদামতলার আড্ডা থাকত হাসি-গল্পে সর্বদা স্বচ্ছন্দ ও সরস। আমরা ছোটরা যখন নিজেদের মত করে আড্ডার আয়োজন করছিলাম তখন কি সেই বাদামতলার বৈঠকখানার স্বচ্ছন্দ উৎসুক আনন্দও কতকটা নিয়ে এসেছিলাম আমাদের সঙ্গে? কতকটা, সম্পূর্ণ নয়। রঙ্গীন হালদার তাতে যোগালেন আরও একটু সাময়িক কৌতূহল, নতুন আয়তন (dimension)। ছোট্ট শহরের পারস্পরিক 'পরনিন্দায়' বাদামতলার কর্তারা কানও দিতেন না। .কানে পৌঁছলে আমরা তা নিরাসক্ত হাসির উপকরণ করে নিতাম। মজার কথা হলেই হ'ল, তবে ঘোঁটগন্ধ নাহি তায়। বরং ঘোঁট করা 'চণ্ডীমণ্ডপী' মানসিকতার প্রতি আমাদের উপেক্ষা জন্মেছিল। তাদের কারো কারো কথা, গল্প নিজেদের আড্ডায় ব্যঙ্গভরে আবৃত্তি করতাম। ব্যঙ্গানুকরণের শোধ তুলতাম। বলা বাহুল্য, প্রাচীন পাকা ভদ্রলোকেরা আমাদের এই কাজটাতেই আপত্তি করেন, এ হচ্ছে 'পরনিন্দা'। প্রবীণ পাকাদের থেকে আমরা ব্যঙ্গের খোরাক ছাড়া বঙ্গীয় সমাজে কিছুই প্রত্যাশা করতাম না। ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপের দৃষ্টিই আমাদের বিশেষ যৌথ দৃষ্টি হয়ে ওঠে। শহরে তা দিয়েও ছিল আমাদের প্রধান পরিচয়। রঙ্গীনের রঙ্গদল ব্যঙ্গদল। মূলতঃ দৃষ্টিটা রঙ্গীন হালদারের স্বভাবগত সরসতার ও স্বচ্ছন্দ অবহেলার। অথচ সকলের আয়োজন-অনুষ্ঠানে তাঁর উৎসাহ। সহজেই তাই এক সময়ে সহজ পরিহাসে সৌহার্দ্যে তাঁর কৌতুকজনক নাম হয়ে গেল 'কর্তা'। সবুজ সঙ্ঘে এই নামটিই ছড়িয়ে যায়, ওনাম কিছুটা হাসির, বেশিটা প্রীতির। আমাদের সরসতায় বিশেষ করে রঙ্গ-ব্যঙ্গের ছোপ লাগিয়ে দিতেন যিনি তিনি অদ্ভুত কৌতুককুশল মানুষ, অনন্তোষ সেনগুপ্ত। আমাদের থেকে বছর কয়েকের বড়, দাদার বছর তিনেকের ছোট।

এদিকে এমন রঙ্গ-নিপুণ লোক দেখা যায় না। কিন্তু এ'রা দু'জন ব্যতীত দ্বিতীয় একজন লোক ছিলেন আমাদের সঙ্গী। কর্তার সহগামী আমাদের সকলের মধ্যে থেকেও তিনি স্বতন্ত্র, তিনি আসলে অদ্বিতীয়। আমাদের স্কুলের শেষ মেয়াদ যখন শেষ হচ্ছে তখন তিনি এ শহরে এসেছিলেন শিক্ষক রূপে। নতুন বি.এ. পাশ-করা মানুষ। চাঁদপুরের বহরিয়া গ্রামের সুরেশ চক্রবর্তী* এ শহরে তখন অপরিচিত, শহরের জীবনযাত্রা থেকেও প্রায় সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন—আপনার ভাবনা-লোকে একক। ভাবনা তাঁর স্বভাবধর্ম। আর সে স্বভাবের বশেই চারদিকের জীবনযাত্রার ছোট-বড় বাল্যতা কিছুই তাঁর চোখ এড়ায় না। সবেরই তিনি দর্শক। নীরব, তবে উদাসীন নয়, বরং মর্মাহত,—অবশ্য আপন অনন্যতায় আপনি সুরক্ষিত।

নীরব অবজ্ঞার বর্ম দুর্ভেদ্য। সে অবজ্ঞা এই তত্ত্বের উপলব্ধিতে নীরব—ভদ্রলোকের এই মানসিক স্থূলতা আসলে তাদের আধ্যাত্মিক শূন্যতারই বহিরাবরণ। ফাঁকি দিয়ে ফাঁক ভরানো, আত্মার শূন্যতা ঢাকা স্থূলতার জঞ্জালে। এই 'ভদ্র জীবন' আসলে এ'দো পুকুরের জল। দাদার স্বচ্ছন্দ উপেক্ষা, অনুতোষ বাবুর রঙ্গ-কুশলতায়, সুরেশবাবু-কথিত ওই আত্মার জড়তার তত্ত্ব—সব মিলে মিশে—চারদিকের জীবনযাত্রার স্থূলতা ও তুচ্ছতার বিরুদ্ধে আমাদের সকলকার মনে একটা বেপরোয়া ব্যঙ্গ-পরায়ণতা জাগিয়ে দেয়; আর আমরা ছিলাম যৌবনের ধর্মে দুর্দমনীয় মুখর। শহরের কেউ তাতে নিশ্চিন্ত বোধ করতে পারে নি, গোপনে গোপনে সবাই রুষ্ট। আজ হলে বলতাম শুধু তাদেরই আমরা উপেক্ষা করি নি, মাত্রাবোধও মনে করতাম উপেক্ষণীয়। স্থূলতা-তুচ্ছতা নিয়েও যে-জীবন—জীবন এবং অসঙ্গতির মধ্যেও যে চাপা পড়ে থাকতে পারে না সেই জীবনের গতিধর্ম, একথাটা আমাদের বিচার-বিবেচনায় তখন স্থান পেত না। কারণ, 'ভালো মানুষ নইরে মোরা ভালো মানুষ নই।' আমাদের আসল পুঁজি ছিল যৌবনের বেপরোয়া হাসি, রঙ্গ-ব্যঙ্গ। ভয়-ভাবনাহীন সহজ স্ফূর্তিতে ও খুশিতে ওই স্থূলতা ছাড়িয়ে আমরা ফুটে উঠছিলাম। ফুটে ওঠাটাই যৌবনের দাবী; আমাদের কাছে তা একটা মজা,—ওই ছোট শহরে তো একটা নতুন ব্যাপার,—সৃষ্টিছাড়া, ঘুমভাঙানিয়া একটা উপদ্রব। তা ঠেকাবার উপায় নেই। এমন কি,—মনে মনে চটলেও, দুষ্কর ছিল—প্রকাশ্যে না, মনে মনেও না। আমাদের নাটকের অভিনয়, খেলার আয়োজন, সাহিত্যের আলোচনা, গীতোৎসব,—একভাবে না একভাবে

*মুদ্রণের অনতিপূর্বে ১১।৩।৭৫ তারিখে আমরা তাঁকে হারিয়েছি। তখন তাঁর বয়স ৮২ পেরিয়েছিল।

এসবের আকর্ষণ প্রবল ; শহরের নাতি-প্রসন্ন ভদ্রলোকদেরও তা সব অপছন্দ করা অসম্ভব।

এ'দো পুকুরের জলেও এ কারণে নাড়াচাড়া পড়ে—স্রোতের জল ঢুকবার ফাঁক খুঁজে নিয়েছে।

নাম ও রূপ

পুকুরের এ-পার জিজ্ঞাসা করছেন ঃ ভবেশ চৌধুরীকে চেনেন, না ?

একটি মুহূর্ত শেষে ওপারের উত্তর, হাঁ। তারপর ওপারই জানায়, আমরা সহাধ্যায়ী সেণ্ট্ পল্স্ কলেজে। হোস্টেলে থাকতাম এক সঙ্গে।

এপার ঃ আমরা এক সঙ্গে ছিলাম পরে সুকিয়া স্ট্রীটের মেস্-এ।

পুকুরটা এ'দো নয় ছোটও নয়, মাঝারি। কিন্তু রঙ্গীন হালদারের কণ্ঠ মাঝারি নয়, ওপারে সে স্বর সহজেই পৌঁছায় ; 'ওপারের কণ্ঠ কিন্তু তত প্রবল নয়—সম্ভবতঃ শিষ্টাচারের রীতিতেও সে স্বর নিয়মিত। এপার উচ্চ কণ্ঠে আলাপ-পরিচয় তাই জমায় স্বকীয় স্বাচ্ছন্দ্যে। সে উচ্চকণ্ঠ জানালে, ভবেশ চৌধুরীর মুখে আপনার কথা শুনতাম। ...আপনি 'সবুজপত্রে' লেখেন—

'ওপার' যেন অপ্রত্যাশিত কথা শুনল। কুতূহলী দৃষ্টি চোখে—একি চ্যালেঞ্জ, না গুণগ্রাহিতা ? দু' মুহূর্ত পরে একটু সলজ্জ শিষ্টকণ্ঠে উত্তর ঃ ও-নামে আরেক জনও লেখেন।

এপারের সানন্দ সবল কণ্ঠে ঘোষণা ঃ সে লিখুক। কিন্তু জানি আপনি লেখেন। ওপার নীরবে স্মিতমুখে আর একবার জানায়—সে বিশেষ কিছু না।

অস্বীকার করা যায় না। দাঁত মেজে মুখ ধুয়ে ওপারের ভদ্রলোক ঘাট ছেড়ে পাড়ে উঠছিলেন। এপার থেকে দাদা তেমনি স্বচ্ছন্দ আগ্রহে জানালেন,—একবার আসবেন আমাদের বৈঠকখানায় আলাপ হবে। ওপার জানায়, আচ্ছা।

আমাদের বৈঠকখানার পাশ দিয়েই ওপারের বাসিন্দাদের যাতায়াতের পথ। এমন নয় যে, এই আমন্ত্রণ-রক্ষা আয়াস-সাধ্য। বরং তা না রাখাই আয়াস-সাধ্য। আমরা পাড়ে দাঁড়িয়ে এপার-ওপারের কথা শুনছিলাম। দাদা জানালেন, বুঝলি 'সবুজপত্রে'র লেখক সুরেশ চক্রবর্তী। দেখবি, কেমন কাল্‌চারড্ লোক। 'সবুজপত্রে'র লেখক এই পরিচয়-প্রাপ্তি যে একটা ছোট শহরের জীবনে কী পরিণতি দেবে বা দিয়েছে তা তখনো অজানা, এখন জানার প্রশ্নও নেই। সময়টা বোধ হয় তখন ১৯১৮ সালের মে-মাস।

তখনো পাণ্ডিচেরির (রঙ্গপুরের সর্বপূজ্য ঈশান চক্রবর্তী মহাশয়ের পুত্র) সুরেশ চক্রবর্তী 'সবুজপত্রে'র একমাত্র সুরেশ চক্রবর্তী হয়ে ওঠেন নি। পরবর্তী কালের 'বারাণসী'র ('উত্তরা'র) সুরেশ চক্রবর্তী, বা সঙ্গীতাচার্য (মৈমনসিংহের) সুরেশ চক্রবর্তীর নাম আমাদের তখনও জানবার কথা নয়। এ সুরেশ চক্রবর্তী চাঁদপুরের বহরিয়া গ্রামের। সবুজপত্রেও তাঁর নিজ নামে লেখা বেশি নাই। নাম-সমস্যা বিদূরিত করতে সম্পাদক প্রমথ চৌধুরী মহাশয় তাঁকে নাম দেন 'শ্রীমণি গুপ্ত'। সে নামেও বেশি লেখা 'সবুজপত্রে' নেই। সত্যই পরিমাণে তাঁর লেখা অল্প। সাধারণের নিকট তাঁর লেখক পরিচয় বা তাঁর লেখার পরিচয়ও স্পষ্ট নয়। বিশেষ একটা জোর তাঁর লেখার বিষয় ও রচনা-পদ্ধতি। আজ তিনি সৌভাগ্যক্রমে জীবিত* এবং অশীতি-উত্তর জীবনেও জ্ঞান-বিজ্ঞানের তাবৎ বিষয়ে জিজ্ঞাসু মনীষী—দেহে অচল না, কিছুটা বার্ধক্যস্পৃষ্ট মাত্র। ১৯৭০-৭২-এও, সুরেশ চক্রবর্তীর দেহ-মনের প্রদীপভাতি একেবারে নির্বাপিত হয় নি, আশি বছরের কঠিন কঠোর জীবন-সংগ্রামেও না। ভাবুক চোখে এখন ছানি পড়েছে, কিন্তু মৃদুস্বভাব ও কৌতূহলের দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয় নি। পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন বৎসর পূর্বে 'সবুজ সঙ্ঘে'র উদ্যোগ-আয়োজনের উৎস ছিলেন রঙ্গীন হালদার; তার ভাবনার উৎস সুরেশ চক্রবর্তী।

ভাবনা ও মানুষ ঃ সুরেশ চক্রবর্তী

সুরেশবাবু বি.এ. পাশ করেন, এম.এ. পড়তে গিয়েও পড়া শেষ করেন নি। বোধ হয় তখন বা তার আগেই পাঠের খরচ নিজেই অর্জন করতেন। কিছুকাল 'সঞ্জীবনী'তে কৃষ্ণকুমার মিত্রের সহকারী হয়েছিলেন। আর সম্ভবতঃ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পরিবারের কারও হয়েছিলেন গৃহ-শিক্ষক। সে সূত্রে বা যে সূত্রেই হোক এসেছিলেন প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের সান্নিধ্যে। তবে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে ও চিন্তার সঙ্গে তাঁর পরিচয় আরও অনেক-অনেক পূর্বে।

চাঁদপুরের বাবুরহাট স্কুলের হেড্‌মাস্টার 'পুণ্যশ্লোক সারদাচরণ দত্ত' (শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক হীরেন্দ্রকুমার দত্ত মহাশয়ের পিতা) মহাশয়ের সাহচর্যে, হয়তো বা কালীমোহন ঘোষ (পরে শ্রীনিকেতনে অধ্যক্ষ) মহাশয়েরও

* মুদ্রণ পর্বেই সেই সৌভাগ্য আমরা হারিয়েছি—এই সুরেশ চক্রবর্তীকে হারিয়ে। (১১।৩।৭৫) সে যে কী দুর্ভাগ্য Statesman-এর সে সপ্তাহের 'Another Mentor Gone' থেকে তার আভাস পাওয়া যায়।

সঙ্গে পরিচয়ে তার সূচনা পূর্ববাঙলার চাঁদপুরের ও-অঞ্চলটিতে রবীন্দ্র-প্রতিভার এই আলোক শতাব্দীর প্রথম দশকেই বিকীরিত হয়েছিল ও দু'জন রবীন্দ্রনাথের প্রতিভামুগ্ধ মানুষের জন্য। কলকাতায়, শিলাইদ বা শান্তিনিকেতনে যে দাক্ষিণ্য ছিল অবারিত, 'পাণ্ডব-বর্জিত' পূর্ববাঙলায় তার বিকিরণে যাঁরা প্রথম যত্নপর হতেন একালের বাঙলার ইতিহাসে তাঁদের কথা কি কেউ স্মরণ করবেন ? রবীন্দ্র-সংস্কৃতির সে প্রসারের তাৎপর্য কি জানবার মতো নয় ? ঊনবিংশ শতকে কলকাতা সারা ভারতবর্ষে পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষার প্রধান কেন্দ্র, তাই বাঙলার জাগরণের পাদপীঠ। পূর্ববাঙলা সে তুলনায় তখন পঞ্চাশ বৎসর পিছিয়ে-পড়া বাঙলা। মেদমজ্জা আছে, কিন্তু রস-কষ কম। সে অসুবিধা তার ঘুচেছিল শতাব্দীর শেষার্ধে। শিক্ষায় স্থানলাভের সঙ্গে তার ওপরে ভেঙ্গে পড়ে তখন ব্রাহ্ম সমাজের বৈশাখী ঝড়। 'আদিখ্যেতায়' বাঙালরা ব্রাহ্ম আন্দোলনের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে। অথচ কী ব্রাহ্ম আন্দোলন কী রামমোহন থেকে রামকৃষ্ণ স্বামী বিবেকানন্দ উদ্বোধন—সবই পশ্চিম বাঙলায় উদ্ভূত। কিন্তু পশ্চিম বাঙলার কাণ্ডজ্ঞান আছে, অতিআদিখ্যেতাপনা তার ধাতুতে নেই। অন্ততঃ পূর্ব বাঙলার মত অত দুর্দান্ত হয় নি ব্রাহ্ম আন্দোলন পশ্চিম বাঙলায়। অবশ্য ব্রাহ্ম আন্দোলনের সেই জোয়ার থিতিয়ে উঠতেই এসে পড়ে স্বদেশীর বান। তাতেও সুরেন বাঁড়ুজ্জে, পি. মিত্র প্রথম ও প্রধান ; কিন্তু বিপিন পাল, অশ্বিনী দত্ত তখনি সমতুল্য গণনীয়। বাঙালীরা বঙ্গভঙ্গে মেতে উঠ্‌লেন। পূর্ববাঙলা তখন থেকে একেবারে storm centre—তুফানের রাজ্য ; 'পাকিস্তান' হয়েও নিস্তার পায় না। নাটোরের মহারাজা জগদীন্দ্র-নাথের কলকাতায় বাস ও রবীন্দ্র-প্রতিভার স্পর্শ লাভ সুবিদিত। ঢাকায় কালীপ্রসন্ন ঘোষেরও রবীন্দ্র-কীর্তি চোখে পড়েছিল। আগরতলার তা রাজপরিবার ছাড়িয়ে সে রাজ্যে সুস্থির হয় নি। ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গীতেই রবীন্দ্রনাথ প্রথম থেকে অগ্রগণ্য—সে কলকাতাই বা কি, ঢাকাই বা কি। কিন্তু, পূর্ব বা পশ্চিম বাঙলায় গোঁড়া ব্রাহ্মদের রবীন্দ্র-সাহিত্য তা বলে বিশেষ মনঃপূত ছিল না,—তা হিন্দুয়ানীর গন্ধমাখা। আর গোঁড়া ছাড়া তখন ব্রাহ্ম ছিলেন কে ? পশ্চিম বাঙলায় বা পূর্ববাঙলায় ? পূর্ববাঙলায় রবীন্দ্রনাথের সমাদরের পর্ব আসে বিশেষ করে স্বদেশীর সময়। গোঁড়া স্বদেশীরা অবশ্য হিন্দুয়ানী-মুক্ত 'স্বদেশী' সমাজের, রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে অচিরেই দ্বিধায় পড়ে যায়—কবি কেন তাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে ? আসলে সকল সমাজের গোঁড়ারাই রবীন্দ্রনাথকে জানতেন আত্মীয় হয়েও অনাত্মীয়। পূর্ববাঙলা তো সত্যই দূর রাজ্য, পশ্চিম বাঙলায় রবীন্দ্র-প্রতিভার আলো বৃহত্তর

কলকাতার বাইরে কোথায় সহজ প্রবেশ-পথ পেয়েছিল—সাহিত্য-মণ্ডলী ছাড়িয়ে শিক্ষিত সাধারণ বাঙালীর মধ্যে ? সেদিনে পূর্ববাঙলার যাঁরা এক-আধজন দূর দূর জেলায় ও গ্রামে তখন রবীন্দ্র-কাব্য ও রবীন্দ্র-ভাবনা বুঝে উঠছিলেন, তাঁরাও সত্যই ছিলেন অনেকটা দলহারা, সঙ্গীহারা, ঘরের বাইরে সমাজে প্রায় একক। তুলসীতলার এক-একটি মাটির প্রদীপ। রবীন্দ্রালোকে পলতে জ্বালিয়ে তাঁরা আঙিনার আঁধার খানিকটা সরিয়ে দিতে চেষ্টা করতেন। চাঁদপুরের ও-অঞ্চলে হয়তো তাই ঘটেছিল বাবুরহাটের হেড্‌মাস্টার সারদা দত্ত মহাশয়ের জন্য। সুরেশ চক্রবর্তী তাঁর সান্নিধ্য পেয়েছিলেন ছাত্র হিসাবে। তবে সুরেশ চক্রবর্তী অনন্যসাধারণ, মেধাবী ব্রাহ্মণগোষ্ঠীর উত্তরাধিকার-ও হয়তো গণনা করা উচিত। আর সেই উত্তরাধিকার বশেই তাঁর গতানুগতিক কার্যপরম্পরার মধ্যে দেখা দেয় কখনো বিদ্রোহের অস্থিরতা, কখনো বিচ্ছিন্নতা।

সুরেশ চক্রবর্তী স্কুলের শেষে পড়তে আসেন কলকাতা সিটি কলেজে; পরে সেণ্ট পলস্ কলেজে। ব্রাহ্মভাবের বনিয়াদটা ভালোই হয়েছিল, তার ওপর পড়ল খ্রীস্টীয় ভাব-জগতের আলোক। ইংরেজির আস্বাদন হেরম্ববাবুদের কৃপায় তৃপ্তিদায়ক হয়েছিল। ইংরেজ অধ্যাপকদের সাহচর্যে সে সঙ্গে এল ইংরেজ চরিত্রের প্রতি শ্রদ্ধা। ইংরেজ ভাষা, সাহিত্য, জীবনচর্যা, এমন কি, তার সাম্রাজ্য ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধিতা—সব নিয়েই তো সেই ইংরেজ চরিত্র। কিপ্‌লিংকেই ধরা যাক্—'কাংস্যকণ্ঠ-কবি কিপ্‌লিং' বলেই তাঁকে প্রথম জানতাম 'প্রবাসী'র একটি প্রবন্ধের শিরোনামা থেকে। মিথ্যা নয় সেই নাম ; ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কবিই কিপ্‌লিং। তবু আরও একটু কিছু কিপলিং। আমরা তো—তাঁর নাম করলেই আবৃত্তি করি—Oh East is East and West is West, and ne'er the twain shall meet. কিন্তু জানি না,—সুরেশ-বাবুই প্রথম বলেছিলেন,—তার পরেকার পঙ্‌ক্তিগুলি ঠিক বিপরীত অর্থের ঃ

But there is neither East nor West, Border nor Breed, nor Birth,

When two strong men stand face to face, though they come from the end of the Earth. 'The Balled of East and West'-এর কথাটির এইটিই বিশেষ মর্মবাণী তা কি আমরা জানি ? জানতাম না। সুরেশবাবুর মতে এই ইংরেজের নিবেদনও স্মরণীয় ঃ

Lord God of Hosts, be with us yet
Lest we forget—lest we forget.

সুশেবাবুর থেকেই এই Recessional প্রথম শুনি। সে বোধ হয় ১৯১৮/

১৯১৯-এর কথা। সেই সঙ্গে পাই 'জাঙ্গল বুক' দু'খণ্ড, বুঝি তার তাৎপর্য। জীবজগতের সঙ্গে মানুষের জগতের যে যোগাযোগের চেতনা পঞ্চতন্ত্রের মধ্যে রূপায়িত হয়ে আছে—আজ তা ভারতবাসীর নয়, আজ ইউরোপীয়-দেরই তা অধিকৃত—তারাই পৃথিবী চিনে নেয়, তাই পৃথিবীও তাদের চিনে নেয়। আকাশ থেকে ভূধর পর্যন্ত তাদের যে-অধিকার এত প্রত্যক্ষ তা শুধু বৈষয়িক লোভের তাড়নায় নয়। ব্রাহ্ম-সত্যের সঙ্গে জগৎ-সত্যের যোগে; সেই অপরাজেয় প্রেরণাই—ওঁ প্রাণায় স্বাহা। এই মন্ত্রটারই জয়। আমরা তা বুঝি না, ওরা তা মানে, ওদের বিশেষ প্রস্থান ওদের আয়ত্ত। খ্রীস্টীয় ধর্মজীবন সামঞ্জস্যপূর্ণ; জীবনকে ওরা মিথ্যা মনে করে না। প্রাণ ওদের তাই প্রবল। তাতেই দেহের বল, মনের ঔৎসুক্য, আধ্যাত্মিক উৎক্রান্তি—সবই ওদের অনেক সুস্থ, অনেক সবল। সুরেশবাবুর চোখে ইংরেজ চরিত্র এসব দিয়ে গড়া, সাম্রাজ্য তাদের সেই প্রাণশক্তিরই প্রকাশ। আর সাম্রাজ্যের লোভে, লুণ্ঠনে ঘটে সেই রাজসিক ইংরেজ চরিত্রের বিকৃতি, খ্রীস্টীয় বিবেকের দানবিক বিকার।

বলা বাহুল্য, সুরেশবাবুর এই সব ভাবনা আমাদের চালনা করত, তা নয়। আমরা চলতাম যৌবনের হাসি-গল্প-উৎসাহের উচ্ছ্বাসে—ছোট ইংরেজকে জানি, বড় ইংরেজকেও ভুলতাম না, ছোট ও বড় ইংরেজের দুই রূপ।

অবশ্য বছর গড়িয়ে ১৯২২-এর দিকে এগিয়ে যেতে না যেতে এই সুরেশ-বাবু তাঁর ইস্কুলের চাকরি ত্যাগ করে ভেসে পড়লেন স্বরাজ-সাধনার উজান গঙ্গায়—তখনো গান্ধীজীর পথ অপেক্ষা রবীন্দ্র দৃষ্টিতেই তাঁর প্রেরণার,—আর পরিবার-পরিজনের একমাত্র অবলম্বন তাঁর মাস্টারি জীবনের স্বল্প উপার্জনে। এসব বাধা তাঁকে তখন ঠেকাতে পারে নি। আর সে গঙ্গায় ভাঁটা পড়তে বছরের পর বছর জীবিকাহারা এই আত্মাভিমানী পুরুষ অনশনে অর্ধাশনে, ইস্কুল মাস্টারির এঘাটে ওঘাটে ঠেক্‌তে ঠেক্‌তে, শেষ অবধি যুদ্ধের দিনে জীবিকার দায়েই ঠেকেন গিয়ে এ. আর. পি.'র উর্দি-পরা এক কর্মীর কাজে। কারণ, তাতেই র‍্যাশন-লাভ তখন সম্ভব। আর র‍্যাশন অভাবে সেই মন্বন্তরে অর্ধাশনও অসম্ভব। কিন্তু সে-সব অন্য পর্বের কথা, আপাতত অবান্তর।

অবান্তর অবশ্য অনেক কথাই যা বলেছি প্রসঙ্গক্রমে নয়, প্রায় প্রসঙ্গ অতিক্রম করে। পুকুর পারের, সেই পরিচয়-সূচনা থেকে 'সবুজ সঙ্ঘে'র জন্মকথা শুরু করলে নিশ্চয়ই তা অযথার্থ হবে। কারণ খেলাধূলা অভিনয় হৈ-

হুল্লোড়কে শুদ্ধ যারা রঙ্গীন হালদারকে কেন্দ্র করে দানা বেঁধে উঠছিল তারা 'সুরেশ চক্রবর্তীকে তখনো জানত না। সবুজপত্র হয়তো চোখেও দেখি নি। তবু দানা বাঁধতে-বাঁধতে তারা চাইল দলবদ্ধতায় একটা মিলিত পরিচয় —একটা নাম, হৈ হৈ-এর একটা সূত্র ও সংজ্ঞা। হয়তো আয়োজনের ব্যবস্থা-গুলিকে অদৃশ্য অস্তিত্বের আভাস ফুটিয়ে তুলবে। অন্ততঃ এই আয়োজনগুলিকে পরিচালনার জন্য কিছু চাঁদা তোলা প্রয়োজন। এই অত্যন্ত বাস্তব কারণেই নামের অত প্রয়োজন। যুবক সমিতি, ছাত্র সমিতি তখনো ইংরেজী নামেই আত্মপরিচয় দিত। বিকল্পে জন্ম নিত বাঙলা নাম ক্বচিৎ কদাচিৎ। রঙ্গীন হালদার নামকরণ করলেন 'সবুজ সঙ্ঘ', আর সঙ্ঘের মূলমন্ত্রটা 'ওঁ প্রাণায় স্বাহা'। তার রূপটা ছিল, নামটাতে তা স্পষ্ট হ'ল, আর তাতেই রূপেরও জুটল আত্মপরিচয়। নাম থেকে বস্তু, না, বস্তু থেকে নাম দার্শনিকদের নিকট তা বড় সমস্যা। নাম জিনিসটা অর্থহীন নয়, মানুষেরই হোক বা বস্তুরই, —তাতে উদ্দেশ্যের আভাস মিলে। মন্ত্র ওঁ প্রাণায় স্বাহা; আর কর্মসূত্র হোক অবেলা কাজ—এই দুয়ের মিল ঘটল নামটায়—নামই দলটার আবার মন গড়ে তোলার কারণ হ'ল। 'সবুজ' শব্দটা নিয়ে এল যৌবনের ও নতুনের ব্যঞ্জনা। এসে গেল 'প্রাণায় স্বাহা মন্ত্রটা'। তাতে দৃষ্টিপথে আরেকটা জানালা ওদিকে খুলে দিল। খেলা ও অভিনয় ছাড়িয়ে সে দৃষ্টি চলে গেল ইতিহাসের সীমায়। বৌদ্ধ সংস্কৃতি থেকে সকল রকমের সাহিত্য, সঙ্গীত ও সংস্কৃতির দিকেও দলটা আপনা থেকেই এগিয়ে চলেছে। তাতে আমরা বিশেষ ভাবেই বুঝতাম আমাদের ভাবদৃষ্টি জড়িয়ে আছে একটা অস্পষ্ট সূত্রে সুরেশ চক্রবর্তী, সবুজপত্র এবং রবীন্দ্র-প্রতিভার সঙ্গে। সুরেশবাবুর ততদিনে আমাদের বিষয়ে ঔৎসুক্য জন্মেছে। সম্ভবত নামটাতে তিনি উৎসাহিত হন।

কিন্তু এতগুলি যুবকের এই উৎসাহ, প্রাণের সহজ স্ফূর্তি তাঁকে নিরাসক্ত থাকতে দিত না। আর, রঙ্গীন হালদারও এমন প্রকৃতির মানুষ নয় যে 'সবুজপত্রে'র লেখক সেই 'কালচারড্ মানুষটিকে' সবুজ সঙ্ঘের থেকে দূরে থাকতে দেবেন। সুরেশ চক্রবর্তী রইলেন দলটার নীরব দার্শনিক অংশীদার।

মাঠে ও মাঠের বাহিরে

সবুজ সংঘের আসর ও আড্ডা যা দিয়ে জমে প্রথম তা ছিল দু'টি অনুষ্ঠান—খেলা ও অভিনয়।

গ্রীষ্মের ছুটির দিনগুলিতে ফুটবল খেলার প্রতিযোগিতা শহরটাকে খেলার মাঠে জড়ো করত। 'সবুজ সঙ্ঘে'র খেলার দিনগুলির আকর্ষণ ছিল সব থেকে বেশি, চিৎকার উত্তেজনা সে খেলা সৃষ্টি করত। অবশ্য খেলার দল আরও ছিল। কোনো কোনো দল আসত বাইরে থেকে। তাতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা জমে উঠত। শহরের দলগুলিও অন্য শহরের নামজাদা একাধিক খেলোয়াড়কে নিয়ে আসত তাদের পুষ্টির জন্য। তারা কিন্তু ভাড়া করা নয়, বরং নিমন্ত্রণ করা। 'সবুজ সঙ্ঘে'র-ও এই সংগ্রহ-বিদ্যায় কম উৎসাহ ছিল না। সাধারণতঃ বাইরের এসব নামকরা খেলোয়াড়রা যেন বরযাত্রী পার্টি। অন্ততঃ আগে-আগে তাই দেখতাম। তখন কোচবিহার, নাটোরের খেলার দলের দেশে নামডাক। আমাদের শহরে সেদিনে ওয়েস্টার্ন ক্লাবের পিছনে অর্থব্যয় করতেন সুরেন বোস মহাশয়। জমিদার বলে তাঁরও খ্যাতি। কিন্তু খ্যাতির তুলনায় জমিদারী নামমাত্র, আয় সামান্য, আয়ের থেকেও ভদ্রলোকের মনটা ছিল বেশি বড়। সুরেনবাবু আধা-ফৌজী শার্ট-ট্রাউজারে ঘোড়ায় চড়ে মাঠে আসতেন, দেখে সমীহ করতে হ'ত। এই সুরেনবাবুর আরও একটু কথা এখানেই সংক্ষেপে শেষ করি কালক্রম অতিক্রম করে।

সুদর্শন, সুবেশ, সচ্চরিত্র এই হৃদয়বান্ প্রিয়ভাষী মানুষটি প্রথম যুদ্ধের দিনে গ্রেফতার ও আন্তরায়িত হ'ল 'স্বদেশী' সন্দেহে। বাইরের লোকে ওজুহাতটা বিশ্বাস করত না—সুরেনবাবু 'বাবু', তিনি আবার কেমন 'স্বদেশী'। কিন্তু ভেতরের মানুষেরা জানতেন অপরাধ না থাকলেও ওজুহাতটা মিথ্যা নয়। যুদ্ধ-শেষে তিনি মুক্তি পান। জমিদারীসূত্রে, ক্রমে কালের নিয়মে আর স্থানের গুণেও, সুরেন বোস মশায় তারপর জড়িয়ে যান প্রজা-শাসনে এবং 'প্রজা-বিদ্রোহী'দের নানা চক্রান্তে। তা বুঝতে হলে জানা দরকার ত্রিশের বৎসরগুলি দেখা না দিতেই নোয়াখালিতে, ত্রিপুরায় দেখা দেয় কৃষক আন্দোলন—জীবন্ত আন্দোলন, কিন্তু নিছক আর্থিক-সামাজিক; তার পদ্ধতি অবশ্য জমির মালিক ও মহাজনদের বিরুদ্ধে, প্রজার ও দরিদ্র সাধারণের বিক্ষোভ সৃষ্টিতেও, অবশ্য জমিদাররা সকলেই হিন্দু, আর প্রজারা প্রায় সকলেই মুসলমান। মূলতঃ দ্বন্দ্বটা এগ্রেরিয়ান্ ও ইকোনমিক, কিন্তু হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক বৈষম্যের ধোঁয়ায়, হ্যাভস্ ও হ্যাভনটের সম্পর্কটা কুয়াশাচ্ছন্ন হয়ে যায়। তিতুমীরের আমলেও গিয়েছিল, একশ বছর পরেও তা যাচ্ছিল। নোয়াখালি-ত্রিপুরায় ১৯৩৮-এ জেল থেকে ফিরে সুরেনবাবুকে একবার কলকাতায় তাঁর সুহৃদ্ সত্যেন মিত্রের গৃহে দেখতে পাই। তিনি প্রথম যুদ্ধের দিনে ডেটিন্যু,—তখন পঞ্চাশোর্ধ্ব, আমরা ত্রিশের ডেটিন্যু, ত্রিশের কোঠায়। স্নেহ-প্রবণ সম্ভ্রম-সমৃদ্ধ

(dignified) প্রৌঢ় পুরুষ অনুজ বন্দীদের প্রতি স্নেহশীল। কিন্তু আমরা (১৯৩৮) 'লাঙ্গল যার জমি তার' দলের মানুষ। সুরেনবাবু স্বল্প হেসে বললেন, 'অপরাধ তা হলে এই—পূর্বপুরুষ কিছু জমিজমা করেছিলেন'। তাঁর কথায় ক্ষোভ ছিল না, খোঁচাও না। অকৃত্রিম স্নেহের দৃষ্টি তখনো তাঁর চোখে। বিনীত মৃদু-কণ্ঠে তাঁকে আমাদের ধারণাও জানালাম।

সুরেনবাবু না বুঝলেন তা নয়। বললেন, মানলাম তর্কচ্ছলে, কিন্তু 'হিন্দু জমিদারের জমি কেড়ে নাও, মুসলমান পীর-মৌলবীর জমি ছেড়ে দাও' এ নীতি তবে কেন ?—এ প্রশ্নের উত্তর ছিল না।

সুরেনবাবুর কথা মিথ্যা ছিল না। আমাদের কথাও মিথ্যা হয় নি। তাঁদের সে অঞ্চলে কৃষক-আন্দোলনের নেতা ছিলেন মৌলবী গোলাম সরওয়ার, তিনি পীরবংশজ, জমিদার না হলেও সুসম্পন্ন লোক, জমিজমার মালিক। বৎসর আট পরে (১৯৪৬) নোয়াখালিতে দাঙ্গার আগুন লাগে, তখন এই এলকা থেকেই প্রথম 'কলকাতার বদ্‌লা নেওয়ার' পালা শুরু হয়। সুরেন-বাবু তখন মহালের কাছারি বাড়িতে পূজা-পার্বণ উদ্‌যাপিত করতে উপস্থিত আছেন।

আক্রান্ত হ'ল তাঁর কাছারি বাড়ি। চারদিক থেকে পরিবেষ্টিত সুরেন-বাবু বন্দুক সঙ্গে সঙ্গে রাখতেন ; গুলি চালাতে বাধ্য হলেন। আক্রমণকারীদের এগুতে দেন না। ক্রমে গুলি শেষ হ'ল। তারপর ইতিহাসের অনুল্লেখিত এক নৃশংস হত্যার ঘটনাবলী-ভরা অধ্যায়। গোলাম সরওয়াররাও ইতিহাসের instrument কিন্তু তারা মানবতার কলঙ্ক। সুরেনবাবু নিজে ছিলেন সাহসী, সম্পন্ন আত্মমর্যাদাপ্রবুদ্ধ পুরুষ ; নোয়াখালি শহরে খেলার উৎসাহদাতা। তাঁর গ্রেফতারের সঙ্গে (১৯১৭) ওয়েস্টার্ন ক্লাবও অবলুপ্ত হয়।

আমাদের কালে (১৯১৮) সেই দিনে খেলাধূলায় পেট্রনের যুগও শেষ হয়ে গিয়েছিল। ক্রেডিট ফিনান্সের দিন আসে নি, স্টেট্ দায়িত্বেরও না। চাঁদা তুলে খেলার দলের দিন চলে ; খেলোয়াড়রা ধার করে খরচ যোগায়, তাদের সংগ্রহ করা খেলোয়াড়রা খেলোয়াড় হলেও আর 'বরযাত্রী' নয়—তারা প্রায় ঘরের আত্মীয়ের মত ; খেলাটাই তাদের বড় নেশা। আমাদের দলে যারা আসে আমাদের সঙ্গে তারা কিছুদিনের মত এক হয়ে যায় খেলায়। খেলার মাঠের পরেকার আড্ডায়, নাটকের মহলায়। খেলায় সবুজ সঙ্ঘের নাম যতটা ছিল কৃতিত্বলাভ ততটা হ'ত না। আমাদের মধ্যে খেলায় প্রধান ছিল (ডাঃ) প্রাণকুমার কর*। খেলায় নামলে তাতেই মন প্রাণ দিয়ে খেলত।

*১৯৭৬ তাঁর মৃত্যু হ'ল।

তাঁর ফুটবল খেলা দেখে নাকি মেডিক্যাল কলেজের কর্তৃপক্ষ তাঁকে সাদরে কলেজে ভরতি করে নেয়। আমরা জানতাম, তাঁর দুর্বলতা কোথায়। খেলার সময়ে কোথাও বাধা পেলে তিনি চটে যেতেন। তাঁকে খেলায় বানচাল করার মুখ্য অস্ত্র হ'ল মাঠে খেলায় একটু বেশি ধাক্কা দেওয়া বা মাঠের বাইরের দর্শকদের দিয়ে উচ্চ টিটকারী দেওয়ানো। এসব বাধা না থাকলে প্রাণকুমার খেলার মাঠে দুর্বার। মেডিক্যাল কলেজের সঙ্গে ল কলেজের খেলার শেষে একবার ল কলেজের বিভূতি দত্ত আমাকে বললেন—না, তোমাদের প্রাণকুমারকে বুখতে আমার প্রাণ বেরিয়ে গিয়েছে। বুখবার উপায় ছিল, মাঠে নয়, মাঠের বাইরে। পরবর্তী খেলায় সে উপায় ল কলেজের ছাত্ররা গ্রহণ করলেন—ল কলেজ ফল পেল। অবশ্য এ কৌশল ফুটবলের মতো খেলায় খাটে। টেনিস-এর মতো খেলায় তা অচল। মেডিক্যাল কলেজের গোবিন্দ শর্মার জুটি হিসাবে প্রাণকুমার কর সেদিন কলকাতার টেনিস জগতে দুর্জেয় ছিল। কিন্তু সে কলকাতায়, তাতে 'সবুজ সঙ্ঘে'র গৌরব বাড়তে পারে। হরিদাসও ভালো খেলত। খগেন্দ্র গুহ, সুশীল রায়চৌধুরী যতটা খেলোয়াড়, তার চেয়েও বেশি খেলার উদ্যোক্তা, খেলার দলের সংগঠক। আসলে তাঁরাই ছিলেন 'সবুজ সঙ্ঘে'র খেলার দলের মেরুদণ্ড।

আমি খেলতাম—অধিকাংশের মতো—মাঠের বাইরে। খেলায় আমাদের বাড়ির নাম বিশেষ ছিল না। বাবা নাকি লাট্টু, ও গুলি ছাড়া কিছুই খেলেন নি। রঙ্গীনদা ফুটবলে পা ছোঁয়ান নি। আমার বিদ্যা মাঝারি—চর্চা করলে এক রকম দাঁড়িয়ে যেত হয়তো। কিন্তু চর্চার অনুকূল আবহাওয়া তখন আমাদের বাড়িতে নেই। আবহাওয়া ও চর্চা মিলিত হলে মধ্যম পর্বটাও উত্তম হয়। অথবা, মিলিত না হলে উত্তমও থাকে অজ্ঞাত। এ বিশেষ করে মনে হয়েছে আমাদের বন্ধু মাখনকে দেখে।

মাখন—মাখনলাল রায়চৌধুরী পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। শুধু খেলাধূলায় নয়, লেখাপড়া, মেলামেশা, বৈষয়িক ব্যাপার—মাখনের সব বিষয়েই খ্যাতিলাভ ঘটেছে। গুণ ছিল, অত্যুৎকৃষ্ট না হোক্ যথেষ্ট। ভাইদের উৎসাহে ও নিজের চর্চায় ও কার্যকৌশলে সে গুণকে মাখন আমাদেরই চোখের সামনে বহুগুণ করে ফেলে। খেলায়ও মাখন ঢাকা কলেজে চ্যাম্পিয়ান। সর্বদাই পড়াশুনায় এম. এ., পি. এচ্‌ডি-তে কিস্তি দিয়ে একদিকে বারাণসীর কোনো সভার 'শাস্ত্রী', অন্য দিকে হয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইস্লামিক ইতিহাসের অধ্যাপক। তাই আমরা বন্ধুরা বলতাম মৌলভী মাখনলাল শাস্ত্রী! অদ্ভুত কাণ্ড। মাখন আপনার বুদ্ধিতেই অপরকে ছাড়িয়ে উঠতে জানত,

ছাড়িয়ে উঠেছিলও। দোষে-গুণেই মানুষ মাখন ; মাখনেরও দুই-ই ছিল, কার তা নয় ? তবে কার কোন্‌টা বেশি কোন্‌টা কম তা কে বল্‌বে ? যাদের গুণ বেশি তাদের দোষটাও বেশি হয়ে উঠলে নানা অসঙ্গতি ঘটে—কথায় ও কাজে, নীতিতে ও রীতিতে, আদর্শে ও আচরণে। তাতে দু-এক সময় অনর্থ-সৃষ্টি অনিবার্য ; না আটকালেই হ'ল। মাখনেরও জীবনে তাই মাঝে মাঝে অনর্থ-পাত ঘটেছে। মাখন তাতে আটকায় নি। খেলার মাঠেও না, লেখাপড়ার হাটেও না। কেবল মনে হয় মৃত্যু তাকে ঠকিয়েছে অতর্কিতে, অসময়ে। বহুমুখী ছিল তার অভিলাষ, সব দিকেই বেশ অগ্রসর। দোষে-গুণে আমাদের মধ্যে এমন সফলতা আর কে লাভ করেছে ? খেলার মাঠেও দেখেছি তার ওয়াটার্লু জয়ের চেতনা।

মাখন ছিল অন্য খেলার দলের সংগঠক ও খেলোয়াড়। আমরাও খেলার দল হিসাবে অহি-নকুল। ব্যক্তিগত ও পরিবারগত সৌহার্দ্য তবু টিকে ছিল। কিন্তু দলের চক্রগতিতে কতকটা ambivalent না হয়েও পারত না। খেলার মাঠে সে দুর্জয় ; তাই সেখানে সে আমাদের প্রতিপক্ষ, সেখানে সে নিস্তেজ হলে আমাদের লাভ। তার বিরুদ্ধে অস্ত্র—মাঠের বাইরে উচ্চ পরিহাস ও উৎকট চীৎকার। কিন্তু মাখন তাতে অটল। সমান ভাবেই খেলত। মাঠের বাইরের বাধা তাকে স্পর্শ না করত, তা নয়। মুখে-চোখে তা দেখা যেত। খেলার শেষে নেপথ্যে আচরণেও বোঝা যেত সে ভোলে নি। কিন্তু খেলার সময়ে নয়। মাঠের বাইরে যদি সে নির্বিষ না হয়, সেজন্য তাকে দোষ দেওয়া যায় না। চল্লিশ বছর পরে আজ বুঝি—খেলায় আমরা এভাবে খেলোয়াড়ী মনোভাব দেখাতাম না। তবে আমাদের খেলা তা এই এক ঘণ্টা, খেলাতেই শেষ। তার পরে আমরা নির্বিকার। লেগে যেতাম নাটকের মহড়ায় বা গল্পে আড্ডায়। আর, চিৎকার ভিন্ন অন্য কিছুও আমরা খেলা নিয়ে করতাম না—হাতাহাতি, মারামারি, ঢিল ছোঁড়াছুঁড়ি, খেলার মাঠে সদলে নেমে খেলা পণ্ড করা ও খেলা নিয়ে জুয়োখেলা, —এসব তখন কলকাতায় ও আমাদের মাথায় দেখা দেয় নি। একবার একটা ছোটখাটো হাতাহাতি তবু হয়েছিল। পুলিশের দলের সঙ্গে ছিল আমাদের খেলা। পুলিশ বলেই বোধহয় বিরাগ। আমাদের খেলোয়াড় বন্ধুদের সঙ্গে খেলার শেষে তাই তাদের দু'একজন খেলোয়াড়ের হাতাহাতি হয়। ঘুষিতে পুলিশের একজনার নাক দিয়ে রক্ত ঝরে, তারা থানায় ডায়ারি করে দিল। পুলিশ সাহেব ছিলেন তখন একজন বাঙালি ভদ্রলোক, সুকুমার সেন। খেলায় উৎসাহী, খেলোয়াড়ী সদ্বুদ্ধি তাঁর ছিল, ভদ্রতা এবং কাণ্ডজ্ঞানও ছিল। খেলার মাঠের ব্যাপার খেলার মাঠেই

শেষ,—আমাদের কথা মতো তিনি নিজেও এই সিদ্ধান্ত স্থির করলেন। অর্থাৎ পুলিশের কাছে হেরে গেলাম আমরা পুলিশের সৌজন্যে। খেলায় যে কতবার কার কাছে হেরেছি, কতবার কার সঙ্গে জিতেছি, তা আজ মনে নেই। কিন্তু মনে রয়ে গিয়েছে এই সৌজন্যের কাছে হার।

ওয়াটার্লু জয়ের মহড়া ঈটনের খেলার মাঠে হ'ত কিনা জানি না; আমাদের মাঠে ওরকম মহড়া হ'ত। রাজ্য জয়ের কথা আমাদের পক্ষে হাস্যকর। এবং খেলা যে খেলা নয় তা কলকাতায় ইণ্ডিয়ান্ বনাম ইউরোপীয়ান্দের খেলায় অনুভব করতাম। মফঃস্বলের খেলায় রাজনৈতিক নেশা ছিল না। তবে মাঠ ছিল অনেক, এত খেলার মাঠ বোধ হয় অন্য কোনো শহরে ছিল না। নোয়াখালিতেও তা দুর্লভ হয়ে গেল। দক্ষিণের একটার পর একটা মাঠ ভেঙে নদী খেলার সুযোগও কমিয়ে দিল। খেলার মাঠ প্রায় রইলই না। তবু যে খেলা রইল, তাই আশ্চর্য। আর শহরের লোক তাই এসব খেলায় ঝুঁকে পড়ত। আমাদের উৎসাহ-উল্লাসকেও ক্ষমার চক্ষে দেখত।

নাটকের পাঠ

নাটক অভিনয়েই সবুজ সঙ্ঘের নাম। সেই নোয়াখালি শহর বিলুপ্ত। সেই সবুজ সঙ্ঘেরও অন্যান্য কীর্তি-অকীর্তি এই পঞ্চাশ বৎসরে প্রায় বিস্মৃত। শুধু এখানে-ওখানে হঠাৎ কেউ এই বৃদ্ধদের এখনো মনে করিয়ে দেন 'টাউন-হলে'র স্টেজে সেই আপনাদের 'সাজাহান' কিম্বা 'সীতা'।' হাঁ; আমাদের সেই সাজাহান এখন আশীর উপকূলে তথাপি নাট্যাগ্রাহী, নানা শিল্পের রসিক। আমাদের সেই সীতা, এখন ষাট-উত্তীর্ণ 'দাদু' কিন্তু পার্ট ভুলে যান নি। অনেকেই আমার মত সত্তরের উপকণ্ঠে sans bite, sans vision, sans সবুজত্ব। অধিকাংশই কবে চলে গিয়েছেন তাঁরা বুড়ো হতে পারেন নি, রয়ে গিয়েছেন, চিরজীবী ও চিরযুবা, এবং চির সবুজ। যে যা হোক, সেদিনকার ওই নাটুকেদের জন্যই সবুজ সঙ্ঘ অবিস্মৃত। এই প্রাপ্যটা তাদের ফাঁকি দিয়ে পাওয়া নয়। কিন্তু কালও যে ফাঁকি দেয় নি, কেউ কেউ তা স্মরণ করে,—তা'ই আশ্চর্য।

আজকের দিনের বিচারে নিশ্চয়ই মনে হয়—এমন বা কী ছিল সেদিনের নাট্যাভিনয়।—একটা অচল আয়োজন। সত্যই তো, পঞ্চাশ বছরে কত জিনিসই এখন অচল। নোয়াখালি শুধু অচল নয়, অতলে, সেই সঙ্গে তার অনেক জিনিসও। সব যে অচল হয় নি, তাই আশ্চর্য। এখনকার মতো তখনো কলকাতার সাধারণ রঙ্গমঞ্চ বাঙলার মফঃস্বলের নাটুকেদের 'মডেল' ছিল।

মেদিনীপুর থেকে একেবারে নোয়াখালির 'ড্রামেটিক ক্লাব'—বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ডক্টরেটের' গবেষণার এ একটা বিষয় হতে পারে। ঊনবিংশ শতকের শেষ পাদ থেকে বাঙালি জীবনে পাশ্চাত্য রীতির বাঙলা থিয়েটারের বিস্তার কত দ্রুত! বাঙলার বাইরেও কত ব্যাপক, সে সঙ্গে কত বিচিত্র। বাঙালির ইতিহাসের এগুলো একটা অধ্যায় —যেখানে বাঙালি সেখানেই বাঙালির বাঙলা নাটক।

১৭৯৫-এ **হেরাসিম লেবেদেফের** আবির্ভাব। 'ডুমতলা'র থিয়েটার থেকে ১৮৭২-এর ন্যাশানাল থিয়েটার, নাটকের ইতিহাসের এই 'কলকাতাই-খণ্ড' এখন জানা বিষয়। তাই সেই 'ডুমতলা'র তিন দিনের কথা তিন হাজার পৃষ্ঠার গবেষণাও কলকাতার 'ন্যাশনাল থিয়েটার' এসে পরিতৃপ্ত। তা ছাড়িয়ে কি অন্য কিছু করবার নেই ? ঠিকই, আধুনিক বাঙলা সংস্কৃতি কলকাতাতেই ভূমিষ্ঠ ; বিশেষ করে হিন্দু ভদ্রলোক তার বাহন। শিক্ষা-দীক্ষায় বাকী বাঙলা দেশটা কলকাতার হয় পাদটীকা, নয় পরিশিষ্ট। পঞ্চাশ বছর পিছনে ছিল পূর্ববাঙলা, আর মুসলমান বাঙালীরা। তবু পূর্ববাঙলা হঠাৎ এগিয়ে যায় স্বদেশীর সংঘাতে। থিয়েটারও অনেকটা ওধরনেই এগিয়ে গিয়ে থাকবে। (মুসলমান বাঙালি এখনো নাটক-নৃত্য প্রভৃতিতে নিরুৎসাহ) কিন্তু সেই থিয়েটারের হয়তো সূচনা পূর্ববঙ্গে আরও আগেই। অভিজাতরাই নাটকের দল প্রথম পুষতেন, লণ্ডনেই হোক আর কলকাতাতেই হোক ; তারপর হতেন দলের 'পেট্রন', মুরুব্বি। কলকাতা শহরে বাবুরাও তাই করেছিলেন। জমিদাররা তাদেরই অনুকরণে কেউ কেউ জলসাঘরের মতোই গ্রামের বাড়িতে স্থাপন করেছেন সাময়িক বা স্থায়ী স্টেজ। কিন্তু শিক্ষা ব্যাপারে যেমন মধ্যবিত্ত, নাটকের ব্যাপারেও ইংরেজি শিক্ষিতেরা ক্রমেই তেমনি বেশি উদ্যোগী হয়। পূজোর সময় নাটমন্দিরে দেবীর মুখোমুখি বাঁধা হ'ত স্টেজ—'নাচ' নয়, নাটক হবে। নাট 'মন্দির' নাম সার্থক হচ্ছিল। এ বিষয় বাঙালির কাছে আজ সুপরিচিত। কিন্তু কখন থেকে স্টেজবাঁধা নাটকের শুরু, কোন্ কোন্ গ্রামে জমিদারবাবুরা প্রথম যাত্রা ছেড়ে, বা যাত্রার সঙ্গে, স্টেজ-বাঁধা থিয়েটারের আয়োজন করেন ; যাত্রাগান, কবিগান, তর্জার স্থানীয় পেট্রনরা কেমন করে থিয়েটারেরও পেট্রন হলেন ; কোন্ শহরে কিম্বা মহকুমায়, বা বড় বড় গ্রামে ইংরেজি-পড়া 'বাবুরা' বছরে দু-একবার করে থিয়েটার করতে উদ্যোগী হলেন ; ক্রমে পাকা স্টেজ প্রায় নিয়মিত ক'রে তুললেন-বছরে দু'-একবার করে নাটকের অভিনয় হবেই পূজাপার্বণেই ;—এসব সূত্রে কেমন করে সারা বাঙলার শহরে গ্রামে, নারীপুরুষ, ইতর-ভদ্র সকলে বিলিতী ধাচের থিয়েটারের সঙ্গে পরিচিত হয়ে উঠলেন, পাশ্চাত্য নাট্যধারার ধ্যান-ধারণা না জেনেও বুঝতে পারেন থিয়েটারের

মহিমা ; সঙ্গে সঙ্গে দেশের মানুষের রুচিরও নতুন দিক খুলে যেতে লাগল ; এসব প্রসঙ্গ এবং নাটকের আনুষঙ্গিক আরও অসংখ্য বিষয়—বাঙালি থিয়েটারের গবেষকেরা এ পর্যন্ত সন্ধান করেছেন বলে মনে হয় না। দেশের পূজো-পার্বণ ও এসব উপলক্ষ লোক-সংস্কৃতির একটা মূল অবলম্বন, আধুনিক বাঙালী জন-সংস্কৃতির মূল একটা উপাদানও তেমনি বাঙ্‌লা থিয়েটার রঙ্গালয়। সে উপাদান শুধু কলকাতাতেই সঞ্চিত নয়, কলকাতা তার সূতিকাগার। কিন্তু যেখানে বাঙালি সেখানেই তো বাঙলা থিয়েটার। উত্তর ভারতের কালীবাড়ির, মতোই বাঙালির নাট্যমঞ্চ ও নাট্যাভিনয়ের নেশা বাঙালিত্বের বড় বিজ্ঞাপনী। সেদিন শুনলাম রাজস্থানের যোধপুরে বর্তমানে (১৯৭০) বাঙালির চারটা দুর্গাপূজা হয়। দুর্গাপূজার সঙ্গেই হ'ত নাটক—দুর্গাপূজার সমতুল্য উৎসব। এখন—না, আর নাটকের দল নয়, এখন যোধপুরেও দুর্গাপূজার অঙ্গ নৃত্যনাট্য। নাটকে সর্বত্রই সকলের 'মডেল' কলকাতার সাধারণ রঙ্গমঞ্চ। অন্ততঃ প্রাক্‌-স্বাধীনতার যুগে এর ব্যতিক্রম প্রায় সম্ভব ছিল না। আমার ধারণা নানা গ্রামের, নানা শহরের, নানা দলের, নাটক অভিনয়ের এসব তথ্য সংগ্রহ না হলে বাঙলা থিয়েটারের ইতিহাস অসম্পূর্ণ। এখন তো কলকাতা শহরেই পাঁচশ বা হাজার শৌখীন নাটুকে দল আছে। কিন্তু এ কথা যাক্‌।

দ্বিতীয় একটা কথাও এরূপ মুলতুবি থাক্‌বে। প্রায়ই শুনি—আমরা বিলিতী থিয়েটারের অনুকরণ করতে গিয়ে আমাদের জাতীয় নাট্য-সংস্কৃতি গড়তে অসমর্থ হয়েছি। অভিনয় ব্যাপারে আমাদের জাতীয় চেতনা যাত্রাগানের সঙ্গে বাঁধা, এ কথাটা মানি। কিন্তু তেমনি জানি, এ চেতনাও গতিশীল, বিকাশশীল। যাত্রাগানও তাই গত পঞ্চাশ বৎসরে নিজের গণ্ডী বাড়িয়ে 'থিয়েট্রিকাল যাত্রা পার্টি' হয়েছে—নতুন থেকে নতুনতর হচ্ছে, কারণ দর্শকেরও রুচি নতুন হয়। বিলেতেও থিয়েটার ক্রমেই গণ্ডী ছাড়াচ্ছে, দিগন্ত বাড়াচ্ছে। বাঙলা থিয়েটার মূলতঃ বিলিতী থিয়েটারের কলমের চারা, মাটি তৈরী না হতেই মাটিতে লাগানো। মাটিটা তখনো ছিল যাত্রাগানের মাটি। যাত্রাগান প্রভৃতি ছিল গানে-নাচে-ভরা দৃশ্যকাব্য। কিন্তু একসময়ে বিলিতী নাটকও অনেকটা ওরকম ছিল মিরাক্‌ল্‌ প্লে, মিস্ট্রি প্লে। এলিজাবেথের যুগে বিলাতের জাতীয় জীবনে কর্মচাঞ্চল্য জাগাতেই সে-সব দৃশ্যকাব্য কর্মকাব্য—'এ্যাক্‌শন্‌ ড্রামা' হয়েছে। রঙ্গমঞ্চ আকৃতিতে প্রকৃতিতে বিকশিত হতে হতে হয়েছে থিয়েটার। কর্ম বা এ্যাকশন্‌-এ নাটকের প্রাণবস্তু। বাঙালি মনও প্রথম থেকেই পাশ্চাত্য 'এ্যাকশন্‌ ড্রামার' কর্ম-প্রাধান্যে সাড়া না দিয়ে পারে নি। তাই, 'বাঙলা থিয়েটার এই বিলিতী থিয়েটারের

কলমের চারা।' কিন্তু বাঙালির নতুন মনের মাটিতে। বাঙালী উপন্যাসও তাই, সাহিত্যেও তাই, জাতীয় পলিটিক্সেও তাই। মাটির গুণে তা বাড়ন্ত, মাটিটা নতুন হলেও দিশি। পুরনো নাচ-গানের ঐতিহ্যও বাঙলা থিয়েটার ছাড়াতে পারে নি, অথচ মেনে নিয়েছে কথায় দৃশ্যে এ্যাক্‌শন-ধর্মী বিলিতী নাটকই যুগের নাটক। বাঙালি জীবনের বহু জিনিসের মত তার বাঙালি যাত্রার সঙ্গে বিলিতী থিয়েটারের সম্পর্ক এরূপ ডায়েলেক্‌টিকাল। বিষয়ে-কথায় তার চাই একাত্মতা। আবার, সাধারণের ইল্যুশন বা চেতনাকে উস্‌কে দেবার প্রয়োজনে তার চাই পৃথকত্ব। বিলিতী থিয়েটারও নাচ-গানকে একদিনে বর্জন করে নি, একেবারে তো করার কথাই ওঠে না। অপেরা, মিউজিক্যাল কমিডি, প্রভৃতিতে অতি প্রাচীন নাচ-গানের ঐতিহ্যকে এরা নতুন করে মুক্তি দিয়েছে। প্রতিটি ধারার বিশিষ্ট প্রকাশ সম্ভব হয়েছে। বাঙলা ও বাঙলা থিয়েটার ততটা আধুনিক ধর্মে এখনো স্ব-প্রতিষ্ঠ নয়। একশো বছরেও তা হ'ল না। বাঙালি সাহিত্যাদর্শ অবলম্বন করতে পেরেছ, সমাজ জীবন আরও বিকশিত হলে নাটকও ওপথে সুপ্রতিষ্ঠিত হবে। তাই এ কথা সত্য নয় যে, থিয়েটার আমাদের জাতীয় জীবনে ভুঁইফোঁড় ব্যাপার। তা নব বলেই সমস্ত বাঙালি ইতর ভদ্রের নিকটে থিয়েটারের উৎকর্ষ প্রথম থেকে অবিসংবাদিত।—বরং যাত্রাগানই ক্রমে থিয়েটারের পথে এগিয়ে এল। আসল কথা, থিয়েটার তো জাতীয় জীবনেরই একটা অঙ্গ। আমাদের জাতীয় জীবনটাই যে এখনো আধুনিক যুগধর্মে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পাচ্ছে না। প্রতিষ্ঠিত হতে না-হতেই সে ভাঙ্‌ছে—এবং ফিরে ফিরে গড়তেও চাইছে। তবু গড়াটা ভাঙার থেকে একটু বেশি জোরদার।

নোয়াখালিতে পঞ্চাশ বছর আগে (১৯১৮-'১৯), আমরা যখন থিয়েটারে মাতি তারও এক পুরুষ আগেই, 'টাউন হল' বা পৌর-ভবন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আর সে 'হল' তখন থেকেই নাট্য-ভবনও, নর্মভবনও এবং গ্রন্থ-ভবনও। যথার্থই মিলনভবন। ছোট হলেও চমৎকার সেই টাউন হল—বাগানে ঘেরা বাড়ি, প্রশস্ত পোর্টিকো, সুরম্য ও সুদৃশ্য ভবনগৃহ। আমরা আজন্ম জানতাম টাউন হল অর্থ সাধারণের সভাগৃহ ও অভিনয়-গৃহ। পশ্চিমের বারান্দা থেকে হল-এ ঢুকলেই অন্য প্রান্তে (পূর্বে) পাকা স্টেজ্, সিন্ প্রভৃতি। আর প্রবেশস্থলের উপরে দেড় তলায় হলের সিকি বা দু-আনা জোড়া মেয়ে ও শিশু-দর্শকদের জন্য নির্দিষ্ট স্থান। অন্ততঃ এক পুরুষ ধরে ও শহরে 'ড্রামেটিক ক্লাব' পাকা। কেরানি-কর্মচারী ভদ্রলোকরা মিলে বছরে দু'চার বার অভিনয় করেছেন। 'মৃণালিনী'র পরে 'দুর্গেশনন্দিনী' 'হরিশ্চন্দ্র' থেকে তাঁরা ক্রমে 'চন্দ্রগুপ্ত' এসে পৌঁছেছিলেন। কলকাতার সাধারণ থিয়েটার তাঁদের আদর্শ।

অবশ্য ঢাকায়ও তখন একটা সাধারণ থিয়েটার ছিল। সেখানকার 'পেন্টার'রা পূর্ববাঙলার মঞ্চের জন্য 'সিন' আঁকত। একবার আমিও ঢাকায় অভিনয় দেখেছি। বোধ হয় ১৯১৩ সাল (?), নাটকখানা 'সরলা'। কণক সরোজিনীর অভিনয় মনে হয়েছিল অপূর্ব। অবশ্য মনে রাখতে হবে, আমার বয়স তখনো এগারো-বারো। 'অপূর্ব অভিনয়ে'রও সাধ্য হয় নি ঘুমকে একেবারে ঠেকিয়ে রাখে। কলকাতার বাইরে ভারতবর্ষে (১৯১৪-১৫ সালে) আর কোথাও সাধারণ থিয়েটার ছিল না; এ কথাটা চালু আছে। ঢাকায় কিন্তু ছিল, মেদিনীপুরেও নাকি ছিল, এসব ভোলা ঠিক নয়। শহরে ও জেলায় সৌখীন থিয়েটার দল তখন বঙ্গভূমিতে সর্বত্রই ছিল রঙ্গশালা। জমিদারদের ও ভদ্রলোকদের চেষ্টায় অনেক গ্রামেই স্টেজ বেঁধে নাটক অভিনীত হ'ত, অর্থাৎ 'থিয়েটার' হ'ত, তবে কলকাতা তাদেরও আদর্শ। গিরিশ ঘোষ, অমৃত বোসের পরে দ্বিজেন্দ্রলাল, ক্ষীরোদপ্রসাদ তাদেরও নাট্যকার। দু'এক বছর পরে পরে নোয়াখালির ড্রামেটিক ক্লাব্ এক একজন সুদক্ষ এ্যাক্টরকে পয়সা দিয়ে কলকাতায় পাঠাত বিশেষ কোনো নতুন নাটকে সে দু-এক রাত্রি অভিনয় দেখবে। সেই নাটক্ পরে এ শহরে তারা অভিনয় করবে, দর্শক-সদস্যের নির্দেশ মতো। সে সব অভিনয় সামান্য দেখেছি। যা দেখেছি তখন মনে হ'ত তা অসামান্য। কেদার দাশগুপ্ত মশায়ের অভিনয়ের গলাও যেমন গানের গলাও তেমন। অমর দত্ত (গ্রামোফোনে শোনা) তখন এ্যাক্টিং-এর আদর্শ। তা যদি হয় তা হলে মানতে হবে কেদারবাবু এ্যাক্টর বটেন। এর সঙ্গে ভাবুন তখনকার সেই সাজ-সজ্জার মোগ্‌লাই জাঁকজমক, সেই চুমকি দেওয়া রাজার (বাদশাহী) পোশাক, মন্ত্রীর পোশাক, স্টেজের-চাপকান পরা সেনাপতি সৈন্য-সামন্ত; আর পেশোয়াজ-পরা রানীরা সখীরা। আর অদ্ভুততর নোয়াখালি-মঞ্চের সেই 'ড্রপ্‌সিন্'—রাজপথ, রাজপ্রাসাদ, বাগানবাড়ি, নদী, পর্বত, স্টীমার, নৌকা ? --সে ড্রপসিনে কী নেই। তাতে রূপকথার রাজ্য চোখে দেখতাম। বলা বাহুল্য, যাত্রাগানে এত চমক নেই—সাজ-সজ্জা এ ধরনেরই, তা ছাড়া তা স্টেজ নয়, চারদিক খোলা, তাই চমক নেই। যাত্রার আসরের চারদিকে উৎসাহ, কলরব, হর্ষধ্বনি সব অবারিত। আমাদের ছেলেবেলায় পূর্ববঙ্গের যাত্রাগান সত্যই যাত্রাগান ছিল। তার মর্যাদাও ছিল। 'ঘোষালের দল' ছিল সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। চাঁদপুরের উমানাথ ঘোষাল, আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ভদ্রলোক, দলে দুর্নীতি বরদাস্ত করতেন না। সে দলের গীত ও অভিনয়ও ছিল সুপ্রসিদ্ধ। স্বদেশীর সময়ে 'ফুলারি আমলে' 'মীরাবাঈ' পালা বন্ধ হ'ল—ও পালার বিরুদ্ধে মুসলমানরা আপত্তি

করেছিলেন। মুকুন্দ দাসের যাত্রার পালায় ছিল সরাসরি 'ফুলারি' আপত্তি। সে পর্বের শেষে মাঝারি ধরনের যাত্রা পার্টি ছিল ব্রজকান্তের ও কালীনাথের। শেষদিকে মুকুন্দও একবার এসেছিল। তখন তার অবলম্বন 'সামাজিক' পালা, সমাজ-সংস্কার উদ্দেশ্য। দু-একবার বারোয়ারিতে শহরের কোনো 'পাড়া' এনেছে 'কবিগান', এক-আধবার 'ঢপ্'; আর (বোধ হয় ১৯১৬ আন্দাজ) দোলের আসরে বাঈজীর নাচ-গানও হয়েছিল। ঢপ্ ও 'বাঈ-নাচ' অবশ্য আমাদের পক্ষে 'আউট্ অব বাউণ্ডস'। স্বদেশী যুগের পরে যুবকদের পক্ষে অচিন্ত্যনীয়ও—তখন আমরা স্বদেশীদের ক্ষুদে সাকৃরেদ। স্কুলের বার্ষিক সম্মেলনে হয় গান, আবৃত্তি, কদাচিৎ নৃত্য; শেখাতে আসবেন কেদারবাবু, সম্মানিত সেরা অভিনেতা। সে আবৃত্তি, সে মহড়া প্রতিদিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুনেও মুগ্ধ হতাম। দাদার তাতে নাম ও নেশা ছিল। রূপে গুণে আমার স্থান নগণ্য। অভিনয়ে জন্মাবধি পেয়েছি কোকিলের বপ, তাতে কি? সবুজ সঙ্ঘের অভিনয়ে কখনো হাস্য কৌতুকের ভূমিকায় ছিলাম অল্‌সো রেন্ (also ran)।

নাট্যধারার এই নাতি-নাটকীয় পারিপার্শ্বিকে 'সবুজ সঙ্ঘে'র আবির্ভাব। মফঃস্বলের নাট্য চেষ্টায় সত্যই তা অভিনব। অভিনেতারা সবাই ছাত্র। তখনো শিশির ভাদুড়ীর পর্ব আসে নি। অবশ্য ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউটে তার বোধন হয়েছে। বাঙলা স্টেজের 'ইউনিভার্সিটি উইট্‌স্' ছিলেন শিশির ভাদুড়ী, নরেশ মিত্র, রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। তাঁদের 'চন্দ্রগুপ্ত' অভিনয় পোশাকে যুগান্তরের আভাস দেয়। কিন্তু সাধারণ রঙ্গালয় তাতে নির্বিকার ছিল। অভিনয়ে যুদ্ধজয়ের উৎসবে (১৯১৯-২০) ইডেন গার্ডেন-এর প্রদর্শনীতে শিশিরবাবুর নেতৃত্বে সীতার অভিনয় সর্বসাধারণের প্রধান দর্শনীয় হয়ে পড়ে। ম্যাডান্ কোম্পানি তখন ফিল্‌ম-এর সঙ্গে বাঙলা নাট্যাভিনয়েও মুনাফার আঁচ পেল। ম্যাডান-থিয়েটারের আহ্বান অধ্যাপক শিশিরকুমারকে নিয়ে এল পেশাদারী রঙ্গমঞ্চে। তারপরেই 'নাট্যমন্দিরে' দেখা দিল শিশিরবাবুর স্বকীয় উদ্যোগ, যোগেশ চৌধুরী মহাশয়ের 'সীতা' নাটক নিয়ে। প্রায় একই সময়ে 'স্টারে' আর্টস্ থিয়েটার্স-এ (স্টারে) তিনকড়িবাবু, অহীন্দ্র চৌধুরীদের 'কর্ণার্জুনে' প্রকাশ। দু'য়ে মিলে বাঙলা থিয়েটারে ঘটে পর্বান্তর। এটাই বাঙলা রঙ্গমঞ্চে 'ইউনিভার্সিটি এ্যাক্টর' পর্ব বলে পরিচিত। যদিও বিশ্ববিদ্যালয় তার এই প্রাক্তন ছাত্রদের বিশেষ খোঁজও নিত না।

'সরস্বতীর দুটি মন্দির'—আমাদের অভিনয়ের উৎসাহদাতা ডঃ ভৌমিকের কথা। 'একটি বিদ্যামন্দির, অপরটি নাট্যমন্দির।' থিয়েটারের নামে তিনি

পাগল ছিলেন। কথাটা একটুও মিথ্যা নয়। শিশিরবাবুদের আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ ছিল কোনো নাট্যরথীর ? ছিল না। গিরিশবাবুরা সরস্বতীর আশীর্বাদ পেয়েছিলেন নাট্যশালায়, বিশ্ববিদ্যালয়ে নয়। নাটকের নেশা কী ভাবে প্রতিভার আত্মপ্রকাশ সম্ভব করে গিরিশ ঘোষ, অমৃত বোস প্রভৃতি তার প্রমাণ। বিনোদিনী প্রভৃতি অভিনেত্রীরা তার আরও বড় প্রমাণ। কারণটা এখনো বোঝা যায়—সেদিনে নট-নটীদের সুনাম এবং সম্মান আমাদের সমাজে ছিল দুর্লভ। দুর্ভাগা দেশের দুর্ভাগা ট্র্যাডিশ্যান্। 'চরিত্র' বলে কোনো জিনিস থাকলে অভিনয়ে নামতে নেই। ঠাকুরবাড়ি বোধ হয় তা অগ্রাহ্য করেছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জন্যই সে বাড়িতে নাট্যাভিনয়ের প্রাদুর্ভাব। কিন্তু থিয়েটার ছোঁয়াচে ব্যাধি। রবীন্দ্রনাথ কত কবিতা, গল্প-উপন্যাস লিখেও পারলেন না নাটকের নেশা ছাড়তে, অভিনয়ের নেশা কাটাতে। কিন্তু তাঁদের বাড়ির অভিনয় ছিল অনেকটা গোষ্ঠীগত,—শিল্প সৌখীনতা, একটা আভিজাতিক বিচ্ছিন্নতা ও আত্মপ্রবঞ্চনা তাঁদের ছিল। ১৮৭২-এর সাধারণ রঙ্গমঞ্চ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্পর্শবঞ্চিত, আবার ঠাকুরবাড়িরও তা অগ্রাহ্য। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ব্যতীত ঠাকুরবাড়িও সাধারণের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করে নি। নেশাকে পেশা করতে তাঁদের রুচি হ'ত না। প্রয়োজনও ছিল না। আসলে নেশা ও পেশার মিলনেই রঙ্গমঞ্চের বিকাশ সুসম্ভব। পেশাদার নট-নটী ও নাট্যকাররা সামাজিক মর্যাদা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ না পেয়েও বাঙালি নাট্যশালা গড়ল, চালু রাখল। কিন্তু বাঙলা সংস্কৃতির নাট্য-প্রস্থান ওভাবে গড়ে তোলা সম্ভব হ'ল না।

নোয়াখালিতে আমরা যখন নাটকে মাতি তখনো শিশির ভাদুড়ী সাধারণ রঙ্গমঞ্চে যোগদান করেন নি—তবে তখন সন্ধিক্ষণ। ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউট-এর অভিনব রীতি-পদ্ধতি সাধারণ-লভ্য ও সাধারণ-গ্রাহ্য হয়ে উঠতে একটু দেরী ছিল। চার-পাঁচ বৎসর পরেই কলকাতায় দেখা দিল একদিকে 'নাট্যমন্দির' অন্যদিকে 'আর্ট থিয়েটার'। অবশ্য দুয়ের বাইরে রবীন্দ্রনাথের 'বর্ষামঙ্গল', 'শারদোৎসব', 'বিসর্জন' প্রভৃতি অসাধারণ আয়োজনও ছিল। কিন্তু সাধারণ রঙ্গমঞ্চে এই ইউনিভার্সিটি-ছাত্রদের আবির্ভাবে বাঙলা নাট্যজগতে এল যুগান্তর, যা 'ডাকঘর' 'ফাল্গুনী'র অভিনয়ও আনতে পারে নি। ইংরেজি সাহিত্যে 'ইউনিভার্সিটি উইট্‌স্'দের দানে এলিজাবেথীয় উজানের সূচনা—যে উজানে শেক্‌সপীয়রের সমুদ্ভব। কিন্তু আমাদের সাহিত্যে নাট্যশিল্পে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ততটা গৌরবের দাবী করতে পারে না।

সাময়িক বিষয়ের নাটকে প্রথম যুগে দর্শকদেরও 'নাটুকেদের' মতই ছিল

আগ্রহ। রাজনৈতিক চেতনাও তাদের তখন কম প্রবল ছিল না। রাজনৈতিক নাটকের দুঃসাহস পুলিশই দমন করলে ; উপেন দাসের দুঃসাহসই তার উপলক্ষ, লোকটা বিদ্রোহী। পুলিশ আইনে সামাজিক নাটকও প্রায় ব্যাতিক্রম হয়ে পড়ল। বিশেষ করে, মঞ্চের মালিকরা পুলিশকে মান্য করে,—তারা লোকসান দেবে ? 'কুলীনকুলসর্বস্ব'র ঐতিহ্য ছেড়ে পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক বিষয় রঙ্গমঞ্চে তখন প্রশস্ত হয়ে ওঠে। সাহিত্যের মতোই তখন ঐতিহাসিক নাটক রোমান্সের ও রাজনীতির ঝোঁক মিটিয়েছে। পুরু বা পৃথ্বীরাজের নামে ধোঁয়ার ছল করে পরাধীন বা নিঃপীড়িতের চোখের জল ফেলা যায়। পৌরাণিক নাটকে বিষয় বলে নটজীবীদের পক্ষে প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসেরও আশীর্বাদ লাভ সম্ভব। এভাবেই বাঙলা সাধারণ রঙ্গমঞ্চ বাঁকা-চোরা পথে সমকালেরও জনসাধারণের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করেছে, তা সত্য। গিরিশবাবুরা দুঃসাধ্য সাধন করেছিলেন—অনাবাদি জমিতে ফসল ফলানো। রবীন্দ্রনাথও অসাধ্য সাধন করছিলেন—অবশ্য 'টেরেস্ গার্ডেনিং'-এ—সেটা নাট্যাভিনয়ের পাব্লিক পার্ক নয়। কিন্তু পুলিশের চোখ, ধার্মিকতার ঝোঁক ও শেষদিকে হিন্দু-স্বাজাত্যের প্রবল প্রভাব—এসব নানা রকমের হেরফেরে বাঙলার জাতীয় নাট্যধারা সুস্থপথে সৃষ্টি হতে পারে নি—না অভিনয়ে, না নাটক-রচনায়, না নাট্য-চেতনায়,—অথচ চেষ্টা চলেছে আজ প্রায় একশ বছর।

প্রাণ আছে, কিন্তু স্ফূর্তি ব্যাহত—এমনিতর রঙ্গমঞ্চে ইউনিভার্সিটি আর্টিস্টরা সুস্থ রোমান্টিক প্রাণস্ফূর্তির সম্ভাবনা নিয়ে এসেছিলেন, বিশের দশকে। তাও সার্থক হয় নি। অভিনয়ে তাঁরা যুগান্তর ঘটান। তবে তা রোমান্টিক ধারায় অভিনয়। ব্যক্তির কলাকৃতিত্ববাদী 'সীতা' 'কর্ণার্জুন'-এর রোমান্টিক চমক যতটা চোখ ভুলাল, 'চিরকুমার সভা', 'শেষরক্ষা' 'ষোড়শী' ততটা মন ফিরিয়ে আনতে পারল না। বরং 'নটীর পূজা'র পরে 'চিত্রাঙ্গদা', 'চণ্ডালিকা' মার্জিত মন কেড়ে নিলে—'নৃত্যনাট্য' নতুন পথ খুলল। নাট্য জগতে রোমান্টিক ধারাই প্রবল থাকে। 'নবান্নে'র অভিনয় বাঙলা নাট্য-ধারার অনাবিষ্কৃত প্রাণ-উৎসের প্রথম সন্ধান দিল—রোমান্টিক ধারা থেকে বাস্তবে ফেরা।—লোকজীবনই নাটকের উৎস। নাটকের শিল্পকলা—বিচিত্রের সমন্বয়ে ঐক্যের স্ফূর্তি। বাঙলা নাট্যসাধনায় 'নবান্ন' আনে এই বোধ, তা তৃতীয় পর্ব। বলতে বাধা নেই—সেই চেষ্টাও সম্পূর্ণ সার্থক হয় নি। বড় দ্রুত গণনাট্য সঙ্ঘ ছড়িয়ে গেল, গঠনের স্তর পেরুবার পূর্বেই। ছিন্নমূল বাঙালির জাতীয় জীবনই এখন আত্মভ্রষ্ট। তার মধ্যেও তবু টিঁকে আছে বাঙলা থিয়েটার, বাঙলা ফিল্‌ম্, আর জন্মান্তরিত নতুন যাত্রা। দেশবিভাগের পরেও বাঙালি

প্রতিভা অভিনয়কলার ক্ষেত্রেই বিশিষ্ট আত্মপ্রকাশে সার্থক হয়েছে। এসব দেখে এমন আশাও হয়, এবার হয়তো বাঙালি সত্যই নতুন নাটকেরও সৃষ্টিমন্ত্র আয়ত্ত করতে পারছে।

পাদপ্রদীপের আলোকে

শিশির-যুগের প্রাক্‌ক্ষণে নোয়াখালিতে 'সবুজ সঙ্ঘে'র প্রকাশ,—তখন সন্ধিক্ষণ। বছরে একটি করে নাটকের অভিনয়। আর সবুজ সঙ্ঘের কালের হিসাব হয় অভিনয়ের নাম দিয়ে। দুর্গাদাসের বৎসর, রাণাপ্রতাপের বৎসর, মেবার পতনের বৎসর, সাজাহানের বৎসর, বঙ্গে রাঠোরের বৎসর, চন্দ্রশেখরের বৎসর, বিসর্জনের বৎসর, আর শেষে 'সীতা'। মাস দেড় দুই মহড়ার নাম করে অভিনয়ের প্রস্তুতি চলত—অর্থাৎ ঢিলেঢালা মহড়া। অভিনয় তো নয়, যেন দুর্গোৎসব। আগমনীর আগে থেকে তার আয়োজন, বিজয়ার পরেও তার বিস্তার। অথবা হিন্দু বাড়ির বিয়ে—পাকা দেখা, গায়ে হলুদ, কত তার আয়োজন। নাটক ঠিক করা, পাকা দেখা, তারপর মহড়া। মহড়ার প্রথম-দিকে টাউন হলের স্টেজে হ'ত সকালবেলা—অর্থাৎ বেলা ১০।১০॥টা থেকে ১।১॥টা। মহড়ায় দাদা (রঙ্গীন হালদার) শিক্ষক। দাদা কিন্তু আশ্চর্য ভালো শিক্ষক ছিলেন—মেয়ে-পুরুষ সকল ভূমিকা সমান ভাবে শেখাতে সমর্থ। আর একটা কথা এ প্রসঙ্গেই বলি, প্রথম থেকে তিনি সর্বদিকে দলের কেন্দ্র পুরুষ। অভিনয় নিয়েই তাঁর নাম হয়ে গেল 'কর্তা'। পরিহাসের ছলে শব্দটার প্রথম প্রয়োগ হয়েছিল; শেষে তাই হয় প্রায় পরিচয়। শুরুটা হয়েছিল এভাবে। 'চন্দ্রশেখর' নাট্যাকারে অভিনয় হবে। নাটকে গুরগন্ খাঁ ঈর্ষাবশে বলছে, 'আমি কে? কেউ না। বাঙলার কর্তা মীরকাশিম। আমি তার ভৃত্য।' রঙ্গচ্ছলে কে বললে, 'কর্তা রঙ্গীন হালদার, আমরা তার ভৃত্য।' রঙ্গটা পাকা হয়ে গেল, সবশুদ্ধ জন ৪০।৫০ তার অনুচর। এভাবে তাঁর কর্তা নামই চালু হয়। নাটকের আড্ডার নাম মহড়া, দিনে পুরো একটা অঙ্কের মহড়াও হয়ে ওঠে না। ঢিলে-ঢালা ব্যাপার। কোনো কোনোদিন কেউ আসে, কেউ যায়—দু'-একজন 'জলত্যাগে' যায়। অর্থাৎ সিগারেট খাবে কর্তার আড়ালে। ও নিয়ে তাদের 'পিছনে লাগা' বন্ধুদের একটা কাজ। শেষ দিকটাতে 'কর্তা' তো (আশু গুহ রাজাকে) স্পষ্টই বললেন—'না, এখন তোরা বড় হয়েছিস, আমার সামনেই জলত্যাগ করবি।' আশু গুহ রাজা বলেন, 'সে কি কর্তা, আপনি কি ভ্রান্ত হলেন নাকি, ওদের কথা শুনে?' কর্তা কিন্তু 'ভ্রান্তই' হলেন—আর ওই 'ভ্রান্ত হলেন

নাকি' কথাটাও আমাদের দলের আর একটি 'কোড্' ফ্রেজ্ (পরিভাষা) হয়ে রইল। আশু রাজার আর 'বাইরে যাবার' অনুমতি মিলল না, কর্তার পিছনে গিয়ে সিগারেট খেতে হ'ত—যেমন নাকি রবীন্দ্রনাথের অনুমতি সত্ত্বেও শরৎবাবু তাঁর পিছনে বসেই সিগারেট খেতেন। আশু রাজার আপত্তি ছিল—পরীক্ষায় পাশ করি না, সিগারেট খাচ্ছি, ডাক্তার সেন দেখে ফেলবেন—বাড়িতে লাগাবেন। ভয়টা বাড়ির লোকদের নয়, তারা এতদিনে ছেলের অভ্যাস বুঝে ফেলেছেন। ভয়টা ডাক্তার সেনকে। ডাক্তার সেন আশ্চর্য মানুষ, সকলের হাঁড়ির খবর রাখেন। এবং শুধু রাখেন না, শহরের বাকী সকলের সঙ্গে সে খবর আলোচ্যের বিষয় করে ছাড়েন। তিনি সে হিসাবে শহরের পুরুষ পার্দিপিসি, হি-গেজেট্। আমাদের ওসব বিষয়ে রুচি নেই, বরং তাচ্ছিল্য আছে small town-এর small talk-এ। কিন্তু আমরাও সম্ভব হলে ডাক্তার সেনের সঙ্গে কথা পাড়ি। ডাঃ সেন স্বয়ং এবং তার খবর ও মন্তব্য সবই আমাদের রঙ্গমিশ্রিত হাসি-তামাশার উপাদেয় উপকরণ। আমাদের মুখে মুখে সে-সবও ফিরত। যাক্, নাটকের মহড়ার কথা হচ্ছে। সকাল বেলার মহড়ার নামে আড্ডা চলত। পরে নাটকের মহড়া। আবার হ'ত কখনো সন্ধ্যায়, খেলার শেষে, বা নদীর পারের আড্ডার শেষে, দ্বিতীয় দফা। নদীতে আমাদের অনেকের বাড়ি ভেঙে গেলে টাউন হল একটু দূর হয়ে পড়ল। তখন আমাদের বৈঠকখানায় মহড়া চলত। সময়ে সময়ে খাওয়া দাওয়া সেরে এসে মহড়া চলত রাত্রি বারোটা অবধি। পাশের ঘরে পরিচারক 'রজনী ভাই' সারাদিনের শেষে ঘুমোবেন। কিন্তু মহড়া শুনে মজা পেয়ে কখনো ঘুম ভুলে যান, কখনো বিরক্ত হয়ে দু' একটা মন্তব্য করেন। যেমন, একবার মহড়া হচ্ছে, বোধহয় প্রেমিক-প্রেমিকার পূর্বরাগের আলাপ। প্রেমিক বলছেন, 'তুমি আমাকে প্রভু বলে ডেকো না।' প্রেমিকা বলছেন, 'তবে তোমায় কি বলে ডাকব?' 'রজনী-ভাই' ও ঘর থেকে বললেন, 'বাপ বলে ডাক্।' অপ্রত্যাশিত সে মন্তব্যে আসরে হাসি পড়ে গেল। মহড়ায় ছেদ পড়ে, আবার মহড়া আরম্ভ হতে অনেক সময় যায়। এমনি করে প্রথম দিকটায় মহড়া গড়িয়ে গড়িয়ে চলে, শেষ দিকটায় পড়ে যেত তাড়াহুড়ো। নিমন্ত্রণ-পত্র ছাপাও, প্রোগ্রাম ছাপাও, আয়োজন পত্র দ্যাখো, সাজসজ্জা, পোশাক-পরিচ্ছদ ঠিক করো, 'গানের দৃশ্যের ভালো রিহার্সেল চাই,' নারী-ভূমিকা আরও দোরস্ত করা দরকার।' 'এ সিনটা জমানো চাই,' 'ও সিনটা ঠিক হচ্ছে না'—এমনি তখন বিয়ে বাড়ির হৈ-চৈ কাণ্ড।

সত্যই বিয়ে বাড়ির কাণ্ড। অন্য বিয়ে নয়, হিন্দু বিয়ের।

একদিনে শেষ হয় না। বাসি বিয়ে আছে, আছে তার পরেও তার জের। সবুজ সঙ্ঘের আগে শহরে ড্রামেটিক ক্লাব টিকেট বিক্রি করে অভিনয় করত, অভিনয়ের খরচ তোলা চাই। আমরা দেখলাম ওভাবে খরচ ওঠে না ; জাত যায়, পেট ভরে না। আবার দেখবার ইচ্ছা থাকলেও অনেকেই দেখতে পায় না। আমরা প্রথমেই ঠিক করলাম—সব খরচ তুলব চাঁদা তুলে। নিশ্চয়ই তার জন্য মুখাপেক্ষী হতে হ'ত একটু অবস্থাপন্ন মানুষের, শহরের বড় চাকরেদের ও অন্য ভদ্রলোকদের কাছে। কাজটা সহজ নয়, দুঃসাহস—নিমন্ত্রণ করব শিক্ষিত সকলকে। দেখা গেল, তাতেও বাধা। মেয়েদের দেখতে হবে দেড়তলার ছোট্ট বলকনি বা 'খাঁচা' থেকে। কারণ, 'হল'-ভর্তি থাকবে পুরুষরা। দেড়তলা থেকে ক'জন মেয়ে দেখতে পাবেন ? ঠিক হ'ল অন্ততঃ দু'দিন অভিনয় হবে। প্রথম সন্ধ্যায় মহিলারা—ফার্স্ট নাইট্, লেডিজ ফার্স্ট, দ্বিতীয় সন্ধ্যায় ভদ্রলোকেরা। তার মানে স্বীকৃত হ'ল মেয়েদের একটা বিশিষ্ট ব্যবস্থা, স্বতন্ত্র সত্তা ! আমাদের দুঃসাহসে সবাই অবাক। কিন্তু আমাদের এ কাজে নোয়াখালির নাট্য-ইতিহাসে যুগান্তর এল, কিছুটা সামাজিক চালেও। নাটক সম্বন্ধে শহরে জাগল দারুণ আগ্রহ। মহিলারা তো দু'হাত তুলে আশীর্বাদ করলেন। সারা বৎসর তাঁরা অপেক্ষা করতেন অভিনয় দেখার জন্য। পুকুর-ঘাটে নয়, হল-এ, চিক না টাঙিয়ে, স্বাধীনভাবে, তারা বস্‌ছেন, দেখছেন, পরস্পর গল্পও করছেন। আবার মা-মাসী বোন্ বউদিদেরই উপর মেয়েদের সকলের তদারক করবার ভার, কমপ্লিট ফ্রেঞ্চাইস। ও শহরে ফেমিনিজম্-এর সূচনা করল থিয়েটার। মজার কথা, বাড়ির কর্তারাও নেহাৎ অপ্রসন্ন নন, হাজার হোক, নিজেরাও নিমন্ত্রণ পান। দেখুক বাড়ির মেয়েরা, অন্ততঃ পয়সা খরচ নেই—তাতে গৃহশান্তিও বরং বজায় থাকছে।

অথচ ১৯১০।১১ থেকে নোয়াখালি শহর মেঘনার মুখের গ্রাস। তার পক্ষে কোনো দিকে কোনো নতুন সঞ্চয় সম্ভব নয়। সব বিষয়েই বাধা—নদীতে শহর ভাঙছে। তাই সত্যই তার বৈষয়িক দৈন্য অপরিমেয়, ভবিষ্যৎ কেন, বর্তমানও অন্ধকার। শহরে বিজলী আলোও নেই। কারবাইড্ গ্যাস আর ডে-লাইটে মিলে স্টেজের অভিনয়কে তমসা থেকে জ্যোতিতে নিয়ে যায়। টর্চলাইট দিয়ে বিদ্যুৎ চমক দেখাতে হয়। ভাঙা প্যাকিং বাক্স ও মামুলী কুর্সী-কেদারা পুরনো ভেলভেটে ঢেকে দেখাতে হয় কখনো 'দেওয়ানী আম' কখনো ঔরঙ্গজেবের শিবির বা সূজার রঙ্গ-মহাল। এমনি সব সেকেলে অবস্থা' ও ব্যবস্থা। তখনো সৌখীন থিয়েটারে স্ত্রীভূমিকা মেয়েদের অভিনয় করা অভাবনীয় কাণ্ড। রবীন্দ্রনাথেরও যা নাটক এ সময়টাতে লিখিত ও অভিনীত

হ'ত তাও প্রায়ই নারীভূমিকা-বর্জিত। অবশ্য তাঁর নির্দেশনায় 'বসন্ত', 'বর্ষামঙ্গল', 'বিসর্জন', ক্রমশঃ এদিকে পরিবর্তন আনতে থাকে। আর, সত্যই শেষদিকে এ সময়টাতেই বাঁধ ভাঙল। প্রথম বোধহয় ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটের আসরে একা নৃত্য দেখান রেবা রায়। প্রশংসা ও নিন্দা দুই-ই পেলেন। দুয়েরই হেতু তাঁর নৃত্য-নৈপুণ্য অপেক্ষা তাঁর দুঃসাহস। প্রসঙ্গক্রমে বলি, প্রায় ত্রিশ বৎসর পরে একদিন একটা কলেজীয় সংস্কৃতি উৎসবে দেওঘরে 'সাহিত্য করতে' গিয়েছি। একা বাড়িতে সকালে ঘুম ভাঙার পরে চায়ের জন্য প্রতীক্ষমাণ। বোধহয় ফাল্গুনের প্রভাত, রৌদ্র ও মৃদু হাওয়া খড়খড়ি ধরে ঠেলাঠেলি করছে, ঢুকতে চায়। কিন্তু একি! খড়ম পায়ে, গেরুয়া শাড়ি-জামা-চাদরে যিনি আপনা থেকে দুয়ারে এসে আমাকে স্বয়ং সম্ভাষণ করলেন তিনি সেই একদা নৃত্যশিল্পী রেবা রায়। স্বামীশুদ্ধ তখন তিনি দেওঘর-বাসিনী। কোনো দিন আগে সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল না। স্বচ্ছন্দ, মধুর-স্বভাবা এবং সর্বরূপ গর্ব-দেমাক বর্জিতা, (সেই বয়সেও) দেখতে তন্বী মহিলাটি তখনো সত্যই নৃত্যশিল্পীর মতই মেদবাহুল্যহীনা, শ্রীমণ্ডিতা। তখনি শুনেছিলাম তিনি নিঃসন্তানা; পরে জেনেছি তিনি সন্ন্যাস নিয়েছেন। স্বচ্ছন্দ গতি ও ও স্নিগ্ধ অমায়িক স্বভাব, কিন্তু চপল প্রকৃতি তো একেবারেই নন। কোনোদিন কি অত 'সাহসিকা' ছিলেন? হতেও বা পারে। একদিন বাঁধ-ভাঙার কাজে ছিলেন অগ্রণী; আর-দিন সংসারের এলেকা পেরিয়ে নতুন ডাঙার দিকে যাত্রায়ও অগ্রবর্তিনী. তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। আমি কিন্তু তাঁর নৃত্য দেখি নি। তাঁর সাহসেই বোধহয় প্রকাশ্যে মঞ্চে বাঙালি মেয়ের নৃত্যারম্ভ। রবীন্দ্রনাথের 'নটীর পূজা' কিছু পরে প্রথম অভিনীত হয় শান্তিনিকেতনে; বাঙালি সংস্কৃতিতে তখন থেকে নৃত্যকলার যথার্থ উদ্বোধন --সে পরেকার কথা, বোধহয় ১৯২৭।২৮ (?)-এর। এখন তো 'নাচ' ছাড়া কোনো সভা-সম্মেলনই ডাকা যায় না। আমাদের সেদিনে সৌখীন নারীভূমিকা অভিনয়েও মেয়েদের যোগদান ছিল অসম্ভব।*

এ প্রসঙ্গে একটা কথা জিজ্ঞাস্য। পুরুষের পক্ষে নারী-চরিত্রের অভিনয়

* কলিকাতায় ১৯৩০ অবধিও দেখেছি সৌখীন নাট্যদলে নারীর পার্ট পুরুষ-অভিনীত হ'ত। ১৯২০-এর আগে ও পরে নোয়াখালিতে আমাদের গত্যন্তর ছিল না, অন্যত্রও এ কাজটা অসম্ভব ছিল। এখন (১৯৭৪-এ) চমৎকৃত হয়ে দেখছি—সংবাদটা ভুল। ১৯৭২-এর রঙ্গমঞ্চ শতবার্ষিকী উপলক্ষে মেদিনীপুরের নাট্য আন্দোলনের বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে। মেদিনীপুরে প্রায় প্রথম থেকেই স্ত্রী-ভূমিকায় স্ত্রীরা অভিনয় করত।

নিশ্চয়ই দুঃসাধ্য। শুধু রূপে নয়, কণ্ঠে নয়, সংলাপের ভঙ্গিতে, চলনে-বলনে নারী-পুরুষের ধরন পৃথক্। নারীর ভূমিকা নারীরই অভিনয় করা স্বাভাবিক—এ বিষয়ে প্রশ্ন নেই। কিন্তু সমস্ত অভিনয় জিনিসটাই তো এক অর্থে যে যা-নয় তা সাজা, অন্য কিছু রূপায়ণ। ছলনা কি ? না, তা নয় ; যা সম্ভাব্য তাকে নিজের মধ্যে গ্রহণ ; গ্রহণ করে নিজের সৃষ্টিশক্তি দিয়ে শিল্পসত্য করে তোলা। অভিনেতার প্রকৃতির ওপরে তার সত্তার আত্মাবিষ্কার। আমরা পুরুষেরা কেউ রঘুবংশের রাম নই, মোগল সম্রাট সাজাহান নই। নিতান্তই একালের মধ্যবিত্ত বাঙালী,—অভিনয়কালে দর্শকেরাও তা মেনে নেয় ; তাই আমরা সে-সব ভূমিকা অভিনয় করি ; কারও কারও তা মানিয়েও যায়। ওসব চরিত্র-ভূমিকা নিজেরা আত্মস্থ করে তাতে আবার প্রাণ দিই। তা হলে আমাদের কারও কারও পক্ষে সীতা বা নূরজাহানের ভূমিকাকেই বা ওরূপ রূপদান অসম্ভব হবে কেন ? সৃষ্টিশক্তি দিয়ে সে-সব ভূমিকায় প্রাণ দিলে তা কি অচল হয় ? অনেক সময়ে হয় ; একটা মাত্রার বেশি পুরুষের পক্ষে মেয়ের মত চলা-বলা সম্ভব নয়। তবু আপাতদর্শনে বেশি ঘাটতি না হলে দর্শক মোটামুটি মেনে নিতে পারে। তাই তো বহুকাল বহুদেশে সে বাধা স্বীকার করেও নারীভূমিকা পুরুষ অভিনয় করেছে,—শেকস্‌পীয়রের যুগের কথা, চীনের অভিনেতাদের কথা না বললাম। বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে পৃথিবীর সব থেকে বেশি অভিনীত নাটক চা-চিন-চো (২.২৩৮-রাত্রি)। সে অভিনয় এশিয়ায় আমেরিকায় সর্বত্র অভিনন্দিত হয়েছে। তার নায়িকা-ভূমিকা অভিনয় করতেন এক চীনা নটশ্রেষ্ঠ (মা ফা লাং ?)। হয়তো সে একটা ব্যতিক্রম। অবশ্য সারা বার্নর্ডও পুরুষের ভূমিকায় অমর—'ডিভাইন সারা।' কিন্তু অত উঁচু না হোক, মাঝারি গোছের ব্যতিক্রম আরও আছে। আসলে, সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে এটাই স্বাভাবিক, মেয়েরা মেয়ের ভূমিকা আর পুরুষেরা পুরুষের ভূমিকা অভিনয় করবে। ব্রিটিশ পার্লেয়ামেণ্টও নাকি নারীকে পুরুষ করতে পারে না, পুরুষকে করতে পারে না নারী। ওটা আধুনিক সার্জারির সাধনা। তবু মেয়ে-পুরুষ দৈহিক-মানসিক বিষয়ে দু'জাতের প্রাণী থাকবে ; নানা কারণে দু'জাত বলেই পৃথিবীর রঙ-রস,—তা এত বিচিত্র। অতএব কে বলে মেয়েকে পুরুষ হতে হবে, বা পুরুষকে হতে হবে মেয়ে ? যা দরকার সে হচ্ছে অভিনয়, চরিত্রের রূপটা ফোটানো, আর সে জন্য বাইরের রূপটা অনুকূল করে নেওয়া। এখানে দর্শকেরও একটু সহৃদয়তা দরকার। অভিনেতার দরকার—সৃষ্টিশক্তি দিয়ে ভূমিকাকে শিল্পসত্য করে তোলা। সাধারণভাবে এ যুগের দর্শকেরা দৃশ্য, সাজসজ্জা, আলোর সমারোহ প্রভৃতি উন্নত উপকরণ চায়,

তেমনি চায় অভিনয়েও ওসবের মত উন্নত স্বতোবিশ্বাস্য বাহ্য সাদৃশ্য, নাট্য-চরিত্রের সদৃশ হবে নট-নটীর রূপ ও চলন-বলন ; দর্শকের শিল্পদৃষ্টি না হলে বাধা পায়। এগুলি বাইরের উপকরণ, সে হিসাবে গৌণ, কিন্তু প্রয়োজনীয়। এই গৌণ উপকরণগুলি বিসদৃশ হলে এখন দর্শকও আর সহৃদয় হতে পারেন না। থাক এ তত্ত্ব। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বেও বাঙলাদেশের সৌখীন দলের অভিনয়ের দর্শকেরা উপকরণে ওরকম হুবহু সাদৃশ্য দাবী করতেন না। পেলে, হয়তো খুশিই হতেন,—কিন্তু না পেলে সে অবস্থাটাও গ্রাহ্য করতেন। সহৃদয় হতে পারতেন। কলকাতায় কলেজের অভিনয় শুধু নয়, কলকাতার ডাক্তারদের সার্থক অভিনয়েও দেখেছি ওই পুরুষ ডাক্তাররা মেয়ে-ভূমিকায় চমৎকার উৎরে যেতেন। তাই, আমাদের মধ্যে যারা মেয়ে ভূমিকা অভিনয় করতেন তাঁদের কৃতিত্ব মনে হয় বেশি উল্লেখযোগ্য। এখন তো মনে হয়, অসাধ্য সাধনই তাঁরা করেছেন। একটা সাধারণ শ্রী ছিল তাঁদের নিজেদের, কণ্ঠস্বরেও একটু কমনীয়তা ছিল ; বাকীটা সবই নিজ নিজ অভিনয়শক্তি। শুধু অভিনয়-শক্তি কেন, পরবর্তী জীবনে তো দেখেছি, এঁরা জীবনেও কৃতীই। নিজেদের বিদ্যাবুদ্ধি-কর্মশক্তিতে দীনেশ গুহ হন ডেপুটি একাউণ্টেন্ট্ জেনারেল ; উপেন রায় চন্দননগরের লাট ; অকালমৃত জগদীশ চাটুজ্জে সৎ কর্মচারী, চারুলাল মুখোপাধ্যায় ইংরেজি বাঙলায় সুলেখক, 'দি সন্তাল'-এর (The Santal) নৃ-বিজ্ঞানী পণ্ডিত, হেডমাস্টার, কী নয়? হৃষীকেশ চট্টোপাধ্যায় সায়েন্সের ডক্টর, গবেষক, অবসরান্তে এখনো অধ্যাপক, ননী চাকরিতে যায় নি, ব্যবসা করেছে, চরিত্র-মাধুর্যে সকলের প্রিয়। ব্যবসায়ী হয়েও সেই কোমলতা হারায় নি। অথচ বাধা কি এদের কম ছিল? দাড়ি-গোঁফ কামিয়ে মেয়ে সাজলে অনেকেই উপহাস করে। নাটক তো বৈষ্ণবদলের রাধাভাবের বা বা গোপীভাবের ভজন নয়, তা হলে সকলে ভক্তি-বিগলিত হ'ত। নাটক নিতান্তই পার্থিব জীবনের কথা, অভিনয়। আরেকটা বড় বাধা, হৃষীকেশ ভিন্ন এঁদের সকলের ছিল—এঁরা কেউ গাইতে জানতেন না। আর, বাঙলা নাটকে যাত্রাগানের ঐতিহ্যানুযায়ী নারীচরিত্রের তো প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে গাইতেই হয়। অন্ততঃ তখনো হ'ত।

'সবুজ সঙ্ঘে'র এ দিকেই ছিল বিপত্তি। গানের কান আছে কারও কারও, নেশা অনেকের, কিন্তু গলা নেই। আসলে সমস্ত নোয়াখালিরই ওটা দুর্ভাগ্য। পাশের জেলা ত্রিপুরা গানের জেলা। বাঙলা সঙ্গীত-শিল্পে ত্রিপুরার দান বর্তমান কালেও অতুলনীয়। কিন্তু নোয়াখালি অতুলনীয় ওগুণের অভাবের জন্য। নোয়াখালি 'বে-গানা' জেলা। সেদিকে আবার

আমাদের বাড়ি বোধ হয় অগ্রগণ্য। গলা নেই ; একটা হারমোনিয়ামও কোনোদিন এ বাড়িতে বাজে নি। চারুলাল, হৃষীকেশ প্রভৃতি আমাদের বন্ধুদের সম্বন্ধে কিন্তু তা বলা চলবে না। এই দুর্ভাগ্য সত্ত্বেও 'সবুজ সঙ্ঘ' ওখানে একটা গানের হাওয়া জোর বইয়ে দিয়েছিল আমাদের বন্ধু বিনয় মুখুজ্জের আগমনে। তাঁর সব-জজ পিতা ওখানে বদলি হয়ে আসেন। সে সূত্রে বিনয়কে বছর দেড়-দুই-এর মতো আমরা পেলাম। সে একটা মহোৎসব—সেবারই বোধহয় আমরা 'সাজাহান' অভিনয় করছিলাম। বিনয় পার্ট নিয়েছিলেন হাসির। মঞ্চে তাঁর দোসর আমাদের অন্য-এক অতিথি বন্ধু সুধেন্দুমোহন ঘোষ। দু'জনাতে স্টেজ জমিয়েছিলেন। কিন্তু সমস্ত শহরটা তখন জমিয়ে তুলেছিল বিনয়ের গান। অভিনয় ব্যাপারে সেবার বোধহয় আমাদের জয়-জয়কার। 'কর্তা' সাজাহান, অনুতোষবাবু ঔরঙ্গজেব, চলচ্চিত্রের শৈলেন চৌধুরী দিলির খাঁ, ডাক্তার সুরেশ গুহ দারা,—কাকে ছাড়িয়ে কে যায় ? মেয়েদের ভূমিকা কেন, ছোটখাটো পার্টগুলিতেও আমাদের এক-একজন যেন উৎরে গেল। শৈলেন চৌধুরী শিশিরবাবুর শিষ্য, পরে চলচ্চিত্রের অভিনেতা রূপেই বেশি পরিচিত। শিশিরবাবুর দলে তিনি দীর্ঘদিন 'সীতা'য় কুশের ভূমিকা অভিনয় করেছেন। কিন্তু 'শেষরক্ষা'য় গদাইতে তাঁর অভিনয় ছিল সত্যই আরও প্রশংসনীয়। আমাদের সঙ্গে নোয়াখালিতে 'সীতা'র অভিনয়ে তিনি বার কয় 'রামে'র ভূমিকাও অভিনয় করতেন। তাঁর ভাগ্নে সুশীল মজুমদার তখন অভিনয় করেছিলেন কুশ (?)। সাধারণতঃ 'সীতা' অভিনয়ে অনুতোষ সেনগুপ্তই আমাদের 'রাম'। আর 'সীতা' অভিনয় বোধহয় 'সবুজ সঙ্ঘে'র শেষ কীর্তি। তার আগেই শহরের জীবনে নেমে এসেছিল ভাঙনের শেষ পর্ব—একটা নদীর, অন্যটা রাজনীতিক উদ্দীপনার জেরটানা সাম্প্রদায়িকতার। সে পারিপার্শ্বিকে 'সবুজ সঙ্ঘে'রও ভিত্তি-ক্ষয় অনিবার্য—দেশের যৌবন কেন, সমস্ত জীবনটাই চিড় খেয়ে যেতে থাকে। পূর্ববাঙলার একপ্রান্তে 'সীতা'তেই শেষ বারের মত যৌবনের স্বচ্ছন্দ শিখা দপ্ দপ্ করে জ্বলে নিব্তে যাচ্ছিল।

'সীতা' যখন অভিনয় হয় তখন 'কর্তা' নোয়াখালি ছাড়া, চারুলাল মুখুজ্জেকে বলা যায় ছোট কর্তা। কাজটা পাকা, কিন্তু নামটা চারুর লাভ হয় নি। 'কর্তা' বলতে একজনই। চারুর যোগ্যতা কম ছিল না। 'কর্তা'র আমলেও সে ছিল তাঁর প্রধান অনুগত সহকারী, কার্যতঃ ছোট কর্তা। সাহিত্য, শিল্পবোধ, নানা উদ্যোগে-আয়োজনে সেরূপ উৎসাহী। পাটনাতে কলেজের 'চন্দ্রগুপ্ত' অভিনয়ে সাহায্যার্থে কর্তা তাঁকে ও বিনয়কে ডাকিয়ে পাঠান। আমি তখন

সেখানেই ছিলাম। চারুর ও আমার উপর ভার ছিল নেপথ্যে প্রোম্‌ট্ করার। কিন্তু চারুকে না হলে কর্তার কোনো কাজ করা অসাধ্য। তবে বিনয়কে না হলে সেবার বোধ হয় পাটনায় 'চন্দ্রগুপ্ত' অসিদ্ধ হয়ে যেত। 'অন্ধ ভিখারী' রূপে বিনয়ের গানে পাটনা চমৎকৃত হয়। দর্শকদের মধ্যে জ্ঞানী-গুণী ও পদস্থ লোকের অভাব ছিল না।—অবশ্য সে অভিনয় 'সবুজ সঙ্ঘে'র নয়,—নামে সবুজের নয়, কিন্তু সবুজের ছাপটা সেখানে গিয়ে পড়েছিল।

নোয়াখালিতে 'সীতা' দু'বৎসরে বহুবার আমাদের অভিনয় করতে হয়—লোকের দাবী। দেখে যেন তৃপ্তি মিটে না। অবশ্য তার একটা কারণ 'সীতা'র বিষয়ে ও অভিনয়ে আবেগপ্রাবল্য। 'সীতার বনবাস' যাই হোক্, বিংশ শতকের নাট্যাকারে সীতা সত্যই 'কান্নার জোলাপ'। কলকাতায়ও সত্য, নোয়াখালিতেও সত্য। কিন্তু নোয়াখালিতেও তার অভিনয়-উৎকর্ষও সত্যই উচ্চমানের ছিল। অনুতোষবাবু 'রাম' হিসাবে, চারুলাল 'বাল্মীকি' হিসাবে, আর ননী ঘোষ 'সীতা' হিসাবে যে-কুশলতা অর্জন করেন, তা যে-কোন স্থলেই আদরণীয় হ'ত। গ্রীষ্মকালীন ছুটির দু'রাত্রির অভিনয়ের জের টেনে অনেক রাত্রেই তাই সীতার অভিনয় চলে। কারণ, তখন আমাদের অনেকেরই ছুটি প্রায় স্থায়ী। অর্থাৎ অনেকেই অভিনয়ান্তে বেকার বা প্রচ্ছন্ন-বেকার। নন্‌-কো-অপারেশন-এর শেষ; শিক্ষকতা ছেড়ে অনুতোষবাবু, সুরেশবাবু বিপন্ন বেকার; কী যে করবেন, ঠিক করতে পারছেন না। ইন্‌সিওরেন্সের দালালিই অনুতোষবাবুর শেষ অবধি স্থির জীবিকা হয়। কিন্তু তৎপূর্বে সব অনিশ্চিত। নাটকের নেশাটাও মনকে প্ররোচিত করত। 'শৈলেন চৌধুরীর মত' কলকাতায় গিয়ে সাধারণ রঙ্গমঞ্চে যোগ দিলে কেমন হয়? কেমন হয়, তা বুঝতে বুঝতে অনুতোষবাবুর দিন যাচ্ছিল নোয়াখালিতে (কিছুদিন চট্টগ্রামেও),—সঙ্গে সঙ্গে চলত অভিনয় ও ইনসিওরেন্সের কাজ। চারুলাল ও আমি কী করব, বুঝে-না-বুঝে অগত্যা সনদ নিয়ে বসেছি। ওকালতিতে মন নেই মতিও, যৎসামান্য। আসলে আমরা প্রচ্ছন্ন-বেকার। ননীও পিতার ঠিকাদারী কাজে নামমাত্র সহযোগী। অতএব, আমাদের 'ছুটি' এখন বছর ব্যাপী। বন্ধুরা অনেকেই কর্মজীবনে প্রবিষ্ট, হয় অত্র, নয় অন্যত্র। সঙ্গে সঙ্গে যথানিয়মে ম্রিয়মান সেই বেপরোয়া সবুজ-উৎসাহ। প্রধান কথা,—ক্রমঘনায়মান ও-অঞ্চলে রাজনীতির শূন্য হাটে সাম্প্রদায়িকতার আঁধি। 'সীতা' সবুজ-দশার শেষাঙ্ক। সত্যই তা শেষ হচ্ছিল সূর্যাস্তের গরিমায়—যদিও সন্ধ্যা আসছিল মন্দ-মন্থরে, পাখি তখনো পাখা বন্ধ করছে না। কিন্তু আকাশ যে অন্ধকার। বিহঙ্গকণ্ঠে গান ফোটে না,—চোখে নেই কোন দিক-দেশের উদ্দেশ্য।

নাটকের খণ্ডটা শেষ হোক্। মহড়া থেকে আরম্ভ করে শেষ অবধি প্রতিদিন সকলে মিলে যে-আড্ডা, হাসি-তামাসা, হৈ-রৈ, আমোদ-উল্লাস জমত তা অশেষ। পঞ্চাশ বৎসর পেরিয়ে কি কাগজ-কালিতে এখন আর সেই আড্ডা ও রঙ্গ-কৌতুকের আবহাওয়ার আভাস ফোটাতে পারে কোনো কলম? হয়তো অনুতোষবাবু পারতেন। অনেকদিন তিনি নেই, (১৯৪৪-এ) তিনি গত। চারুলাল পারেন, কিন্তু এখনো এ বিষয়ে তিনি কলম ধরতে নারাজ। 'অমৃতবাজারে' ও কখনো-কখনো 'যুগান্তরে' ইংরেজি-বাঙলায় তবু তাঁর এক-আধ ঝলক দেখতে পাই। এখানে আর দু'-একটি কথা বলেই এ প্রসঙ্গ শেষ করি। প্রথমত, ব্যক্তিগতভাবে অভিনয়খণ্ডে আমি পার্শ্বচর। যাত্রার দলে তামাক-সাজার মতই ছিল আমার কাজ। আমি প্রোম্‌টার, কী বলব 'প্রচেতক'? তবে প্রমোশন পেয়ে দু-একবার কাটা সৈনিকের পার্টও করেছি। আর শেষ দিকে, সীতার অভিনয়ের 'মধ্যভাগে' আমাকে ক্ষত্রিয় বালকও সাজতে হয়। সে নাটকের অভিনয়ের গতিছন্দে যে তা যথেষ্ট বাধা হয় নি, তাই যথেষ্ট। দ্বিতীয় কথা, পাদপ্রদীপের বাইরে যারা অভিনয়কে সম্ভব ও সুষ্ঠু করে তোলে তাদের কথা। 'সবুজ সঙ্ঘ' যে সত্যই প্রাণ-পূর্ণ সংহতির একটা বিরল দৃষ্টান্ত —একথা বুঝি সেই আমাদের বন্ধুদের কথা স্মরণ করলে। যাঁরা অভিনয় করেন, তাঁরা তো জেনারেল—যুদ্ধের খ্যাতি-অখ্যাতি সবই তাঁদের প্রাপ্য—'কর্তার ও তাঁর সহযোগী শিল্পী-কর্নেল'দের। পাদপ্রদীপের সামনে দর্শনীয় হয়ে ওঠার মাদকতা একটা সহজ প্রেরণা। কিন্তু শখের বশে যারা 'দৃশ্য' ব্যবস্থা করে,—মঞ্চ সাজায়, পোশাক গুছোয়, স্বেচ্ছায় 'সিনে'র দড়ি টেনে 'দৃশ্য' বদলায়, অতি চতুরভাবে সমস্ত নাটকটিকে সৌষ্ঠব দান করে, যাঁরা আবহসঙ্গীত চালান, স্বতঃ-প্রবৃত্ত হয়ে যাঁরা বাঁধা তবলা, বাঁশি, হারমোনিয়াম প্রভৃতি বাজনা বাড়ি থেকে নিজেরা বহন করে আনেন এবং বহন করে আবার গভীর রাত্রে বাড়ি ফিরে যান, —দেখেন ভাত ঠাণ্ডা, গৃহিণী উষ্ণ; তদনুরূপ সে সব বন্ধুদের নেশাটা কিসের ছিল? অনেকেই তাঁরা আজ নেই। কিন্তু কী স্বচ্ছন্দভাবে সম্পূর্ণ একাত্ম হয়ে গিয়েছিলাম আমরা অভিনেতা ও উদ্যোক্তা সকলে তা ভাবলে আজও বিস্মিত হই। দলের কর্তৃত্ব যেমন কর্তার না জানাতেই আপনা থেকে তাঁকে দেওয়া হয়ে গিয়েছিল আপনাদের অ-জানৃতেই, তেমনি মিলে গিয়েছিল দলের ছোট-বড় সকলের সঙ্গে—'সকলের তরে সকলে আমরা।' আমি একা একক, বিচ্ছিন্ন, এভাবে ভাববার অবকাশ কোথায়? 'সবার রঙে রঙ মেশাতে হবে', নাট্যাভিনয় জিনিসটা সেই আয়োজন। সাহিত্যের থেকেও নাটক মানুষে মানুষে বেশি মেলায়। নাট্যশিল্পের ধর্মই তা; অনেক ধরনের শিল্পের তা সুসঙ্গত

সমাবেশ—সাহিত্যের, অভিনয়কলার, সঙ্গীতের, এযুগে মঞ্চশিল্পেরও। সকলের সঙ্গে সকলের সম্পর্ক হওয়া চাই সজীব, অন্তরঙ্গ এবং সুসমঞ্জস্। সেই সামঞ্জস্য-বিধান প্রযোজকের দায়িত্ব। সবুজ সঙ্ঘের তা নিয়ে ভাবনা ছিল না—'কর্তা' আছেন।

কিন্তু ওকারণেই সমস্যাও আপনা থেকেই সৃষ্টি হয়। বছর চারেক পরে, আমাদের ভেতর থেকেই একটি ছোট গোষ্ঠীর উদ্ভব হ'ল। কারণটা ঠিক দলাদলি নয়। কতকটা বৃদ্ধির ফলেই এ বিচ্ছেদ। সেল্ ডিভিশন। আমরা অধিকাংশেই ছিলাম শহরের পূর্ব-প্রান্তিক; মাত্র কয়েকজন পশ্চিম-প্রান্তিক। এই স্থানিক দূরত্বটা ধরেই স্বাভাবিকভাবে দেখা দেয় দুই প্রান্তে দুই গোষ্ঠীর নিজেদের মধ্যে নৈকট্য। তবে বিশেষ করে তা দেখা দেবার কারণ,—গুণে ও আয়তনে মোট বেশি দলটা বৃদ্ধি পেয়েছে। মাত্র একটি নাটকের অভিনয়ে সকলের যথার্থ প্রকাশ সম্ভব হয় না। প্রকাশের সুযোগ না পেলে মানুষ ফুটে উঠতে পারে না। পশ্চিম-প্রান্তের গোষ্ঠীর মধ্যে এ অভাববোধ দেখা দেয়, তারা নিজেদের [illegible] ফুটে উঠতে চায়। উদ্ভূত হ'ল এক পৃথক নাট্যগোষ্ঠী। বছর দুই তারাও ছুটিতে একটি করে নাটক অভিনয় করে। তারপর, তারাও মিলিয়ে যায়—ঠিক একটা স্থায়ী সঙ্ঘ-সত্তা তারা তখনো লাভ করে নি। কিন্তু সে দলেও কেউ কেউ ভালো অভিনয় করতেন। তার মধ্যে একজন, অচিন্ত্য-কুমার সেনগুপ্ত—যখন তিনি ছুটিতে নোয়াখালি আসতেন।

সংস্কৃতি-যোগ

থিয়েটার করে দিন যায় না। তবু থিয়েটারের নেশা কাটাতে অনেক দিন গেল, এখনো নেশা একেবারে যায় নি, অন্ততঃ দেখার নেশা। তবে তখন খেলা, থিয়েটর ছাড়াও আমাদের আরও 'ব্যসন' ছিল। তাকে কি বলব? সংস্কৃতি-যোগ, না, সাহিত্য-যোগ? ওসব সংক্রামক ব্যাধি নয়, তবু ব্যাধি। 'সংস্কৃতি-সম্মেলন' বাঙলাদেশে তখনো দেখা দেয় নি, শব্দটাও উদ্ভূত হয় নি। আমাদের প্রয়াস ১৯১৯-২০-এর ব্যাপার—হয়তো তাই আগামীর আভাস।

চৈত্র-বৈশাখের দিন, ঘরের ভেতরে গরম। টাউন-হলের প্রাঙ্গণ ঘাসে ঢাকা। ছোট সবুজ মাঠ। নদী তখন ভেঙে-ভেঙে এগিয়ে প্রায় তার সীমানায়। দক্ষিণে দিক্‌দেশহীন জলের বিস্তার, বঙ্গোপসাগরের লবণাম্বুরাশি, অবাধ উদ্দাম বাতাস। সুপারি-নারকেলের মাথায় ও নানা গাছের ডালে ডালে তার মাতামাতি। সামনের সড়কের ঝাউগাছের অশ্রান্ত দীর্ঘশ্বাস। সন্ধ্যা হতে না-হতেই বঙ্গোপসাগরের মধ্য থেকে শুক্লপক্ষে চাঁদ উঠে আসবে—পূর্ণিমার চাঁদও।

আর নদীর ঢেউ-এর উপর অজস্র রূপোর মুষ্টি ছড়িয়ে ছড়িয়ে তখন সে চাঁদ এসে দাঁড়াবে ঠিক আমাদের মুখোমুখি। আহা, সেই যুগ—যখন 'চন্দ্রিকাজাগর' ছিল নাগরিকদের বিলাস। তা থাক্,—আমরাই বা 'পূর্ণিমা সম্মেলন' করি না কেন এ শহরের দশজনকে নিয়ে? খোলা আঙিনা, সেখানে আসর বস্‌ল—মাথার ওপরে জ্যোৎস্নার ধারা—সমস্ত আলো দিতাম নিবিয়ে। শ্যামল ঘাসের ওপরে বিছানো হত শতরঞ্চি ও আস্তরন। তার ওপরে সভাপতির শুভ্র আসন। সভাপতি হতেন বসন্তকুমার সেনগুপ্ত, 'পশ্চিম প্রান্ত কুটিরে'র গৃহস্বামী, অচিন্ত্যবাবুর অগ্রজ। দীর্ঘদেহ সৌম্যমূর্তি। প্রৌঢ়ত্বের গম্ভীর সৌন্দর্যে, গম্ভীর উদাত্ত কণ্ঠের শান্ত গৌরবে, মর্যাদাবান্ পুরুষ। আবার সাহিত্য-প্রীতিতে স্নেহকোমল। সাহিত্যানুরাগ নিয়েই তিনি জন্মেছিলেন, জজ কোর্টে ওকালতিতে বসেছিলেন, বিদ্যাবুদ্ধি বাগ্মিতায় সুসমৃদ্ধ। কিন্তু ব্যবসায়ের যোগ্যতা তাঁকে আবৃত করতে গিয়েও, আচ্ছন্ন করতে পারল না তাঁর সাহিত্যানুরাগ। ক্রমে তাঁর বঙ্গীয় সমাজতত্ত্বের গবেষণা গ্রাস করতে চাইল তাঁর সেই সাহিত্যানুরাগ। কবিতার পথ ত্যাগ করে তিনি ব্যাপৃত হয়ে গিয়েছিলেন 'বৈদ্যজাতির ইতিহাস' রচনায়। কিন্তু সে গবেষণাও গ্রাস করতে পারে নি তাঁর সংস্কৃতি-অনুরাগ, তাঁর সাহিত্যানুভূতি, তাঁর আজন্মলব্ধ রসবোধ। আমরা জানতাম—বসন্তবাবু ছাড়া শহরে দ্বিতীয় কোনো লোক নেই যিনি রসে-রুচিতে আমাদের পূর্ণিমা-উৎসবের আয়োজনকে অন্তর দিয়ে স্বাগত করবেন, এবং অন্তরের আশিস্‌স্নাত ভাবে ও ভাষায় সেই উৎসবকে শ্রী ও সার্থকতা দিতে পারবেন। আমরাও দ্বিতীয় কোনো লোককে বসন্তবাবুর ভাষণের পরে বলতে দিয়ে সে সৌন্দর্যকে ম্লান করতে দিই না। তিনি করতেন পৌরোহিত্য, সভায় একটি মাত্র 'ভাষণ'—তাঁর। তার পূর্বে পরে মধ্যে সেই জ্যোৎস্না-ভরা আকাশের তলে থাকত গান, গান, গান। প্রথম শুভ্র ধুতি-চাদরে সমবেত কণ্ঠে আমাদের উদ্বোধন-সঙ্গীত। 'মোর সন্ধ্যায় তুমি সুন্দর বেশে এসেছ, তোমায় করি হে নমস্কার।' কিম্বা, 'সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সংবোমনাংসি জানতাম।' তারপর গান, আবার গান, আবার গান। সবই প্রায় রবীন্দ্রনাথের। কদাচিৎ দ্বিজেন্দ্র-লালের 'ওই মহাসিন্ধুর ওপার থেকে কি সঙ্গীত ওই ভেসে আসে', কিম্বা 'নীল আকাশের অসীম ছেয়ে ছড়িয়ে গেছে চাঁদের আলো।' নজরুলের গজল 'তখন সর্বহৃদয়হারী'। কিন্তু আমাদের মনে হ'ত তার সঙ্গে আমাদের পূর্ণিমা-সন্ধ্যার অনুচ্চ সুরটা মিলবে না। এই ছিল 'সবুজ সঙ্ঘের পূর্ণিমা সম্মেলনের' ধরন। কিন্তু শীঘ্রই এ উৎসবের নামটা বদলে গেল, আর নামের সঙ্গে বদলে গেল কিছুটা তার রূপ, অন্ততঃ মুখচ্ছবি।

বৈশাখ মাস, পাঁজিতে কখনো কখনো 'বৈশাখী পূর্ণিমা' পড়ত জ্যৈষ্ঠে। সে দিনে কয়জন রাখত খোঁজ 'বৈশাখী পূর্ণিমা'ই 'বুদ্ধ পূর্ণিমা'? কথাটা মাথাতে এল। কারণ নালন্দা-রাজগিরি-বুদ্ধগয়া দেখেছি, আর ধম্মপদ ও জাতকের গল্পগুলি আগাগোড়া পড়েছি—সে বুদ্ধ কথাবস্তু নিয়ে দু-একটা কাব্যনাট্য লিখছি। আসলে রবীন্দ্রনাথের হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর কৃপায়, সহজেই ওসবে বাঙালির ঝোঁক, এবং আরও কতখান থেকে এসেছিল বুদ্ধমহিমার জ্যোতিঃ-স্পর্শ। বুদ্ধদেবের সমকালীন ভারতের স্বপ্ন এভাবে আমাকে বেশ পেয়ে বসেছিল। বুদ্ধদেবের স্মৃতি ও কল্পনায় সুরভিত সে-সব স্বপ্ন। তাই, পূর্ণিমা সম্মেলন অচিরেই পেল নতুন পরিচয়, আমরা আহ্বান করলাম 'ভগবান তথাগতে'র নামে তাঁর স্মরণে 'বৈশাখী পূর্ণিমা'র উৎসব। 'তথাগত' কথাটাও ওখানকার শিক্ষিতদের মধ্যে অজ্ঞাত; সে উপলক্ষেই তার প্রচলন, সঙ্গে সঙ্গে সেই অনুষঙ্গে এল বুদ্ধ-কথা। বুদ্ধ-মহিমায় আপ্লুত হয়ে উঠল পূর্ণিমা—তখনো উদ্বোধনে সেই আহ্বান 'তোমায় করিহে নমস্কার'। কিন্তু সঙ্গীতে এল ত্রিশরণ মন্ত্র—'বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি, ধম্মং সরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং সরণং গচ্ছামি'। অবশ্য আক্ষরিক অর্থে নয়, আমাদের নিবেদন ইতিহাসের রঙেরসে পুষ্ট সুন্দরের ও আনন্দের দেবতার উদ্দেশ্যে। মাঝখানে উদ্বোধন সঙ্গীতের পরেই, মনে পড়ে, ছোট্ট একটি লেখাও পড়া হ'ত। বুদ্ধবাণী স্মরণ করিয়ে দিয়ে স্বাগত সম্ভাষণ। আসলে তারও মর্মবাণী—সেই সুন্দরেরই স্তব। কিন্তু মূল ভাষণ বসন্ত সেনগুপ্ত মহাশয়ের। তাঁর সাহিত্যিক মন সেই প্রাকৃতিক পরিবেশে, ঐতিহাসিক স্মৃতিতে উচ্ছ্বসিত হ'ত। আর কী তাঁর বাগ্‌বৈভব। পঞ্চাশ বৎসরের ওপার থেকে এখনো মনে পড়ে তাঁর দু-একটি বাক্যের ছটা, বাণীবিন্যাস, আর সেই গম্ভীর উদাত্ত কণ্ঠধ্বনি। আর সবুজ সঙ্ঘের নাম করে শ্রোতাদের সকলকে আমাদের সেই আয়োজন ও কৃতির মর্ম গ্রহণের জন্য সাগ্রহ আহ্বান। এই বেপরোয়া লক্ষ্মীছাড়ার দলকে এমন করে প্রকাশ্যে আর কেউ অভিনন্দিত করে নি, করতে পারে মনেও হ'ত না। আমরাও চাইতাম না। বিশেষ করে মনে পড়ে বসন্তবাবুর একটি কথা—গতানুগতিক নৈতিক-সামাজিক সংস্কারের বিরুদ্ধে ছিল আমাদের অভিযান। সমাজ-কর্তাদের অনেককে সে-সব স্বস্তি দিত না, বিশেষত আমাদের সামাজিক প্রগতির ঘোষণা। ভক্ষ্যাভক্ষ্য সম্বন্ধে নিষেধ না মানা, জল-অচলদের জলচল করা, পঙ্‌ক্তিভোজনে পাঙ্‌ক্তেয় অপাঙ্‌ক্তেয় না মানা। কিন্তু বসন্তবাবু একদিন এ-সবের জন্যই করলেন আশীর্বাদ; কারণ, 'হিন্দুর জাতিভেদ ও জাতিতত্ত্ব নিয়ে আমি কিছু অধ্যয়ন ও গবেষণা

করেছি। তাতে বুঝেছি—জাত না মরলে এ জাতি বাঁচবে না।' কাব্য-কথা নয়, জ্ঞানীর ভবিষ্যদ্বাণী। দুঃখের কথা—তখন তিনি ভগ্নস্বাস্থ্য, আর অচিরেই তাঁকে হারাতে হয়। তাঁর স্থান শূন্য রইল। তিনি রইলেন জীবনে-মরণে এই দুরন্ত বিদ্রোহীদের অন্তরের শ্রদ্ধার আসনে। এই 'ভগবান তথাগতে'র উৎসবে স্বভাবতই তখন সভাপতির অভিভাষণের সঙ্গে জুড়ে দিতে হ'ল আমাদের লেখা কোনো কবিত্ব-গন্ধী স্বাগত সম্ভাষণ! উৎসবের সুর নেমে যায় নি, তা জানি। রেশ রইল কি কোথাও?

বৈশাখের প্রারম্ভেই গ্রীষ্মের ছুটি। ছুটি শেষ হবার মুখে এসে যেত আষাঢ়। আষাঢ়ের আগেই নোয়াখালিতে নামত বর্ষা। একবার আমরা আষাঢ়ের উদ্বোধন করলাম—পয়লা আষাঢ় 'মেঘদূত দিবস' নাম দিয়ে। তখন রবীন্দ্রনাথ 'বর্ষামঙ্গলে'র প্রবর্তন করেছেন। নোয়াখালিতে বর্ষামঙ্গলের থেকে বর্ষাবিদায়ই বেশি সমীচীন। অর্থাৎ 'শারদোৎসব'। কিন্তু ছুটি তার পূর্বেই ফুরোয়। আমরা তাই করতাম আষাঢ়-অভিনন্দন—তবে তাও অভিনব। বর্ষার গান ও কবিতায় উদ্বোধন; কিন্তু 'মেঘদূতে'র নামটা আরও একটা মায়া-অঞ্জন লাঞ্ছিত। যতটা সম্ভব রবীন্দ্রযুগের সঙ্গে সুরে বাঁধা কালিদাসের কালকে। 'বহুযুগের ওপার থেকে আষাঢ় এল আমার মনে।' তাই 'মেঘদূত দিবসের' সূচনা। সে সূচনারও সূচনায় অচিন্ত্যবাবু ছিলেন নোয়াখালিতে। তিনি নিজে থেকে সুন্দর একটি আবেগময় নিবন্ধ পাঠ করলেন। গদ্যকবিতাই তাকে বলা ঠিক। মেঘদূতের সঙ্গে সুর মেলানো। রোমাণ্টিকতার সুর—আমাদেরও তখন তাই প্রিয়। সেই সুরে সুর মিলিয়ে চলল গান, 'বহুযুগের ওপার থেকে আষাঢ় এল আমার মনে।' মঞ্চে কিছু কিছু মূক অভিনয়; প্রধান উদ্দেশ্য বর্ষার মেঘমেদুর আবেশ সৃষ্টি। সেবার বিনয় মুখুজ্জে আমাদের সঙ্গে এ 'মেঘদূত সন্ধ্যায়' গানের বন্যা বইয়ে দেন। খগেন্দ্র গুহ আমাদের মঞ্চসজ্জার শিল্পী। ইঞ্জিনিয়ারীং-এর ছাত্র তাঁরা, তাঁদের শিল্পকর্মে ও আলোকসম্পাতে সেই সুরকে দিয়েছিল আলোকের ও রঙের সজ্জা। মঞ্চে সত্যই বর্ষার আবহাওয়া জাগল—বৃষ্টির ছাঁট, উতলা বায়ু, মেঘের কোলে কোলে বকের পাঁতি ডানা নেড়ে উড়ে যাওয়া—সামান্য উপকরণ নিয়ে এই নেপথ্যকর্মীরা অদ্ভুত একটা বর্ষাভাস সৃষ্টি করেছিল। উপকরণের উৎপীড়ন নয়, পরিমিত প্রয়োগ—মাত্র সৃষ্টির পরিবেশ রচনা। সৃষ্টির আসল কাজ বিনয় মুখুজ্জের সঙ্গীতে—'বাদল বায়ু বাজায় বাজায় বাজায় রে একতারা'—'পাতায় পাতায় টুপুর টুপুর নূপুর মধুর বাজে।' বিনয় আত্মভোলা বাউলের বেশে একতারা নিয়ে

নাচতে নাচতে যেন সেই বাদল বাউলকে মূর্ত করে তুললেন সে পরিবেশে। গান ও রূপ-রসের দিক থেকে সেদিনের 'মেঘদূত উৎসব' সাফল্যে চিরস্মরণীয়। আর সে উৎসব শেষ হতে না হতে আকাশ ভেঙে নামল আবার সেই সন্ধ্যায় বৃষ্টি। বাড়ি ফিরতে সকলেরই অভিষেক হয়ে গেল।

চিরস্মরণীয় তাই **বিনয় মুখুজ্জে**—১৯৪২ সালে যাঁর জীবন-দীপ নির্বাপিত হ'য়েছে, তাঁর বয়স তখন বোধহয় ৪২।৪৪-এর বেশি নয়। 'সবুজ সঙ্ঘের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক স্বল্পদিনের। আমার সঙ্গে তখনো মাত্র বছর দুয়ের। তবে আমাদের কারও কারও সঙ্গে তা দীর্ঘতর—কর্তার, অনুতোষ-বাবুর, চারুলালের। বলেছি, এই আশ্চর্য মানুষটির সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্পর্কে এসেছিলাম হার্ডিং হোস্টেলে। আর প্রায় তখনি সমস্ত খ্যাতি-অখ্যাতির সত্যমিথ্যা জনশ্রুতি উড়িয়ে আমরা অকপট সুহৃদ হয়ে উঠলাম। বাইরের অনেক দিকেই আমরা বিপরীতধর্মী। কিন্তু যা প্রকাশিত, তা মানুষের সত্তার কতটুকু প্রতিলিপি? বিনয়ের সমস্ত দোষের দাম সে নিজেই দিয়েছে—অকাল মৃত্যুতে। আরও দুঃখের কথা- সে মৃত্যু প্রায় আত্মহত্যার সামিল। দৈহিক অর্থে নয়, সৃষ্টিশক্তির দিক থেকে। গান বুঝি না-বুঝি, কিছু শুনেছি—আমাদের দিনে কলকাতায় রবীন্দ্রনাথের আয়োজিত কোনো গীতোৎসব বাদ দিই নি। 'প্রবাসী' আপিসে অশোক চাটুজ্জের আয়োজিত কিছু বৈঠকের প্রান্তেও শ্রোতা হয়ে বসেছি, শুনেছি। কিন্তু 'এমন গলা আর দ্বিতীয় শুনি নি'—একথা বিনয় মুখুজ্জের গান যাঁরা শুনেছেন তাঁরা সকলেই এখনো একবাক্যে বলেন। আমি বললে বা না-বললে কী যায় আসে? গলা ছেড়ে তিনি গাইতেন। মুক্তকণ্ঠ। আর যতই গলা চড়ছে ততই হচ্ছে তা অপূর্ব ঐশ্বর্য-মাধুর্যময়। শৈশবে বসন্ত রোগে মুখ তার বিক্ষত, সুপুরুষ নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও কী অসামান্য আকর্ষণ তার মুখের, চোখের, তার বুদ্ধি-উজ্জ্বল চাহনির, সুরসিক বাক্-রীতির। আর, গীতে-গানে সর্বজয়ী সত্তার।—আশ্চর্য নয়, নারীর চিত্ত তা সহজেই জয় করত। আর জয় করতে করতে সে জয়ের নেশায় নিজেও মাতাল হ'ত। তাতেও ক্ষতি ছিল না—যদি সত্যই সে নিজের সঙ্গীত-প্রতিভার ও নিজের আয়ুর দাবিকে ওরূপ ব্যসনের বশে অবজ্ঞা না করত। তাঁকে বাঁচাবার চেষ্টা আমরা না করেছিলাম তা নয়। কাকে দোষ দেব?—নারী-পুরুষ কাউকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। বিনয়ের অসংযমের সঙ্গী তার নিজের অসঙ্গত জীবনযাত্রা—ওসব আমাদের সৌহার্দ্য ও তাঁর নিজের সৌন্দর্যবোধের অপেক্ষা তার জীবনে প্রবলতর ছিল। আর, তাই কাল হ'ল। দাদা আরও একজন অসামান্য বাঙালি প্রতিভার কথা উল্লেখ করতেন,—তিনি

ছিলেন ডঃ গিরীন্দ্রশেখর বসুর সুহৃদ, এবং তাঁর সম্বন্ধে ডঃ বসুর অভিমত স্মরণ করে দাদা বলতেন,—এই আত্মাপঘাতের নাম ফ্রয়েডের ভাষায় 'ডেথ্ উইশ্'। তাই কি ? বিনয়েরও আমাদের মতই জীবন-পিপাসা সামান্য ছিল না,—বরং আমাদের থেকে বেশিই ছিল তার যৌবনের দিনের এই সুস্থ প্রার্থনা —'মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে।' এমন জীবন্ত, প্রাণপূর্ণ, কলা-সুরসিক একটি সত্তা—আনন্দময় যার সান্নিধ্য, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের নিকট—কেন সে হতে যায় সত্যই 'ডেথ্ উইশে'র শিকার ? 'তবু হয়, তবু।' বলবেন মনোবৈজ্ঞানিক—ঐশ্বর্যের সঞ্চয়ের মতই ঐশ্বর্যের অপচয়ও প্রকৃতির নিয়ম। 'কিন্তু কেন ?' আশ্চর্য জীবনের প্যারাডক্স্—দ্বান্দ্বিক এই গতি-পদ্ধতি—বাঁচবার নামে মৃত্যু-আলিঙ্গন।

'তথাগতের স্মৃতিপূজা' ও 'মেঘদূত সন্ধ্যা' দুই-ই ছিল কাব্যের সুরে বাঁধা—ঐতিহাসিক রোমাণ্টিকতা ও কালিদাসের রোমাণ্টিকতায় মিশে মনের সঞ্চরণ কল্পলোকে। বাঙালির মন তাতেই সহজে মজে, আমার অন্ততঃ তখনো মজত। কিন্তু সে সঙ্গেই চলছিল দেশ জুড়ে গান্ধীযুগের কর্মযোগের যজ্ঞ—বোধহয় 'তা সূত্রযজ্ঞে' ঠেকছিল বলেই আমরা চাইছিলাম রোমাণ্টিকতার স্বপ্ন। গদ্যের একটা স্থির সুরও সেইসঙ্গে আমাদের মন চাইত। সাহিত্যই যোগাত সেই সুর—তার শাদায় সপ্ত রং মিলিয়ে। সাহিত্যের প্রবন্ধ পাঠ ও সাহিত্যের বক্তৃতার ব্যবস্থাও করেছিল 'সবুজ সঙ্ঘ'। শুধু গদ্য নয়, অনেকটা তেল-নুন-লক্ড়ির ব্যবস্থাও। সাহিত্য-আলোচনায় লোক জোটানো প্রয়োজন। তা এক অসাধ্য সাধনা।' এখনকার দিনে নৃত্যনাট্য ও আধুনিক গানের 'স্যুগার-কোটিং' না হলে সাহিত্যসভা প্রায় নির্জন লোকসভা। কিন্তু বলেছি, 'নাচ' তখনো অগোচর। কি করে ছোট্ট সেই 'পাণ্ডব-বর্জিত' দেশে সাহিত্যসভায় লোক জুটত, এখনো তাই ভাবি। বাদ তো দিই নি, শেলি সেণ্টিনারিও করেছি। বৎসরে একবার করে এক বক্তৃতামালার আয়োজনও করলাম, দুঃসাহস নিশ্চয়, একটা ঘুমন্ত শহরে ঘুম ভাঙা। মনে আছে, সাহিত্যের আলোচনা সার্থকও হ'ত।

একবার আমাদের সে আয়োজনে বক্তৃতা করেছিলেন পুরুলিয়ার নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয়। তিনি পুরুলিয়াতে 'ঋষি নিবারণ দাশগুপ্ত' নামেই স্মরণীয়। পরে শুনেছি—'জাগরী' পিতার চরিত্রের মূল আদর্শ এই মাস্টার মহাশয়। (তখনো 'জাগরী'র লেখক বালক) পুরুলিয়ার 'মুক্তি আশ্রমের' তিনি প্রতিষ্ঠাতা। গান্ধীনীতির ও স্বরাজের সাধনার তা এক প্রধান প্রতিষ্ঠান। তাঁর জ্যেষ্ঠ কন্যা মালতী, আমাদের অনুতোষবাবু তাঁকে বিবাহ করেন।

নিবারণবাবু এসেছিলেন কন্যার গৃহে। একটু বিশেষ উপলক্ষ ছিল—গান্ধীজীও তখন এসেছিলেন নোয়াখালিতে। পিতার জন্য কন্যা সে সুযোগ নিলেন, আমরাও সেই সুযোগটা নিই। দেখবার আগেও জানতাম—একই কালে নিবারণবাবু গান্ধীনীতি ও রবীন্দ্রবাণীর সশ্রদ্ধ ভক্ত। যখন হেড-মাস্টারি করতেন তখনো ছাত্ররা দেখেছে 'চতুরঙ্গ' নিয়ে আলোচনায়ও তাঁর উৎসাহ, আবার ছাত্রদের শিক্ষাদানেও তাঁর আগ্রহ। ছাত্ররা তখন হেড্মাস্টার মশায়কে মনে করত—জ্ঞান-তপস্বী গুরু। যখন স্বরাজের ডাকে তিনি সব ছেড়ে দিলেন তখন মানভূমের আপামর সাধারণ তাঁকে মনে করতেন—এ যুগের ঋষি। আমরা তাঁকে বক্তৃতা করতে বল্লাম—'গান্ধীজী ও রবীন্দ্রনাথে'র বিষয়ে। জ্ঞানে ও অন্তর্দৃষ্টিতে সরস, প্রাঞ্জল সেই বক্তৃতা। প্রথম থেকেই যে আলোর রেখা দেখেও দেখতে পেতাম না—যেন তা ফুটে উঠ্ল সম্মুখে। আমরা বুঝতে বাধ্য হই, এ যুগে 'সত্যাগ্রহ' ও 'সত্যের আহ্বান' এ দুয়ের মাঝে মিল কোথায়, কোন্ গভীরে; কত তা নিগূঢ়। আমরা 'সবুজ সঙ্ঘ' নানা কারণে গান্ধীবাদীদের রাজনীতিকে নিয়ে বক্র পরিহাসেই অভ্যস্ত। প্রমথ চৌধুরীর সেই দৃষ্টিভঙ্গীটাতেই সবুজের রুচি। কিন্তু মন বলত—মতবাদ ছাড়িয়েও গান্ধীজীর আদর্শের মধ্যে একটা গভীরতর দিক আছে। সেখানেও রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজী দু-জনাই অভিন্ন নন, কিন্তু দু-জনা আত্মীয়। ঋষির স্বচ্ছ দৃষ্টিতে নিবারণচন্দ্র সে স্থানটিই প্রত্যক্ষ করতেন। আমাদেরও সামনে সে দিকটি খুলে ধরেন। সে একটি স্মরণীয় বক্তৃতা। তার পরে অনেকদিন গিয়েছে। নিবারণচন্দ্র এই ১৯৪৭-এর 'স্বাধীনতা' দেখে যান নি; গান্ধীজীও এই 'স্বাধীনতা' স্বাগত করেন নি। গান্ধীজীর রাজনৈতিক শিষ্যদল কি 'সত্যের আহ্বানে' কান দিয়েছিল? না, 'সত্যাগ্রহ'কে গ্রহণ করেছিল? 'সত্য' বোধহয় অরুচিকর, শিষ্যদের স্বরূপে তাই সুস্পষ্ট। অন্য শিষ্যরাও গান্ধীবাদকে সত্য করেন না, করেন 'ক্যাল্ট্', 'চরকা', 'গ্রামোদ্যোগ', 'ভূদান' যা'ই হোক্ তার রূপ। সুস্থ বুদ্ধিতে ও অকপট অন্তরে দু'-চার জন লোক তবু গান্ধীজীর জীবনাদর্শকে উদ্‌যাপন নিশ্চয়ই করেন। হয়তো কোটিকে গোটিক। গান্ধীজীর externalities বহিরঙ্গ ও মাত্রাছাড়া ব্রহ্মচর্য-যোগ তাঁদের স্থির চেতনাকে আচ্ছন্ন করে নি। তেমন মানুষ ছিলেন ঋষি নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত, এবং এখনো আছেন আবদুল গফ্ফার খাঁ।

আলোক-উৎস

আসল প্রসঙ্গটা কি ছাড়িয়ে যাচ্ছি? না। সবুজের অভিযানে আমাদের বিদ্রূপের অস্ত্র আমাদের অজানতেই আমাদেরও যে পেয়ে বসছে এরূপ একটি

আয়োজনের মধ্য দিয়ে আমরা সে সম্বন্ধে সচেতন না হয়ে পারতাম না। আমাদের যৌবন শুধু রবীন্দ্রযুগের স্বপ্নময় কাল নয়, গান্ধীযুগেরও সংগ্রাম-ভরা কাল ; তা মেলাতে পারি কই ? কাল মনে মনে জিজ্ঞাসা জাগিয়ে দিত। বেপরোয়া হাসির আনন্দ এক-একবার সংহতি চাইত গতির সংযত আনন্দে। তা প্রত্যক্ষ করতে চাইতাম আমাদের সাহিত্য-আলোচনার আয়োজনে। অবশ্য হাসিরঙ্গের অবারিত উল্লাসে বিনা-আয়োজনেই বেশি সময় আমাদের দিন-রাত্রির আড্ডা-আলাপ ভরে উঠত। তবু একবার একটা বক্তৃতা-মালার আয়োজন করলাম—আমাদেরই আচার্য সুরেশ চক্রবর্তীকে রাজী হতে হ'ল। চারটি বক্তৃতা হবে, প্রথম বক্তৃতা বোধহয় 'আর্ট কী' ? ('কলার কথা'), দ্বিতীয়টা বোধহয় 'রবীন্দ্রনাথ', তৃতীয়টি বোধহয় 'হুইট্‌ম্যান্'। চতুর্থটি সবচেয়ে অভিনব. ওই মজা করার বেপরোয়া বুদ্ধির খেলা, বিষয়—'নাস্তিকতার প্রয়োজনীয়তা'। একথা বোঝানো আজ কঠিন, কী ছিল সেই বক্তৃতা। বলাই বাহুল্য, শুধু বুদ্ধির খেলা নয়, বিদ্যারও পরিচয় নয়, ওসব ছাপিয়ে উজ্জ্বল ও অনন্য এক ব্যক্তিত্বের প্রকাশ। সে ব্যক্তি সুরেশ চক্রবর্তী।

বলবার না থাকলে সুরেশ চক্রবর্তী বলেন না,—লেখেন তো না-ই। বলার তাঁর কী আছে ? সেইটিই অদ্ভুত ব্যাপার। সকল কথাকেই তিনি নিজের মত করে বুঝে নেন। তাতেও দু'টি দিক। এক তো কথাটা তিনি মূল থেকেই দেখেন। শুধু তাঁর পরিচিত রূপ নয়—দেখেন কথাটার অন্তর্নিহিত মূল ও শিকড়। আর তারপরে তার শাখা, ফুল, পাতা, অনন্ত বিস্তৃত আকাশের তলে তার প্রকাশের বিশিষ্টতা। প্রত্যেক বস্তুরই সে বিশিষ্টতা আছে—প্রতিটি ঘাসের ডগারও। রূপের এই বিশিষ্টতা সুরেশবাবুর পক্ষে স্বতঃসিদ্ধ। তাঁর জিজ্ঞাসা এই মূল থেকে—এই অর্থে সুরেশবাবুর কথা মৌলিক—'অরিজিন্যাল'। আরেকটি অর্থে তা আরও বেশি অরিজিন্যাল। প্রত্যেক কথাটাই তিনি নিজস্ব দৃষ্টিতে দেখেন। নিজের মন-বুদ্ধি-চৈতন্যের মধ্যে গ্রহণ করে প্রত্যেক জিনিসের স্বরূপ অনুভব করা চাই। যা তার রূপ, দর্শকের সত্তার স্বাক্ষরে প্রকাশিত হয় তখন তার স্বরূপ,—এই দ্বিতীয় নিজস্বতা—অরিজিন্যালিটি—সুরেশবাবুর বৈশিষ্ট্য। শুধু জিজ্ঞাসায়ও তার শেষ নয়, উপলব্ধিতে তার সম্পূর্ণতা। অর্থাৎ একই কালে মৌলিক ও নিজস্ব—ওরিজিন-সন্ধানী, এবং personality পুষ্ট—এই দুই অর্থেই সুরেশবাবুর চিন্তা-ভাবনা 'অরিজিন্যাল'। আরও একটু কথা আছে : এই মানুষের বলার ভাষা ও ভঙ্গিও তেমনি ওরূপ—সম্পূর্ণ অনন্য। unique, অনন্য। উচ্চ গণিত যেমন দু'চার স্তর ডিঙিয়ে এগিয়ে যায়, পাঠকের বুদ্ধি ও ধারণাশক্তিকে টেনে তোলে,—সুরেশবাবুর বক্তৃতা ও

লেখা তেমনি ধরনের। তা পা গুণে গুণে চলে না, তা চলে 'ঝাঁপতালের তালে তালে।' আর, এক অনুষঙ্গ থেকে আরেক অনুষঙ্গে তার গতিও তেমনি দ্রুতচকিত। সমগ্রভাবে বিষয়টা পরিক্রমা না করে নিঃশ্বাস ফেলে না। তার গতি দুরূহ, কারণ, তাঁকে অনুসরণ করতে হলে পাঠকের নিজেরও প্রস্তুতি চাই। কিছুটা প্রয়োজন বিদ্যাবুদ্ধির। আরও বেশি—অনুধাবনের গভীর সঙ্কল্প। নিজেকে প্রচারে সুরেশবাবু সম্পূর্ণ বিমুখ, প্রকাশেও নিস্পৃহ। তাই বক্তৃতাতে তিনি বীতরাগ। সম্ভবতঃ আমরাই তাঁকে সে কাজে মাত্র একবার প্রবৃত্ত করিয়েছিলাম। লেখায় তিনি কুণ্ঠিত। পাঠকের কাছে এই সুরেশ চক্রবর্তী প্রায় অজ্ঞাত-নামা। কিন্তু পরিচিত গুণী-সমাজ জানেন—তিনি কী প্রতিভার অধিকারী। আমরা যাঁরা তাঁকে কাছ থেকে দেখবারও কিছুটা সুযোগ পেয়েছি তাঁরা কেউ কেউ অন্ততঃ এ যুগের এমন সুলেখক ও বিদগ্ধ মানুষদেরও দেখেছি —কেউ মেধায় অসামান্য, কেউ বিদ্যাবুদ্ধির স্থির প্রভায় অগ্রগণ্য, কেউ বহুব্যাপী [illegible], এমন সব মনস্বী,—অনেককে তাঁদের দেখেছি। আমরা বলতে পারি—সুরেশ চক্রবর্তী শুধু সকলের থেকে স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট নন, অবিসংবাদিত প্রতিভায় তাঁদেরও মধ্যে অনন্য। মৌলিক চিন্তার অধিকারী বা 'অরিজিন্যাল থিংকার' হিসাবে আমাদের কালে এরকম আর দ্বিতীয় লোকেরও সাক্ষাৎ পাই নি। অবিসংবাদিত তাঁর প্রতিভা,—এবং আমাদের ধারণা—এক হিসাবে আবার অসম্পূর্ণ। কারণ, যে প্রতিভা সম্পূর্ণ, তা আত্মপ্রকাশ ছাড়া স্থির থাকতে পারে না। প্রকাশেই তার স্বাস্থ্য, সম্পূর্ণতা। শুধু তাই নয়—আপনার প্রকাশের প্রয়োজনে সেরূপ প্রতিভা নিঃসঙ্কোচ, আত্মসর্বস্ব, এমনকি প্রয়োজন মত নির্মম। সুরেশবাবুর প্রতিভা খণ্ডিত, তাঁর প্রকৃতিগত অনীহায়—[illegible] শুধু প্রচারে নয়, আত্মপ্রকাশে আগ্রহহীন। সক্রেটিস-এর মত তিনি শিষ্য-সুহৃদদের চিত্তবিকাশেই দেখেছেন আত্মবিকাশ—কিন্তু কোনো প্লেটো তাঁর সে আলাপন লিপিবদ্ধ করে রাখে নি—তাই সাধারণের তিনি প্রায় অপরিজ্ঞাত। বন্ধু বা সুহৃদদের নিকট তাঁর একান্ত নির্বাসন থেকে লিখিত চিঠি-পত্রের মধ্য দিয়ে সে প্রতিভার দীপ্তি ও জিজ্ঞাসার অনুমান করা যেতে পারে। কিন্তু কে তা সংগ্রহ করে, সে স্থানও এটি নয়। তবু খান তিন যা পাওয়া যায় দাখিল করি। তা হলে বোধহয় কতকটা তাঁকে দেখতে পাবো—হাজার কথায়ও যা হবে না।

নওয়াখালি

৪.৯.২১

হে বন্ধু,

বাদ্‌লা।

সূত্রবিহীন গোঁজামিলের মধ্যে ঐক্যের আদানের হে ব্যবসায়ী, তোমার কাছে নির্ভয়ে এ আবোল্‌তাবোল্‌ ছেড়ে দিলুম।

তিনটি point আছে।

(১) এদেশের পলিটিকেসে যেমন টল্‌স্‌টয়ের ফিলসফিক্‌ অ্যানার্কি আর আয়ার্ল্যাণ্ডের Declaration of Republic প্রভৃতি নিয়ে একটা পল্লব-গ্রাহিতার কারবার চলেছে, তেমনি বাংলার সাহিত্যে Storm and drung প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে সমাজ-মন, সমাজ-যন্ত্র, সমাজ organism প্রভৃতি কতগুলি 'বুকনি' খুব ফুট্‌ছে। সত্যকথা বল্‌তে কি, এ-পদার্থগুলির ক্ষীণতম ধারণামাত্র আমার নেই। চেহারা যতই ভিন্নরকম হোক্‌, এদেশে সমাজ নামক পদার্থের উপরেই ছিল ব্যক্তি। এদেশের ধর্ম-এ "তুমি যার আমি মাঝে", কিংবা সঙ্গে "কেহ নাই"! চিত্র রেখামাত্র সম্বল, clearly defined, individuality. গান পঁচিশ জনে মিলে গাওয়া চলে না (কীর্তনের কথা পরে)। ব্যক্তির জন্যে এক ব্যবস্থা, সমাজের জন্য আর, এ বিধি ভারতবর্ষের নয়। রাষ্ট্রীয় মুক্তি এ phrase-টাই খাস বিলিতি। এ-দেশ কেবল একরকম স্বরাজ চেনে, সে হচ্ছে বৈদান্তিক স্বরাজ্য।

এমতাবস্থায় ব্যক্তির জন্যে দাস্যের prescription দিয়ে সমাজের জন্যে অন্য ব্যবস্থা এ দেশের ধাতে সইবে না ["সবুজ-পত্র", পৃ.…?]

(২) কারণ কি, সমাজ হাওয়ায় উড়বে (না-ত)[১]। সে ব্যক্তির মধ্যে আপন realisation খুঁজে পাচ্ছি।—রবীন্দ্রনাথ, যে চরকা না ঘুরিয়ে গান গেয়েছেন সেই রবীন্দ্রনাথেই ভারতবর্ষ আপনাকে সার্থক করেছেন। আমি যে রেলগাড়ীতে সবচেয়ে ভাল সীট্‌, জানালার ধারের, খুঁজি,—আমার comfort, আমার conven-

১. বন্ধনী মধ্যস্থ শব্দটি কিছুটা পাঠকের সংযোজিত। পত্রাংশ পোকায় কাটা-শব্দাংশ পড়া যায়। বাকীটুকু অনুমানের সাহায্যে পরিপূরিত।

ience, আমার self-realisation-এর জন্যে দরকার—আমি এই সমস্ত সুবিধা ও স্বাস্থ্য ভোগপূর্বক যে উৎকর্ষ লাভ করব, আমার সমাজ তা ভোগ করবে। আবার কখনো বা আমার আরাম আমি ছাড়্ব, কিন্তু স্বেচ্ছায় ছাড়ব, সেও আমারই self-realisation-ওয়াস্তে।

আসল কথা, এই 'স্বেচ্ছা' নামক ব্যাপারই সমুদয় difference সৃষ্টি করেছে। যে দারিদ্র্য যে অপমান আমার উপরে পুঞ্জীকৃত হয়েছে, সে যদি আমার উপরে চাপান না হয়ে, আমা-কর্তৃক বৃত, আলিঙ্গিত, আনন্দে গৃহীত হ'ত তবে সমুদয় ব্যাপারটার চেহারা অন্যবিধ হ'ত।

যেমন, যৌন ব্যাপারে। একটি শিশু যদি coition দেখে সে মনে করবে নীচেকার ব্যক্তিটি ভয়াবহরূপে নির্যাতিত হচ্ছে, এবং উপরকার ব্যক্তিটি হয়ত নীচেরটির উপরে ভয়ানক রাগ করে থাকবে। সমস্ত ক্রিয়াটা minus যৌন উত্তেজনা—একটা ভীষণ নিপীড়ন।

আমি যা বলতে চাচ্ছি, তা এই যে, আমাদেরকে একবার কায়মনোবাক্যে শূদ্র হতে হবে, "নহিলে নাহি রে পরিত্রাণ"। অর্থাৎ, শূদ্র তো রয়েছিই এখন এই শূদ্রত্বকে আলিঙ্গন করতে হবে। অর্থাৎ এই necessity-টাকেই virtue করা আবশ্যক হয়েছে।

অর্থাৎ, একমুহূর্তে ভিতরের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করে আমাদের আবিষ্কার করতে হবে, যে, আমরা, জজই হই, ম্যাজিস্ট্রেটই হই, আমাদের দৈন্য আমাদের লাঞ্ছনা অতলস্পর্শ। পরক্ষণে, মেথর মুচি এবং চাঁড়ালদের সঙ্গে আমাকে এক এবং অভিন্ন,—কেবলমাত্র সগোত্র নয়,—একেবারে একাত্ম অনুভব করে, যে যেখানে আছি সে সেখান থেকে নেমে দাঁড়াব—এই করতে হবে। সেই নামাই ওঠা হবে।

অর্থাৎ এ ব্যাপারটি কবিতায় নয় যার কিন্তু জীবনে আচরণ করতে হবে। Non-co-operation এই দাবী করচে।

সমস্ত ভারতবর্ষ অপনাকে সত্যভাবে শূদ্র বলে অনুভব করা, এবং যথার্থ শূদ্রবৎ আচরণ করা মাত্রও তার সিদ্ধিলাভ হতে বাধ্য। একটা শূদ্র consciousness জাগ্রত করার প্রয়োজন হয়েছে।

তবে সে শূদ্রের মুখ লাটদরবার থেকে পাহাড়গুলির দিকে যেন তাকায়। কেবল এই।

(৩) আমি আবিষ্কার করেছি, যে, বৃন্দাবন মিথ্যা নয়। এবং স্বাধীন ভারতবর্ষ-এর নাম "নব বৃন্দাবন" হওয়া উচিত, "Pan-Hindu-Islam" না হয়ে।

এ আবিষ্কার আমি নিজের মধ্যে করেছি। দেখেছি যে, 'নবঘন' এবং 'দূর্বাদল'-ভরা শ্যামলতা মানুষের মাংসের উপরে রঞ্জিত হওয়ার মধ্যে আচানক কিছু নাই। এবং এজন্য যদি আমি কোনোরূপ ক্ষুধিতবোধ করি, এবং তার জন্য যদি কোনো গেঁয়ে চটে যায়, তবে তাতে যেমন আমার কোনো লজ্জা নেই, তেমনি ভয়ও নেই।

কারণ আমার মধ্যে যা কিছু নিন্দার্হ, যা কিছু নীচ এবং হেয়, আমার ভেতরকার যা কিছু সম্বন্ধে আমি লজ্জিত, যা কিছু আমি প্রাণপণে লুকোতে চাই নিকটতম বন্ধুরও কাছ থেকে, তাই—সে সবই কেবল অপেক্ষা করছে মর্দিত ও চুম্বিত হওয়ার জন্যে। বৈশাখের মাঠ যেমন চৌচির হয়ে থাকে বর্ষার ক্ষুধায়, আমার স্বভাবের দীনতাগুলো সেই রকম দীর্ণতা। সে দীর্ণতা এখন কেবল ফাটল, এখন তার কোনো মানে নেই, এমনকি এখন সে বীভৎসতা, কিন্তু আগামী বর্ষণ ধারার সঙ্গে মিলিয়ে দেখলেই তাকে বোঝা, তাকে ক্ষমা করা সহজ হবে।

সেই যে "আমার অনাগত", সেই যে "আমার অনাহত", সেইখানে আমার সার্থকতা।

সেই সার্থকতা খোঁজা ছাড়া এ পৃথিবীতে আমার আর কি কর্তব্য আছে? এখনো, না জেনে, আমার সমুদয় আলস্যে, নিদ্রায়, গল্পগুজবে, বন্ধুনির্বাচনে, দৈনন্দিন কাজে, ভুলে, love-making-এ (?), সেই খোঁজাই, না-জেনে, চলছে। বৃহৎ আইডিয়ার জন্যে যদি নিজেকে ছাড়ি, তবে না হয়, মেনে consciously খুঁজব। আমার সেই সন্ধানের পথে বাই-প্রডাক্ট রূপে হয়ত ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়ে যেতে পারে—কিন্তু তাতে আমার কিছু এসে যায় না। ভারতবর্ষ স্বাধীন করবার জন্য ত আমি জন্মাই নি। হয়ত, ভারতবর্ষ (যদি) স্বাধীন থাকত, তবে আমার সার্থকতার পথ আর একটু সুগম থাকৃত। এই মাত্র।

অর্থাৎ ভারতবর্ষের পলিটিক্যাল্ প্রোগ্রামের সঙ্গে কোন্ ভাব খাপ খাবে, কি না-খাবে, সে প্রশ্নই অপ্রাসঙ্গিক।

যাঁরা বলেন, ব্যক্তির মুক্তি চেষ্টাটা এদেশে একটু বেশি বেশি হয়েছিল বলেই আজ ভারতবর্ষের এ দুর্গতি, অরবিন্দ তাঁদের শেষ জবাব দিয়েছেন। সে চেষ্টা যদি সর্বদা সত্য থাকত, তবে এ দশা ঘটতে পারত না। দুর্গতি সেই ফাঁকে এসে পড়ল, পান্থশালা যখন গৃহ হ'ল। হঠাৎ, যে-সমস্ত সমাজ ব্যবস্থা, institutions ব্যক্তিকে তার চরম লক্ষ্যের দিকে অভিমুখীন এবং অগ্রসর করবার জন্যেই গড়ে উঠেছিল, সেইগুলো নিজেরাই যখন লক্ষ্য ও বিশ্রামস্থল হয়ে উঠ্‌ল, তখনি।

দেখি নি কি, যখনই থেমেছি তখনই পাপ এবং দুঃখ পায়ে পায়ে এসে হাজির হয়েছে?

ইতি
'সু'

চিঠি

২৫।৭ (১৯২৮)

প্রীতিভাজনেষু,

মুর্গী-পাচক রজনী'র ভাগিনা'র সঙ্গে ফেণীতে দেখা। সে বলিল, হালদার মশায়[১] নাকি কিছুই খাইতে পারেন না, এবং তাঁর চক্ষুও খারাপ হইয়া গেছে। সত্য কি? এখন তাঁর কি রকম?

"মনো বিকলন"[২] পড়িয়া মনে হইয়াছিল যেন "Hibbert Journal"-টর্ণ্যাল পড়িতেছি। তুমি নিজেকে এই ঘটনাটার উপরে অনায়াসে কন্‌গ্র্যাচুলেট্ করিতে পার যে, বঙ্গে সর্বদা ওরকম জিনিস্ লেখা হয় না।

কিন্তু চিঠিতে ডেকাডান্‌স্ সম্বন্ধে যা লিখিয়াছিলে তৎসম্বন্ধে আমার জেরা অ্যামেণ্ডমেণ্ট আছে। ইউরোপীয় চারুকলার ইতিহাস থেকে ও কথাটি নেওয়া, যেমন ইউরোপীয় পলিটিক্স থেকে স্বরাজ্যরা ডেডলক্ কথাটি লইয়াছে। আমাদের দেশে টিপ্‌রা বালকেরা আমাদের মতো করিয়া 'হরির লুট' প্রভৃতি করে। তাদের

১. রঙ্গীন হালদার মহাশয়ের পিতা প্রমোদাকান্ত হালদার।
২. ভারতবর্ষে রঙ্গীন হালদার লিখিত প্রবন্ধাবলী।

'হরির লুট' যে প্রকারের, স্বরাজদের অব্‌স্‌ট্রক্‌ষ্যন্‌ সে প্রকারের, অর্থাৎ একটা খেলা। সে যাই হোক্‌। ডেকাডান্‌স্‌ বলিলে বোধ করি অল্পকাল পূর্বের একটা পুষ্পায়মান্‌ অবস্থা থেকে বিচ্যুতিকে নির্দেশ করা হয়। আমাদের জাতের সে প্রকারের কোনও পুষ্পোদ্‌গম কবে তুমি দেখিলে দশ বিশ পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে? অ্যানার্কিসট্‌ আন্দোলন? সে ত একটা আক্ষেপ। ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলন? সে ত ঐ সুদর্শন[১] হালদার হয়তো যাকে 'ফ্যাগোশাইট' আন্দোলন বলিতেন। রবীন্দ্র-সাহিত্য? —একটা অঁকিড্‌। জগদীশ বোস্‌ প্রফুল্ল রায়? —জগদীশ বোসের কথা তুমি জান, পিসি'র কথা আমি জানি।

অতএব অবস্থাটা বুঝাইবার জন্য অপর শব্দ বল যেটা ডেকাডান্‌স্‌-এর মতো একটা সাময়িক অবস্থার নাম নহে কিন্তু একটা ক্রোনিক্‌ অবস্থার নাম।

'অন্তঃসারহীন মৌখিকতা' ফ্রেজ্‌টা clumsy cumbrous- কিন্তু একটা very near approach লক্ষ্য করিবে, ও জিনিস্‌টা ঠিক কাপট্য নহে—কিন্তু তার চেয়ে স্বতন্ত্র।

এই অন্তঃসারহীনতাই গান্ধী আন্দোলনকে লইয়া 'স্বরাজ্যামিতে পৌঁছাইয়াছে, বিবেকানন্দের মঠে বিবেকানন্দসট্‌ (?) বসাইয়াছে, ইউরোপীয় সাহিত্যের শ্রমশীল ছাত্র (অজিত চক্রবর্তী-বৎ) গণ্ডায় গণ্ডায় প্রড্যুশ না করিয়া এ বঙ্গে একটি অপরূপ আস্তাকুঁড় (মাসিক সাহিত্য) স্তূপীকৃত করিয়াছে। বলিতে চাই গান্ধী আন্দোলন, বিবেকানন্দ ও ইউরোপীয় সাহিত্য যদি কতকগুলি বীজ হয়, তবে, তারা যে soil এখানে পাইয়াছিল, সে একটা 'বালিয়াড়ি' ('কপালকুণ্ডলা')। ভাল ত? ইতি

সুঃ চঃ

[**হালদার কোম্পানি**][২]

পুনশ্চঃ

রঙীন হালদারের স্বভাবের মধ্যে যে বাস্তবিক জীবনের রুটিন-ভাঙা একটা আসপেক্ট্‌ আছে তাকে এই বসন্তের অন্তে স্বাগতম্‌—এই

১. ডাঃ সুদর্শন হালদার (অগ্রজ)।
২. ঐ নামের (এক সময়ে হালদারদের) বড় ঔষধপত্রের দোকান।

নারিকেলের জঙ্গলে সমুদ্রের ধারে অবিরাম পাড় ভাঙার ঝুপঝাপের মধ্যে! জীবনের গভীর নৈরাশ্য থেকে চা ও শ্বেতপত্রের উত্তেজনার মধ্যে! শতকোটী প্রথা সামাজিক শিষ্টতা কলে বাজানো মরালিটির বেড়াজালে রুদ্ধ নিশ্বাস INDIVIDUAL-এর বিচিত্র self assertion-এ হৈ হৈ রৈ রৈ 'মাঝরোতে'[১]! সাধুর শান্তিভঙ্গে চেয়ার-ঘুরানিয়ার[২] দর্পচূর্ণে! স্বাগতম্ পঙ্কতিলক। এস অকৃতার্থতা Those that are filled do not hunger আফসোসের আত্মতৃপ্ত আরামের গভীর অপমান থেকে বৈফল্যের বজ্রদগ্ধ পত্র মহীরূহের দৃপ্ত ঘাড় 'তেড়ামিতে'! শুনিতে পাওয়া যায় 'দূর দিগন্তের সকরুণ সঙ্গীত' 'যা নিরুদ্দেশ যাত্রা থেকে লাগে মোর চিন্তায় কাজে'।

চিঠি

মাঃ কালি

৩।১০

প্রীতিভাজনেষু,

তোমার পত্র। বঙ্গব্যূহে অভিমন্যু=বৎ তটস্থ সুরেশ চক্রবর্ত্তীকে ভাষার লালিত্য একোয়ার করিতে বলা আর ছাই-এ জল ঢালা এক। মলয়=মারুত, শাশ্বত বাণী, জ্যোৎস্নার ফালি, কিরণের জোয়ার প্রভৃতি 'দিদি'=প্রণেত্রীদের জন্যে রাখিয়া দিয়া—আমাদের যদি কিছু বলিবার থাকে যেমন=খুসি বলিব,—যদি না থাকে চিড়া চিবাইব। গোপালের দেওয়া নোটগুলি[৩] আমার কাছে নাই ফিরাইয়া দিয়াছিলাম। Walt Whitman নোতুন করিয়া লিখিয়াছিলাম—চাঁদপুরের এক ব্যক্তির পীড়নে; —সে এক সভায় পড়িয়াছিল তাই। সেটার এক নকল অনেকদিন হয় এক ব্যক্তির হাতে দিয়াছিলাম। দেখি।

১. একটি সবুজ সঙ্ঘের বেপরোয়া কর্মের বর্ণনা—মাঝারো তাদের একটি ধ্বনি, সমবেত চিৎকারে আত্মঘোষণা। তুল্: নজরুলের 'দে গরুর পা ধুইয়ে'।

২. সরস্বতী পূজার আসরে যাত্রাগানে প্রতিমার দিকে মুখ করিয়া অভিনয় হয়, রাজাও সিংহাসনে বসে। কিন্তু একবার হাকিম-হাকিমানীরা আসায় রাজার 'চেয়ার' তাদের মুখোমুখি ঘুরিয়ে প্রতিমাকে পিছনে ফেলা হয়। প্রতিবাদে 'সাধু' (প্রফুল্ল হালদার) প্রভৃতি জোর করিয়া তাহা আবার ঘুরাইয়া দিতে বাধ্য করে।

৩. সম্ভবত নোয়াখালি সবুজ সঙ্ঘের অনুষ্ঠিত বক্তৃতামালার নোট্।—পাওয়া যায় নাই।

ভাল, তুমি কি রুষীয় চিত্রকরের আঁকা 'Stream of life'-এর প্রতিলিপিটি পাও নি, যা আমি পাঠিয়েছি ? একেবারে শচীনবাবু[১] কি আমাকে স্মরণ করেন ? সতীন্ বাবু[২] ?…সু. চ.

চিঠি

পোস্টকার্ড

মঃ কান্দি* ৯ই কার্ত্তিক (অক্টোবর ১৯২৮)

প্রিয়বরেষু—তোমার দশমীর p.c.।গত p.c.'র পূর্বে তোমাকে পাটনার ঠিকানায় যে লম্বা লেপাফা পাঠাইয়াছিলাম, সে খানা বুঝি পাও নি ? না পাইয়া থাকিলে আমার মৃত্যু। হয় সেখানা এখানে খোলা হইয়াছে, না=হয় পার্টালিপুত্রে। হেরম্ব=মৈত্র মরালিটির সাইকো অ্যানালিসিস্ (?)। গেছি।

যাউক্।

এখানে আজ খুব বৃষ্টি হইল। কলিকাতায় কি=রকম ?

কিছুকাল পূর্বে মিস্‌টেসিস্‌ম্=সম্বন্ধে চিন্তা করিতে করিতে একটা ফিগার আমার মগজে আসিয়া গিয়াছিল। সেটাকে যদি জ্যোৎস্নার ফালি=জাতীয় এবারতে লিপিবদ্ধ করিতে পারিতাম, খুসি হইতাম।

একটা দীঘী গভীর কালো। নিম্নে মাছেরা। নিতান্ত পরিচিত একঘেয়ে রকমে দীর্ঘিকার মধ্যেই পর্যাপ্ত তাদের দিনগুলি গুজ্‌রায়। একটা রুই একটা 'ফাল্' দিয়াছিল ঃ দিয়া উপরের নীল আকাশ, রৌদ্র, কলরবমুখরিত চারিপাশ প্রভৃতির একটা মোটা-মুটি আভাস তার চেতনার উপরে লাভ করিয়াছিল। মুহূর্ত্তেক পরে পরিচিত জীবনে ফিরিয়া আসিয়া বলিয়াছিল শুধু, 'দেখিয়াছি'। সেই দেখাটা চিরজন্মের মত তার মাথা খাইয়াছিল। সে কি বলিত ট্যাংরা পুঁটিদের কাছে তা স্পষ্ট করিতে পারিত না—অনির্বাচ্য।

---

১. ৺শচীন্দ্রনাথ বসু পাটনার শিক্ষিত সমাজের অগ্রগণ্য মানুষ, ব্যারিস্টার।

২. সতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত—পাটনা বি-এন কলেজের ইংরেজির অধ্যাপক। ও তাঁহার সহযোগী।

* মঙ্গলকান্দি (ফেনী, নোয়াখালি), সেখানকার স্কুলে তিনি কিছুদিন (১৯২৭-২৮এ) শিক্ষক ছিলেন।

গোপাল যদি এই আইডিয়া=টাকে আবদ্ধ (?) করার যোগ্য মনে করে, আনন্দিত হবো। ইতি

ভবদীয়
সুরেশ চক্রবর্ত্তী

সুরেশ চক্রবর্তীর দৃষ্টিভঙ্গি ও তাঁর বাক্য-রীতি এই পত্র-কয়টির ফাঁকে ফাঁকে, বেরোচ্ছে। বাঁকা-চোবা বাক্য-রীতি আরও সহজগতিও হতে পারত। 'কলার কথা' রীতিমত তাত্ত্বিক বক্তৃতা, কঠিন হতে বাধ্য, কিন্তু হয় নি। তা 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত হয়েছিল। 'রবীন্দ্রনাথ' স্বভাবতই সু-প্রসঙ্গ। রবীন্দ্র-ভাবনায় গভীররূপে সমৃদ্ধ এ বক্তৃতা ছাপা হলে রবীন্দ্রনাথও নাকি সন্তুষ্ট মনে জানতে উৎসুক হয়েছিলেন কে এই লোক (বক্তা ?) ? স্বতঃ-উৎসারিত শ্রদ্ধায় সে বক্তৃতা ছিল বিচ্ছুরিত দ্যুতি। শ্রোতারা সকলে চমৎকৃত ও প্রবুদ্ধ হন। পুরাতন সাময়িক পত্রে (ভারতবর্ষে কি ?) এ দু'টি বক্তৃতা অনুলিখিত রূপে খুঁজে পাওয়া গেলেও যেতে পারে। কিন্তু হুইটম্যান বক্তৃতাটি আর পাওয়া যাবে না। স্মৃতিসার উদ্ধার করা চলে কি ? দেখি—

হুইটম্যান তখনো শিক্ষিতদের নিকটও প্রায় অপরিচিত নাম। আই-এ পরীক্ষার আগে মাস দুই ওঁরই মুখে সে কবির কাব্যপাঠ শুনতে শুনতে পরীক্ষাটি তলিয়ে দিয়েছিলাম,—তাতে কিছুমাত্র ক্ষতি হয় নি। রবীন্দ্রনাথ, ব্রাউনিং-এর পরেই সুরেশবাবুর সমাদৃত কবি ছিলেন হুইটম্যান্।

কে এই কবি ? বিশুদ্ধ-অর্থাৎ অবিকৃত ইংরেজি উচ্চারণে সকলে শুনেছে। 'হুইটম্যান' কে ?

Walt Whitman, a kosmos, of Manhattan the son.

Turbulent, fleshy, sensual, eating, drinking and breeding. No sentimentalist, no stander above men and women or apart from them.

No more modest than immodest.…

I believe in the flesh and the appetites.

- Seeing, hearing, feeling, are miracles, and each part and tag of me is a miracle. ('Song of Myself' 24)

কী তাঁর বক্তব্য ?

One's-self I sing, a simple separate person ; yet utter the word Democratic, the word En-Masse. Of Physiology top to toe I sing.

Not Physiognomy alone nor brain alone is worthy for the muse, I say the Form complete is worthier far,

The Female equally with the Male I sing.

Of life immense in passion, pulse and power, cheerful for freest action formed under the laws divine.

The Modern Man I sing.

বলে কী এ অদ্ভুত কবি ! মহৎ ও তুচ্ছ, সূক্ষ্ম ও স্থূল, পুণ্য ও পাপ, ভব্য ও অভব্য সবই যাঁর বলিষ্ঠ দৃষ্টিতে সমান সত্য, কবিকৃতিতে সমান গ্রাহ্য। এ কি বিশ্বরূপ দর্শন ? ও কথাটি বলেই সভাপতি (আমার বাবা) উপস্থিত শ্রোতাদের মনকে আলোকের আভাস দিয়েছিলেন।

I sing the Body Electric. ...

O my body ! I dare not desert the lives of you in other men, women, nor the lives of the parts of you. ...

Head, neck, hair, ears, drop and tympan of the ears, ...

O I say these are not the parts and poems of the body, only but of the soul.

O I say now these are the soul !

'Children of Adam' 9.

'These are the soul' ; এ কি দেহাত্মবাদী সহজিয়া তত্ত্ব ?

I am the part of the Body and I am the poet of the Soul. ...

I am the poet of the woman the same as the Man.

And I say it is great to be a woman as to be a man.

And I say there is nothing greater than the mother of men. (Song of Myself 2)

My comrade!

For you share with me too greatnesses, and a third one rising inclusive and more resplendent,

The greatness of Love and Democracy, and the greatness of Religion.

('Starting from Paumanok, 10.)

কিন্তু এ কি কবিতা, কবিতা বলব একে ?

'Who touches this book touches man,

সবই Passion-এর বিদ্যুচ্ছটা।

Leaves of Grass-এর একশ বছর পরে সেই দুর্বার কবির এরূপ প্রাণ-প্রবন্ধ স্বপ্ন—এখন কি মনে হয় পাগলের প্রলাপ ? কোথায় বা তাঁর সেই স্বপ্নের 'আমেরিকা', সেই কল্পনার 'ডিমোক্র্যাসি', সেই দেশে-দেশে ভুজবন্ধনের সখ্য-সংগঠন—By the manly love of comrades ? সেখানে দেখি ভিয়েৎনাম যুদ্ধ পারমিসিভ সোসাইটি—আর সমকামিতার সখ্যতা। তখনো বিশ্বাস করা সম্ভব ছিল 'ঐ মহামানব আসে'। অন্ততঃ ভারতবর্ষে আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল, তখনো আমেরিকাতেও বিশ্বাস করা, ডিমোক্রাসিতেও বিশ্বাস করা, তাঁর চেয়েও বেশি বিশ্বাস করা প্রাণের অপরাজেয়তায়—সেই মন্ত্রে ওঁ প্রাণায় স্বাহা। তবে ওসব কথাগুলোর স্থূল অর্থ তখনি বদলে যাচ্ছিল। সেদিনকার বক্তৃতার শ্রোতারা কি ভেবেছিলেন কে জানে ? এ কি নতুন 'বিশ্বরূপ-দর্শন' ? দু-একজন তাতে সত্যই প্রবুদ্ধ হন। অধিকাংশেরই একটা অস্পষ্ট ধারণা 'ক্ষ্যাপাটা ধূলোকাদা সবকিছুকেই মনে করে পরশ পাথর। তবু ভালো।'

হুইট্‌ম্যানের পরেই শেষ বক্তৃতা ছিল **'নাস্তিকতার প্রয়োজনীয়তা।'** বিষয়টা বোধহয় আমিই দুষ্টুমি করে বলেছিলাম। সুরেশবাবু সাগ্রহে বললেন, 'ঠিক'। আমরা তো অবাক। সুরেশবাবু রবীন্দ্র-ভাবনায় ভাবিত, উপনিষদ-বাইবেলের ভক্ত। আসলে গভীর অধ্যাত্মভাবনার ভাবুক। এরূপ বিষয়ে তাঁকে দিয়ে বক্তৃতা তাঁর আন্তরিক বিশ্বাসের উপর অত্যাচার। তিনি কিন্তু রাজী। 'ছাপানো বিজ্ঞাপনী'তে বক্তৃতা-বিষয় পূর্বেই শহরে প্রকাশিত হয়ে গিয়েছিল। ঐ বক্তৃতার বিষয় দেখা মাত্রই তো সকলে অগ্নিশর্মা। 'সবুজ সঙ্ঘ' তো বেপরোয়ার দল ; কিন্তু বাড়াবাড়িরও একটা সীমা আছে। জাত মানে না,

ধর্মকর্মে বিদ্রূপ করে, গান্ধীজীকে ছাড়ে না ; তাই বলে একেবারে 'নাস্তিকতার প্রয়োজনীয়তা।' এই শেষ বক্তৃতার নামেই সকল দিনের থেকে শ্রোতার সংখ্যা আশাতীত হয়েছিল। শেষদিন, ভীড় বেশি, উত্তেজনা বেশি। বিরোধের ক্ষোভও আছে, আর ভয়-নৈরাশ্য কি কম ? 'ওরা (সবুজ সঙ্ঘ) সব ভাঙবে, কিছু আর থাকবে না—বউ-ঝি নিয়ে তবু এতদিন বাস করছিলাম, তাও আর সম্ভব হবে না।' বক্তৃতার বিষয় জেনেই একাধিক প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ প্রকাশ্যে এই দুর্ভাবনায় মুখর। প্রায় সকলেরই নাতিপ্রচ্ছন্ন অপ্রসন্নতা। ছোট সভাগৃহে তাই নানা ধারণার লোকের ভীড়। সুরেশবাবুর বক্তৃতায় তাদের ক্ষোভ একটু একটু করে গুলিয়ে যেতে লাগল। অনেকেই নিঃশ্বাস বন্ধ করে অপেক্ষা করছিল। সে বক্তৃতার তির্যক রঙ্গ ও ব্যঙ্গ তারা প্রথম বুঝতে পারল না, পরে গায়ে মাখল না, সন্দিগ্ধ মনে শুনতে লাগল।

বক্তৃতার মোট ধারণাটা এরূপ ঃ

জীবনের সব থেকে প্রয়োজনীয় জিজ্ঞাসা, কে তুমি ? সে জিজ্ঞাসাকে সার্থক করাই জীবনের উদ্দেশ্য, না হলে মানব-জন্মই মিথ্যা। কারণ, ওই জিজ্ঞাসাহীন জীবন নাস্তিকতাও না, আস্তিকতাও না,—নিছক ফাঁকা, মিথ্যা। নাস্তিকতার থেকে অনেক অনেক হেয়। ভগবানের যে বিপক্ষে, আমরা জানি, তার মুক্তি তিন জন্মে। ভগবানের যে স্বপক্ষ তার কিন্তু মুক্তি সাত জন্মে। কারণটা আর কিছু নয়। ও রকম ভগবানের স্বপক্ষীয়রা আসলে নিজেরই স্বপক্ষে—'ভগবান্' তাদের হাতের পাঁচ বা তুরুপের গোলাম। কিন্তু নাস্তিকের তো তা নয়। নিজ জন্মটাকে অনেক বেশি প্রাণমন দিয়ে নাস্তিকের গড়তে হয়। একটাই জন্ম, একটাই জীবন, তা নিয়ে সে হেলাফেলা করবে কি করে ? আস্তিকের অবশ্য সেরূপ দুশ্চিন্তা নেই—'এ জন্মে না হয়, আরেক জন্ম আছে।' কিম্বা, 'আমার আবার করার কী ? ভগবান আছেন, তিনিই করবেন। সব ভগবানের হাত। তিনিই মুক্তিও দেবেন।' এঁদের 'ভগবান আছেন'টা কেমন ? না, 'থ্যাঙ্ক ইউ ভগবান্'। বেশ আছি টাকাকড়ি, সুখ-সুবিধা যথেষ্ট পাচ্ছি। অতএব, 'থ্যাংক্ ইউ ভগবান্।' অথবা, 'মনে করো শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর'—যমদূত এসে লোহা পুড়িয়ে বিঁধছে শরীরটাকে। অর্থাৎ এ হচ্ছে 'পুলিস্-ম্যান ভগবান্'। কিম্বা, 'কী আশ্চর্য ভগবানের কৌশল—মোষকে দিয়েছেন শিং, না হলে মোষ কি করে বাঁচবে ?' অর্থাৎ এ হচ্ছে 'মোষের শিং' এর ভগবান্'। আবার, কারও পক্ষে—'পরকালের কথা ভাবো একটু—পূজা-আর্চা করো, পুণ্য সঞ্চয় করো, পরকালে না হলে কি করবে ?' অর্থাৎ ইন্সিওরেন্স পলিশির' ভগবান্। অথবা, 'দাও কিছু দাও, পূজা, পাঁঠাবলি, কিছু

দাও। এ হচ্ছে 'হাকিমের পেশকার' ভগবান—ঘুষ না পেলে চোখেই দেখবে না তোমাকে।' ইত্যাদি, ইত্যাদি। আস্তিকদের এরূপ প্রায় আট-দশ-শ্রেণীর ভগবানের ব্যাখ্যা সুরেশবাবু করলেন। শুনতে শুন্‌তে শেষদিকে মজা পাচ্ছিলেন শ্রোতারা; কিন্তু কারো গায়ে তা বিঁধছিল মনে হয় না। এই মজার পালা চল্‌ত আরও, কে একজন—বোধহয় সভাপতিই—বক্তার উদ্দেশ্যে বললেন, 'টাইম্‌স্‌ আপ্‌।' সুরেশবাবু আধ-নিমেষ থেমে সভার উদ্দেশ্য বল্‌লেন, হাঁ, 'টাইম্‌স্‌ আপ্‌'।

টাইমস্‌ আপ্‌—এই জন্ম, এই জীবন—তা ফুরিয়ে যাচ্ছে। প্রতি মুহূর্তে তা ক্ষয় হচ্ছে। টাইম্‌স্‌ আপ্‌। কী তা নিয়ে করবেন- ঠিক করুন্‌—টাইম্‌স্‌ আপ্‌। চান ফাঁকি দিন—জীবনকে ফাঁকি দিয়ে ভগবানকে ফাঁকি দিতে পারবেন কিনা জানি না। তবে ফাঁকি যদি না দিতে চান—তা হলে জিজ্ঞাসা করুন নিজেকে—কী আপনার জ্ঞান-বুদ্ধি-মনের উপলব্ধি। কী এ জীবন? কী এ পৃথিবী? সত্য কী? আপনি কি তা জেনেছেন? জানতে চেয়েছেন কখনো? যদি জানেন—যদি বোঝেন—নেতি, নেতি, নেতৎ, নেতৎ যেনমেতে উপাসতে—'সব ঝুট হ্যায়'—তা হলেও মুক্তির নিকটতর হলেন। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নাস্তিকেরা অনেকেই আস্তিকদের থেকে সত্যের নিকটতর। তাঁরা জ্ঞান দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে এমন কি প্রেম দিয়েও মনুষ্য জীবনকে মহিমান্বিত করেন, পৃথিবীকে জানেন, বিশ্বকে দেখেন, মানুষকে আবিষ্কার করেন। ভগবান্‌ যা হয় হোন—এই জানার, এই সত্য সন্ধানের, মানুষের এই স্বরূপ আবিষ্কারের জন্যই নাস্তিকতার প্রয়োজনীয়তা।

সুরেশবাবু যা সত্যই বলেছিলেন কারও সাধ্যে নেই তার সারাংশ সংগ্রহ করে, কিন্তু শব্দ ও অর্থ-ব্যক্তিত্বের স্পর্শে তাতে সার ছাড়া অবান্তর কিছু ছিল না। পঞ্চাশ বৎসরে তাই স্মৃতি থেকে মাত্র সেই অনুভূতির স্মৃতিই আহরণ সম্ভব। আমরা তো এসব কথা শুনে যেমন চমৎকৃত হলাম তেমনি অসুবিধায়ও পড়লাম। আমাদের মাথায় ছিল এরূপ উদ্দেশ্য—অধ্যাত্ম বুদ্ধির জায়গায় দেশটায় একটু যুক্তি, বুদ্ধি, বিজ্ঞানের প্রসার বাড়ুক। সে দিকটা স্পষ্ট করে দেওয়া দরকার। দু'-একজন তাই দাঁড়িয়ে পড়লাম—একটু চড়া সুরেই কথাটা বল্‌লাম—'আমরা নাস্তিক।' স্পর্ধা বটে, ধৃষ্টতাও নিশ্চয়। সুরেশবাবুর কথা যাঁদের গায়ে বেঁধে নি, এই স্পর্ধা তাঁদেব গায়ে না লেগে গেল না। তাই লেগে গেল তামাসা। কারও ক্ষোভ, কারও ক্রোধ, কারও ক্রন্দন 'এবার আর কিছু থাকচে না, সব যাবে—সব গেল।' অর্থাৎ, আমাদের উদ্দেশ্য এক অর্থে সিদ্ধ হল; অন্যদিকে একটি অসামান্য বক্তৃতা প্রায় এই বাঁদরামির ফলে চাপা পড়ে

[illegible] ...

[illegible]। [illegible] ([illegible]) [illegible] তো [illegible]। কিন্তু নাস্তিকতা যে মহাপাপ! এমনিতেই তো ছেলেরা বাপ-মাকে মানে না। নাস্তিকরা আস্কারা পেলে বউ-ঝি আর ঘরে রাখা যাবে না।

নোয়াখালির ইতিহাসে সে একটা মজার দিন গিয়েছে। কিন্তু মজা উপভোগ করেও আমরা সম্পূর্ণ তুষ্ট হতাম না। সঙ্গীত-সাহিত্যেও শেষ হ'ত না যৌবনের উৎসাহ। না, স্যাংটিটির অপেক্ষা দেশটায় স্যানিটির কিছু প্রসার প্রয়োজন। সংকীর্তনের থেকে স্যানিটেশনের দরকার বেশি। আর ভগবানের উপাসনার থেকে মানুষের মঙ্গলের আয়োজন বেশি জরুরী। মাথায় সোস্যালিজম-কম্যুনিজমের কাঁচা ধোঁয়াও ছিল (আলো নয়), ন্যাশনালিজম্-এর ঝোঁকও ছিল। রাজনীতির ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমানের ভেদ কেবলি বাড়ছে। হিউম্যানিজম্-এর প্রচারই মনে হল তখন প্রয়োজন। জনা সাত-আট বন্ধু মিলে আমরা নদীর পারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একদিন স্থাপিত করে ফেললাম **'মানব মঙ্গল মণ্ডলী'**। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই হ'ল কাজ। বিদ্যাসাগর—অক্ষয়-কুমারের ধারাটা দেবেন্দ্রনাথ থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ পর্যন্ত ধর্মাত্মারা একদিকে চাপা দিয়ে ফেলেছেন। এদেশে চাই একটা র‍্যাশনলিস্ট সোসাইটি। 'দেশের বাণী'তে ছাপিয়ে দিলাম সে সংবাদ। ভাবলাম ওই যথেষ্ট। 'সবুজ সঙ্ঘে' যা আমরা করি—চেঁচামেচি, চিৎকার, কোলাহল, 'মানব মঙ্গল মণ্ডলী'তে তাও করি নি। কারণ, তা তো সভা নয়, সমিতি নয়, মণ্ডলী। ওটা আছে—আছে, অর্থাৎ—নেই। কিন্তু কে জানত তা অমর? বছর সাত পরে কলকাতায় গ্রেপ্তার হয়ে গোয়েন্দা বিভাগে পড়লাম মহা সমস্যায়। প্রশ্নের পর প্রশ্ন—'মানব মঙ্গল মণ্ডলী' কী? কী তার কাজ? কে-কে তার সভ্য? কৌতুকবোধ না হচ্ছিল তা নয়, কিন্তু পুলিশ বন্ধুদের কারও নাম পেলে যে বন্ধুদের পক্ষে সেটা কৌতুকের ব্যাপার থাকবে না, তাও বুঝছিলাম। তাই আমার নিজের ছাড়া আর কারও নাম সেখানে (গোয়েন্দা দপ্তরে) আমার মনে পড়ল না। কাজও না। বোধহয় বিভ্রাট তাতে বাড়ল। গোয়েন্দা বিভাগ বুঝল, গোপন করছি। সন্দেহটা আরও ঘনীভূত হ'ল। তার ফলাফল কতদূর গড়িয়েছিল জানি না। পরে শুনেছি পুলিশ দু'একজনকে বিড়ম্বিত করতে ছাড়ে নি—যেমন, রেঙ্গুনে চারুলালকে। কিন্তু সে 'মণ্ডলী'র সভ্য বলে নয়; আমার নিকটতম বন্ধু, অথচ রাজনীতিতে সে মাত্র সুদূর দর্শক। পুলিশের ধারণা হ'ল, চারু গভীর জলের মাছ। তারা ব্রহ্মদেশে তাকে তাড়া করলে এবং তাড়িয়ে দেশে এনে ফেলল।

'চারুপাঠ'

সাহিত্য ও সংস্কৃতির উৎসব এখন পাড়ায় পাড়ায় আপিসে-আপিসে। কিন্তু ১৯২০-২৫-এ তা নিশ্চয়ই দুর্বায়ু বলে গণ্য হ'ত। আমাদের মধ্যে তা চালনার ভারে ছিল কে? আমি, না, চারু (চারুলাল মুখোপাধ্যায়), তা বলা দুষ্কর। হয়তো চারু, নয়তো আমি। অথবা, বোধহয় বলা ঠিক—চারু ও আমি। অথবা চারুই আমি আর আমিও চারু, একজোড়া। নানা সূত্রে আমরা দু'জন জড়িয়ে গিয়েছি, একের থেকে আরকে পৃথক করা সহজ নয়। 'সবুজ সঙ্ঘে' 'সকলের সঙ্গে সকলে আমরা,'—আর পরিহাস করে বলতাম, প্রত্যেকে আমরা 'কর্তা'র তরে। কিন্তু তারও মধ্যে আপনা থেকেই গড়ে উঠত বিশিষ্ট চক্র। বিচ্ছিন্ন নয়, বিশিষ্ট। আমাদের চক্রটা নাম পেয়েছিল 'সাব্‌জেক্ট্‌ কমিটি' —চারু, আমি, আমার ভাই সাধু (প্রফুল্ল হালদার), উপেন সেন, দীনেশ গুহ আর (শহরে থাকলে) উপেন রায়। আরও দু'জন ছিলেন 'এক্স-অফিসিও' অনুতোষ সেনগুপ্ত ও স্বয়ং কর্তা। সকলের সঙ্গে একত্র বৈঠক আমাদেরও, তবে হয়তো বসতাম এক পার্শ্বে। আড্ডা-ইয়ার্কির মধ্যেও মন্তব্য চলত নিজেদের মধ্যে, চোখের ইঙ্গিতে নিম্নস্বরে। সেগুলি আমাদেরই পরিভাষার বোধ্য, নিছক রঙ্গরসের বিষয়। আসলে আমাদের প্রধান কাজটা হ'ল নিজেদের মধ্যে কারও না কারও সঙ্গে 'লাগা'। সাধু প্রধান তীরন্দাজ, অভ্রান্ত লক্ষ্য, অক্লান্ত ক্ষমতা। চারু প্রধান লক্ষ্য। তার কারণ, চারু চক্রের কেন্দ্র, সকলের প্রিয়। কলকণ্ঠ, কলহাস্য। তার দেহ কথা বলে, মুখ কথা বলে, মন কথা বলে। যেমন সহজেই চকিত হয়, তেমনি সহজেই ঝঙ্কৃত হয়, সাড়া দেয়। তার ছোট চোখ সেই সঙ্গে যোগ দেয়। লম্বা লম্বা হাত ও লম্বা লম্বা আঙুল সেই সঙ্গে শূন্যে বা মাটিতে বা মেজেতে আঁকে সরল ও বক্ররেখা। আসল কথা, সে একটা বিদ্যুতের তার, live wire—স্নায়ুতন্ত্রীতে যার বিদ্যুৎ খেলছে, তাই চমকে উঠে, চমক দেয়, 'শক্'ও দেয়। পিছু লাগলে পরে শেষে এক সময়ে হঠাৎ ক্ষেপে ওঠে, আবার ক্ষেপলে পরে ইংরেজিই বলে। আর সে ইংরেজি শুনবার জন্য তার পিছু লাগা একটা তৃপ্তিকর কাজ। আমরা বলতাম—'এবার ওর মাথায় কেটলি চাপাব, চায়ের গরম জল হয়ে যাবে।' আসলে সবশুদ্ধ চারুর মন দেয় আলোক, আর সঙ্গ দেয় আনন্দ, প্রাণের ছটা, প্রীতির সরসতা, স্পর্শকাতরতা। চারু বেশি সহজলভ্য, কাজে-অকাজে নানা সূত্রে। তাই চারু আর আমিও বিশেষ করে জড়িয়ে পড়ি। কাজটা সামান্য। দু'জনেই সাহিত্যের ছাত্র। ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যে চারুর আকর্ষণ পরিবারগত। বাঙলায় তার আকর্ষণ তখন সে তুলনায় গৌণ। আমার কাছে বাঙলা

সাহিত্যই লক্ষ্য, ইংরেজি তার অফুরন্ত পাথেয়। কাল-ধর্মে ইংরেজিতে আমার কলম এখন ভোঁতা, কিন্তু বাঙলায় চারুর কলম এখন ইংরেজির মতোই স্বচ্ছন্দ। আবার পরের যুগে আমার পল্লবগ্রাহিতা ভাষা-বিজ্ঞানেও আমাকে লাগিয়ে দেয়, আর চারুর ঔৎসুক্য তাকে করে তোলে নৃ-বিজ্ঞানের গবেষক। তার 'দি সন্তাল' নৃতত্ত্বের ভালো গ্রন্থ। সুপাঠ্য ও সুখপাঠ্য—সাহিত্যের বস্তুও *। তখনো কিন্তু ওই সাহিত্যের টানই ছিল চারুর মনের বৈশিষ্ট্য। সেই টানেই দু'বছরের পেছনের আমাকেও সে সঙ্গে টেনে নিয়েছিল। স্পর্শদোষে নেশাও আমার লেগেছিল। সাহিত্য, ভাষা ও সাহিত্যের পূর্বরাগে-অনুরাগে মিলে—রস-গ্রহণের সাযুজ্যে দু'জনে আমরা চক্রের মধ্যে পরস্পরের সমধর্মী, সম্পূরক 'অত্যাগসহনো বন্ধু'। সবুজ সঙ্ঘের সাহিত্য-সম্পর্কিত উদ্যোগে আমার আর চারুর ওপরই পড়ত প্রধান ভার। চারু ভার নিতে জানে। শুধু সাহিত্য, সঙ্গীত নয়, নাটকে অভিনয়েও সে উৎসাহী। সব জুড়ে সে ছিল 'কর্তার' অপরিহার্য সহকারী। পরে, কর্তা দি সেকেণ্ড. ছোট কর্তা। প্রথম থেকেই চারুকে না হলে কর্তার বাজার করা চলে না, বেড়ানোও না। কর্তা যদি হন ডক্টর জনসন্, চারু বস্ওয়েল। অবশ্য বস্ওয়েলের তুলনায় রসবোধ চারুর একটু বেশি, হাত হাল্কা, মন স্বতঃস্ফূর্ত। চারুর তাই ডাক পড়ত পাটনাতেও। চারুও প্রস্তুত। আমরা বলতাম সেখানে চারুর জন্য একটা অন্য রসেরও ডাক আছে—তা মধুর রসের পর্যায়ের পূর্বরাগ। যাক, 'চারু পাঠের' সেই দ্বিতীয় ভাগ (বঙ্গদেশ ছেড়ে ব্রহ্মদেশে) ও তৃতীয় পাঠ (দুমকা হয়ে চুঁচুড়া) নামমাত্র উল্লেখ করছি। যৌবনের যৌবরাজ্যে দিন যেতে পারল না। বিশেষ করে সামাজিক সাম্প্রদায়িক উত্তাপ দুঃসহ হ'ল। স্বরাজে আন্দোলন ছাপিয়ে তখনও জেলায় উগ্র সাম্প্রদায়িকতার শ্বাসরোধী বাতাস বইছে। তাই আমি আসি কলকাতায়—সত্যই কী আমার সাধনা ও সাধ্য, তার সন্ধানে। চারু শিক্ষণ-শিক্ষায় পারদর্শী হয়ে পাড়ি দিলে ব্রহ্মদেশে। অনুতোষ সেনগুপ্ত চট্টগ্রাম—নোয়াখালি করছেন (শেষ অবধি এসেছিলেন কলকাতাতেই)। আমাদের বাড়ির ও চারুর বাড়ির বৈঠকখানা দু'জনার অনুপস্থিতিতে খালি। ওর ভাই-ঝি পারুল-পুতুলদের যখন-তখন পান ও চা যোগাবার তাড়নায় আর বৈঠকখানার দিকে কান খাড়া রাখতে হয় না। দুপুর রাত্রিতে আমাদের বাইরের ঘরে মাকে এসে বলতে হয় না—'ওরে এবার তোরা ঘুমোবি, না, আরও গপ্প

* 'The Santal'ই পুস্তকাকারে পাওয়া যায়। শত ২০০-এর ওপর ইংরেজি বাঙলা প্রকাশিত লেখা রেখে চারু ১২।২।৭৫-এ চলে গিয়েছে—সুপাঠ্য হলেও কে নেবে তার প্রকাশ ভার?

করবি ? সমস্ত দিনেও কি কথা শেষ হয় নি, রাত যে ভোর হবে।' না, রাত ভোর হ'ত না, তার আগেই আমরা ঘুমোতাম বৈঠকখানায় পাশাপাশি। কথা কিন্তু শেষ হ'ত না। তখনো না, কখনো না। তাই ছুটতে হয় মাঝে মাঝে চুঁচুড়ায় দেশবন্ধু স্কুলের সম্মানিত হেড্‌মাস্টার মহাশয়ের বাড়ি। ব্রিটিশ 'কম্ব্‌লি' তাঁকে ব্রহ্মে ছাড়ে নি, ছাড়ে নি বিহারে দুমকায়, কারণ, সে আমার বন্ধু। মজা এই, চারু আর 'কর্তা' দু'জনাই ছিল কড়া রাজনীতির বিরোধী। ইংরেজের উমেদার নয়, কিন্তু ইংরেজের কর্মশক্তির admirer. দু'জনরাই ধারণা ইংরেজের পৃথিবী-জোড়া সাম্রাজ্যে ফাটল ধরবে না। আমাদের 'লাফ-ফাল' হাস্যকর ও শোচনীয়। 'বুদ্ধি খাটিয়ে যা পার তাই নাও।' আমাদের পারিহাসিক পরিভাষাতে চারু 'মডারেট্'। ছল পরিহাসে বলতাম—সেই 'বর্‌ন্ ম্যারেডম্যান'দের (born marriedman) মতোই 'আমরা সবাই মডারেট্'। 'এক্সট্রিমিস্ট' একমাত্র ক্ষিতীশ রায়চৌধুরী। আমাদের সেই পরিহাসের পরিভাষাতে 'ক্ষিতীশ' মহামান্য ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে ফটকা ফুটিয়ে জেলে যায়, এমন পাগল। যা-ই এসব বলি, কার্যতঃ চারু বর্মা থেকে বিতাড়িত হ'ল, বিহারেও বিড়ম্বিত হ'ল আমার বন্ধু বলে। শেষে একটা রক্ষাকবচ চারু ধারণ করলে। তাতে চারুপাঠের নতুন খণ্ডের সূচনা। সে নিষ্কৃতি পেল ওই কবচের জোরে—অব্যর্থ কবচ, উদ্বাহ। গৃহিণী গৃহ ও কন্যাশুদ্ধ তখন চারু এই শেষ ভাগে ফেলতে পারল স্বস্তির নিঃশ্বাস। চুঁচুড়ায় সুবিদ্বান হেড্-মাস্টার, সম্প্রতি অবসরপ্রাপ্ত। তাই এখনকার সেখানকার সাংবাদিক শ্রেষ্ঠ। আমারঅত্যাগসহনো বন্ধু—সকন্যা দৌহিত্র শুদ্ধ থেকে গিয়েছে—বন্ধুর মধ্যে নিকটতম বন্ধু—'in the manly love of comrades'।

রঙ্গ-প্রতিভা

'সবুজ সঙ্ঘের' সর্বাঙ্গীণ পরিচয়ের বাহন প্রথমতঃ কর্তা, দ্বিতীয়তঃ কিন্তু অনুতোষ সেনগুপ্ত, চারু, তৃতীয়তঃ। সমস্ত শহরে রস-রঙ্গের প্রধান বাহক অনুতোষ সেনগুপ্ত—রঙ্গপ্রাণ মানুষ, রঙ্গ-রসিকতায় অদ্বিতীয়। কিন্তু আরও অনেকদিকে অসামান্য। দীর্ঘাকৃতি, শ্যামবর্ণ, চোখ-মুখ সুশ্রী ; এই মানুষটি অল্প কয়েকদিনের পীড়ায় অকস্মাৎ কলকাতায় মারা যান ১৯৪২-এ। তখনো তাঁর বয়স বোধহয় ৪৫-এর দিকে। নোয়াখালিতে কেন, বহু ক্ষেত্রেই তিনি তাঁর স্বাভাবিক রঙ্গ-প্রতিভার জন্য পরিচিত। 'প্রতিভা' কথাটা ভেবে চিন্তে প্রয়োগ করছি : 'প্রতিভা' শুধু gift বা স্বাভাবিক শক্তি নয়, তাঁর সম্বন্ধে তবু কথাটা অত্যুক্তি নয়। অবশ্য সে জন্য রঙ্গ কথাটারও

ঠিক অর্থ বোঝা দরকার। কৌতুক রসের একটা বিশেষ দিক এই রঙ্গ। তা সংস্কৃত ঐতিহ্যের বিদূষকের পেটুক-বৃত্তি নয়, বা বাঙালী ঐতিহ্যের গোপাল ভাঁড়ামিও নয়। যে অর্থে চার্লস্ চ্যাপলিন* অদ্বিতীয় রঙ্গ-প্রতিভা আর শ্রেষ্ঠ এক সৃষ্টি-প্রতিভা,—সে অর্থেই অনুতোষবাবুও সে পর্যায়ভুক্ত। নিশ্চয়ই দু'জনার তুলনা চলে না। কারণ. চ্যাপলিন অপূর্ব প্রতিভা, সৌভাগ্যক্রমে সৌভাগ্যেরও অধিকারী। তবে চলচ্চিত্রের বিকাশ না হলে প্রকাশের অভিনব সুযোগ চ্যাপলিন পেতেন না। পাশ্চাত্য দেশে না জন্মে এদেশে জন্মালে সেই সুযোগ এই অদ্বিতীয় প্রতিভার এখনো জুটত না। রঙ্গ-মঞ্চের গ্রেট্ কমিডিয়ানরাও পৃথিবী জয়ের এই রাজাকে পেয়েছেন চলচ্চিত্রের প্রভাবে ও বৈভবে। পাশ্চাত্য দেশে সেরূপ সুযোগ পায় চ্যাপলিন। আমাদের দেশে চলচ্চিত্রে সে যুগ এখনো সে তুলনায় প্রায় অনাগত ; তবে অনুকরণ ছাড়িয়ে সৃষ্টির যুগও আসছে—সত্যজিৎ তার সূচনা করেছেন। চলচ্চিত্রে চ্যাপলিন-এর অভিনয়—যাকে বলে slapstick বা horseplay, তা থেকে একেবারে মুক্ত নয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও চ্যাপলিন রঙ্গনাথের বরপুত্র। চ্যাপলিনের সঙ্গে কারও তুলনার প্রশ্নই ওঠে না। তবু অনুতোষবাবুর নাম করেছি শুধু 'গোত্র' বুঝাতে। কারণ, অনুতোষবাবুর ধারাটা স্বাভাবিক ভাবে সেদিকেই বাহিত হ'ত। তাঁর কৌতুক-রসের মধ্যে ছিল তেমনি একটি অকৃত্রিম রঙ্গচেতনার আভাস। তা আভাসই থাকে, কিন্তু বিকাশ সম্ভব হয় নি। হ'ত কি হ'ত না তাও তাই বলা যায় না। আবার সেই কথাই মনে পড়ে—অসম্পূর্ণ প্রতিভা। কারণ, 'অসম্পূর্ণ' সুযোগের অভাবে, নিজের কাছেও অনাবিষ্কৃত শিল্পী। অনুতোষবাবুর সর্বপরিচিত কুশলতা এই যে, যে-কোনো মানুষের কথা স্বরে-সুরে-বাচন-ভঙ্গিতে তিনি নকল করতে পারতেন—এবং পরিচিত যে-কোনো অঞ্চলের বাঙলা উপভাষাকেও আয়ত্ত করতে জানতেন। চলচ্চিত্রে এ গুণের প্রয়োজন নেই, থিয়েটারেও নয়, এ হচ্ছে mimicry। মনে হতে পারে এ তা অনুকরণ, ভঙ্গীকে 'ভেঙ্‌চি'তে পরিণত করা। অনুকরণে কণ্ঠ-কৌশলের পরিচয় থাকতে পারে, কিন্তু কলা-কুশলতা অনাবশ্যকও হতে পারে। অবশ্য মিমিক্রি নয়, বাঙলার নানা উপভাষার কথাও অনুতোষবাবু তেমনি সহজভাবে বলতে পারতেন। শোনা মাত্রই ধ্বনি-বৈশিষ্ট্য, ব্যাকরণগত রূপ, তার বাগ্‌-রীতি (সিন্‌টাক্‌স্), কিছু না-কিছু বাগ্‌ভঙ্গি (ইডিয়ম্), এবং আঞ্চলিক

*এই পৃষ্ঠাটির প্রুফ দেখতে দেখতে পড়ছি চার্লি চ্যাপলিন গতকাল (২৫।১২।৭৭ ইং) মারা গেচ্ছেন।

সুর (টোন্) শুদ্ধ সে উপভাষার পরিবেশন—এ শুধু অনুকরণ নয়, কৌতুক-কুশলতাও নয়। কান ও কণ্ঠ ছাড়া এজন্য চাই ভাষার সম্বন্ধে অন্তর্দৃষ্টি।

অনুতোষবাবুর ক্ষেত্রে এই দুইটি ক্ষমতার বিশেষ সাফল্য ঘটিয়েছিল তৃতীয় এক শক্তি, অনুতোষবাবুর রসবোধে। হাস্য-কৌতুকের একটা জনপ্রিয় রূপ তখনো ছিল—'মাইমে'র ভদ্র সংস্করণ। চিত্তরঞ্জন গোস্বামী বাঙ্‌লায়, এবং 'ফ্যানিম্যান' ইংরেজিতে এ ধরনের হাস্যকৌতুক কলকাতার ভদ্র আসরে পরিবেশন করতেন। অবশ্য অনুতোষবাবুর মতো তাঁদের বিবিধ উপভাষার ওপর দখল ছিল কিনা জানি না। কৌতুকবোধই তখন যথেষ্ট হয়েছে। তাঁরা খ্যাতি অর্জন করেছেন,—জীবিকাও ওই গুণে অর্জন করেছেন। কলকাতায় তা সম্ভব হয়েছে। অনুতোষবাবু ছোট্ট নোয়াখালি শহরেই আবদ্ধ ছিলেন। তাঁর শক্তি বেশি হোক, কম হোক, খ্যাতি সেই প্রত্যন্ত ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকতে বাধ্য, জীবিকার্জন তাতে অসম্ভব। তা ছাড়া, শিক্ষিত ভদ্রলোকের পরিবারের ছেলে এ ধরনের জীবিকার কথা ভাবতে চায় না,—'সং' সেজে বা খেল দেখিয়ে জীবিকার্জন প্রশংসনীয় নয়। বি. এ. পাশ করে মামুলী একটা 'ভদ্রজীবিকা'ই বরং কাম্য থাকে। যেমন, সুযোগের অভাব, তেমনি এ ক্ষেত্রে ভদ্রশ্রেণীর মামুলী মনোভাবও দুরতিক্রম্য ছিল। চ্যাপলিন জন্ম থেকে যে ধারণায় বর্ধিত, আমাদের ভদ্র অভিনেতারা জন্ম থেকেই সেরূপ জীবিকাকে হেয় ভাবতে অভ্যস্ত। অথচ চরিত্র-সৃষ্টির ও বিশেষ ঘটনার বা সিচুয়েশন উদ্ভাবনার শক্তি অনুতোষবাবুর প্রচুর ছিল। কৌতুক-চরিত্র-সৃষ্টির কথাতেই মনে পড়ে যায় চ্যাপলিনের কথা—চ্যাপলিন কথা দিয়ে কৌতুক সৃষ্টি না করে কৌতুক সৃষ্টি করেছেন ঘটনা-উদ্ভাবনায় ও চরিত্র-চিত্রণে। সৃষ্টির এই গোত্র ছিল অনুতোষ বাবুর জন্মগত। সাধারণতঃ লোকে দেখত অনুতোষবাবুর কথার কৌতুক—অসামান্য অনুকরণ-শক্তি। তাঁর কথা যে চরিত্রের উদ্‌ঘাটন, সে দিকটা সকলের লক্ষ্যগাচর হ'ত না। অনুতোষবাবুর মধ্যে দু'শক্তিই মিলিত হয়েছিল। যেমন, যে-কোনো ঘটনার মধ্যে আশ্চর্য রঙ্গ-সম্ভাবনা দেখা ছিল তাঁর স্বভাবগত। তাকে কাট-ছাঁট করে সাজাতেও ছিলেন কুশলী। তাকে বেশি উদ্ভাবনায় বিস্তারিত কৌতুক-কথিকা করার চেষ্টা থাকত না। সেরূপ দাবীও ছিল না,—শ্রোতার থেকেও না, জীবিকার দায়েও না। দ্বিতীয়তঃ, ঘটনার পিছনকার মানুষের চরিত্র-রূপও বোঝা ছিল অনুতোষবাবুর স্বভাবগত। আপনার জীবনবোধ ও কৌতুকবোধ দিয়ে সেই চরিত্রকে রূপায়িত করতেও পারতেন। মিনিট দশ-পনেরর মধ্যে একটি স্কেচ বা খণ্ডচিত্র তাঁকে দিতে হত ভদ্রলোকের আসরে—সে জন্য বিস্তারিত করে রক্তমাংসে পূর্ণতা দেওয়ার প্রশ্ন উঠত না। যদি এদেশে

'কমিডি স্টেজ্' থাকত, এবং ও বৃত্তিটা ভদ্র গণ্য হ'ত, তা হলে চ্যাপলিনের পথেই অনুতোষবাবু এক কমিডি-স্রষ্টা ও কমিডির সার্থক অভিনেতা হতে পারতেন। কিন্তু সেই মঞ্চ নেই, তাই সেই সম্ভাবনাও আবিষ্কৃত হয় নি। আর আমার ধারণা 'প্রতিভা'ও অপরিজ্ঞাত থেকে গিয়েছিল। তিনি রঙ্গ-রসের পরিবেশক, সঙ্গীত-শিল্পী নন, কৌতুক চরিত্র উদ্ভাবনায়ও সুদক্ষ, —এ কথাটা তাঁর নিজেরও জানবার সুযোগ হ'ল না।

কিন্তু তাঁর সরস মন আমাদের জীবনের চারদিকে কৌতুক উপকরণের অভাব দেখত না,—এ জানত 'এত ভঙ্গ বঙ্গ দেশ তবু রঙ্গে ভরা।' অনুতোষ সেনের অনুকরণ-প্রধান রঙ্গ-কৌতুক ঢাকা-চট্টগ্রামে না জানত এমন লোক ছিল না। সেই সঙ্গে নোয়াখালি, চট্টগ্রামে অনুতোষবাবুর খ্যাতি ছিল নাট্যাভিনয়েও। তাতে কিন্তু কৌতুকাভিনয়ের ভূমিকা তাঁর নয়। একবার একটিমাত্র তিনি কৌতুক-চরিত্র অভিনয় করেছিলেন 'চন্দ্রশেখরে'র 'বিশ্বাস' (বোধহয় চন্দ্রশেখরের সে চরিত্র অমৃতলাল বসুর যোজনা)' ; চমৎকার হয়েছিল সে অভিনয়। কিন্তু প্রধানতঃ নায়কোচিত ভূমিকাতেই তাঁর খ্যাতি ছিল। সে-সব ভূমিকায় তাঁর অভিনয়-নৈপুণ্য ছিল আশ্চর্যজনক। 'সাজাহানে' তিনি ঔরঙ্গজেব, 'সীতা'য় তিনি রাম—এই কথাতেই তা বোঝবার পক্ষে যথেষ্ট। আমাদের দলে তিনিই শ্রেষ্ঠ অভিনেতা। আবার, অভিনয় ব্যতীত সাংবাদিকতায়ও তাঁর হাত ছিল। মূলতঃ তিনি ছিলেন সাহিত্য-রসিক ও জীবন-রসিক এবং সর্বসময়েই কৌতুক-রসিক। যেখানে যান সেখানেই নিজের সঙ্গে নিয়ে আসতেন সত্যকারের কৌতুক-আনন্দের হাওয়া। তিনি আসা-মাত্রই ঘর আলোকে ঝল্‌মল্ হয়ে উঠবে। দু'মিনিটের মধ্যেই তাঁর কথায়, নতুন কোনো একটা দেখা ঘটনার বর্ণনায়, রঙ্গের ছটা ফুটে উঠবে ; —তার মাঝে-মাঝে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ না থাকত তা নয়, কিন্তু বিদ্রূপ প্রায়ই গৌণ। আসল জিনিসটা একটা স্বচ্ছন্দ রঙ্গ-বোধ। 'সবুজ সঙ্ঘে' তো আমরা তাঁকে মনে করতাম—আমাদের আড্ডা, আনন্দ, হাসি, হুল্লোড় সকল জিনিসের কেন্দ্রস্থিত রঙ্গ-সরসতার অফুরন্ত উৎস। শুধু রঙ্গরস নয়, লোকটির আরও কিছু ছিল—হাস্যপ্রবণতার মতোই প্রবল ছিল—তাঁর অন্তরের সহজ আবেগ-সম্পদ। হাস্য প্রবণতা তারই একটা রূপ। সহজেই তাঁকে ভালোবাসত বন্ধুরা, এবং বান্ধবীরাও, যাঁরা সেদিনে মেলামেশায়ও যথেষ্ট দূরত্ব রাখতেন। সেই সঙ্গেই সহজ ছিল তাঁর নিজের আন্তরিকতা ও শালীনতাবোধ। তাই তিনি সকলের অকৃত্রিম বন্ধু হয়ে উঠতেন, এবং বন্ধু থেকেও যেতেন। বিশেষ করে বন্ধুগোষ্ঠীর আমাদের অনুজদের সমবয়স্ক বন্ধু। আবার, স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয়, স্বজন

শুদ্ধ মানুষটি অকৃত্রিম দরদী মানুষ, হৃদয়বান স্বামী, স্নেহপ্রবণ পিতা, সহনশীল আত্মীয়। অনাত্মীয়দের প্রতিও উদাসীন নন। বহু মানুষের সঙ্গে নানা যোগাযোগে তাঁর আপনার বাস্তব কাজেই ঘাটতি পড়ত, জীবিকায় আত্মনিয়োগ করার অবকাশ হ'ত না। স্কুলে মাস্টারি করেছেন, আবার স্বরাজের নামে তা ছেড়েছেন, পড়েছেন বেকারত্বের বিপাকে। কী করবেন, না জেনে নানা বৃত্তিতে হাত দিয়েছেন, এবং স্থির হতে পারেন নি। 'সবুজ সঙ্ঘে'র আড্ডা-আনন্দের মধ্যে কিছুতে সুস্থির হবার অবকাশই বা ছিল কই তাঁর বা আমাদের? তবু চিন্তা এল কিছু করতে হবে। কী তা? অভিনয়? সাংবাদিকতার কথাও অনুতোষবাবুর মনে উদিত হ'ত যেমন হ'ত আমাদেরও। কিন্তু তার স্থান কলকাতা। শেষ অবধি ইনসিওরেন্সের এজেন্ট রূপে অনুতোষ সেনগুপ্ত জীবিকা প্রায় আয়ত্ত করেছিলেন, সুস্থিরও হয়েছিলেন, আর ঠিক সে সময়েই হ'ল আকস্মিক মৃত্যু। ছোট-বড় সকল মানুষের এমন প্রিয়জন আর কয়জন ছিলেন? ফিরে তাকিয়ে তাই ভাবি হয়তো আমাদের বন্ধু-বান্ধবদের আকর্ষণের দাবীতেই তাঁর নিজের মূলশক্তি আবিষ্কারের সুযোগও অনুতোষবাবু লাভ করেন নি। অবশ্য দেশেও ছিল সেরূপ সুযোগের অভাব। 'কমিক স্পিরিট' চারদিকে চোখের জল ও ভাঁড়ামির মধ্যে এ দেশে অবহেলিত থাকে। অথচ বাঙালির কৌতুক-বোধ যে নেই তা নয়।

অনুতোষ সেনগুপ্ত ও বিনয় মুখোপাধ্যায় দু'জনার উদ্দেশে—আমার 'আড্ডা' নামে বইখানা আমি উৎসর্গ করেছি 'আড্ডারসরসিকেষু'। এক অর্থে সে বই সবুজ সঙ্ঘের সকলের উদ্দেশ্যেই—উৎসর্গীকৃত। কারণ, এক বিষয়ে সকলেই আমার সমধর্মী—আড্ডারসরসিক। সবুজ সঙ্ঘের যা প্রধান লক্ষণ—তা আড্ডা। যা তার একান্ত বৈশিষ্ট্য তা বাঙালিরও নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। সে বইতে যা আছে তাতে আমাদের এ অধ্যায়ের উল্লেখ নেই। কিন্তু সবুজ সঙ্ঘের বন্ধুরা না হলে কে বুঝবে 'আড্ডার' প্রেরণার উৎস কোথায়? মা-জ্যেঠিমাদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা ভাত নিয়ে অপেক্ষাকে অগ্রাহ্য করতে শিখিয়েছে এই আড্ডার নেশা। পরে তা গৃহিণীদের মান-অভিমান দুঃখ-বেদনার কারণ স্বরূপ, আড্ডা তাদের সকলের 'সতীন-কাঁটা'। আড্ডার নেশা সংসারে বিষয়কর্মে আমাদের নিজেদের আগ্রহহীন করেছে, পৃথিবীতে দশজনের চোখে আমাদের করেছে লক্ষ্মীছাড়া। আমরা যা করতাম বাঙালি জীবনে সেটা একটু ব্যতিক্রম—অভিনয়ে, গানে, সাহিত্য সভায়, হাসিতে আনন্দে, কথায়, আলোচনায় যৌবনকে জীবনকে স্বচ্ছন্দ ভাবে গ্রহণ। বুঝি না-বুঝি, আমরা যেন এই কথারই প্রমাণঃ There is a

joy in mere living. জীবনের এই জয়গান রবীন্দ্রনাথ নিজের সৃষ্টি থেকে যোগাতে চেয়েছিলেন সমস্ত দেশের প্রাণে—পূর্ববাঙলার এক ছোট শহরেই তার যে প্রতিধ্বনি জেগেছিল দেশে অন্য কোথাও তা জেগেছে কিনা জানি না। এত বৎসর পরেও আমরা ভাবি ভালোই করেছি There is a joy in living.

বাস্তব অর্থে Living তখন সহজসাধ্য নয় ; কেউ আমরা অবস্থাপন্ন বিশেষ ছিলাম না। পরিশ্রমের দ্বারা জীবিকার্জন না করলেই নয়, এমন ভদ্রলোকদের বাড়ির ছেলে—জমিও নেই জমাও নেই। প্রথম যুদ্ধের অবসান থেকে বিশেষ বছরগুলি এদেশে ছিল বেকার-বেষ্টিত। তারই মধ্যে গেছে আমাদের যৌবনের দিনগুলি ; মোটেই 'জীবনের জয়গান' রচনার মত পরিবেশে নয়। বিশেষতঃ নোয়াখালি শহরে নদীর ভাঙনে তখন আমাদের প্রায় সকলেরই বাসগৃহ নিশ্চিহ্ন হ'ল—শহরে মাথা গুঁজবার ঠাঁই নেই,—তখনি নদী-ভাঙা (১৯২১-২৭) বাস্তুহারা ; বিশ-পঁচিশ বৎসর পরে হই দ্বিতীয়বার ছিন্নমূল শরণার্থী। সেই বিশ-পঁচিশ বৎসর পরেকার—'নদী-ভাঙা' নয়,—আকাশ-ভাঙা দুর্যোগের কালো মেঘও তখনি যে বাঙালীর জীবনের কোণে কোণে জমতে আরম্ভ করেছে নোয়াখালিতে বসে তা চোখে না দেখেও উপায় ছিল না। আমাদের যৌবন—তার উৎসব, তার অভিযান—তার স্বরাজের সাধনা তার প্রাণোচ্ছ্বাস—সবই কি তখন (১৯৪৭), ইতিহাসের সেই অভিশাপের সামনে দেউলে হয়ে গেছে ?

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

আঁধি ও ব্যাধি

বৃত্তি ও প্রবৃত্তি

উঁকিলের ছেলে উঁকিল হবে, এই স্বাভাবিক। কিন্তু ছেলেরও তো স্বভাব আছে? সেই স্বভাব কিরূপ? আমি আজও তা ঠিক জানতে পারলাম না। বোধহয় নিজের স্বভাব জানতে নিজে পারে না। যেমন শুনতে পায় না নিজের কণ্ঠস্বর। রূপ অপরের চোখে যা ধরা পড়ে তা-ই। কিন্তু 'আমি' তো আমিত্বের বাইরের পীঠ, ভিতরের পীঠ অন্যেই বা কে দেখতে পায়? স্বভাব আমার যাই হোক, বৃত্তি খুঁজে না পেয়ে ওকালতি করতে বসে গিয়েছিলাম। ওকালতি করব, এ কথা আমিও আগে ভাবি নি। পাশ করার পর যা করবার সাধ হয়েছিল তা করবার সাধ্য ছিল না। প্রথম সাধ জার্নালিজম্। সেদিনে এদেশে জার্নালিজম্ পড়ার ব্যবস্থা ছিল না, থাকলেও নিষ্ফল হ'ত। কারণ, বাবা একটা ইংরেজি কথা ঘুরিয়ে আমাকে জানালেন, A subject race can have no politics. A subject race can have no journalism either. আজকে হলে বলতাম—ঠিক কথা। এজন্যই তো পরাধীন জাতির পলিটিক্স ছাড়া গতি নেই, আর, ঠিক ওই কারণেই বার্তাজীবিতাও হওয়া উচিত প্রধান বৃত্তি। সেদিনও তা বুঝতাম, তার জন্যই তো বেছে নিতে চেয়েছিলাম ওই জীবিকা। পিতা প্রতিকূল, কাজেই তা হ'ল না।—অবশ্য আরও কথা ছিল—আমার আসল ঝোঁক—স্বাধীনতা ও সাহিত্য। সাংবাদিকতা তার যোজক, তাই প্রকাশ্যে স্বাধীনতা নয়, সাংবাদিকতাকেই বলতাম প্রথম সাধ। সাংবাদিকতা বৃত্তি হ'ল না, কিন্তু ও-প্রবৃত্তি গেল না। অন্য কোন্ বৃত্তি কাম্য? বৃত্তিটা শুনে এখন আশ্চর্য হবার কথা—আমার দ্বিতীয় বাঞ্ছা ছিল গ্রন্থাগারিকতা। যে-কোথাও স্থির হয়ে বসল না, লাইব্রেরিতে সে কি করে শিকড় গেড়ে বসত? দেশে লাইব্রেরিয়ান-শিপেরও স্কুল ছিল না—বলাই বাহুল্য। কিন্তু তা পঠনীয় ও শিক্ষণীয় বৃত্তি তা জানতাম; 'টাইমস লিটারেরি সাপ্লিমেণ্ট'-এর বিজ্ঞাপন থেকে লণ্ডনের তেমন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা সংগ্রহ করলাম। জানতে চাইলাম তাদের পাঠ্যক্রম, ভর্তির নিয়মাবলী প্রভৃতি। ভারতীয় ছাত্রদের লণ্ডনস্থ অভিভাবককেও লিখলাম সেরূপ পাঠের সুযোগ সন্ধানের জন্য। বিলিতী প্রতিষ্ঠান উত্তর দিয়েছিল, কিন্তু বিলাতস্থ ভারতীয় অভিভাবক দেয় নি। ও-সাধের ওখানেই সমাপ্তি। তৃতীয় বাঞ্ছা অধ্যাপনা। কিন্তু সে দিনে (১৯২৪-২৫) কলেজ

ছিল কয়টি ? আঙুলে গোনা যেত। তাতে কর্মখালি কদাচিৎ ঘটত, আরও কদাচিৎ কারও তা জুটত—বিদ্যা ছাড়াও চাই ধরবার লোক। খাতাপত্রের একশ টাকা মাইনে অবশ্য অধ্যাপকের সব সময়ে হাতে মিলত না। এসব কারণে—অভিভাবকদের অভিপ্রায়—সরকারী চাকরির পরীক্ষা দিই। আমার অনিচ্ছা দু-কারণে—তখনকার শিক্ষিতের বাজারে এখনকার একশ ভাগের এক-ভাগও পথ খোলা ছিল না। ওই পথটাই ভালো ছেলেদের পক্ষে ছিল খোলা, তাঁরা সেজন্য উদ্যোগী হতেন, সযত্নে প্রস্তুতও হতেন। সেখানে ভিড়ও প্রচুর, প্রতিযোগিতাও কঠিন। নিজের যোগ্যতা সম্বন্ধে আমার সংশয় ছিল; তা অকারণ নয়। তা ছাড়া, সরকারী চাকরিতে আমার আগ্রহ ছিল না। তবু পরীক্ষা দিয়েছিলাম—বোধহয় ১৯২৫ সালে। ছোট-বড়-মাঝারি চাকরি সে-বার বেশ কিছু পরিমাণে খালি ছিল। না, দু-চারশ নয়, তবে প্রায় গোটা ত্রিশ। শিকে ছিঁড়তেও পারে। কিন্তু পাশের পরে নিয়োগের পূর্বে পাশ-করাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষায় সে-বার কড়াকড়ি হ'ল। বাড়ির কড়ি খরচা করে গিয়েছিলাম ওই স্বাস্থ্য-পরীক্ষার জন্য দার্জিলিঙে—দার্জিলিঙে না হলে উচ্চ আই. এম. এস. অফিসারদের গ্রীষ্মে কোথায় পাওয়া যাবে ? তাদের রাহা খরচও তাতে মিলবে। স্বাস্থ্যপরীক্ষক রাজ্যের উচ্চতম তিন-তিনটে আই. এম. এস. অফিসার, মিলিটারি মেজাজ ও মিলিটারী মাপে তাদের পরীক্ষা। তাঁরা এক ধার থেকে আমাদের প্রায় সবাইকে ফেল করে দিলেন। পরীক্ষায় যাঁরা উপরে তাঁরা অনেকেই পরিত্যক্ত হন, নিচের কারো কারো তাতে ভাগ্যোদয় হয়। অনেকের মতো আমিও ফেল করলাম,—দেহের ওজন ভারী নয়,—চাকরি পেলেই তো ভারী হতে পারতাম। কিন্তু রাজকৃপা তখন ভাগ্যে নেই। আমাকে নাকচ করা অন্যায় হয় নি, কিন্তু অনেকে ফেল করেছিলেন অতি কাঁচা যুক্তিতে—দাঁত খারাপ, মিলিটারি হিসাব সবকিছুর জন্য। বয়স থাকতে পরের বৎসর তাঁরা আবার পরীক্ষা দিয়ে স্বাস্থ্য-পরীক্ষায়ও সসম্মানে গ্রাহ্য হলেন। আমি আর পরীক্ষা দিই নি। সিভিল কর্তারা নাকি সেবার স্বাস্থ্যের কড়াকড়ি নিষেধ করেছিলেন, স্বাস্থ্য-পরীক্ষাও কলকাতাতেই হয়। রবীন্দ্রনাথ বসুর মতো বন্ধুর এবার ভাগ্যোদয় হ'ল। দুর্ভাগ্যবশে বিমলাকান্ত সরকারের মতো দু-একজন যাঁরা প্রথম বারে ছিলেন উপরে, পরের বার গেলেন নিচে।

সেই আমার প্রথম দার্জিলিঙ দেখা,—আর সেই শেষ। প্রথম বলেই ভুলতে ভুলতেও তার অনেক কথা ভুলে যাই নি—দু-একটা কৌতুকপ্রদ মনুষ্য-চরিত্রের কথা, আমার সহপ্রার্থী চাকুরে বন্ধুদের কারও কারও কথা—যাঁরা অনেকেই এখন নেই, দু-একটি আমার আত্মীয়-বন্ধুদের সহৃদয়তা—তাঁরাও অনেকে নেই; এবং

কাব্য-কুয়াশার মধ্যে ম্যল ও ক্যালকাটা রোড, টাইগার হিল ইত্যাদি দেখা। তখনো দার্জিলিঙ শৈলসুন্দরী—অতুলনীয়া। চোখে দেখলাম হিমালয়। দেখবার জিনিসই। তখনো জীবনের প্রথম অধ্যায়। পৃথিবী যে তার দূরের দুয়ারগুলি আমাদের মত সাধারণ সন্তানদের চোখের সামনে কোনো দিন খুলে দেবে, তা তখনো আশা করতে পারতাম না। দার্জিলিঙ সত্যিই রূপসী, তার পথেও তখন রূপের হাট। আর আজ বলতে পারি, সব দেখলেও ভারতবাসীর পক্ষে দু'টি জিনিস না দেখলেই নয়—একটি হিমালয়, দ্বিতীয়টি বারাণসী। এ দু-জিনিসের 'দেখা' দেখেও শেষ হয় না। কারণ, আমরা ভারতবাসী তো তা চোখ দিয়ে দেখি না, মন দিয়ে দেখি।

তা হলে ওকালতিই গতি। সনদ নিই। আইনে আমার অরুচি ছিল না। কিন্তু ওকালতি তো আইনের চর্চা নয়, আইনের ব্যবসা। আর প্রসিডিওরে, দপ্তরখানার প্যাঁচে—তা একটা গোলকধাঁধাঁ। আইনের জ্ঞান সম্ভবত কিছুটা আদৃত হাইকোর্টে। কিন্তু সেখানে আমার প্রবেশ অসাধ্য ছিল। পঙ্গুর গিরি-লঙ্ঘন। পুঁজি বাড়ির নেই—থাকলেও কাজ দিত না। কারণ নিজস্ব পুঁজি আরও কম—রূপে, কণ্ঠস্বরে, ব্যক্তিত্বে আমি জন্মাবধি দেউলে। ওসব ওখানে প্রাথমিক প্রয়োজন। তা ছাড়া, আইনের আলোচনায় রস পেলেও আইনের ব্যবসায়ে আমার রুচি ছিল না। না হলে পৈতৃক বৃত্তিই হ'ত আমার প্রথম কাম্য। তবু জিলা-কোর্টে ওকালতিতে বসলাম—বাড়ি বসে আছি বলে। ও-নাম করে বছর দেড়েক নোয়াখালি ছিলাম, তখন আমার সাধারণ পেশা ওকালতি—নেশা কি, কিছুই জানি না। নাটক, সাহিত্য সভা, সে তো বৎসরে দু-চারদিন হয়। বরং সময় কাটানো যায় কংগ্রেসের রাজনীতিতে। তাতে অরুচি ছিল না। অবশ্য বর্দৌলির পর এসেছিল অবসাদ। স্বরাজ্য পার্টির পলিটিক্সও চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুতে দেউলে হয়ে যাচ্ছে। আমার কাজ ছিল বন্ধুগোষ্ঠীতে আড্ডা, লাইব্রেরিতে পড়া, স্থানীয় সাপ্তাহিক 'দেশের বাণী'তে যদিচ্ছা কলম চালনা, আর কলকাতার ইংরেজি-বাঙলা কাগজে কখনো বা গল্প-প্রবন্ধ লেখা—অর্থাৎ সেই সাংবাদিকতা, নামমাত্র দক্ষিণায়। কলকাতার সাংবাদিকতার পালা আসে পরে, তবে 'দেশের বাণী'র কথা এখানে বিজ্ঞাপ্য।

সম্প্রতি সরকারী দপ্তরের কয়েক বৎসরের পূর্বেকার গোপন নথিপত্র খুঁজবার সুযোগ পেয়েছিলেন আমার বন্ধুরা। অধ্যাপক গৌতম চট্টোপাধ্যায় দেখেছেন—ওই ১৯২৪-২৫-এর সময়কার রাজনৈতিক ব্যাপারের যে-গোপন রিপোর্ট এদেশ থেকে বিলেতের কর্তাদের কাছে গেছল, তাতে বলা হচ্ছে 'আত্মশক্তি', 'বিজলী', 'দেশের বাণী' এসব হচ্ছে কমিউনিস্টদের কাগজ;

এবং পৃথক করে বলা হয়, কোনো কোনো পত্রিকা মস্কোর সাহায্যপুষ্ট। তাদের মধ্যে, 'দেশের বাণী' অন্যতম। এখনকার দিনে অনেকে হয়তো 'দেশের বাণী'র নামও শোনেন নি। গৌতমবাবুও জানতেন না। নোয়াখালির তা সাপ্তাহিক পত্র। কংগ্রেস যখন প্রথম পর্বের জেল-যাত্রা শেষ করে আঁধিতে পড়ে কাউন্সিলের মধ্য দিয়ে স্বরাজের জন্য পথ হাতড়াচ্ছে তখন সে শহরের কংগ্রেস-কর্তাদের মনে হ'ল—তাদের কথা প্রচার করবার মতো একটা পত্রিকা চাই।

একালের অনেকেই হয়তো জানেন না—চিত্তরঞ্জনের বিরুদ্ধে তখন আনন্দবাজার চালাত জেহাদ। নিরুপায় হয়ে তাঁকেও কলকাতায় কাগজ বের করতে হয়। সেরূপ কারণেই নোয়াখালির কংগ্রেসীদের কর্তৃত্বে 'দেশের বাণী'রও প্রকাশ। সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র মহাশয়কে তাঁরা সম্পাদক করেন—সরকারের অনুমোদনের বাধা এড়ানো তাতে সহজ হবে, কারণ সত্যেনবাবু তখন আইনসভার 'স্বরাজী' সদস্য, তবে থাকেন কলকাতায়। পত্রিকায় লেখাপড়ার দায়িত্ব প্রথম নিয়েছিলেন নগেন্দ্রকুমার গুহরায় ; অন্য কাজকর্মের—ক্ষিতীশ রায়চৌধুরী। সবই অবৈতনিক, দেশের কাজ। ক্রমেই সব ভার এসে পড়ে ক্ষিতীশদার ওপর। আমি, অনুতোষবাবু এবং আরো দু-একজন বেকারবন্ধু বেগার দিতাম প্রথম থেকেই। কখনো সংবাদ-সংকলন করে দিতাম, কখনো সম্পাদকীয় মন্তব্য যোগাতাম। মন্তব্যে সাম্রাজ্যকর্তাদের প্রতি ব্যঙ্গ পাড়তাম। সংবাদ সংকলনে একটু নতুনত্ব ছিল। স্থানীয় সংবাদের পাশে আন্তর্জাতিক সংবাদ ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শঠতার তথ্য সংকলন ; এটুকু বোধ হয় আমার কাজ। কখনো থাকত এম. এন. রায়ের 'ভ্যানগার্ড' বা 'এ্যাডভান্স গার্ড' থেকে এক-আধটুকু উক্তির পুনরুক্তি, 'লাল জুজু' নিয়ে সরকারকে পরিহাস, কখনো কানপুরে দণ্ডিত মোজাফ্‌ফর আহমদের আলমোড়ায় পীড়ার কথা। এসবে হয়তো সে পত্রে সমাজতন্ত্রী ছায়া এক-আধটুকু পড়া সম্ভব। কিন্তু 'দেশের বাণী' কংগ্রেস-কর্তাদের কাগজ, তাঁরা মালিক, তাঁরা চালক—কমিউনিজম তাঁরা জানতেনও না, চাইতেনও না। অর্থাভাবে ক্রমেই কাগজটা বিপন্ন হয়। সত্যেনবাবু তখন মান্দালায় রাজবন্দী। মাথাব্যথা ক্ষিতীশ চৌধুরীর—শেষে যেমন করে হোক কংগ্রেসী কর্তাদের সাহায্যে একটা লিমিটেড কোম্পানি করে 'দেশের বাণী' প্রেস স্থাপিত হ'ল—প্রেসটা চালানো ক্ষিতীশদারই দায়িত্ব। তবে তাতে 'দেশের বাণী'র ছাপার অসুবিধা ঘুচল। আর কিছু না থাক 'দেশের বাণী'র তেজ ছিল—টাকা কড়ি ছিল না। কাজ অবৈতনিক। কে বোঝা বইবে ? পরিচালকরা কংগ্রেসী ভদ্রলোক, তাতে রাজি নয়। আমিই বা কী ? ক্ষিতীশদার সঙ্গে হাত লাগাই। কলম চালাই—মাত্র-চার আনার

কংগ্রেসম্যান। কী জানতাম আমি কমিউনিজমের? জানতাম শুধু এই—সোভিয়েট রাষ্ট্রটার কথা। স্বাধীনতা জিনিসটা যদি ভারতবর্ষে শ্রমিক-কৃষকের জিনিস না হয়, তা হলে সে স্বাধীনতার মূল্য বিশেষ থাকবে না। 'দেশের বাণী'র লেখায় এরূপ তত্ত্বের ঝোঁক দেখা গেলেও তা সামান্য। সেই ছুটোছাঁটা লেখাতেই-যে গোয়েন্দা প্রভুরা দেখতেন কমিউনিজম-এর spectre, সে খবর এই চল্লিশ বৎসর আমাদের অজানা ছিল। সত্যই অদ্ভুত গোয়েন্দা মস্তিষ্কের উর্বরতা। এটা কি শুধু ভুল, না, বিলাতের কর্তাদের বোঝানো—এ দেশের গোয়েন্দারা কী ভয়ঙ্কর বিপদ থেকে ব্রিটেনের ভারতসাম্রাজ্য রক্ষা করছে? সম্ভবত দুই-ই। এ প্রসঙ্গে তাই বলা দরকার, একালে দপ্তরখানার দলিল দেখলেই আমরা মনে করি তা বেদবাক্য। কিন্তু খবরের কাগজের খবরের মতোই ওসব পুলিশের রিপোর্টের মূল্যও পরীক্ষা-সাপেক্ষ। বেশ ভালো করে যাচাই না হলে ওসব সংবাদও গ্রহণের অযোগ্য। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাতেও জানি—পুলিশ স্বদেশীদের অনেক খবর জানে, তা ঠিক। কিন্তু যা জানে তার থেকে কম তারা বানায় না—মামলা ও গোপন রিপোর্টে আস্ত manufacture ধরা সহজ, adulteration বা ভেজাল কিন্তু চোখে পড়ে না। সেরূপ ভেজাল মেশানো সর্বথা গোয়েন্দা-নীতিসম্মত।

এই 'দেশের বাণী'র লেখার সূত্রে আমার সাংবাদিক-লীলা ও উকিল-লীলা একবার জড়িয়ে গিয়েছিল। রাজনীতির সঙ্গে এসব নিয়ে সম্পর্ক ঘনতর হচ্ছিল। মুসলমানরা তখন কংগ্রেস থেকে পৃথক হয়ে পড়ছে। ভারতবর্ষের নানা স্থানে দাঙ্গা-হাঙ্গামা। নোয়াখালি জেলায় তারও একটা বিশিষ্ট রূপ দেখা দেয়। দাঙ্গা-হাঙ্গামা নেই—কারণ, দাঙ্গার জন্য দু পক্ষ চাই। হিন্দুরা এ জেলায় অতি সংখ্যাল্প। তা ছাড়া, তারাই দোকানী-পশারি, মালিক-মহাজন। যদিও তা-ও আসলে ইংরেজদেরই অধীনে—আর ক্ষমতায়ও বিশেষ কিছু নয়। তবু তুলনায় হিন্দুরা 'হ্যাভস', মুসলমানরা তাদের তুলনায় 'হ্যাভ্‌নটস'। এই আর্থিক-সামাজিক হীনতাবোধ স্বভাবতই মুসলমানদের মধ্যে শোষণ-সচেতনতায় পরিণত হ'ত। কিন্তু ক্ষোভটাকে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষে রূপ দেওয়া যাদের প্রয়োজন তারা তার সে দিকে মোড় ঘুরিয়ে দিলে। এ কাজেও দু-একজন ছাড়া তারাও জড়িয়ে পড়ত যারা এক সময়ে ছিল কংগ্রেস-খেলাফতের কর্মী। শহরেও দেখতাম তাদের উগ্রতা—কিছুটা গায়ে পড়ে হিন্দুদের অপমান, কিংবা হিন্দু মেয়েদের সম্বন্ধে এমন অভব্য মনোভাব,—তা আচরণে না ফুটলে হিন্দুদের দুশ্চিন্তার কারণ হ'ত না। গ্রামে আঘাত দেখা গেল গরীব ও নিম্নবর্ণের হিন্দুদের উপর। তাদের মেয়েরা আরও বেশি

অসহায়। সেখানে গ্রামে হিন্দুদের দেবস্থান ও দেবতারাও হিন্দু মেয়েদের মত অসহায়। শহরের ভদ্রলোকেরা তাতে দুঃখিত, আবার একটু আশ্বস্তও—'হিন্দু ছোটলোকেরা' অমন চিরকালই সয়েছে—ঠাকুর-দেবতারও মার খাওয়া গা-সওয়া। তাদের উপর দিয়েই 'মারটা' যায় যদি, যাক। শাসকদের মনোভাব বুঝেই পুলিশ এসব বিষয়ে নীরব থাকাই মনে করে নিরাপদ। মাস কয় ধরে এখানে-ওখানে এরূপ উৎপাত-উপদ্রব ঘটছে, ক্রমশই তা বাড়ছে। গরীবের মেয়েরাও আর রেহাই পাচ্ছে না। মেজাজটা বিগড়ে যাচ্ছিল—মনে হচ্ছিল মুসলমানরা বড় সহজে ধর্মের নামে দেশকে ভোলে, নীতিধর্মও খুইয়ে ফেলে। কিন্তু গরীব ও নিম্নশ্রেণীর মেয়ে-পুরুষের ওপর এসব অত্যাচার তা বলে চুপ করে সওয়া উচিত নয়। এ যে 'মনুষ্যত্বেরও দায়'। বিশেষ উত্তাপ নিয়েই 'দেশের বাণী'তে লিখে দিলাম কলম দুয়ের একটা সম্পাদকীয় লেখা—সাম্রাজ্যবাদী প্ররোচনার বিরুদ্ধে, পুলিশের বিরুদ্ধে; আর মুসলমান নেতাদেরও তাঁদের দায়িত্ব স্মরণ করিয়ে দিতে কসুর করলাম না—যেন সকলকে শাসন করার ভার আমাদের উপর দিয়েছেন মানুষের দেবতা। তাতে বার্নার্ড *শ-র 'জন বুলস আদার আইল্যাণ্ড', টৌনিসি-র* 'ফাণ্ডামেণ্টালিস্ট'দের ধর্মান্ধতা, আরও কত কি যে ছিল, তা আজ ভাবলে হাসি পায়—কাঁচা মনের কাঁচা ভাবালুতা। কিন্তু লেখাটার ধার ও তেজ ছিল। ক'মাস পরেই সিডিশনের *ও ক্লাশ-হেটরেড প্রচাবেব দাযে গ্রেফতার ও অভিযুক্ত হলেন* সম্পাদক ক্ষিতীশ রায়চৌধুরী, আরম্ভ হ'ল মামলা। লেখাটা আমার একটা মক্কেল জোটাল; এই সাংবাদিকই হ'ল উকিল, তবে জুনিয়র। সিডিশনের মামলা—খেলো কথা নয়। মফঃস্বলের কাগজের বিরুদ্ধে সেই প্রথম। এ মামলা চালাতে স্বয়ং শরৎ বোস এসেছিলেন একবার স্থানীয় এস. ডি. ও.র কোর্টে। মনে আছে, তিনি ক্ষিতীশদা'কে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করলেন, "কি, জেলে যেতে তৈরি আছেন তো ?" ক্ষিতীশদা জানালেন, "আছি"। "তবে বস্, ওদের ('শাসনবিভাগ'কে) একবার এক্সপোজ করি।" সে-কাজের জন্য প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশ দফা প্রশ্ন আমি আগেই তৈরি করেছিলাম; তিনি দেখে, বুঝে, খুশি হয়ে তা নিয়েছিলেন। একটা দিনে তিনি প্রশ্ন করলেন বর্ষীয়ান বাঙালি পুলিশসাহেবকে আর [illegible] তার অনুবাদক বিভাগের অনুবাদক ভদ্রলোককে। দেখলাম তাঁর জেরার [illegible] সাক্ষীরা তাতে ধূলিসাৎ হয়ে গেল। বুঝলাম, কি চাই ওকালতিতে। [illegible] পরিষ্কার হ'ল—স্থানীয় পুলিশকর্তারা গ্রামের নানা স্থানের অত্যাচারের [illegible] কিছু করে নি; আর সরকারী অনুবাদক মহাশয় লেখাটা [illegible] অনুবাদ করেছেন। শরৎবাবু যা বলেছিলেন তা

সুসম্পূর্ণ হ'ল—এক্সপোজ করা। কিন্তু আমি তো জানি—লেখাটা কি জিনিস। মামলার আসল বিচার্য লেখাটা। পরে আরও কয়েকদিন মামলা চলল। শরৎবাবু আর আসেন নি। শেষে এলেন আমাদের স্বপক্ষে কুমিল্লার কামিনীকুমার দত্ত —তিনিই সওয়াল করেন। বেশ ধীর, স্থির, সংযত এবং যুক্তিতে সুকৌশলী। ওকালতির আরেক ধরনের প্রয়োজনীয় গুণও দেখলাম। কামিনীবাবুর সঙ্গে সেই আমাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয়। এ পরিচয় ক্রমে গভীর হয় তাঁর অমায়িক গুণে, আন্তরিক সহৃদতায়। তিনি কার্যত হন আমাদের জেল-ফেরত (১৯৩৮-৪৭) সকলকার কৃষক আন্দোলনের নিঃস্বার্থ নেতা, সকল রাজনৈতিক বিচার-বিবেচনায় পরামর্শদাতা ; কিন্তু সে অন্য অধ্যায়—জনসমুদ্রের তরঙ্গ-তাড়নার মধ্যে। এ মামলা একদিন শেষ হ'ল—সম্পাদকের তিন মাস কারাদণ্ড আর তিনশত টাকা অর্থদণ্ড হয়। হাইকোর্টেও দণ্ড বহাল থাকে। কিন্তু তখন আমি ওকালতি ছেড়েছি, নোয়াখালিও ছেড়েছি। 'দেশের বাণী'র জীবনে দুর্যোগ ঘটালেও সাংবাদিকতা আমাকে ছাড়ল না, কোনোদিন একেবারে ছাড়ে নি ; কিন্তু আমার শিক্ষা বা সুবুদ্ধি হয় নি। লেখায় আমি আরও মানুষকে ঠেলে দিয়েছি আইনের কবলে—তার মধ্যে 'ফরওয়ার্ড ব্লক'-এর সম্পাদক সুভাষচন্দ্র একজন। নিজে অবশ্য বেঁচে গিয়েছি, কিন্তু সে বুদ্ধির জোরে নয়, অবস্থার গুণে, আইনত সম্পাদক নই বলে। তবে বিশেষ তৃপ্তি পাই নি সেই নিষ্কৃতিতে। কেবলই মনে হ'ত, যে কলমের খোঁচায় শত্রুপক্ষ মরে না, মিত্ররাই জেল খাটে, তেমন কলমবাজিতে খুশি হওযার কারণ কই ?

'দেশের বাণী'র মামলা সামান্য হলেও উল্লেখযোগ্য ঘটনা। মফঃস্বলের ক্ষুদ্র কাগজের ওপর সিডিশানের আগ্নেয়াস্ত্র প্রয়োগ সেই প্রথম। তবে ইদানীং সরকারী দপ্তরখানার দলিল দর্শনে বুঝতে পেরেছি 'দেশের বাণী'র বিরুদ্ধে অস্ত্র বানাতে ও শানাতে খোদ সাম্রাজ্যবাদী কারখানার কতটা প্রয়োজন ছিল। সত্যই, A subject people can have no free press or journal. কিন্তু গলদটা যে গোড়ায়—সাবজেক্ট পিপল সাবজেক্ট না থাকতে চাইলে ওরকম রাজদ্রোহ চালাতেই হবে।

'দেশের বাণী'র মামলাই একমাত্র মামলা যাতে আমি সত্যই মন দিয়েছিলাম। তাতেও বুঝলাম মন দেবার মতো মামলা পেতে হলে আমাকেই বার বার সিডিশানের লেখা লিখতে হবে—না হলে কোথায় পাব ওরকম মামলা ? ওকালতির গুণও দেখলাম ভুল বুঝি নি—শরৎবাবুর মতো 'বিদ্যা-বপু-ব্যক্তিত্ব' না থাকলে চাই কামিনীবাবুর মতো ধীরতা, স্থিরতা, সংযত বিশ্লেষণ-বিচক্ষণতা। বছর বিশেকের ঘষামাজায় আমারও তা চলনসই রকমে আয়ত্ত

হতে পারত। কিন্তু সে পক্ষেও দেখলাম বাধা আছে। একটা মামলায় তা আমার কাছে আরেক রূপে স্পষ্ট হ'ল। সে মামলাটাও আমার ওকালতি জীবনে ওজন্য স্মরণীয়। বোধহয় সব-জজের আদালতে মূল একটা মামলা—ছোট্ট একটা কী আনুষঙ্গিক বিষয়ে আমাকে দাঁড়াতে হবে। উল্টো পক্ষে দাঁড়াবেন আমার বন্ধুর এক অগ্রজ র'-দাদা—তিনি আমার থেকে বছর পনের বড়। আমার প্রতি স্নেহশীল। মামলা উঠবার সময়ে নিজেই বললেন, "চলো, গোপাল।" তাঁর সঙ্গেই গেলাম। মামলাটায় আমার নিবেদন যুক্তিযুক্ত। আমি আরম্ভ করতেই র'-দাদা আমার মুখের কথা শেষ করতে না দিয়ে নিজে আরম্ভ করলেন বলতে—থামেনও না যে আমি বলব। হাকিম তাঁকে থামালেন,—"বুঝেছি।" আমি তখন বলতে চেষ্টা করতেই আবার আমাকেও হাকিম জানালেন, "থাক্, বুঝেছি।" র'-দাদা আদালত ঘর থেকে বেরুতে বেরুতে আমাকে বললেন, "তুমি চুপ করে রইলে কেন, গোপাল ?"

"আপনি যে বলতে দিলেন না, বলতে আরম্ভ করলেন।"

"তাতে কি ? তুমি থামলে কেন ?"

"আপনি বলছেন যে—"

তিনি বুঝলেন, হাসলেন, "আরে, এই তো নিয়ম। তা নইলে মক্কেল বুঝবে কেন তুমি তার কথা বলেছ ?"

সে মামলার ব্যাপারে আমিই জিতেছিলাম। কিন্তু বুঝলাম মক্কেলের কাছে আমার জিত হয় নি। কোনোদিন হবে না—অন্যের মুখের কথা কেড়ে কথা না বললে।

এই শিক্ষাটা ফলপ্রদ হয়েছে—যদিও র'-দাদা তা জানেন না, অন্যেরাও জানলেন না। আমার বরং কলমই ভালো, কথা-কাড়াকাড়ি ব্যবসায়ে কাজ নেই। আমরা গলার জোরে জিততে চাই—আড্ডা না হলে জমবে কেন ? কিন্তু আড্ডার তর্ক নিষ্কাম কর্মযোগ—ওকালতির মতো তর্কের ব্যবসা নয়।

মনে মনে ঠিক করলাম এবং তা কাজেও করলাম শীঘ্রই। অর্থাৎ ওকালতি ছাড়ি ঃ আসলে তা ধরিই নি। ছাড়ি—প্রকৃতপক্ষে নোয়াখালি। তার কারণই বরং বলা বেশি দরকার—এখন বুঝি, তা শুধু ব্যক্তিগত নয়।

বিষের ধোঁয়া

কংগ্রেসকে বরাবর খোঁচা দিই। ওটা প্রমথ চৌধুরীর ঢঙ। আমিও ছাড়তাম না। অথচ আমরাই আবার কংগ্রেসের লোক—আমি, অনুতোষবাবু, সুরেশবাবু। কংগ্রেসকে নানা সময়ে সাহায্য করতেও সকলেই আমরা উৎসাহী।

কিন্তু এ কি স্ববিরোধিতা, না নীতিবিরোধিতা, ambivalence ? হয়তো তা'ই।

গান্ধীজী বাঙলা ভ্রমণোপলক্ষে নোয়াখালিতে এসেছিলেন, আমাদের ডাক পড়েছিল—কাজটা সুনির্বাহিত করে দিতে হবে। আমাদের না হলে তা সম্ভব হবে না। অভিনন্দনপত্র লেখা, সকল সাজানো-গোছানো কে করে ? ছাত্রদের মুখপাত্র হিসাবে তাদের অভিনন্দনপত্র আবার পড়তে হবে আমাকে—তখনো সত্যাই আমি ছাত্র। মেয়েদের অভিনন্দনপত্র পড়তে হ'ল আমার বোন লক্ষ্মীকে। বৈচিত্র্য ছিল আমাদের সব আয়োজনে—রুদ্রাক্ষের বোতামের খাদি পাঞ্জাবি আমাদের পরনে, সবাই ভাবে এ কি কাণ্ড। সত্যাই, 'সবুজ সঙ্ঘ' বটে—নতুন কিছু করতে জানে। ছাত্রদের অভিনন্দন আমরা দিলাম—তুলট কাগজে হাতে লিখে পাঁচটি বাক্য। পুঁথির মতো গাঁথা পাঁচটি পাতা। আর সে পুঁথি আবার পদ্মপাতায় করে দেওয়া হ'ল মহাত্মাজীর সামনে। ভাষায় ছিল শ্রদ্ধার্ঘ্যের আবেগকম্প্রতা, আর পদ্মপাতায় দেওয়া হ'ল তা অর্ঘ্যরূপেই। সকল অনুষ্ঠানে, গান্ধীজীর সরলতার ও নির্মলতার সঙ্গে, আমরা রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য ও সুষমাবোধ জাগিয়ে দিতে চেয়েছিলাম—'সত্যাগ্রহে' আর 'সত্যের আহ্বানে' মিল কোথাও আছে, যত নিগূঢ় হোক তা, এই ছিল আমাদের নিগূঢ় অনুভূতি। সেদিন কংগ্রেস-কর্তারা বুঝেছিলেন—না, এরা জানে—কাজ করতে জানে। আমার কাছে তা মনে হয়েছিল—যখন সে ক্ষুদ্র ছাত্র-অভিনন্দন পড়ি—জীবনের 'পরমক্ষণ'। কিন্তু মধ্যাহ্ন বিশ্রামের পরে গান্ধীজী যখন ডাকিয়ে পাঠালেন—পনের মিনিট কথা বলবেন ছাত্র-প্রতিনিধিদের সঙ্গে—তখন আমি বিপন্ন বোধ করলাম। আন্দোলনে পা বাড়ালেও তা ধরে বসে থাকি নি, ফিরে গিয়েছি কলেজে। বিলাতী শিক্ষা বর্জন করি নি, করতে চাইও না। সত্য ছাড়া মিথ্যাই বা বলব কি করে গান্ধীজীর সম্মুখে ?

কিন্তু গান্ধীজী সে বিপদ থেকে আমাকে বাঁচালেন—'ইতিগজ' বলারও প্রয়োজন হ'ল না। একবারেই জিজ্ঞাসা করলেন, "নাউ, ডু ইউ স্পিন ? চরকা কাটো ?"

"না।"

"কেন ?"

"চরকায় আমার বিশ্বাস নেই।"

প্রসন্ন মুখে বললেন, "কিসে আছে ? পরিশ্রমে বিশ্বাস করো ?"

"নিশ্চয়।"

"এ দেশের সাধারণ মানুষের অনেক সময়ে কাজ নেই। সকলকে খেটে

খাবার মতো কাজ কিসে দেবে বলো ?”—নিজেই তারপর স্টাটিস্টিক্‌স্ দিতে শুরু করলেন।

আমি একবার বোধহয় বলতে চেষ্টা করলাম, “কিন্তু চরকা কেটে কাটনীদের কী আর আয় হয় ? খাওয়া-পরাও চলে না।”

মহাত্মাজী আমাকে পেলেন তাঁর নিজের কোঠায়। বলে চললেন, “এ দেশের মানুষের গড়পড়তা দৈনিক রোজগার আরও কম। চরকা কেটে যদি দিনে দু-আনাও তাতে রোজগার বাড়ে তা হলে তাদের পক্ষে সে কত বড় আয়। অথচ ছেলেবুড়ো মেয়ে-পুরুষ সবাই চরকা কাটতে পারে—বাড়িশুদ্ধ কাটলে তাতে পরিবারের রোজগার বেশ বাড়ে।” ...ইত্যাদি। চুপ করে শুনছিলাম—এ যুক্তি তো মিথ্যা নয়। মহাত্মাজী বললেন, “কেমন ? বুঝেছ একথা—শ্রম ও রোজগার ?” তর্ক তুললাম, “হাঁ। কিন্তু অন্যভাবে আরও বেশি রোজগার হতে পারে।” তৎক্ষণাৎ বললেন, “পারো যদি, সে কাজ দাও তাদের। এত কোটি লোকের ছেলেবুড়ো মেয়েপুরুষ সকলের, আর কোনোরূপ পরিশ্রমের ও উপার্জনের পথ খোলা থাকলে আমি বলব করুক তা। কিন্তু পথ নেই।”

কোটি কোটি মানুষের বেকারদশা ঘোচাবার উপায় তখন থাক, এখনো জানি না। বলব কি করে ? মহাত্মাজী আরো কিছু বলেছিলেন। কিন্তু পনের মিনিট ছেড়ে বিশ মিনিট হচ্ছে। তাই উঠে পড়লেন। বললেন, “এখন বুঝেছ চরকা কেন ?” মাথা নেড়ে জানালাম—হাঁ।

উঠতে উঠতে মহাত্মাজী বললেন, “এজন্যই আমি চরকা-পাগল।” হাসতে হাসতে বললেন, “কিন্তু এখন চরকা কাটবে তো ?”

মহাত্মাজীর থেকে কি আমি বাঙালি কম চালাক ? উত্তর দিলাম, “চেষ্টা করব।”

স্বচ্ছন্দে হাসলেন। বললেন, “চেষ্টা করবে ? আচ্ছা, সত্য সত্যই তা করো।” বলে হেসে চলে গেলেন। বিদায় পেলাম।

সত্য সত্যই চেষ্টা করেছিলাম। তুলো নষ্ট ও সময় নষ্ট করে বুঝলাম—একাজ আমাকে দিয়ে হবে না। কিছুকাল পরে তা ছেড়ে দিলাম। হিন্দু 'নবজীবন'-এর গ্রাহক হয়ে বছরখানেক তা পড়লাম, 'ইয়ং ইণ্ডিয়া'র থেকে তার লেখা বেশি ভালো লাগে নি। দেখলাম রাষ্ট্রভাষায় বিষয়ের অর্থ গৌরব বাড়ে না। চরকা কাটা ? তাতে বিশেষ রোজগার হয় না—তা নিঃসন্দেহে এখন বুঝি—চল্লিশ বছর ধরে চরকার নামে অনেক টাকা ও শক্তি দেশের নষ্ট হয়েছে।

অনেক দূর এসে গিয়েছি স্মৃতির সূত্রে জড়িয়ে। কিন্তু তখনি দেখে-

ছিলাম—সারা শহরে প্রকাশ্যে পাঁচটি মুসলমানও গান্ধীজীর সভায় এল না। মুসলমানদের আঞ্জুমান তাঁর বয়কট ঘোষণা করেছিল। শুধু দু-দশজন পথচারী গ্রাম্য মুসলমান সভার সীমানায় দাঁড়িয়ে 'গান্ধী মহারাজ'কে দেখল। আর সেই সীমানায় কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আরেক নতুন আমদানি আই. সি. এস. ইংরেজ জজ, সঙ্গী সিনিয়র সাব-জজ বাবুকে বললেন, "লেট আস গো ইন—আই মাস্ট সি হিম অ্যাণ্ড হিয়ার হিম্।" নীরবে এসে সভায় তাঁরা সম্মুখের পঙ্‌ক্তিতে বসলেন। কিন্তু কোথায় মুসলমান সাধারণ মানুষ—শতকরা যাঁরা জেলায় আশি জন—আর খেলাফতের নামে যাঁরা গান্ধীজীকে বলতেন 'গান্ধী রাজা'? প্রায় বিশ বৎসর পরে ১৯৪৬-এ যখন সে জেলার গ্রামে গ্রামে গান্ধীজী মুসলমানদের সঙ্গে মিলনের আকাঙ্ক্ষায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন তখন তাঁর শুভেচ্ছা ও আন্তরিকতাতে সেখানকার মুসলমানদের সে বিশ্বাস ফিরিয়ে আনা আর সম্ভব ছিল না। মনে আছে, সে-বার শীতে আমি তখন পাটনায়,—বিহারের ভূতপূর্ব মন্ত্রী গান্ধীবাদী আচার্য বদ্রীপ্রসাদ বলছিলেন, "তাই তো, ওখানে (নোয়াখালিতে) মহাত্মাজীর এতদিন লাগছে কেন—লোককে বুঝোতে?" হায়, কি করে বুঝোব—এতদিন কেন, এত বৎসরেও তখন আর বুঝোবার সুযোগ ফিরে পাওয়া যেত না। ১৯২০-এর পরে বিশ-বাইশ বৎসরে কংগ্রেস ও স্বরাজের নাম ওখানকার মুসলমানদের কাছে অস্পৃশ্য হয়ে গিয়েছে। নির্মলকুমার বসু নোয়াখালি থেকে ফিরে (১৯৪৭) ক্ষুব্ধস্বরে বলেছিলেন, "কিন্তু কংগ্রেসের জন্য গান্ধীজীকে তারা দোষী করে কেন? গান্ধীজী তো কংগ্রেসের সদস্যও নন।"

বিনীতভাবে বললাম, "ওটা তো একটা ফর্ম্যাল যুক্তি। এ যুক্তিতে অবিশ্বাস বরং বাড়ে। গান্ধীজীকে ছাড়া কংগ্রেসের কোনো সিদ্ধান্ত স্থির হয়? সাধারণ মানুষ ফর্ম্যাল যুক্তি বোঝে না—কিন্তু এই সত্যটা তারা জানে। যারা কংগ্রেসকে জেনেছে শত্রু, তারা তাই গান্ধীজীকে এ যুক্তিতে বিশ্বাস করতে পারে না।"

ধান ভানতে শিবের গীত কি চলছে এখনো? কিন্তু সেই তখন রাজনীতিক আঁধি ও ব্যাধির প্রাদুর্ভাব। সে বিষয়টা মোটেই অপ্রাসঙ্গিক নয়। বিষটা সেই ১৯২৩-১৯২৫ থেকে নোয়াখালিতে যে-অবস্থাটা ঘনিয়ে তুলেছিল তাতে অন্য যাই হোক, আমার অস্বস্তি বাড়ল। আমার চারিদিকে আঁধি। অবশ্য সারা ভারতবর্ষ জুড়েই হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে অবিশ্বাস বাড়ছিল। যদিও তখন পর্যন্ত মোসলেম লীগ দুর্বল, কংগ্রেস ও খেলাফতে মুসলমানরা কি তবে তাল সামলাতে পারছিলেন? বলা ঠিক—সামলাতে পারছিলেন না। ক্রমেই

মুসলমানদের নিকট স্বতন্ত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান অভীষ্ট হয়ে পড়ল। আসলে যে-জাতীয়তাবাদের উপর আমাদের রাজনৈতিক চেতনা—সেই রাজনারায়ণ বসু ও বঙ্কিমের আমল থেকে গড়ে উঠেছিল,—সেই জাতীয়তাবাদের গোড়া ধরেই টান পড়ছিল। যতই মুসলমান মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণী সংখ্যায় বাড়ল, আর আর্থিক ও রাজনৈতিক ব্যাপারে সচেতন হতে লাগল, ততই তারা তাতে হিন্দু জাতীয়তাবাদের রূপ দেখে তার থেকে বিচ্ছিন্ন হতে থাকল। ঠিক যে জাতীয় স্বাধীনতার প্রতি বিমুখ হ'ল, তাও নয়। তবে তৃতীয় পক্ষের প্ররোচনার রন্ধ্র বেড়ে গেল। যদি ভারতীয় 'কম্পোজিট কালচার'-এর উপর কোনো 'কম্পোজিট জাতীয়তাবাদ'-এর পলিটিক্স প্রথম থেকে দেশে গড়ে উঠত তা হলে হয়তো 'তৃতীয় পক্ষের' ভেদনীতির খেলাতে এত সুবিধা হ'ত না। কিন্তু কার্যত যা হয় তাতে কী যে হতে পারে ভারতের জাতীয়তার সূত্র, তা মুসলমানরাও বুঝে উঠতে পারে নি, হিন্দুরাও না। তাদের চোখের সামনে ছিল ইংরেজ, ফরাসী, জার্মান জাতীয়তার মডেল। বহুধর্মীয়, বহু জাতীয় দেশ বলেই বা এ দেশের জাতীয়তার মডেল অন্যরূপ হবে? —ওরূপ চেনা, রূপ ছাড়া, তা কেন? হিন্দুরা এবং সাধারণভাবে ভারতীয়রা ভাবল এতদিনের (১৮৮৪ ও পূর্বেকার) জাতীয়তাবাদী সাধনা নষ্ট হতে চলল মুসলমানের পৃথকত্ববাদিতায় (সেপারেটিজমে) স্যার সৈয়দ আহ্‌মদ-এর উদ্দেশ্যানুযায়ী। মুসলমানরা ভাবল—তাদের পৃথকত্ব দুর্ভেদ্য করে না রাখলে শতকরা সত্তর জনের মধ্যে মুসলমানদের (শতকরা ত্রিশ জনের) ধর্মগত সত্তা (আইডেন্টিটি) ডুবে যাবে। থাক গে এই হিন্দু-মুসলমান সমস্যার বিশ্লেষণ। আমার চোখে ঠেকত—ভারতীয় স্বাধীনতা-আন্দোলনের সঙ্কট অনিবার্য। যতই মুসলমানরা পৃথকত্ববাদী হচ্ছিলেন আমি ততই ভাবছিলাম—তা হলে এবার ভারতের ইতিহাসই ফেল করবে। রবীন্দ্রনাথ যে স্থির বুঝেছেন, তাতে সন্দেহমাত্র নেই—সে ইতিহাস 'বিচিত্রের মধ্যে একের' সাধনা। এ সাধনায় অপূর্ণতা রয়ে গিয়েছে; ভারতবর্ষ মুসলমানদের আপনার করে ফেলতে পারে নি; হিন্দুরা বরং বরাবর পৃথক থেকেছে এবং সাত শত বৎসর ধরে সকলকে পৃথক রেখেছে।

বিচিত্রের মধ্যে ঐক্য এই approach-টাও সার্থক হবে না—তার সঙ্গে আরও কিছু চাই। তা বহু তপস্যাসাপেক্ষ—তার পদ্ধতি হবে সমদৃষ্টি ও সমপ্রাণতা। বৈষয়িক ব্যাপারে সমানাধিকার না থাকলে সমপ্রাণতা হাওয়ায় রচিত হয় না। এজন্য বারে বারে ভাবি—আমরা ভারতবাসী সকলকে একাত্ম করতে পাচ্ছি না,—তা করাই হচ্ছে আমাদের যুগের ভারত-সাধনা। আবেগের ভরে মূল মন্ত্রটার সঙ্কীর্ণ ধারণাও করতাম—equal rights হিন্দু-মুসলমানের তা'ই তো মানুষের

অধিকার। কিন্তু বাস্তবে যারা মাইনরিটি তারা তো ঐ equal right-এর জোরে মেজরটি হয়ে উঠবে না—চাকরিতে যতই হোক সংখ্যালাভ, আর প্রতিনিধিত্বমূলক শাসনে হোক সদস্য—মেজরিটি-মাইনরিটি ভাবনাটাই আসলে ভুল। অবস্থাটা দেখতে হবে সামগ্রিকভাবে জাতির দিক থেকে। বিশেষ করে আবার তা দেখতে হবে পরিশ্রমী দরিদ্র কৃষক, মজুরশ্রেণীর দিক থেকে। মাথায় ছিল এমনিতর মার্কস-লেনিনের অস্পষ্ট ধারণা এবং রবীন্দ্রনাথ-বিবেকানন্দ হিন্দু ন্যাশনালিজম-এর জগাখিচুড়ি। তা দিয়ে 'হিন্দু মিশন' 'হিন্দু মহাসভা'ও সমর্থন করা যায়, আবার সোস্যালিজম 'শূদ্র-রাজ'ও সমর্থিত হয়। 'দেশের বাণী'র সে লেখায়ও তারই ছাপ ছিল—যদিও তার বক্তব্যটা হ'ল মানুষের অধিকার ও মনুষ্যত্বের দায়। সে লেখার পরে জেলার ও দেশের অবস্থা আরও ঘুলিয়ে উঠল। চিত্তরঞ্জনের বেঙ্গল প্যাক্ট কংগ্রেস মানল না। ভোলানাথ সেনের হত্যা, স্বামী শ্রদ্ধানন্দের হত্যা এসব যেন বুঝিয়ে দিলে ধর্মান্ধতা শুধু একটা মধ্যযুগীয় পাপ নয়—অন্ততঃ ভারতবর্ষের মুসলমানদের মধ্যে। এই আঁধি ও ব্যাধির প্রতিকার কী ? এজন্য 'নাস্তিকতার প্রয়োজনীয়তা' এ দেশে সর্বাপেক্ষা বেশি।

ইতিমধ্যে কাজ যখন ছিল না তখন আমি এক বছর ঘরে বসে পড়ছিলাম—দেশী ও বিদেশী দর্শন। দেশী দর্শনের জন্য অনুবাদ মিলিয়ে মূল সংস্কৃত দেখতাম। আবার, অন্যদিকে পড়েছি কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র (ইংরেজি অনুবাদে), আর ইংরেজি ধনবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের নানা বই। আইন ছাড়া বাদ দিচ্ছিলাম না কিছুই—সাহিত্যও না, সমাজবিজ্ঞানও না। পল্লবগ্রাহিতার চূড়ান্ত। আবার প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতিতে নেশাও লেগে গেল। তা দেখে চাবুলাল একদিন বললে, "তোর মাথায় এবার টিকি গজাবে।" মাথায় নয়, মনে গজাচ্ছিল। প্রায় বিশ্বাস করতে আরম্ভ করেছিলাম প্রাচীন ভারতবর্ষের সভ্যতা, বিশেষ করে বৌদ্ধ জীবনচর্যা, মানুষের ইতিহাসের প্রধান কীর্তি। অবশ্য ভুলি নি শূদ্রের প্রতি ভারতীয় সভ্যতার অত্যাচার, আর স্ত্রীজাতির প্রতি তার অবজ্ঞা। তবু ভাবতাম—এ সভ্যতাই বুঝি সবচেয়ে সহনশীল ; তার অর্থ উদার, মানবতা-বাদী। আর তাই মধ্যযুগের ধারণায় পুষ্ট মুসলমানদের আক্রমণে ভারত-সভ্যতার এত অবজ্ঞা ভোগ করতে হয়েছে। মনে পড়ত উত্তর ভারতের ভাঙা মন্দিরগুলি। তাই ঘটছে কি আবার এখন ? প্রতিদিনই যেন নোয়াখালিতে সেরূপ অনুভব করেছিলাম। কিন্তু না, প্রাচীন ভারতীয় 'ভ্যালুজ'-ও বাঁচাবার মতো। আর তাই এই 'তৃতীয় পক্ষ'-পুষ্ট মুসলমানদের পুরনো ধর্মান্ধতাও প্রতিরোধিতব্য। নোয়াখালিতে তখনকার দিনে যেন প্রতিদিনই মনে প্রশ্ন

জাগত—ভারতবর্ষের সাধনা কি ফেল করছে ? 'বিচিত্রের মধ্যে এক' গড়ে উঠবে না ? প্রশ্ন জাগত, তর্ক উঠত, হিন্দুদের সঙ্গেই তর্কটা বেশি, কিন্তু তারা নির্বিকার। মুসলমানদের প্রতি তাদের বিশ্বাস নেই ; বরং আইন-আদালত আর নিজেদের বুদ্ধি ও বিত্তের বলেই তারা তখনো নিশ্চিন্ত। হিন্দুদের মধ্যে তাই আমি বেখাপ্পা। মুসলমানদের যাদের দেখতাম—মনে হ'ত তাদেরও দায়িত্ববোধ নেই। শিক্ষিতদের ভাবটা এই—সঙ্কট অনিবার্য হচ্ছে ? হবে। অথবা হোক। মুসলমান যাঁদের দায়িত্ব-বোধ আছে—তাঁরা ভালো মানুষ, অক্ষম। কিন্তু আমার ভাবনায় তাঁরাও খুশি নন। একমাত্র সান্ত্বনা ছিল দু'জন মানুষ—কংগ্রেসের সেক্রেটারী ক্ষিতীশ রায়চৌধুরী, আর তাঁর সহকর্মী সেরাজ। এ'রা বিষণ্ণ বিপন্ন, কিন্তু সত্য শুভবোধে প্রণোদিত—তাই একা। ছোট শহর ছোট জেলা—যেন সব বিষের ধোঁয়ায় ছেয়ে যাচ্ছে। ক্রমে মনে হ'ল, এই বায়ুমণ্ডলে নিশ্বাস-প্রশ্বাসে আমার ফুসফুসে বিষ জমছে। একটু বড় জায়গায় ছাড়া না পেলে ক্রমশঃ শ্বাসগ্রহণ দুঃসাধ্য হবে। অথচ আমি পড়ছিলাম, গল্প লিখছিলাম, নাটকও লিখছিলাম, অভিনয়ও করছিলাম, একই কালে লিখছিলাম সমাজতন্ত্রের সম্ভাবনা, আর সংস্কৃত বিদ্যার স্তব। কলকাতার কাগজে লেখা প্রকাশিত হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল—সেখানেই বুঝি আমার স্থান।

একটা কথা বলা দরকার—এই শত গোলমালেও আমি বুঝতাম—জমিদারী, তালুকদারী, মহাজনী অধিকার,—এসব শোষণের বিলুপ্তি প্রয়োজন। ওসব সামাজিক অন্যায়। কিন্তু ভদ্রলোকেরা বলতেন, ওসব না থাকলে বাঙালি ভদ্রলোকের মরণ হবে। আমি ভাবতাম, তা হলে সে মরণং শ্রেয়ঃ। এবং শীঘ্রং চ। সে মরণকে ফাঁকি দিতে গিয়েই স্বরাজ্য পার্টি বাঙলা কাউন্সিলে পাঁচ-ছ বছর পরে (ভূমিস্বত্ব আইনের সংস্কারে) জমিদারের পক্ষ হয়ে প্রজার দাবি বিনষ্ট করে, ও বাঙলার হিন্দু প্রতিনিধিরা (১৯৩১-এর) রাউণ্ড টেবল কনফারেন্সে বাঙালি ঐক্যকে জবাই করে দেশে ফেরেন। আপাতত ১৯২৫-২৬-এ এ নিয়েও হিন্দু ভদ্রলোকদের সঙ্গে আমার চলত নিত্য কথা কাটাকাটি, মতের বিরোধ, মনের মধ্যে আত্মক্ষয়ী অশান্তি। আমাকে লেখক না পেলে 'দেশের বাণী'রও চলবে না। কিন্তু আমার এ ধরনের কথায়ও তাঁরা খুশি হতেন না, তা নিশ্চয়।

মনের এই অশান্তিতেই নোয়াখালি ছাড়ি। সাম্প্রদায়িকতার আঁধি ও ওখানকার ব্যাধি,—শেষ পর্যন্ত যা দেশ-বিভাগের ব্যাধিতে পরিণত হ'ল—তার আশঙ্কা নোয়াখালিতে তখনি আমার দম বন্ধ করে এনেছিল। অন্ততঃ বাইরের বৃহৎ জীবনে আমার মনের বায়ু পরিবর্তন প্রয়োজন। কলকাতায় সে অবকাশ

আমার মিলবে ; আর শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতির আড্ডার আসরে আমারও প্রবৃত্তি। আমি সেখানেই ফেরারী হলাম। আসলে নোয়াখালি ছাড়তে পারি নি। কারণ, নোয়াখালির আকাশ-বাতাস-নদী-জলের জন্য মমতা আমার নাড়িতে, আমার স্বপ্নেও এ সত্য এখন পর্যন্ত যখন-তখন জানান দেয়—সেই নারকেলের বন, ঝাউ-এর সার, নদীর বান। নোয়াখালির জলবাতাসের মতোই দেখি তার মানুষদেরও। তাই আমি 'কলকাতার মানুষ', আবার আমি 'নোয়াখালির গোপাল হালদার'ও। এমনি বুঝি অনেক বাঙালিরই স্বভাব দ্বিমুখী, অথবা অস্থির non-conformist।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ভাষা পরিচ্ছেদ

মনে করেছিলাম গবেষণার কাজ করব। জ্যেঠামশায়-জ্যেঠাইমাদের পাট কলকাতায় এসে গিয়েছিল ছেলের (প্রফুল্ল) কাছে। আস্তানার সমস্যা যখন নেই, তখন নিজের খরচ চালাবার মতো উপার্জন সাময়িকপত্রে লিখে সংগ্রহ করা যাবে কি? সজনী 'প্রবাসী'তে কাজ করে, জানাল, 'তা আর যাবে না?' কিন্তু গোল তাতে নয়, গোল আমার নিজের মধ্যে। একশটা দিকে যার ঝোঁক কিসে সে গবেষণা করবে?—ইতিহাসে, প্রত্নতত্ত্বে, না, সমাজ-তত্ত্বে, না, ভাষায়, সাহিত্যে? ইংরেজি সাহিত্যের যথেষ্ট পরিচয় না থাকলে আমার মতে আমাদের বাঙলা সাহিত্যকেও ঠিকমতো ঐশ্বর্যবান্ করা যাবে না। এবং রবীন্দ্রনাথের পরে বিশ্বসাহিত্যের মানদণ্ডেই বাঙলা সাহিত্যের পরি-মাপ প্রয়োজন, শিশুসুলভ আদর-আবদারের দাবী লজ্জাজনক। না হলে, এ কথা ভালো করেই জানতাম—ইংরেজি সাহিত্যের দরবারে আমরা চোপদার ফরাস-দারও হতে পারবো না। শুনেছি, আমাদের ইংরেজি অধ্যাপক জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ (জে. সি. ঘোষ) ইংরেজিতে বিলেতে গবেষণা করতে চাইলে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে প্রথম আমলই দেয় নি। পরে খুব অনুগ্রহ করে ওটোয়ের 'ভেনিস্ প্রিজার্ভড্' নাটকটি সম্পাদন করবার ভার দেয়, তার বেশি নয়। অবশ্য সে সম্পাদনার কৃতিত্ব তারা পরে মেনে নিয়েছিল, অক্সফোর্ড-এর ক্ল্যারেণ্ডন প্রেস থেকে তা প্রকাশিত হয়। তার পূর্বে কোনো ভারতীয়ের বই সে প্রেস প্রকাশ করেছে শুনি নি। ১৯৪৭-এর পরে আমাদের বর্ণদোষ কেটে গিয়েছে। ইংরেজি সাহিত্যের ভারতীয় গবেষক ও সমালোচকরাও জাতে উঠেছেন। সম্মানের কথা নিঃসন্দেহ। কিন্তু ইংরেজি পড়া বাঙালি পণ্ডিতরা বাঙলা সাহিত্যের গবেষণায় বহু দান যুগিয়েছেন,—ইংরেজিপড়া মাইকেল, বঙ্কিমদের দানের তুলনা হয় না। সুশীলকুমার দে, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, আমাদের কালের সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্তদের নাম করাই যথেষ্ট, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের এঁরা পণ্ডিত। স্বাধীনতা চাই অথচ নিজেদের সমাজ-সভ্যতার গবেষণার কাজও আমরা করে উঠতে পারছি না, করছে ইংরেজ-জার্মান-ফরাসীরা, তাঁরই 'ভারতবিদ্যার' দিকপাল, রাজা। এ রাজ্যে ভারতীয়দের আত্মপ্রতিষ্ঠার একটা আলোর রেখা এসময়ে ফুটে উঠেছিল—১৯২৬-এ সুনীতি-কুমার চট্টোপাধ্যায়ের বাঙলা ভাষার ইতিহাসের প্রকাশ। দাদাকে নিয়ে সাক্ষাৎ করতে গেলাম সুকিয়াস্ স্ট্রীট নয়—সুকিয়স্ রো'তে অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ি।

অবিস্মৃত অপরাহ্ণ

এবার বলা দরকার অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের কথা। তাঁর দর্শন ঘটেছিল কলেজ-জীবনের গোড়ায়। দর্শনই, পরিচয় নয়, এম. এ. ক্লাশেও সুনীতিকুমার চাটুজ্যেকে আমরা পাই নি। তিনি ছিলেন বিলেতে গুরুগৃহে। পরিচয় হ'ল পাঠ্যজীবনের শেষে।

দাদা একদিন অপরাহ্ণে নিয়ে গেলেন প্রমথ চৌধুরী মশায়ের সঙ্গে দেখা করতে (১৯২৫-এ) তাঁর মে-ফেয়ারের বাড়িতে, আমরা সবুজপত্রের দল—দাবী কি কম? আগে টেলিফোন করে চৌধুরী মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থা হয়েছে। আর কেউ নেই। চৌধুরী মশাই নানা কথা বলছেন। মনে আছে প্রসঙ্গক্রমে তাঁর প্রথম দিনের লণ্ডনের কথাও বলেছিলেন। কী চমৎকার ঠেকেছিল তাঁর চোখে লণ্ডন সে দিন। বোধহয় পূর্বদিন সন্ধ্যায় (বা রাত্রিতে) লণ্ডনে (?) পৌঁছেছেন শীতকালে। দীর্ঘ নিদ্রার শেষে পরদিন চোখ খুলতেই দেখলেন কাঁচের মধ্য দিয়ে সূর্যালোক। জানালা দিয়ে বাইরে তাকাতে মনে হ'ল সব রূপায় মোড়া। গাছের পাতা সাদা, বরফে আবৃত বাড়িঘর, সব জিনিস তা'ই। সে এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। বিলাতের প্রথম দিন, তার প্রথম দৃশ্য। ভাষায় উচ্ছ্বাস ছিল না, effort-ও নয়; শানানো নয়, বানানো নয়, ঝকমকে নয়—প্রমথ চৌধুরীর লেখার মত। মুখর কথা, কিন্তু বানানো 'কথ্য বাঙলা' নয়, যথার্থ 'কথিত বাঙলা', তাঁর মনের ছাপেই স্বচ্ছ—যেন রূপোয় মোড়া। তাই সেই কথা এখনো মনে রয়ে গিয়েছে। অথচ এই প্রমথ চৌধুরীরই সাদরে মুখস্থ-করা কত সাজানো লেখা ও বানানো বাক্য আজ ভুলে গিয়েছি। আমরা সামান্য মানুষ, তবু মনে রয়েছে তাঁর সেদিনকার সহজ অথচ সাদর ব্যবহার; যেন সমগোষ্ঠীর মানুষের সঙ্গে কথা বলছেন। কালচার-প্রীতি যাদের আন্তরিক তাঁরাই এই গুণের এমন অধিকারী। একবার মাত্র একটি কথায় মনে হচ্ছিল তিনি জানেন তিনি প্রমথ চৌধুরী—সাধারণ মানুষ নন। কথাটা উঠেছিল 'চার ইয়ারী কথা'র প্রসঙ্গে। আমি বোধহয় শুধু শ্রোতা না থেকে তখন বলে ফেললাম ও বই-এর অপূর্বতার কথা। চৌধুরী মশায় এতক্ষণ খুবই সহজ ছিলেন, আলমারি থেকে কী বই নিচ্ছিলেন, এবার একটু মুখ ফিরিয়ে বললেন, 'ও বইয়ের একটা কথাও কেউ বাড়াতে-কমাতে পারলে আমি মেনে নেব'। মুহূর্তে মনে পড়ল তিনি কত সযত্ন শিল্পী, আর কত সচেতন নিজের কৃতিত্ব সম্বন্ধে। সাক্ষাৎকালে এরূপ সচেতনতাই প্রত্যাশা করেছিলাম, তাই ভালো লাগল সহজ স্বচ্ছন্দতা। প্রমথ চৌধুরী মশায়কে আমরা সেদিনে ভাবতাম বৈদগ্ধ্যে অদ্বিতীয়, আর বিচারে সাহিত্য-কর্মে অতুলনীয় সারথি।

আজও জানি, বৈদগ্ধ্যে সাহিত্য-কর্মে সত্যই তিনি অসামান্য কৃতী। কিন্তু এখন মনে হয় তাঁর রচনাশৈলীর মতোই একটু কৃত্রিম তাঁর সাহিত্য-কর্ম—ততটা স্বতঃস্ফূর্ত নয়, যতটা সুপরিশীলিত। সেদিন স্বচ্ছন্দভাবে তিনি গল্প করছিলেন তখনকার পলিটিক্‌সেরও। বাঙালি পলিটিক্‌সের কথা না বলে পারে? বাঙালি শিক্ষিতের গল্পে-আড্ডায় দুটো স্থায়ী মূল বিষয়—পলিটিক্‌স্ ও সাহিত্য। আমার তো বক্তব্য—এই দুটি পথেই ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে আধুনিক যুগের বাঙালির প্রতিভা আত্মপ্রকাশের পথ বেছে নিয়েছে—স্বাধীনতার সংগ্রামে ও সাহিত্যের সৃষ্টি-সঙ্কল্পে। প্রমথ চৌধুরীর বৈদগ্ধ্যও সেই সত্যের সাক্ষ্য বহন করত—তাই তা ক্রমশঃ সাংবাদিক আলোচনায় এগিয়ে গিয়েছিল। ঠিক সে সময়ে রাজনীতিতে গান্ধীজী বা কংগ্রেস না চাইলেও দেখা দিয়েছিল প্রজার অধিকারের প্রশ্ন। প্রমথ চৌধুরী 'রায়তের কথায়' তার আগেই কথাটা তোলেন। তাঁর মুখেই সেদিন শুনেছিলাম সাহিত্যে সমাজতত্ত্বে শ্রীযুক্ত অতুল গুপ্তের নাকি গভীর জ্ঞান। পরে তো অতুল গুপ্ত মশায় কৃষক সভার প্রধান উৎসাহদাতা হন, তিনি আর নরেশ সেনগুপ্ত মশায়। 'বঙ্গদর্শনে'র পরে 'সবুজপত্রে'র 'রায়তের কথা'ই বাঙালি সমাজের মূল সমস্যাটিকে আবার জীইয়ে তোলে—'লাঙলে'র জন্ম তার পরে। 'রায়তের কথা'য় প্রমথ চৌধুরীর বক্তব্য নোয়াখালিতেও আমাদের মনের কথার যুক্তি যুগিয়েছিল। তাই শুনতে আগ্রহ ছিল—তিনিও বলেছিলেন, কেমন করে কংগ্রেসের দু'-একটি মোড়ল-গোছের হাফনেতা প্রজাপক্ষের সে বক্তব্যের প্রতিবাদে এখানে-ওখানে সভা-সমিতি ও বক্তৃতা করছে। 'কিছু জোৎ-টোৎ রাখে বোধ হয়'। তাঁর এ ধারণাও বাস্তবতঃ মিথ্যা নয়, আমরা জানতাম। অবজ্ঞা আর সমাজ-বিজ্ঞানীর স্থির দৃষ্টি চৌধুরী মশায়ের সে কয়টি শব্দের মধ্যে দেখেছিলাম। স্বরাজ্য পার্টির জমিদারবাবুরাও প্রজাস্বত্বের প্রশ্নে জোতদারদের সঙ্গে শ্রেণী স্বার্থের টানে একত্রিত।

এসব কথা হচ্ছে, এমনি সময়ে প্রায় ঝড়ের মত ঘরে ঢুকলেন সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। আমাদের কাছে তাঁর পরিচয়ের প্রয়োজন ছিল না। তবে আমাদের সাক্ষাৎ পরিচয় তিনি এই জানলেন। তৎপূর্বে একবার ফেণী অঞ্চলে যাওয়ায় তিনি 'সবুজ সঙ্ঘে'র নাম যথেষ্ট শুনেছিলেন, সেই সূত্রে নাম জানতেন তার হৈ-রৈবাজদের। সুনীতিবাবুর আগমনে গল্প বেশ জমে উঠল, কিন্তু প্রসঙ্গ বদলে গেল। তিনি মোটা একতাড়া কাগজ বের করলেন 'সবুজপত্রের' জন্য লেখা—'বাঙলা ভাষা ও বাঙলা জাতির গোড়ার কথা'। তাঁর বড় বই ইংরেজিতে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরুচ্ছে; মুদ্রণ শেষ, এবার বাঁধাই হচ্ছে,—'ওরিজিন্ এ্যাণ্ড ডিভোলাপ্‌মেণ্ট অব বেঙ্গলী ল্যাঙ্গোয়েজ্'। 'তা প্রকাশিত হবার আগে আমি

তার সারকথা বাঙলায় আমার ভাষায় জানাতে চাই।' চৌধুরী মশায় খুশি হলেন। সুনীতিবাবুই বললেন, বড় লেখা। মূল বই প্রায় হাজার-পনের শ পৃষ্ঠার। এই সব কথাও এক সংখ্যার পক্ষে বেশি বড় হবে। বরং দু'সংখ্যায় দেবেন।' সবুজপত্রে দু'সংখ্যায় সে লেখা বেরোয়। কয়বছর পরে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রবন্ধটি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়—এম. এ.র বাঙলা ছাত্ররা তাই পড়ত, এখনো পড়ে। 'ও-ডি-বি-এল' প্রথম সংস্করণ ফুরিয়ে গেলে কিনতে পাওয়া যেত না। লাইব্রেরিতেও বই নেই, চুরি হয়ে গিয়েছে, তাই দুষ্প্রাপ্য। তা ছাড়া ও-ডি-বি-এল পড়ার মত ধৈর্য ও পরিশ্রম কয়জনার থাকে ?*

তখন ও-লেখা সম্পর্কে আর বেশি কথা হয় নি। অন্য গল্প হ'ল আরও ঘণ্টাখানেক। কী একটা ফরাসী লেখা চৌধুরী মশায় পড়তে দিলেন, সুনীতিবাবু পড়লেন—শুনলাম। একজনকে দেখছিলাম পরিণত বৈদগ্ধ্যের সূরী, অন্যজনকে নবোদিত সংস্কৃতির সূরী—দুই বাঙালি। ইতিমধ্যে চা ও জলখাবার এসে গিয়েছিল। তারপর বিদায় নিলাম, তিনজনে একসঙ্গে—হেঁটে চললাম। আমির আলি এভিন্যু তখনো তৈরী হয়ে ওঠে নি। চৌধুরী মশায়ের মে ফেয়ার-এর বাড়ি থেকে এমন সব পোড়ো জমি ও বস্তির মধ্য দিয়ে এসেছিলাম যে নিজেও তা বুঝে উঠতে পারি নি যখন বছর তিনেক পরে ১৯২৮-এর ডিসেম্বরে পার্ক সার্কাসে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। পার্ক সার্কাসেও সেদিন (১৯২৫ ?) প্রথম ট্রাম লাইন সবে বসেছে, ডিপো গড়ে ওঠে নি। সেখান থেকে চৌরঙ্গী এসে সুনীতিবাবু যেন কোথায় যাবেন, আমরা যাব শ্যামবাজারে নিজেদের বাসায়। পথে চলতে চলতে আলাপ-পরিচয় হ'ল। একবার তিনি ঢাকা গিয়েছিলেন, আরেকবার ফেণীতে বন্ধু নগেন্দ্রনাথ দাসদের বাড়ি—সেখানে শুনেছিলেন 'চৌধুরীর নাড়াই গান—সে-সব কথাও হ'ল। স্বচ্ছ-বৈদগ্ধ্যের ও প্রাণবান সংস্কৃতির মিলনে উপভোগ্য সেই অপরাহ্ণ অবিস্মরণীয়।

ভাষার ভেলা

সেই প্রথম ব্যক্তিগত পরিচয়। তার পরে ৩নং সুকিয়াস্ রো'র বাড়িতেই আমাদের যাতায়াত, আর পরিচয়ের কিছু প্রসার.—যদিও সেবার আমি ছুটির শেষে চলে যাই নোয়াখালি। 'সবুজপত্রে'র সেই প্রবন্ধ সেখানে বসেই সবিস্মিত আগ্রহে পড়েছি। যতটা পেরেছি বুঝতেও ছাড়ি নি। অন্ততঃ বাঙলা ভাষার

*সম্প্রতি 'এ্যালেন অ্যাণ্ড অনউইন' হাত থেকে ও বই পুনর্মুদ্রিত করেছে—আগেকার দুই বৃহৎ খণ্ডের নতুন সংযোজন ও সংশোধনাংশ নিয়ে এখন সে বই তিন খণ্ড হয়েছে।

কথা বুঝতে হলে কত কথা জানতে হয় তার একটা ধারণা হ'ল। ভারতবাসীর রক্তে যেমন, ভাষায়ও তেমনি মুণ্ডা-কোল-সাঁওতাল, দ্রাবিড় মঙ্গোল, আর ইন্দো-এরিয়ান কত জাতির মিশ্রণ। আর কত যোগাযোগে কত বিবর্তন। আরও মাস দুই পরে ও-ডি-বি-এল প্রকাশিত হলে (১৯২৬) সংবাদপত্রে তার অজস্র প্রশংসা পাঠ করে মনে হ'ল, বাঙলা ভাষায় বোধহয় কিছু করবার মতো গবেষণার যুগের সূচনা হ'ল, তার আভাস দেখছি ; কিন্তু এ বই'র পরে করবার মতো কিছু থাকবে কি ?

তখন পর্যন্ত আমার ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে যা ধারণা তা ইংরেজি ভাষার ইতিহাস পড়া থেকে। কত যে তা ঝাপ্সা তা বুঝতাম না। ইংরেজি অনার্সের ছাত্রদের ও ইংরেজিতে এম. এ.র ছাত্রদের সাহিত্যের ইতিহাসের মতোই বেশ একটু ইংরেজি ভাষার ইতিহাসও পড়তে হ'ত ; পড়ানো হ'ত লাউনস্‌বারি বা এমার্সনের বই। আমাদের আমল থেকে সে-সব বই তুলে দিয়ে পাঠ্য করা হয় খুব সরল দু'খানা বই। কাজটা ঠিক হয়েছিল। বি. এ. অনার্সের ছাত্রদের পক্ষে বিদেশী ভাষার অত তত্ত্ব সত্যই বিপজ্জনক। এম. এ.তেও সাহিত্যের ছাত্রের পক্ষে অত ভাষার কচ্‌কচি দুষ্পাচ্য। আমার কিন্তু থার্ড ইয়ারে অকারণে কৌতূহল জাগল। লাউন্‌সবারির ইংরেজি ভাষার ইতিহাস হাতে পেয়েছিলাম, পড়তে লাগলাম। পড়তে পড়তে ক্রমে তাতে একটা স্বাদ পেয়ে গেলাম। মজা লাগল—বাঃ রে বাঃ ! এত রহস্য শব্দের মধ্যে, তার রূপে ও রূপান্তরের ইতিহাসে ! ভাষার ইতিহাস দেখছি জাতির ইতিহাস, সংস্কৃতির ইতিহাস, সমাজের ইতিহাস ! একেবারে মনস্তত্ত্ব পর্যন্ত সব ঘাট ছুঁয়ে ছুঁয়ে ভাষার ভেলায় মনোবুদ্ধি কোথায় যায় ভেসে ভেসে ! বেশ মজা এই নতুন ঘাট পেরিয়ে নতুন দেশ দেখা। আর সেই উপলব্ধিতেই প্রথম মনে হ'ল ইংরেজি ভাষার জন্য ইংরেজ পণ্ডিতেরা কী কাজটাই না করেছেন। কিন্তু আমাদের বাঙলা ভাষার জন্য কী করেছি আমরা বাঙালিরা ? দীনেশবাবু সেদিকে পা না বাড়িয়ে হাত বাড়িয়েছেন। পা বাড়াবেন কি করে, জমিই তখন চোখে পড়তো না। বিজয়চন্দ্র মজুমদার মশায়ও তো কই, এ রকম ইংরেজি ভাষার ঐতিহাসিকদের মতো পরিষ্কার করে বাঙলার স্রোতধারা দেখতে পান নি। পাড় তখন জাগছিল গ্রীয়ার্সনাদির চেষ্টায়—আমরা জানতাম না। সবুজপত্রের দু' সংখ্যায় প্রকাশিত সুনীতিবাবুর সেই বাঙলা প্রবন্ধে একটা আভাস দেখেছিলাম ; তাতে আঁচ করলাম বাঙলা ভাষার ধারাটা কী পথ পেরিয়ে এসেছে—কোল-সাঁওতাল-দ্রাবিড়-মঙ্গোল-ভোটচীনা, ইন্দো-এরিয়ান—কত ধারা। তবু ভাষাতত্ত্বের এ বস্তুটা ছিল অগোচর ! যখন ইংরেজি 'ও-ডি-বি-এল' দেখলাম তখন বই

খুলতেই চক্ষুস্থির। ‘ফনোলজি’ ‘মর্‌ফোলজি’—এ কী কাণ্ড! শুনেছি সুনীতিবাবু যখন তাঁর ও বইয়ের সদ্যপ্রকাশিত দু’খণ্ড রবীন্দ্রনাথকে উপহার দেন, রবীন্দ্রনাথ তা সাগ্রহে পড়তে যান। পরে দেখা হলে বলেন, ‘ও সুনীতি, এ কি কাণ্ড। তোমার ‘ইন্ট্রোডাক্‌শান’ অংশ পড়তে পড়তে খুব উৎসাহ বোধ করলাম। তারপরে এগুতে গিয়েই দেখি—একি! এ যে এ্যালজাবরা।’ (কবি কিন্তু সে বই খুঁটিয়ে পড়েছিলেন) আমার বই খুলতেই চক্ষুস্থির। বাঙলা ভাষাতত্ত্বটা মোটেই তো সুখপাঠ্য নয়। তৎপূর্বে সবুজপত্রের প্রবন্ধ পাঠে সুনীতিবাবুর সঙ্গে দেখা করবো ভেবেছিলাম—মনে মনে বাঙলা ভাষাতত্ত্বে কিছু করার জল্পনা-কল্পনা ছিল। কিন্তু ওঁর বই দেখে ভরসা চলে গেল—প্রথমত, এ-যে দেখছি মহাসমুদ্র; ভেলায় ভেসে আমি পার হব কি করে? দ্বিতীয়ত, মনে হ’ল, বাঙলা ভাষার রাজ্যে এর বেশি আর কী থাকতে পারে যা ‘ও-ডি-বি-এল’-এ বলা হয় নি।

ও ভয় ও ভাব মনে নিয়েই সসঙ্কোচে দাদা ও আমি সুকিয়াস্‌ রো’র ৭।৬৮৩ গিয়েছিলাম। কথাটা পাড়লাম—বাঙলা ভাষায় গবেষণা করতে চাই—করবার আরও কিছু থাকলে। সুনীতিবাবু বললেন—‘করবার তো কত জিনিস। এখনো তার কতটুকু হয়েছে?’ বেশ কিছু উৎসাহ দিয়েই কথা বললেন। জানতে চাইলেন, আমার পড়াশুনা কী ও কিসে আমার আগ্রহ। দু-একটা লেখা দাদা সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন, পড়তে দিলেন। নিজে দ্বিধাভরে বললাম, ইংরেজি সাহিত্যে এম. এ. পড়েছি, বাঙলায় পড়ি নি। বাঙলায় এম. এ. পড়ে নেওয়া কি দরকার? তিনি জানালেন, তেমন প্রয়োজন নেই। দরকার মত বাঙলার যা পড়বার ঘরে পড়ে নেবেন। ইংরেজির ছাত্রদের সাধারণত একটা বড় সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় হয়ে যায়। তাতে বিষয়বস্তুর ধারণা গ্রহণ করা সহজ হয়।

এ মত সুনীতিবাবু এখনো পোষণ করেন। ইংরেজি পাঠের উপর জোর দেওয়া তাঁর পক্ষে নতুন নয়। মাতৃভাষা সৃষ্টিকর্মে অপরিহার্য, আর সাধারণের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারের জন্যও মাতৃভাষাই গ্রাহ্য। কিন্তু বিশ্বব্যাপী জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাণ্ডারের চাবি আমাদের পক্ষে ইংরেজি। আমার অবশ্য যৎসামান্য সংস্কৃতও পুঁজি ছিল।

সেদিন কয়েকটা বিষয়ে গল্পে-গল্পে জেনে খুশি হলেন, সংস্কৃত ভাষায় আমার এক সময়ে একটু আগ্রহ ছিল। তাও জেনে নিলেন। দু-একটু আলাপ করলেন, নানা বিষয়ে গল্প করলেন—সংস্কৃতে ও বাঙলায় কত কাজ হতে পারে এসব বিষয়ে। ভয়টা কেটে যাচ্ছিল, কিন্তু ভরসা পাচ্ছিলাম

না। পরে একদিন আসতে বললেন, নিজের মন বুঝে। দিন চার-পাঁচ পরে গেলাম। তখন কর্পোরেশনে পুরনো সুকিয়া স্ট্রীটের নামটা পুরোপুরি বদলে ফেলার প্রস্তাব উঠেছিল। সুনীতিবাবুরা সুকিয়াস্ রো'র বাসিন্দা, নাম পরিবর্তনে তাঁর বিশেষ আপত্তি। পুরনো নাম পরিবর্তন অনুচিত, বিশেষ করে যে নামের একটা ঐতিহাসিক মূল্য আছে। সুকিয়া স্ট্রীট তেমনি নাম। কলকাতার প্রাথমিক দিকে আর্মানী বণিকেরা এখানে এসেছিল বাণিজ্য-সূত্রে—বোধহয় কলকাতার ইতিহাসে প্রথম যা খোদিত নাম পাওয়া যায় তা আর্মানী বণিক-পত্নী 'বিবি রাজিয়ার' নাম,—তার সমাধিতে উৎকীর্ণ। ১৯শ শতকে 'কওয়াসজী রুস্তমজী' সুবিখ্যাত নাম। কলকাতার প্রোটো-ইতিহাস, কলকাতার আর্মানীদের ইতিহাস। এসব নানা কথা, সুনীতিবাবুর মুখে কথায়-গল্পে, তখন শুনি—পরে অবশ্য তাঁর লেখায়ও পড়ি। এবং যথানিয়মে ভুলে-ভুলে অনেক ভুল করে মনে রাখি। তবে বিষয়টায় সেদিনই মনে আগ্রহ জন্মে, তাই একেবারে ভুলতে পারি না। এরই মধ্যে আমার কাজের কথাও হ'ল। আমার ছাপা দু-চারটি লেখা দেখেছেন—বুঝলাম, অপছন্দ করেন নি ; বুঝে নিয়েছেন আমার ঝোঁক ও দৌড়। বেশ স্বচ্ছন্দভাবে বললেন, একবার ও-ডি-বি-এল-টা পড়ে নিন, বাঙলা ভাষার বিষয়ে একটা ব্যাক-গ্রাউণ্ড তাতে তৈরী হবে। আর দু'-একখানা ভাষাতত্ত্বের প্রাথমিক বই-এর কথা বললেন। আবার জানালেন—নিছক ভাষাতত্ত্ব ছাড়া অন্য কাজও করার আছে। তিনি বলে গেলেন কথায় কথায় কয়েকটা বিষয়—মনে তার ঢেউ খেলতে লাগল। যেমন, একটা বিষয়, বাঙালির সংস্কৃত চর্চা—একটা বড় বিষয়, তার নানা দিক। শুধু নব্য ন্যায় বা তন্ত্র কেন, স্মৃতি, বৈষ্ণব-দর্শন, রসতত্ত্ব, সাহিত্য (আমি তখনি বললাম সংস্কৃতে অতটা অধিকার আমার নেই)। আরেকটা বিষয় ব্রজবুলির পদাবলী —তার ভাষা ও সাহিত্য, বাঙলা, অসমীয়া, মৈথিলী আগে পড়তে হবে। তৃতীয় একটা বিষয়—মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্য ও স্থানীয় লিজেণ্ডের নানা বিকাশ-বিবর্তন। যেমন, জার্মানে নিবিলুঙ্গস্‌দের পতন, ফরাসীতে আর্থারের রোমান্স, স্কাণ্ডিনেভিয়ান্ স্যাগা, কেল্টিক কাহিনী প্রভৃতিতে পাওয়া যায়। ওসব পড়ে দেখলে বুঝতে পারা যাবে, বাঙালি মঙ্গলকাব্যের কাহিনীগুলি দিয়ে কত কী সন্ধান করার আছে। যেমন, গোপীচন্দ্রের গান, সারা উত্তর ভারতে তার কথার নানা রূপ, সে-সব খুঁজে দেখা দরকার। লোক-সাহিত্য গান গীতিকা ইত্যাদিতে 'ফিল্ড ওয়ার্ক' চাই। রবীন্দ্রনাথের 'হারামণি' সংগ্রহ প্রবাসীতেই দেখে পরে মোঃ মনসুরউদ্দিন কিছু সংগ্রহ করেছেন। তা ছাড়া, বাঙলা লোক-জীবন, লোক-জীবনের শব্দ-সংকলন একটা বড় ক্ষেত্র। যেমন, জর্জ গ্রিয়ার্সনের

'বেহার পেজেণ্ট লাইফ' (আলমারি থেকে বই বের করে দেখালেন)। বাঙলার এক-একটা অঞ্চল নিয়ে এরূপ লোক-শব্দ সংগ্রহ করা যায়। মুর্শিদাবাদের শব্দ-সংকলন (অকালমৃত মোল্লা রফিউদ্দীনের ?) তখন বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ পত্রিকায় চলছে। পূর্ববাঙলার নানা অঞ্চলের শব্দ-সংকলন প্রয়োজন। গ্রিয়ার্সন-এর এই বইখানা সেদিকে আদর্শ হওয়া উচিত। তা ছাড়া, আধুনিক বাঙলার এক-একটা উপভাষার বর্ণনামূলক বিবরণও দরকার। যার বেশ কিছু কাজ হয়েছে 'L.S. I.'-তে। কিন্তু উপভাষার সম্পূর্ণ বর্ণনা না হতে বাঙলা ভাষার ইতিহাস সম্পূর্ণ সুস্থির হয়ে উঠবে না। এমনি গুটি দশ-বারো সম্ভাব্য গবেষণার বিষয় সুনীতিবাবু মুখে মুখে তখনি উল্লেখ করলেন—সে-সব বিষয়ে নানা কথা বলে গেলেন। আবার বললেন, ভাষাতত্ত্বে যদি মন লাগে, তবে ভাষাতত্ত্বের প্রাথমিক জ্ঞান সংগ্রহ করতে হবে। 'ও-ডি-বি-এল' একবার পড়া দরকার। বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিতে তা আছে; সুনীতিবাবুর পরিচয়-পত্র নিয়ে লাইব্রেরিতে পড়া সম্ভব। কিন্তু আমি নিজেও বইটা কিনতে চাই, কারণ, ওটাকে সর্বক্ষণের সহায়ক করতে হবে। তিনি পত্র লিখে দিলেন, কনসেশন রেট-এ তা কিনতে পাব—বোধহয় বিশ টাকার স্থলে আঠার টাকায়। সে কপি হ'ল বাড়িতে সর্বক্ষণের পাঠ্য, আর তখনকার ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে বীম্‌স, হর্নলে, গ্রিয়ার্সন প্রভৃতি পণ্ডিতদের লেখাসমূহ সেই লাইব্রেরিতে পাঠ্য —কোথাও বই, কোথাও তা এশিয়াটিক সোসাইটির জর্নাল ও স্বতন্ত্র পুস্তিকায় পাওয়া যাবে।

আরম্ভ করলাম পড়াশুনা। ওরিজিন এ্যাণ্ড ডেভোল্যাপমেণ্ট অব বেঙ্গলি ল্যাংগোয়েজ কিনলাম। পড়তে লাগলাম—বলতে পারি না, খাওয়া-পরা ভুলে গেলাম। কারণ, কলকাতা এসেই সজনীর সঙ্গে দেখা হয় 'প্রবাসী' অপিসে তখন 'শনিবারের চিঠি'র অধিষ্ঠান, চিঠির প্রারম্ভ পর্ব। ভাষার চক্রব্যূহে যখন প্রবেশ-পথ খুঁজছি, তখনি তাই সাহিত্যের মুক্ত-অঙ্গনের দিকেও আনাগোনা না করে পারি না। একটা চোখ সজনীর সাহচর্যে সাহিত্যের দিকে রইল, আর অচিরেই মনও রইল অর্ধেকটা সেদিকে পড়ে।—তথাপি 'ও-ডি-বি-এল' এখন প্রধান—আর কখনো তা গৌণ হবে না। যদি সাহিত্যের কামড় কচ্ছপের কামড় হয়, ভাষার কামড়েও বিষ আছে—মাঝে মাঝে কম্প দিয়ে জ্বর আসে। এখনো আসে।

ভাষা উদ্ভাসিকা

'ও-ডি-বি-এল' আমার ভাষাবোধের উদ্ভাসিকা। বাঙলায় এখন ভাষাতত্ত্বের আরও বই রচিত হয়েছে—প্রায়ই সে-সব এম. এ. বা ওরূপ পরীক্ষা-পাশের বই। ডঃ সুকুমার সেনের 'ভাষার ইতিবৃত্ত' (১৯৫৭ ?), পড়েও এখন কৌতূহল মিটতে পারে, তথ্যঠাসা-সংক্ষিপ্তসার। কিন্তু তখন ইংরেজিতেও ভাষাতত্ত্বের দিগ্‌দর্শিনী এদেশে সুলভ ছিল না। পরে তা হয়েছে (Edward Sapir-এর An Introduction to the Study of Speech, 1921 পাই নি)। এখন বিশেষ করে মডার্ন লিঙ্গুইস্টিক্‌স্-এর হৈ-চৈ—R. H. Robin's General Linguistics, Hockett, Bloomfield, Chumski, প্রভৃতি তত্ত্বাদি তখনও উদ্ভূত হয় নি। পরিভাষা ও সংজ্ঞার প্যাঁচে নিউ লিঙ্গুইস্টিক্‌স্ দুষ্প্রবেশ্য।* ১৯২৬-এর সময়ে Linguistics বিজ্ঞানরূপে প্রতিষ্ঠিত হয় নি। পাণিনির মত বিজ্ঞানীদের ভাষা-জিজ্ঞাসার বহু শতাব্দীর ঐতিহ্য সঞ্চিত হচ্ছিল। স্যর উইলিয়াম জোনস থেকে Antoine Meillet পর্যন্ত ভাষাতত্ত্বের Comparative Philology-র সে বিকাশধারা। 'ও-ডি-বি-এল' ঠিক ভাষাতত্ত্বের পরিচয়-গ্রন্থ নয়, সে বিজ্ঞানের তা এক প্রয়োগ-দৃষ্টান্ত। মুখ্যত 'ও-ডি-বি-এল' যদিও বাঙলা ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশের কথা, কিন্তু সেই সূত্রে আধুনিক ইন্দো-এরিয়ান্ ভাষা-গোষ্ঠীর (সম্ভবতঃ এখনো) প্রধান ঐতিহাসিক বিবরণ—আধুনিক ভারতীয় ভাষাসমূহের ঠিকুজী-কোষ্ঠী। প্রায় চল্লিশ বৎসর ধরে ভারতের বিভিন্ন ভাষার গবেষণা তা অনুসরণীয় দিগ্‌দর্শনী হয়ে আছে। অবশ্য সুনীতিবাবু বলেন, তাঁর অধ্যাপক জুল ব্লক-এর মারাঠী ভাষার তত্ত্বই তাঁর আদর্শ এই ছিল। কিন্তু ও-ডি-বি-এল আরও বিশদ ও ব্যাপক এবং অদ্বিতীয়। তা বাজারে

*নিউ লিঙ্গুইস্টিক্‌স্ সম্বন্ধে আমার জ্ঞান সামান্য, এদেশের কেউ তা আমাদের বুঝিয়ে বলেন নি। শুনেছি, পুণ্যশ্লোক রায় বাঙলা নিয়ে সে ধারায় কাজ করছিলেন। ঢাকাতেও নাকি সে প্রথায় চাষ হচ্ছে। বিদেশী লেখকেরা বোঝাবার অপেক্ষা স্ব-স্ব ধারায় ও পরিভাষায় স্বকীয়তা প্রতিষ্ঠাতেই ব্যস্ত। শাখা-প্রশাখায় তা পল্লবিত হচ্ছে। সম্প্রতি প্রধান এ বিপ্লবের কর্ণধার চুম্‌স্কি ভারত ঘুরে গেলেন। ভাষা-বিজ্ঞানের বিষয়ে তাঁর বক্তব্য সঠিক জানি না। যাই হোক, ভাষার সমাজতাত্ত্বিক সম্বন্ধ নিয়ে যা বললেন তা মার্কস্‌বাদেরও দৃষ্টিসম্মত হতে পারে, কিন্তু তা নিউ লিঙ্গুইস্টিক্‌স্-এর বহুসম্মত মত কিনা জানি না। তবে ভাষাকে গঠন-পদ্ধতির দিক থেকে বুঝবার চেষ্টা—অর্থাৎ স্ট্র্যাক্‌চারাল্ গ্র্যামার রচনার মূল প্রয়াস, প্রয়োজনীয়—এরূপ মনে হয়। তা যদি হয় তাহলে ভাষাবোধ syntax থেকে আরম্ভ করতে হয়। ২।৭।৭৬ ইং। পুনশ্চ ১৯৭৬-৭৭এ বাঙলায় এ বিষয় আরও আলোচনা হয়েছে।

অপ্রকাশ্য হয়ে গেলে (১৯৭২ পর্যন্ত) পৃথিবীর সকল দেশের গবেষকরাই বিপন্নবোধ করেছেন। জাপান তো শত দুই কপি সাইক্লোস্টাইল করেই ব্যবহার করছিল। আমাদের দেশে আড়াই-শ তিন-শ টাকা দিয়ে তার পুরনো কপি কিনবার জন্য স্বদেশী-বিদেশী গবেষকরা ঘোরাফিরি করতেন। ও-দামে আমার ওই আঠারো টাকায় কেনা কপি কিনবার জন্য বিদেশীয় পণ্ডিতও ছিলেন। তবে আমার পক্ষে তা বিক্রয়ের প্রশ্নই ওঠে নি। কারণ, আমার ও-কপি আমার ও আরও অনেকের পরিশ্রমের সাক্ষী, সাক্ষী সৌভাগ্যের ও স্মৃতির। রাজশেখর বসু মহাশয় তাঁর 'চলন্তিকা' রচনার জন্য আমার এই বিশেষ কপি নিজে ব্যবহার করেছিলেন। কাজ হয়ে গেলে তা ফেরত দেন সম্পূর্ণ অক্ষতভাবে, বরং আরও একটু শ্রীবৃদ্ধি করে—চমৎকার কাগজের মলাটে তা সুরক্ষিত, মলাটের ওপরে লেখা শিল্পী যতীন্দ্রকুমার সেনের অসামান্য লেটারিং-এ বই-এর নাম, লেখকের নাম ইত্যাদি। সে মলাট কালক্রমে বিনষ্ট; কিন্তু সে স্মৃতি সেই কপির পক্ষে বিশিষ্ট শ্লাঘার বস্তু, আমার পক্ষে সৌভাগ্যের ও আনন্দের। তা কি বিক্রি করা যায়? আমার ব্যক্তিগত মমতা ও কৃতজ্ঞতাও অবশ্য অল্প নয়। ও-ডি-বি-এল আমার ভাষাবোধের জ্ঞানাঞ্জন-শলাকা—যাতে বাক্-প্রতিমার মহিমা আমার চোখে প্রথম ফুটল।

আহার-নিদ্রা ভোলাবার মত বই না হোক, আমার চক্ষে সভ্যতা, বিশেষ করে ভারত-সভ্যতার নতুন আয়তন উদ্ভাসিত হয়ে উঠল ও-ডি-বি-এল-এ। ছাত্রের শ্রদ্ধা নিয়ে পড়া আরম্ভ করি। এগুতে না-এগুতে শত দেড়েক পৃষ্ঠার 'ইন্ট্রোডাকশান'-এ আমি একেবারে ডুবে গেলাম। সুনীতিবাবুর মুখে শুনেছিলাম, ভাষাতত্ত্বের দিক থেকে ওরূপ ইন্ট্রোডাকশান আবশ্যিক নয়। ভাষাবিজ্ঞানের নানা মহল হ'ল ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব প্রভৃতি। কিন্তু একটা সামগ্রিক পটভূমি উপস্থিত না করে তিনি তৃপ্ত হতে পারতেন না। না হোক ভাষাতত্ত্বে আবশ্যিক, ওই ইন্ট্রোডাকশান আমার পক্ষে সবিশেষ মূল্যবান। এরূপ ব্যাপক পটভূমি না পেলে আমারও চোখ খুলত না। গাছ চিনতে চিনতে ভারতীয় ভাষাতত্ত্বের ইতিহাসের অরণ্যানী আমার দুর্লক্ষ্য থাকৃত এবং হয়তো পা অবশ হয়ে পড়ত পথের ক্লান্তিতে। ভারতীয় জীবনধারার ইতিহাস, তার সঙ্গে ভারতে আগত আর্য-ভাষার ও আর্যেতর ভাষার মিশ্রণ ও বিবর্তন,—সে ইন্ট্রোডাকশান এই চিত্রটা মনের সামনে প্রথমেই তুলে ধরে দেখায়—এই ভারত-সভ্যতার ধারা। এই পরিপ্রেক্ষিত-বোধেই বাক্-এর লীলা-বৈচিত্র্য অর্থময়, চিত্তজয়ী,—অন্ততঃ আমার বেলা তাই হয়েছে। ও-ডি-বি-এল পড়তে পড়তে আরও দেখলাম, ভাষা-বিজ্ঞানে আছে বুদ্ধির সুস্থ ব্যায়ামের অবকাশ।

তা মনে পুষ্টি দেয়, চিত্তে দেয় উজ্জ্বলতা ; মানব-মনের বিকাশ-বৃত্তিতে বিশ্বাস জাগে। সাহিত্যের মতোই ভাষার মধ্য দিয়েও অনুভব করতে হয় জাতীয় আত্মার বাণীরূপ, ভারতের বর্তমান ভাষা-দ্বন্দ্বের মধ্যেও মহাজাতিক আত্মার ছন্দ-আভাস—'তারা মোর মাঝে সবাই বিরাজে কেহ নহে নহে দূর। আমার শোণিতে রয়েছে ধ্বনিতে তাদের বিচিত্র সুর'। আমার বাণীতেও রয়েছে রণিত তাদের দান।

কথাটা জানতাম না তা নয়—শুধু রবীন্দ্রনাথের কথা বলেও নয়। মজা করেই বলতাম—আমি ভরদ্বাজ গোত্রের 'আর্য্য, সন্তান—মুখের সাক্ষ্য অথচ বিপরীত, বাঙাল দেশের 'রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ', কৃত্তিবাসের মত 'মুখুটি গাঁই' ; অন্ততঃ আট পুরুষ ধরে ফারসি পদবীতে চিহ্নিত 'হালদার'।—পাঁচ পুরুষ ধরে পূর্ব ভদ্রাসন পদ্মায় শিকস্তি, দ্বিতীয় ভদ্রাসনও এ পুরুষে তারই সামিল। আমি অনাগারিক, অথবা যথার্থ প্রোলেটেরিয়ান, চাল-চুলো নেই। আমার বংশ-পরিচয় ওই 'হালদার' পরিচয়েই এখন সুস্থির। ভারত-সমাজের ইতিহাসের এটিও তো একটি মজার দৃষ্টান্ত ঃ 'ভরদ্বাজ' পরিণত 'হালদারে'-অর্থাৎ—ভারতীয় আর্য-ভাষার উত্তরাধিকারে এসে মিলেছে আরবী-ফারসির 'দার' প্রত্যয়। তবু জানতাম না—চাল, কলা, সিঁদুর, হলুদে বাঁধা আমাদের বাঙালি মূল আচার-নিয়ম আসলে আমাদের সাঁওতাল বা আস্ট্রিক পূর্বপুরুষের দান। 'পূজা' শব্দ ও 'পূজা' পদ্ধতি ও 'পূজা' থেকে ধরে 'নাড়াজোল', 'ডোমজুর', 'শিলিগুড়ি', 'হাওড়া, 'বাঁকুড়া' প্রভৃতি স্থানের নামে আমরা দ্রাবিড় গোষ্ঠীর সঙ্গে বাঙালির আত্মীয়তা জীবন্ত করে রেখেছি। কিন্তু সন্দেহ করেছি যে, শুধু হালদার মহালানবীশ তা প্রভৃতিতে শেষ নয়। মাগন ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ঠাকুর-দেবতা ও বামুন ঠাকুর প্রভৃতি সকল 'ঠাকুরই' বহন করছেন বহু বহু দিনের বিস্মৃত তুর্ক 'তিগিন্' শব্দের স্মৃতি ? বিজ্ঞানে অবশ্য এরূপ ঐতিহ্যগত আবেগ-অনুভূতির স্থান নেই, এসবে লজ্জারও কারণ নেই, গরিমারও নেই। কিন্তু আমার মতো অজ্ঞানদের শব্দতত্ত্ব এরূপে মজার ও কৌতুকরসের খোরাক যোগাতে পারে—কোথায় বা 'তিগিন্', কোথায় বা 'ঠাকুর'। আবার, নতুন রকমের চমৎকৃতিও জাগায়—অন্ততঃ জাগিয়েছিল আমার মনে,—যখন যোগীমারা গুহার (সিরগুজা) খোদিত দু'হাজার বৎসরেরও পূর্বেকার সুতনুকা প্রত্নলিপির কথা জানলাম—

শুতনুক নম দেবদেশিক্যে
তং কময়িথ নম বলন সেয়ে
দেবদিনে নম লুপদখে।

"সুতনুকা নামে দেবদাসীকে········কামনা করেছিল বারাণসীর দেবদত্ত (দেওদিনের) নামে রূপদক্ষ"—সেই পুরাতন কথা, নর-নারীর ভালবাসা—মানবরস এখানে কথা কইছে ; অথচ ভাষার রূপ জানায় প্রাচ্য-প্রাকৃতের সু-এর স্থানে শু'র-এর স্থানে 'ল' বর্ণ, এবং পুংলিঙ্গ শব্দের প্রথমার একবচনে 'এ'-এখানে দেখা যাচ্ছে অত আগে।

ভাব থেকে রূপে যাওয়া-আসা

ছোটবেলায় প্রথম ইংরেজি শিখেছি বানান করে ; মুখস্থ করতে হ'ত ইংরেজি শব্দ। নিজে থেকেই ধ্বনির কোনো সামান্য মিল খুঁজে নিয়ে (by association) আমরা তা মুখস্থ করবার উপায় খুঁজতাম। 'পদ' 'পা'-এর সঙ্গে মনে রাখার সুযোগ 'foot' ত ও প বর্গের ধ্বনির জন্য ; হ-এর মধ্যস্থতায় 'hand'—ইংরেজি প্রতিশব্দ হস্তের (হাতের) : man 'ম'-এর সহায়তার মানবের বা মানুষের ইত্যাদি। আর path পরিষ্কার পথ। ভাবিও নি, ইংরেজি আর বাঙলার এই যে মিল তার পিছনে সত্যই কোনো সংযোগ আছে। তারপরে এক সময়ে জেনেছিলাম ইংরেজ-প্রভৃতি সাদা-চামড়ার জাতিও নাকি আর্যবংশীয়, যেমন, 'আর্য্য' আমরা ; এবং ওরকম সব ভাষার পিতা, মাতা, ভ্রাতা প্রভৃতি শব্দ বা সংখ্যাবাচক কিছু শব্দ (টু, থ্রি, ইত্যাদি) নাকি তার একটা সন্দেহাতীত প্রমাণ। শব্দতত্ত্বের দু-একটা মূল নিয়মও পরে শুনেছিলাম, যেমন, 'গ্রিম্‌স্‌ল'। কিন্তু এখন দেখলাম এক আশ্চর্য জগৎ—আমাদের 'শত' শব্দের মূল আর্যভাষার অনুমিত রূপ 'কমতোম্‌'। এই 'কমতোম্‌' শব্দটিকে প্রতীকরূপে ধরে আর্যভাষীদের প্রথম দুই ধারা চিহ্নিত হয়েছে—'কেন্তুম্‌' গুচ্ছ ও 'সতম' গুচ্ছ এই দু নামে। 'কেন্তুম্‌'-বাচীদের ধারা গ্রীক লাতিন গথ্‌, জার্মান, ইংরেজ প্রভৃতির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত ; তাতে সেণ্ট সেঞ্চুরি, হাণ্ডরেড্‌ প্রভৃতি শতবাচক শব্দের উদ্ভব। আর 'সতম্‌'-বাচীদের ধারা বয়ে গিয়েছে ইরাকী ভারতীয় আর্য, আর্মানিয়ান, স্লাবো-বাল্টিক (রুশ, লিথোনিয়), আলবেনীয় প্রভৃতির ভাষার মধ্য দিয়ে। তা হলে, এক অর্থে গ্রীক, জার্মান ইংরেজিও তত নয় রুশ, লিথোনীয় প্রভৃতির সঙ্গে আমাদের এই ভারতীয় ভাষার গোড়ায় ছিল যত নিকট আত্মীয়তা। অবশ্য সেই ১৯২৬-এও জানতাম না রুশ 'ভড্‌কায়' ও 'উদক'-এ 'আগোন' ও আগুনে (অগ্নিতে), 'গ্রাদ'-এ ও গৃহে সত্যই কাছাকাছি সম্পর্ক। এমন কি, রুশ 'পিশাতেলি' (লেখক), 'নারোদ' (মানুষ)-ও আমাদের প্রায় 'জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর শব্দ'।

কিন্তু শুধু শব্দ দিয়ে ভাষার পরিচয় নয়। তা হলে আরবী শব্দের বাহুল্যে ফারসি ভাষা এখনো ইন্দো-ইরানীয় বংশের ভাষা বলে গণ্য হ'ত না ; ভারতীয় ভাষা উর্দু'ও হয়ে পড়ত সেমিটিক-পারসিক গোষ্ঠীর ভাষা। কিন্তু না, উর্দু ভারতীয় ভাষা, আমাদেরই ভাই। ভাষার বিচারে ধ্বনি (phonom স্বনূন), রূপ (morpheme), বাক্যরীতি (syntax), শব্দার্থ (semantic), এসব জিনিস শব্দের (vocabulary-র) থেকেও অনেক বড় গুরুতর উপাদান। তাতেই তো বুঝি আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষা আসলে বহু পরিবর্তিত প্রাচীন যুগের (বৈদিক) ভারতীয় আর্যভাষা। অথচ প্রাচীন আর্য সেই স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জনবর্ণের ধ্বনির পরিবর্তনও কি কম ? যুগে যুগে সেই প্রাচীন আর্যভাষা ভারতী কত ধ্বনি খোয়াল, কত ধ্বনি তাতে নতুন ভারতে যোগ হ'ল ; কত ধ্বনি বদলে বদলে নতুন হ'ল। এক "কৃষ্ণ"-থেকে কন্ন, কণহ, কানু কান, কানাই, আবার কেষ্ট ; এক 'ক্ষুদ্র' থেকে 'খুল্ল' (খুড়ো), চুল্ল, (চুল), ছোট, কুট্টি, চুটি (চুতিয়া), খোট্টা,—কত পরিণতি কত বিভিন্ন অর্থও। সেই পূর্বেকার শব্দ-রূপ ধাতু-রূপের কারক-বিভক্তি-প্রত্যয় কোথায় গেল উড়ে ? বাক্যরীতি (syntax) সংস্কৃতে ছিল গৌণ, প্রায় নিষ্প্রয়োজন। বাঙলার এই যে ক্রিয়া উহ্য-করা বাক্য—(এক রাজা, তার দুই রানী) তা কি কোনো দ্রাবিড়-প্রভাবিত ভাবনার ফল ? কিম্বা, ওরূপ বাক্যবিন্যাসের নিয়মে syntax বিকাশে সুর-মাত্রা-তালে মানুষের কত অজ্ঞাত উত্তরাধিকার কি ভাবে সঞ্চিত। 'ও-ডি-বি-এল'-এর শত শত শব্দ, তার ধ্বনির বিবর্তন, ব্যাকরণের নিয়ম-নীতির ক্রমবিকাশ দেখতে-দেখতে মনে হয়েছে এ-পরিবর্তন খেয়ালিপনা নয় ; পরিবর্তনের নিয়ম-নীতি আছে, খেয়ালের সে নীতিও বিচিত্র। কিন্তু ভারতীয় আধুনিক ভাষাসমূহের বিকাশে আমাদের সভ্যতার পরিপ্রেক্ষিতে দেখে তার রহস্য বুঝতে পারা, তা সত্যই কৌতুকের, কৌতূহলের আর বুদ্ধিগত বিস্ময়ের। ললিত বন্দ্যোপাধ্যায় 'অনুপ্রাসের অট্টহাসে' মজা পেয়েছিলেন। ভাষাতত্ত্বের মধ্যে একটু ডুব দিলে আরও কত রকমের হাসির ও কত মজার না খোঁজ পেতেন। কৌতুকের উপকরণের থেকে কৌতূহলের উপকরণই বেশি মিলে। আর আগাগোড়া মিলে বুদ্ধির তৃপ্তির মৃদুহাস্য। সেই সঙ্গে শেষ অবধি একটু অনুভূতিরও—রহস্যানুভূতির। না হলে মনে হয় কেন—মানুষের ইতিহাসের এক অপূর্ব প্রকাশ এই বাগ্‌দেবীর লীলা-বৈচিত্র্য।

বাগ্‌দেবীর লীলা-বোধ অবশ্য সাহিত্যরসের বিশ্লেষণেই সহজে পাওয়া যায়। কিন্তু সাহিত্যও শব্দের মালাতেই গাঁথা, ভাষা তার বাহন। ভাষা ছাড়া

ভাব নেই, ভাব ছাড়াও নেই ভাষা ; অবশ্য সঙ্গীতের ভাষা, ভঙ্গির ভাষা, চোখের ভাষা, এসবকে ভাষা না বলে প্রকাশ-পদ্ধতি বলাই উচিত। ভাষা বলতে মুখের ভাষাই বোঝা উচিত। সেই ছোটবেলা থেকে সহজ বুদ্ধিতে এ কথাই বুঝে এসেছি। তারপরে শব্দের ব্যুৎপত্তি (etymology)-তে মজাও পেয়েছি। এখন তাতেই দেখলাম ধ্বনিতে, রূপে, বাক্য-রীতিতে, শব্দার্থে মিলিয়ে ভাষা কী জটিল জীবন্ত রহস্য, তার তুলনামূলক, তার আকৃতিগত, ও গাঠনিক দিক থেকে ভাষার রহস্য বিশ্লেষণ করলে সে রহস্য অলীক হয়ে যায় না। বরং বুদ্ধিতে ও বোধে মিলে রহস্যটার তখন নতুন আয়তন দেখা দেয়।

ও-ডি-বি-এল আমার কাছে ভাষাবোধের এইরূপ চাবিকাঠি। অবশ্য, বইতে উল্লেখিত বিশেষ বিশেষ সূত্র (reference), লেখপঞ্জী ও গ্রন্থপঞ্জী যতটা পারছিলাম লাইব্রেরিতে দেখেছিলাম—তা বাঙলা ভাষার ক্ষেত্রেই নিবদ্ধ ছিল না। তবে রবীন্দ্রনাথ, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীদের ভাষাতাত্ত্বিক লেখায় পূর্বে আগ্রহ বোধ করি নি। রামমোহন রায়ের গৌড়ীয় ভাষার ব্যাকরণও যে তাঁর প্রতিভার একটা প্রমাণ, তাও জানতাম না। আর নকুলেশ্বর বিদ্যারত্নের বাঙ্গালা ব্যাকরণের কথা সুনীতিবাবুর পূর্বে কারও মুখে শুনি নি। সত্য কথা বলতে, ব্যাকরণ যে আসলে কী বস্তু, তাই বুঝতাম না। ছোটবেলা থেকে ব্যাকরণ বিভীষিকা ছিল। তবু বিদ্যাসাগরের 'ব্যাকরণ কৌমুদী'কে রপ্ত করেছিলাম সংস্কৃত পড়ার প্রয়োজনে। সংস্কৃতের দু-একটা পরীক্ষা দিয়েছিলাম স্কুলের পণ্ডিত মশায়ের যত্নে। কিন্তু ব্যাকরণের রহস্য কিছুমাত্র বুঝি নি। বাঙলা ব্যাকরণ ছিল অপাঠ্য, ইংরেজি গ্রামার দুষ্পাচ্য। 'ব্যাকরণ-বিভীষিকা'ও এখন অনেকটা অকারণ বিভীষিকা', কথাটা ভাবতে গিয়েই বুঝি ও-ডি-বি-এল ভাষার সেই উদ্ভাসিকা, আমার চোখে তাতে ভাষার রহস্য প্রকাশিত হয়। সেই ও-ডি-বি-এল-এর সঙ্গে সঙ্গে ভাষাতাত্ত্বিকদের লেখা পড়ে পড়ে বুঝেছি, ব্যাকরণটা অকারণ নয়, তার বিভীষিকাটাই অকারণ। অবশ্য সাম্প্রতিক কালে structural linguistics-এর নামের সঙ্গে নতুন structural grammar-এর প্রচলন হচ্ছে—পদ্ধতিটা ভেবে দেখবার মত। তবে structural linguistics-এ মার্কিনদের আগ্রহ দেখে ভরসা পাই না। Structural grammar থেকে ভাষা-বিবরণ শুরু করলেও ভাষার ঐতিহাসিক ও তুলনামূলক বিশ্লেষণ বাদ দেওয়া যাবে না। থাক্, এ তর্ক অবান্তর।

ও-ডি-বি-এল পড়া শেষ করে কথা হয়েছিল ব্রজবুলি সম্বন্ধে কাজ করবার। বিদ্যাপতি ও মৈথিলী পড়তে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে দরকার মত যাই। সুনীতি-বাবুর কথামত এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে কিনে নিলেম এ. জি. গ্রিয়ার্সনের

'মৈথিলী ক্রিস্টোম্যাথি ও গ্রামার'। পাতা পুরনো, বাঁধিয়ে নিলাম। সযত্নে দোরস্ত করতে করতে ভড়কে গেলাম। বিদ্যাপতির কালে যে মৈথিলী ছিল সে মৈথিলী লোক-মুখে এখন অনেক বদলে গিয়েছে—কবিতায় অবশ্য পুরনো ধাঁচই তখন সচল। বাঙালির পক্ষে বিদ্যাপতির মৈথিলী আয়ত্ত করা বিশেষ কষ্টসাধ্য নয়—তাকেই তো গ্রহণ করে বাঙালি বৈষ্ণবরা, একদিকে বিদ্যাপতির ভাষা আরও কিছুটা বদলে বিদ্যাপতিকে বাঙালি বৈষ্ণব করে ফেলেছিলেন ; অন্যদিকে সেই মডেলেই ব্রজবুলি পদাবলী রচনা করতে থাকেন। তার বিষয়বস্তু ব্রজকথা। তখনকার আসামেও ব্রজবুলি পদাবলী আছে বেশ-কিছু, তাও ব্রজবুলি সাহিত্যের মধ্যে গণ্য। এসব অবশ্য আগেই স্বীকৃত, 'ও-ডি-বি-এল'-এও পড়েছি। তবে কিছু কিছু তথ্য গ্রিয়ার্সন তাঁর ব্যাকরণে দিয়েছেন (লিঙ্গুইস্টিক সার্ভে অব ইণ্ডিয়াতে তার নমুনা রয়েছে)। গ্রিয়ার্সন মনে করতেন মৈথিল্ল কেন, সমস্ত বিহার অঞ্চলের ভাষার কথিত রূপ গত ৩।৪ শত বৎসরে এত পরিবর্তিত হওয়ার কারণ সম্ভবতঃ যেখান থেকেই হোক ও-অঞ্চলে মুর্যাহির প্রভৃতি শিক্ষাদীক্ষায় অনুন্নত (যাযাবর ?) উপজাতিদের প্রবেশ ও বিস্তার। এ তত্ত্ব কে বিচার করবে ? আমার দৌড় 'বিদ্যাপতি ও তার ভাষা' পর্যন্তই পৌঁছেছিল। স্বভাবদোষে গবেষণার অন্য এক দিকে দৃষ্টি গেল। বাঙলা উপভাষার দু-একটির ভাষাতাত্ত্বিক বর্ণনা তৈরি করতে যাই, আমার পক্ষে তা কম শ্রমসাপেক্ষ। অধ্যাপক সুকুমার সেন মহাশয় ব্রজবুলির গবেষণা হাতে নিয়েছিলেন। সমাপ্ত করলেন (১৯৩৫-এ)। ব্রজবুলি সাহিত্যের উপর A History of Brajabuli Literature সর্বমান্য বই—ভাষা ও সাহিত্যের গবেষণার সকল রকমেই তিনি ছিলেন ও-কাজের যোগ্যতম অধিকারী। তাঁর কথা, তাঁর যোগ্যতার ও ব্যক্তিগত সৌহার্দ্যের কথা ভালো করে বলতে না পারলে আমার খেদ থেকে যাবে।

উপভাষায় উপকণ্ঠ

ডায়েলেক্ট্-এ (উপভাষায়) হাত দিয়েছিলাম। লোক-শব্দ সংকলনও চলবে। প্রথম নিই নোয়াখালির উপভাষা। লিঙ্গুইস্টিক সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার (LSI) পঞ্চম খণ্ডের প্রথম ভাগে বাঙলা উপভাষাসমূহের বিবরণ। বিরাট আকার বই, কী যত্ন করে তখন ইংরেজ শাসকরা এসব বই ছাপত। LSI-এর খণ্ডটি সুনিশ্চিত পুঁজি, আর আমার নিজের নোয়াখালির উপভাষার সঙ্গে আবাল্যের পরিচয়, ভুলতে ভুলতে এখনো, যা আজও একেবারে ভুলি নি। মডেল ছিল সুনীতিবাবুর লেখা বেঙ্গলী ফনেটিক্ রীডার। প্রথমে স্থির করতে

হবে নোয়াখালির ধ্বনিসমূহ। কিছু কাজ করতে গিয়ে বুঝলাম নিঃসন্দেহ হওয়া কত শক্ত। কথাসূত্রে সহজভাবে শব্দ উচ্চারণ করে যাই, যে ধ্বনি যেমন তা ফোটে সহজে। কিন্তু সচেতন হলেই আর সহজ থাকি না। জিজ্ঞাসা করলে সব যায় গুলিয়ে। স্বর বর্ণের উচ্চারণ-স্থান ঠিক করা গেল, তাদের অনুনাসিকও সন্দেহাতীত। ব্যঞ্জনে এসে বিভ্রাট। চ বর্গে পার্থক্য স্পষ্ট। শব্দের আদিতে, মধ্যে, শেষে, যুক্তবর্ণে আবার কোথায় কিরূপ কোন ধ্বনি, নোয়াখালিতে আদি 'প' কি 'ফ' না 'হ' ('পান্' কি 'ফান্' না 'হান্' ?). সেই 'ফ' কিরূপ, 'হ', দুর্গাপূজা কি দুগ্‌গো'জা না দুগ্‌গা ফুজা। ড় র-এ অভেদ বাঙ্গাল দেশে, কিন্তু সর্বত্র কি ? স্বরমধ্যবর্তী ব্যঞ্জনের কত বিপত্তি। 'শ' কোথাও 'হ', কোথাও 'অ'। আর সত্যই কী তফাৎ এই 'হ' ও 'অ'-এতে ইত্যাদি। তারপর কত ধ্বনির শ্লথ উচ্চারণ, উষ্মীভবন, বিশেষ করে ঘ, ঝ, ধ, ভ-এর কণ্ঠনালীর হয়ে অবরুদ্ধ ধ্বনি—এসব সুনীতিবাবুর কাছে উচ্চারণ করতে তা ধরা পড়ল, তিনি খুশি, রহস্যটা আমাকেও বুঝিয়ে দিলেন। কিছু নমুনা, আর তার ফনেটিক্ লিপ্যন্তর শুদ্ধ তৈরী করলাম প্রথম কাজ A Short Sketch of the Noakhali Dialect of SE Bengali, ফনেটিক্ লিপি দেখলে ছাপাখানার মাথা ধরে। ও পুস্তিকা ছাপা হতে হতে তাই এসে গিয়েছিল বোধহয় ১৯৩০ সাল। ততদিনে সেই স্বভাবদোষে অনেকদিকে চোখ যায়। সাহিত্য, পলিটিক্স্ ইত্যাদিতে ঝোঁক বাড়ে। সঙ্গে সঙ্গে তৈরি করছিলাম নোয়াখালির উপভাষার ব্যাকরণের কঙ্কাল। ধ্বনির মত গোল নেই—রূপ বিশ্লেষণে সংশয় বাধে না, তবে ও পুস্তিকা ছেপে বেরুতে বেরুতে হয়ে গিয়েছিল বোধ হয় ১৯৩৩-এর মাঝামাঝি। মনে আছে, আমি তখন বক্সা বন্দিশালায়। লেখা এত বিলম্বে ছাপা হলে মনের উৎসাহ ক্রমশঃই ছাই হয়ে যায়। বিশেষ করে যার আগ্রহের গভীরতা বা একনিষ্ঠতা নষ্ট হতে বসেছে। আমারও সেই দশা হয়েছিল। অন্যধরনের গবেষণা করাই ভালো যাতে ছাপার এত ঝক্মারি নেই। তবু আগ্রহটা খুঁচিয়ে রাখার মত কারণও জুটত। নোয়াখালি-ভাষার ফনেটিক্ রূপরেখা ছাপা হতে সুনীতিবাবুর নির্দেশ মত ভারতীয় ভাষাতত্ত্বের গুরুদের কাছে তা পাঠালাম, সুনীতিবাবুই পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন ; দেশী-বিদেশী পণ্ডিতদের থেকে এল উৎসাহভরা মন্তব্য। তবু বিশেষ করে মনে আছে পণ্ডিত জুল ব্লক, এল টার্নার এবং সিদ্ধেশ্বর বর্মা ও গ্রিয়ার্সনের উৎসাহ-বাক্য। সে-সব অনেকটাই হয়তো জ্যেষ্ঠদের সহৃদয় স্নেহের প্রমাণ ছাড়া কিছু নয়—তবু তাই কি কম ? বিশেষ করে গ্রিয়ার্সনের চিঠির শেষ কথা, 'তোমার সন্দ্বীপের ভাষা সম্বন্ধে বক্তব্যও চোখ এড়িয়ে যায় নি'। কথাটার হেতুমূল এই

—সন্দ্বীপের ভাষা সম্বন্ধে তিনি LSI-তে বলেছিলেন ওটা ঢাকাই উপভাষার অনুরূপ। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা তা নয়,—LSI-এর নমুনাও সন্দেহাতীত নয়। যিনি সন্দ্বীপের বিবরণ তাঁকে জানিয়েছিলেন আমার বিশ্বাস, তিনিও নির্ভরযোগ্য ছিলেন না—কাছারির কোনো আমলা ভদ্রলোক বোধ হয়।' আমার লেখায় ফুটনোট্ দিয়ে জানিয়েছিলাম—সন্দ্বীপের ওরূপ ভদ্রলোকরা অনেকেই বলতে চান—তাঁরা ঢাকা-বাখরগঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চলের লোক, সেখান থেকে সন্দ্বীপে এসেছিলেন। অনেক সময়ে বলেন তাঁদের ভাষা 'বিক্রমপুরী' (মূলতঃ একটা মান্য ঢাকাই উপভাষা)। কিন্তু, সাধারণ মানুষের কথা, উচ্চারণ, নোয়াখালি-চট্টগ্রামেরই ধাঁচের, ঢাকাইর মত নয়। গ্রিয়ার্সন এই ফুটনোটের কথাই তাঁর পত্রে উল্লেখ করেছেন—তিনি তখন অশীতি উত্তীর্ণ, বিলাতে বসে তাঁর কথাটার পুনর্বিচার সম্ভব নয়। অবশ্য নোয়াখালি উপভাষার ব্যাকরণসার A Skeleton Grammar of Noakhali (C.U.) যখন প্রকাশিত হয় তখন তা পাঠানো আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না—গ্রিয়ার্সন বোধহয় তখন জীবিত নেই। নতুন কিছু আমি তাতে বলি নি,—কিন্তু প্রথম পুরুষ সর্বনামের স্ত্রীলিঙ্গ রূপ (পুঃ হেতে, হিতে, স্ত্রী হেতি, বহুবচন পুঃ 'হিতেরা' 'হেতেগো', স্ত্রী 'হেতিরা', 'হেতিগো', ইত্যাদি) কিম্বা ক্রিয়ায় ভবিষ্যৎ কালে 'তাম', 'তা', প্রভৃতি কিছু কিছু উল্লেখযোগ্য জিনিস তাতে বলা হয়েছিল। ভাষা-আচার্যদের ও গবেষকদের গ্রাহ্য হয়েছিল। তাতে ভরসা পেয়ে শেষ অবধি জেলখানায় পূর্ববঙ্গীয় উপভাষাসমূহের তুলনামূলক ব্যাকরণ রচনা সমাপ্ত করি—কিন্তু সে এ জন্মের কথা নয়, জন্মান্তরের কথা, যৌবনান্তের কথা।

১৯২৭-২৮-এ গবেষণার আরেকটি কাজ করেছিলাম—তা ভাষাতত্ত্বের নয়, সমাজ-সংস্কৃতির প্রসঙ্গে। সুনীতিবাবু বললেন—গোপীচন্দ্রের গান নিয়ে একটু খোঁজ করুন—ময়নামতী, গোপীচন্দ্র, গোরক্ষনাথ একসূত্রে গাঁথা আমাদের বাঙলা দেশে। কিন্তু গোপীচন্দ্রের আখ্যান পাঞ্জাব, সিন্ধু, মারাঠা পর্যন্ত রাজ্যে নানা আকারে বিস্তৃত, সে-সব নানা আঞ্চলিক ভাষাও অনুসন্ধেয়। এই বঙ্গীয় রাজার কথা সারা উত্তরভারতে কি করে এত ব্যাপ্ত হ'ল, কেন সেখানে এত জনপ্রিয় হ'ল?

অনুসন্ধানের সূত্রগুলি সুনীতিবাবুই যুগিয়েছিলেন, আমি শুধু সে সূত্র অনুসরণ করি। তাতেই একটা প্রাথমিক নিবন্ধ দাঁড়িয়ে যায়। কিন্তু এ প্রসঙ্গে একটা ছোটখাট মজার ব্যাপার ঘটল,—তার অর্থ বুঝবার মতো। কাজ আরম্ভ করবার আগেই একজন অধ্যাপকের নাম করে সুনীতিবাবু বললেন, ওঁর সঙ্গে দেখা করুন! উনি হয়তো নতুন মালমশলার সন্ধান দিতে পারবেন।

একটা পরিচয়-পত্রও সেই অধ্যাপকের নামে *দিতে দেরী করলেন না।* তা নিয়ে উত্তর কলকাতায় অধ্যাপকমশায়ের বাড়ি গেলাম দেখা করতে। দেখা হলে—আধঘণ্টা থেকে এক ঘণ্টা ধরে অধ্যাপক মশায় জানালেন—এ ব্যাপারে অনেক কিছু তিনি নিজে করে রেখেছিলেন ; তারপরে আর আমাদের কিছু করবার নেই। আসলে সে সবই তৈরি পাওয়া যেত। এখন একটু দেরী করতে হবে—সে-সব মালমশলা শুদ্ধ তাঁর প্রায় সমস্ত কাজ একটা দুর্বিপাকে বিনষ্ট হয়ে গিয়েছে—গৃহদাহে। তবে শীঘ্রই তিনি পুনর্লিখনে হাত দেবেন —আমরা তখন সব পেয়ে যাব।

আমি ফিরে এসে সুনীতিবাবুকে বললাম—ওকাজ তো হয়েই আছে। অধ্যাপক মহাশয়ের শুধু প্রকাশ করা বাকী। সুনীতিবাবু বললেন, তা হলে একটু অপেক্ষা করুন। ও'ঁর কাজ পেয়ে তখন আবার দেখা যাবে—কোন্ দিকে কী করার বাকী! নিশ্চেষ্ট হচ্ছিলাম, কিন্তু হওয়া হ'ল না। দাদার অনুজ হিসাবে প্রায় পাঠশেষেই পরিচিত হয়েছিলাম ১৪নং পার্শিবাগানে ডাঃ গিরীন্দ্রশেখর বসুদের সঙ্গে, সে সূত্রে স্থান পেতাম সে গৃহের উৎকেন্দ্রিক ক্লাবের আড্ডায়ও। এ প্রসঙ্গে তা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু একদিন সেখানে যেতে ডাঃ বসুর সঙ্গে দেখা। তিনি আমাকে বিশেষ স্নেহ করতেন—দাদার পরিচয়ে আমার কাজকর্মেও তাঁর আগ্রহ ও সদিচ্ছা ছিল। জিজ্ঞাসা করলেন, কি কাজ করছি। জানালাম—একটা কাজে হাত দেবার কথা ছিল, গোপীচন্দ্র রাজার কাহিনীতে। সুনীতিবাবু তাঁর মালমশলা সংগ্রহ করতে পাঠিয়েছিলেন অধ্যাপক বি-এর কাছে—

কেন? —ডাঃ বসু তৎক্ষণাৎ বললেন, বি-এর কাছে কেন?

তিনি মালমশলার খোঁজ রাখেন।

কী বললেন তিনি? তোমাকে নিরস্ত করলেন তো?

আমি একটু বিস্মিত হয়ে বললাম, ঠিক তা নয়। তবে বললেন ওসব তাঁর করা আছে।

কথা শেষ করতে না দিয়ে ডাঃ বসু বললেন, আর ওঁর বাড়ি পোড়া যেতে তা নষ্ট হয়েছে, না?

আমি অবাক হয়ে তাকিয়েছিলাম। তিনি আবার বললেন, কেমন ঠিক কিনা?

বললাম, 'ঠিক'!

যাও। এমন কোনো বিষয় নেই যা ওর বাড়ি পোড়াতে নষ্ট হয় নি। আর এমন কোনো অনুসন্ধানী জিজ্ঞাসু নেই যাকে উনি কাজে এ বলে নিরুৎসাহ না করেন।

আমার বিস্ময় বাড়ল গিরীন্দ্রশেখর বসু মনস্তাত্ত্বিক, না দৈবজ্ঞ, গণা জানেন ? ডাঃ বসু বললেন, তুমি এসব পণ্ডিতদের কথায় কান দিয়ো না। সুনীতিবাবু যা বলেন, আর যে-বই পড়তে বলেছেন, সে-সব সূত্র ধরে নিজে নিজে এগোও, সুনীতিবাবুকে দেখিয়ে নেবে দরকার মতো।

সুনীতিবাবুকে এই কথাটা জানাতে তিনি জানালেন, আচ্ছা, তবে দেখুন এগিয়ে। বলে আরেকবার কিছু পথের খোঁজ দিলেন। সেই সূত্র ধরে আমি এগুই। দেখলাম, একটা সূত্র অনুসরণ করে তাতেই পাওয়া যায় নতুন অন্য সূত্র, তার থেকে আবার নতুনতর সূত্র। একটু ঘুরতে হয়, একটু খাটতে হয়, অনেক কথা তখনকার মতো কাজে লাগে না, কিন্তু তা সমস্ত আনুষঙ্গিক বিষয়ে নতুন প্রশ্ন মনে জাগিয়ে দেয়। অথবা প্রশ্ন মনের তলায় জমে, নতুন কথার সঙ্গে মিশে দৃষ্টিক্ষেত্রকে প্রশস্ত করে, দৃষ্টিভঙ্গিকে করে স্থির ও সতর্ক, সবল। যা পেলাম তার চেয়ে অনেক বেশি আমি খুঁজলাম, অনেক পড়লাম, আর বিষয় ছাড়িয়ে দৃষ্টি গেল দূরে বিষয়ান্তরে, নানা দিকে, নানা সূত্রে নতুন কথা আমারও এসে গেল দৃষ্টিপথে। আবার স্বভাবদোষে উপস্থিত বিষয় ছাড়িয়ে দৃষ্টি ছাড়িয়ে গেল। তবু একেবারে বিষয়টা হারিয়ে ফেললাম না যে তাই ভাগ্য। একটা নিবন্ধ সত্যই দাঁড় করিয়েছিলাম। ভয় ছিল, সঙ্কোচও, সাহস করে শেষের দিকে অবধূত নাথপন্থা সহজযান তন্ত্রের সম্বন্ধে ও এসবের সম্ভাব্য ভাবমণ্ডল বিষয়ে আমার যে-ধারণা জন্মেছিল তারও কিছু আভাস দিয়েছিলেন। নিবন্ধটি তথ্য-ভিত্তিক, ওটুকু কিন্তু তাত্ত্বিক, অনুমানও (speculation) তাতে ছিল। সে ধারণা-টাকে field work ও তথ্য-প্রমাণের দ্বারা যাচাই করা হবে আমার ভবিষ্যতের কাজ, এই মনে ভাবছিলাম। ভয় ছিল সুনীতিবাবু বলবেন,—এসব কেন ? কিম্বা, এ ধারণা জন্মাল কিরূপে ? সুনীতিবাবু নিবন্ধটি খুঁটিয়ে দেখলেন, পছন্দ করলেন ; প্রয়োজনমতো দু-একটা কথা পাল্টালেন। পাটনায় ওরিয়েণ্টাল কংগ্রেসে নিবন্ধটা পড়া হয়, সে সম্মেলনের নিবন্ধ সংকলনে (Proceedings) ছাপা হয়েছে ; ইদানীং দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় পুনর্মুদ্রিত করেছেন তাঁর প্রকাশিত Indian Studies-এ। বোধহয় ডঃ সুশীল দে দেবীবাবুকে এ পুনর্মুদ্রিত করতে বলেছিলেন। আমি না জানলেও History of Bengal, Vol. I (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়) ডঃ দে তাঁর নিবন্ধের ফুট নোটে আমার নিবন্ধটির কথা বহুপূর্বে উল্লেখ করেন। আরও অনেকেও করেছেন বাঙলার বাইরেও। এখন হয়তো সে লেখা বিস্মৃত। নতুন গবেষণা ওদিকে হয়ে থাকবে। তাতে আমার লেখাটিও কাজে লেগেছে এবং নতুনের মধ্যে সেই পুরাতন মিলিয়ে গিয়েছে,—তার নিজের আর আয়ু নেই।

ও নিবন্ধ ছিল আমার সংস্কৃতি-ভাবনার প্রাথমিক ভাবনা। ঠিক মতো তা নির্মাণের পূর্বেই আমার গবেষণার পাট চুকে যায়। একালের কেউ এসে যদি দেবীপ্রসাদের এই পুনর্মুদ্রিত লেখা বা আমার নিছক উপভাষিক অপকর্ম হাতে নিয়ে আমার সঙ্গে কথা বলে তা হলে আমিও বলবার অধিকারী, 'তোমরা ভেবো না সব পেয়ে যাবে, সবই আমি করে রেখেছি তখন। আমার বাড়ি পুড়ে গেল, তাতেই প্রকাশের পূর্বে সে সব পুড়ে গেছে।' বলা বাহুল্য, এক্ষেত্রে এ 'বাড়ি-পোড়া' হচ্ছে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের দয়ায় বন্দিদশা। আসলে গভর্নমেণ্টও একটা উপলক্ষ, আমার তার পূর্বেই উপলক্ষ জুটে গেছল—'শনিবারের চিঠি' ও সাহিত্যের হুজুগ ও সাহিত্যের সাংবাদিকতা; লক্ষ্যও যাচ্ছিল বদলে। রাজনীতির নাগরদোলায় দোল খেতে খেতে প্রথম গিয়েছিলাম বাবার নির্দেশে (প্রায় আদেশে) ফেণী কলেজের অধ্যাপনায় (১৯২৯, জুলাই)। তারপর সুনীতি-বাবুর ও দাদার সঙ্গে ১৯২৯-এ বিজয়ার পরে গেছলাম দক্ষিণভারত (তামিল-দেশ) প্রদক্ষিণে—সে এক গভীর অর্থপূর্ণ অভিজ্ঞতা। কয়েকমাস পরে কলেজ থেকে দু বছরের ছুটি নিয়ে কলকাতায় যাই (১৯৩০-এর জুন) সুনীতিবাবুর রিসার্চ এ্যাসিস্টেণ্ট রূপে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। তাতে গবেষণাকর্মের সর্ব-ক্ষণের সুযোগ পেয়েছিলাম, কিন্তু তখন ১৯৩০ সাল। পলিটিকসের চাপাপড়া নেশা একেবারে দ্বিগুণ হয়ে আমাকে টেনে নিয়ে গেল আগুনের দিকে। ঘরটা পুড়ল। কারণ আগুনটা আমিও জড়ো করেছিলাম, ইংরেজ রাজা নিমিত্ত মাত্র, তখন মনে হয়েছিল বুদ্ধ প্রাণের আবর্জনা যাক না পুড়ে।

তবু এই গবেষণার ঘর-পোড়া ছাত্রের বলা দরকার, ওই গবেষণা-পর্বে তার যা অভিজ্ঞতা তা মোটেই জ্যেষ্ঠদের হাতে কনিষ্ঠদের অবজ্ঞা বা ঔদাসীন্য প্রাপ্তির আখ্যান নয়। বরং বিপরীত। তখনকার দিনে অগ্রগণ্য পণ্ডিতদের কিছু কিছু পরিচয় আমি তখন পেয়েছি,—প্রায়ই একটু দূর থেকে, কিন্তু সময়ে সময়ে কাছাকাছি এসেও। যেমন, সম্মেলনে সভায়, কিংবা সুনীতিবাবুর গৃহে তাঁর ছাত্র-সাথী হিসাবে। এঁর মধ্যে স্বয়ং সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কথা বলা নিষ্প্রয়োজন এবং অসম্ভব। কারণ, গবেষণার গুরু ছাড়াও তিনি আমার অনেক বিষয়ে শিক্ষার গুরু, অনেক জিজ্ঞাসার উদ্বোধক। তা ছাড়া, তিনি প্রায় আমার অগ্রজ সুহৃদ—দেশ-বিদেশে রাজদ্বারে শ্মশানে সস্নেহ সাহায্য দানে যিনি আমার বিশেষ আত্মীয়। নিজের ছাত্র ছাড়াও ভারতীয় সংস্কৃতির প্রায় সকল বিভাগের গবেষক ছাত্ররা তাঁর গৃহে, তাঁর নিকটে আসত—নিজ নিজ জিজ্ঞাসা নিয়ে। কখনো তাঁর মুখে 'না' নেই। কারও একটু বুদ্ধি বা নিষ্ঠা দেখলে তৎক্ষণাৎ বসে যান তাঁর লেখা নিয়ে। সকলের কাছেই তাঁর

গৃহদ্বার অবারিত, গবেষক ও ছাত্ররা সকলে তাঁর কাছে সমভাবে স্নেহ-সৌহার্দ্যে সম্বর্ধিত। প্রত্যেকে নিজের জিজ্ঞাস্য কথার সঙ্গে আরও যা মুখে মুখে শিখত তাতেই সে গৃহে আসত বারে বারে ;—আর জমে যেত তাঁর গল্পে-আড্ডায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা। আসলে 'গুরুগৃহের' অভিজ্ঞতা অজ্ঞাতসারে তাদের লাভ হ'ত তাঁর গৃহের সেই আলাপে আড্ডায় আলোচনায়। আর কোথাও আর কারুর কাছে ছাত্ররা ও গবেষকরা তা পায় নি,—এই সানন্দ সকৃতজ্ঞ উক্তি শুনেছি আমি অনেকের মুখে অনেকবার। সুনীতিবাবুর প্রধান আরেকটি গুণ—সহকর্মী ও সহযোগী অধ্যাপকদের কাজের গুণগ্রাহিতা,—যেমন অকুণ্ঠ ছিল ছাত্রদেরও কাজের প্রশংসা। সময়ে সময়ে হয়তো মিথ্যা হয়ে যেত তাঁর আশা—যেমন, আমার ক্ষেত্রেই ঘটেছে,—মাত্রাতিরিক্ত হয়ে যেত তাঁর প্রশংসা, যেমন বহুক্ষেত্রে দেখেছি। কিন্তু ওই 'তোমাদের করতে হবে না—সব আমার করা আছে'-জাতীয় ছাত্র বিতাড়ন অপেক্ষা অমন অল্পে-উৎসাহিত ছাত্র-পোষণও অনেক ভালো। ও-বয়সে ছাত্র ও গবেষকের মনে থাকে সঙ্কোচে-শঙ্কায় নিজের সম্বন্ধে সংশয়। গুরুর কাছে তাদের প্রয়োজন সহানুভূতি ও মানবীয় সহৃদয়তা। আর সুনীতিবাবুর মূল গুণ এই মানবীয়তা,—ছাত্র ও গবেষকদের প্রতি অকৃত্রিম সৌহার্দ্য। ছাত্র ও অধ্যাপকের যোগাযোগ যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল কথা হয় তা হলে সুনীতিবাবুর বাড়িতেই আমি ও আমরা প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ের রসাস্বাদ করি কথায় কথায় যা জেনেছি। বিদ্যার সততায়, অকৃপণ বিদ্যাদানে আগ্রহী ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরও দু-একজন অধ্যাপক। যেমন, প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের সুবিখ্যাত অধ্যাপক হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী ও ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী। সুনীতিবাবু তাঁদের এ গুণের কথা অনেক সময়ে বলতেন। ডঃ রায়চৌধুরীর সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয়ের সৌভাগ্য হয় নি, অনেক পরে (১৯৩৭-এর শেষে) ভারতবিদ্ ক্যামব্রিজের অধ্যাপক টমাস-এর বক্তৃতায় দেখেছি তাঁর বুদ্ধি-উজ্জ্বল প্রশ্ন ও আলোচনা, তা শুধু মনে আছে। সুনীতিবাবুর ছাত্র হিসাবে আমি ডঃ বাগচীর সাক্ষাৎ পরিচয় লাভ করেছিলাম—অমায়িক মানুষ, সহৃদয়, অধ্যয়ন-গবেষণায় স্থির ও অক্লান্ত। পাটনার ওরিয়েণ্টাল কনফারেন্সে সুনীতিবাবু ডঃ বাগচী প্রভৃতি গেছলেন একসঙ্গে, তাতে ডঃ বাগচীর সঙ্গে পরিচয় ব্যক্তিগত সম্পর্কের কাছে পৌঁছে, যেমন উটকামণ্ডে ডঃ নিরঞ্জন চক্রবর্তীর গৃহে সুনীতিবাবুর সহযাত্রী অতিথি হিসাবেও পেয়েছিলাম ব্যক্তিগত স্নেহ ও সমাদর। কিন্তু ওসবের উপলক্ষ গবেষণা নয়। ডঃ সুশীলকুমার দের সঙ্গে পরিচয়ও ঠিক গবেষণা-সূত্রে নয়—প্রধানত সাহিত্যের স্রোতের টানে 'শনিবারের চিঠি'র

বৈঠকে। ডঃ সুশীল দের কাছে গবেষণার প্রশ্ন নিয়ে গিয়েছি কম। কিন্তু তাতেও দেখেছি তাঁর আভিজাত্য ও শিষ্টতার সঙ্গে ছাত্র-ছাত্রীদের বিদ্যাদানে অকৃত্রিম ও অকৃপণ সদিচ্ছা। এ আভিজাত্য শুধু কুলের নয়, বিদ্যার সম্পদ। —গবেষণার দ্বারা ছাত্রদের নিরুৎসাহ করতেন না।

প্রতিদিন না হোক, সুনীতিবাবুর সঙ্গে সপ্তাহে ওসময় চার-পাঁচ দিন সাক্ষাৎ ঘটে যেত। গবেষণা-বিষয়ক প্রশ্ন অপেক্ষাও আমার নানা বিষয়ে কথা শুনবার আগ্রহ ছিল বেশি প্রবল। তিনি জানুন বা না জানুন সর্বমুখী গল্পে আলাপে তিনি সিদ্ধপুরুষ। আলাপের সজীবতা ও সরলতা যে কত বড় আকর্ষণ তা আমি বুঝি,—আমার বাবার বৈঠকখানায়ও তা দেখেছি,—কিন্তু সুনীতিবাবুকে না দেখলে তার পূর্ণ রূপ অজানা থাকত। তিনি রবীন্দ্রসঙ্গমে দ্বীপময় ভারত এ সময়ে ঘুরে এলেন, আর সে কী এক অভিজ্ঞতা। ফিরে এলে সর্বত্র তাঁর ডাক, সে অভিজ্ঞতার জন্য। আমরাও যাই, দু'কান ভরে তা শুনি—সভায় সমিতিতে, বাড়িতে বাক্যালাপে। এসব সূত্রে অবশ্য ভারতবিদ্যার নানা শাখায় নতুন-পুরনো ছাত্রদের সঙ্গে পরিচয় হয়, সে আমার বড় লাভ। তাঁরাও কেউ কেউ আজ সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক, দু-চারজন উদ্দিষ্ট গবেষণার কাজ শেষ করে যথারীতি কর্মজীবন (career) গুছিয়ে নিয়েছেন। কেউ কি হিট্‌কে বেরিয়ে গিয়েছেন?—গবেষণার কেন্দ্র থেকে বিদায় নিয়ে অন্যত্র গিয়ে বসেছেন? মনে অনেককেই পড়ে—এখন মনে করতে গেলে একসঙ্গে মনে অনেকের কথা মিলে মিশে যায়। ওরূপই মনে পড়ে, পরে ১৯৩৯-৪০-এ যাঁদের ওঁর গৃহে দেখেছি। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতিকে পরীক্ষক রূপে; কিম্বা পরীক্ষকের কাজের তত্ত্বাবধায়ক রূপে, সাহিত্য-জগতের বর্তমান কৃতী পুরুষ পরিমল গোস্বামী, মনোজ বসু, প্রমথনাথ বিশী প্রভৃতি শ্রদ্ধেয় পুরুষদের। কারণ ভাষা-পরিচ্ছেদ শেষ হয়ে গেলেও সুনীতিবাবুর সঙ্গে পরিচয়-পরিচ্ছেদ বেড়েই যায়। যৌবনের কেন, তা সারা জীবনের পুরস্কার।

পারগামী

তবে যাঁরা ছিলেন বিদ্যান্বেষী গবেষক সেই ১৯২৬।২৭ থেকে ১৯৩০-এর দিনেও তাঁদের মধ্যে নিজের গুণে বিশেষ স্মরণীয় অধ্যাপক **সুকুমার সেন**। বোধহয় সুনীতিবাবুর তিনিই শ্রেষ্ঠ কৃতী ছাত্র—প্রথম থেকেই তাঁর বিদ্যানুরাগ ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি অকৃত্রিম ব্যক্তিত্ব ও ব্যক্তিগত সৌহার্দ্য আমাকে আকৃষ্ট করেছিল। সে বিদ্যানুরাগ শুধু শব্দতত্ত্বানুরাগ নয়—একাগ্রতা সত্ত্বেও তা বহু বিস্তৃত। সাহিত্য তো নিশ্চয়ই, কিন্তু ডিটেক্‌টিভ্ গল্প ও ভূতের গল্পও

সুকুমারবাবুর পাঠ ও জিজ্ঞাসার এলাকায় পড়ে। সংস্কৃত প্রাকৃত কেন, প্রাচীন পারসিক আবেস্তা থেকে গ্রীক, লাতিন প্রভৃতি ভাষায় নিজের অধিকার তিনি তখন বিস্তার করছেন। কিন্তু সাহিত্যেও উৎসুক। সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় তাঁর প্রথম (?) একটি লেখা বেরিয়েছে 'বাঙলায় নারীর ভাষা'—আমি অবশ্য সুনীতিবাবুর কথামত সাহিত্য পরিষদের সভ্য পদ নিয়েছিলাম,—সুকুমারবাবু একখণ্ড 'অফ্‌-প্রিন্ট' আমাকে দিয়েছিলেন। পড়ে আমি মহাখুশি। শব্দতত্ত্বও যে মজার বিষয় আমার সে ধারণার যেন দৃষ্টান্ত ডঃ সেনের সে লেখাটি। সযত্নে তা রেখে দিয়েছিলাম। পরে কত বিষয়ে কতদিন আলাপ হয়—তিনি সেই রিসার্চ এ্যাসিস্টেণ্ট থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ও-বিভাগের অধ্যাপক হলে, বোধ হয় ১৯৩০-এ আমিই সেই গবেষকের শূন্য পদ লাভ করি। কিন্তু সে কথা নয়, তখন থেকেই তাঁর সঙ্কল্প বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস লিখবেন। পরে তা লিখেছেন—সবাই তা জানি। আর শুধু তা নয়, ইংরেজিতে ও বাঙলায় এত জিনিসে এত সুস্থির ও সুবিজ্ঞ গবেষণার ও চিন্তার লেখা ও গ্রন্থাদি বোধহয় ভারতবিদ্যার ক্ষেত্রে বেশি লোকের নেই—একমাত্র তাঁর শিক্ষাগুরু সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ছাড়া। সেদিকে তাঁর বিশেষত্ব এই—যত বিস্তৃত হোক তাঁর নানা বিদ্যায় কৌতূহল—কোথায় তাঁর স্বক্ষেত্র, কোন্ জায়গায় তাঁর স্বকেন্দ্র, কোথায় ক্ষেত্রসীমা, তিনি সে বিষয়ে অবহিত। ক্ষেত্র সুবিস্তৃত তবু সীমা একটা থাকবেই, এবং অনতিক্রম্য সে সীমা। সেই সুচিহ্নিত বিস্তৃত ক্ষেত্রে অধ্যাপক সুকুমার সেন এখনো একাগ্র ও 'অক্লান্ত' কর্মী। সভাসমিতি, সম্মেলন, বিদেশ ভ্রমণ, এসবে তাই তিনি উৎসাহী নন। একথাও সত্য, কি গবেষণার প্রশ্নে, কি তৎসম্পর্কিত ব্যবস্থাপনায়, তাঁর মত সর্বদাই সুদৃঢ়, হয়তো সময়ে সময়ে মনে হয় অনড়, অনমনীয়। অবসর গ্রহণের পর আজও তিনি নতুন নতুন গবেষণায় সর্বদা নিরত, আর পরিশ্রমে অক্লান্ত। এ কালের গবেষণেচ্ছু ছাত্রদের নাকি তিনি ভয়ের বস্তু। হওয়া স্বাভাবিক এবং হয়তো আবশ্যক। কারণ, আমার তো জানা আছে—তাঁর গবেষণার বিশেষ বিষয়ে বিদ্যার প্রস্তুতি প্রয়োজন। একালের ফাঁকি দিয়ে পাশ করা ছাত্রদের সে ক্ষেত্রে প্রবেশ-চেষ্টা তাঁর পক্ষে অসহ্য, তাঁর গবেষণা সময়ের ওপরে উপদ্রব। কিন্তু আমি এও দেখেছি, যথার্থ গবেষককে তিনি নিরাশ করেন না। সহায়-সম্বল ও সামাজিক-আর্থিক সুবিধা অনাবশ্যক, চাই বিদ্যার বনিয়াদ, চাই কর্ম-নিষ্ঠা। সুকুমারবাবু ছাত্রকে বাজিয়ে নেন, এবং একবার গ্রহণ করলে তাকে পথ প্রদর্শনে কিছুমাত্র কার্পণ্য করেন না। সুকুমার সেন

মহাশয়ের সঙ্গে দীর্ঘদিনে আমি ব্যক্তিগত সম্পর্কেও এসেছি—আমার দাদার সঙ্গেই তাঁর ঘনিষ্ঠতা অধিকতর। আমরা তাঁর মনের সুকুমার ও সুমার্জিত দিকটিরও অজস্র পরিচয় পেয়েছি,—বিদ্যার দিক, বুদ্ধির দিক, রুচির দিক, সকৌতুক রসানুভূতির দিক। ব্যক্তিগত প্রীতি-সৌহার্দ্যের দিক বাইরের অনেকের পক্ষে স্বভাবতই অগোচর, তাই আমার এ সৌভাগ্য আরও স্মরণীয়। গবেষণার সম্পর্কে যাওয়াতেই এই সৌভাগ্য অর্জন আমার পক্ষে সম্ভব হয়েছে; তা ভুলি কি করে ?

সুনীতিবাবুর দ্বিতীয় কৃতী ছাত্র বোধহয় ডঃ মনোমোহন ঘোষ। তিনিও সংস্কৃতেরই লোক; বাঙলায়ও তাঁর কাজ আছে। ইংরেজিতে ভারতের নাট্যশাস্ত্রের অনুবাদ-গ্রন্থ তাঁর পাণ্ডিত্যের প্রমাণ। আমার অবশ্য জেলে থেকে ফেরার পরেই তাঁর সঙ্গে পরিচয় বেশি হয়। সুনীতিবাবুর কাছেই প্রথম পরিচিত হয়েছিলাম বাঙলা ছন্দের বিশিষ্ট অন্তর্দর্শী অধ্যাপক অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়ের সহিত। তিনি ইংরেজির অধ্যাপক, তাঁর অধ্যাপক পুত্ররা আজ যতটা লেখক বলে পরিচিত তিনি ততটা নন। কিন্তু তাঁর বিদ্যা ও মনীষা বোধহয় আরও গভীরতর এবং তীক্ষ্ণতর; হয়তো বিনয় ও শিষ্টরুচিতে তা ঢাকা পড়ে যায়। কিন্তু গবেষণার মূল্য সেভাবে ঢাকা পড়ে না। আরও দু-একজন লোকের কথাও মনে হয়। বিশ্বভারতীর ডঃ প্রবোধ সেন ছন্দোবিদ্ বলে সুপরিচিত। শুনেছি, প্রথম জীবনে রাজনীতিতে পোড় খেয়েছিলেন। কিন্তু সত্যিকারের বিদ্বান্ ও সাহিত্যে রসিক। তাঁর বাঙলা ছন্দের আলোচনা সুপ্রসিদ্ধ, তা ছাড়াও তাঁর সাহিত্য-আলোচনা ও চিন্তা, পরিমাণে ও গুণে অনেক। তাঁর মৃদু কণ্ঠের বুদ্ধিমার্জিত রসিকতা (wit) তাঁর সাহচর্যকে আরও সরস করে রাখে।

কথা কি শেষ হয়? কত বিদ্বান্ ও কৃতী পুরুষের কথা মনে পড়ে। বরং এবার এই পালা শেষ করি। আমি গবেষণার ক্ষেত্রে ছিলাম অবান্তর; অথবা প্রক্ষিপ্ত, সাহিত্য থেকে ভাষায়। তবু বোধহয় তখনকার কিছু জের থেকে গিয়েছে। তাই পরে জেলে, ও জেলের বাইরেও সময়ে সময়ে এক-একবার 'তোট, তোট, তোটায়তে' আবার ফিরে যাই। Amateurish ঝোঁক ছাড়া তা বেশি কিছু নয়। আর amateurishness বা পল্লবগ্রাহিতা বিজ্ঞানে একেবারেই অচল, ভাষা-বিজ্ঞান নিশ্চয়ই সেরূপ বিজ্ঞান।

বৃত্তি-বার্তিক

পালাটা শেষ করতে করতে আর দু-একটা অভিজ্ঞতা বলে নিই। ১৯২৯-এ কলকাতায় গবেষণা-বৃত্তির চেষ্টা করলাম—পেয়েও গেলাম। এ

সম্পর্কে আমার ধারণা যা হয়, তা বলছি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন পোস্ট গ্র্যাজুয়েটের গবেষণা-বৃত্তি ছিল মাত্র ছয়টি—বোধহয় তিনটি আর্টসে, তিনটি বিজ্ঞানে। তার মাসিক পরিমাণ ৭৫ টাকা। কত বিভাগের কত ফার্স্ট ক্লাশ ছাত্র তার প্রার্থী, এ বৃত্তি পাওয়া তাই মহাভাগ্যের কথা। এত বড় বিশ্ববিদ্যালয়, তার কৃতী ছাত্রও সংখ্যায় কম নয়। ক'জন পাবে এই বৃত্তি ? আর অন্যেরা ? আমাদের সময়ে কলেজ স্বল্প, বিজ্ঞান পাঠন হয় স্বল্পতর কলেজে। কলাবিভাগেও অনেক বিষয় তখনও স্বীকৃত হয় নি—শিক্ষা-জগতে তখন কত সঙ্কীর্ণ সেই কৃতী ছাত্রদের কর্মসংস্থান। তার বাইরে—এখনকার সামরিক-অসামরিক সরকারী-বেসরকারী বিভাগেই বা কতটুকু স্থান ছিল ? আর বেসরকারী ইন্‌ডাস্ট্রি বা ব্যবসা-বাণিজ্য কোথায় তখন ? বৎসরে কয়টি ছাত্র পাবে ? কৃতী ছাত্রেরও তো এরূপ জীবিকার সুযোগ নেই ; বিদ্যার্জনে জীবনের চরিতার্থতা তবে কয়জনার হত ? আমার ভাই প্রথম এম. এ. ইকোনমিক্স সেকেণ্ড ক্লাশ, নিতান্ত দৈবক্রমে একাউটেণ্ট জেনারেল অপিসে ৭৬ টাকা মাইনের চাকরি পায়, (পরে বিভাগীয় পরীক্ষায় পাশ করে, ক্রমে উন্নতি করে)। তার মুখে শুনেছি—তার সে বৎসরের সহকর্মীদের মধ্যে ছিলেন একজন রসায়নের ফার্স্ট ক্লাশ এম. এস-সি, আমিও তাঁকে দেখেছি বুদ্ধিমান, সুদর্শন যুবক। উত্তরবঙ্গে (?) একটি কলেজে আই. এস-সি. ক্লাশ খোলায় সেখানে চাকরি পেয়ে চলে যান। বেঁচে থাকতে সেখানেই তাঁর ছাত্র পড়িয়ে জীবন কেটেছে। খুব মন্দ ভাগ্য নয়, কিন্তু গবেষণার ইচ্ছা থাকলেও সেখানে ল্যাবরেটরি পান নি। কেমিস্ট্রির ফার্স্ট ক্লাশ—১৯২৬-২৭-এ ঃ এই তো তার সার্থকতা ছিল এদেশে। কোথায় বেসরকারী কেমিক্যাল ইনডাস্ট্রিজ, কোথায় বা সরকারী সেরূপ শিল্প-উদ্যোগ। ব্রিটেনের ভারত শাসনকালে এই তো ছিল বিজ্ঞানের ছাত্রদেরও ভাগ্য। তা হলে কলাবিভাগের ছাত্রের আবার আর বেশি কী হবে ? সেদিনকার সে দৃশ্য ও ভাবনা মনে থেকে গেছল। সে বার যাঁরা বৃত্তি পেল না, তাঁদের মুখ ম্রিয়মাণ—গতিতে কোথায় একটা নৈরাশ্যের আভাস। আমি সে বৃত্তি পেয়েছিলাম, আর একজন সংস্কৃতিবিদ যিনি ওরূপ বৃত্তি পেয়েছিলেন, পরে তিনি পাণ্ডিত্যে খ্যাতিও অর্জন করেন। নিজের সৌভাগ্যে তাই সেদিন পুলকিত হয়েছিলাম। কিন্তু কাজের যখন দিন এল তখন আমার চোখ গেল অন্য দিকে। তখন গবেষণার কাজ সামান্যই করেছি। বরং জেলে গিয়ে নিজের বিবেককে বাঁচিয়েছিলাম। এ প্রসঙ্গে আমার এখন মনে পড়ছে স্বাধীনতা-উত্তরকালে লেনিনগ্রাদের আমাদের টেকনোলজি ও বিজ্ঞান ট্রেনীদের কথা (১৯৬৩/৬৪)। কৃতী ছাত্র তারা—কেউ প্রথম শ্রেণীর কেউ বা দ্বিতীয়

শ্রেণীর এম. এস-সি.। গবেষণা বৃত্তিও পেয়েছিল পাঠ শেষে। বৃত্তি এখন সংখ্যায় বেশি, আর তার পরিমাণ (তখন) ২৫০ টাকা করে মাসে। তবু সে বৃত্তি নেবার মত গবেষক নাকি কম। কথায় কথায় তারা জানালে—'ও বৃত্তি নেওয়া তো দু-চার মাসের জন্য,—অন্য একটা কিছু মিলে না যাওয়া পর্যন্ত। তখন ছেড়ে দেওয়া।' আমি বললাম—'কেন, গবেষণা করবে না ?' 'ফুঃ! ওই ২৫০ টাকা নিয়ে সময় নষ্ট করব নাকি—যখন যে-কোনখানে আমাকে ৫০০ টাকা নিয়ে ডাকাডাকি করছে ?'

কাল বদলেছে, আজ গবেষণার বৃত্তির সংখ্যা বেড়েছে। পরিমাণ ২৫০ টাকা হলেও বেশি নয়—এসব কথা তো ঠিক। তবু ভাবতে হয়—গবেষণায় কি আগ্রহ বেড়েছে ? বিজ্ঞানের গবেষণায় কী বাঙালি ছাত্রের মন আছে ?

স্রোত সঙ্গমে

অন্যরূপ অভিজ্ঞতাও অন্য দিকে হয়েছিল তখন। পাটনার ওরিয়েণ্টাল কনফারেন্সে গিয়েছিলাম ১৯৩০-'৩১। আমার সেই গোপীচন্দ্রের উপাখ্যান (গোপীচন্দ্র লিজেণ্ড) বিষয়ে লেখাটা পড়া হবে। কত পণ্ডিত, কত অধ্যাপক, কত বিদ্বজ্জনের সম্মেলন—ভারতবিদ্যার স্রোত-সঙ্গম। অধিকাংশ শাখাতেই কিন্তু দেখি নিবন্ধ পড়া প্রায়ই হয় না। অনেক নিবন্ধ শ্রোতা নেই। তাঁরা চলে গিয়েছেন দৃশ্য-পরিক্রমায় (রাজগীর, নালন্দায়), বা কোথাও বন্ধুগৃহে আলাপ-আপ্যায়নে। আমার নিবন্ধ শোনার জন্য সুনীতিবাবু, দাদা ও তাঁর বন্ধুরা কিছু বাঙালিদের একত্র করেছিলেন। ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় হন সভাপতি। পড়ার পরে সত্যই আলোচনাও হ'ল। সে আলোচনার প্রধান ছিলেন ক্ষিতি-মোহন সেন মহাশয় নিজে। গোপীচন্দ্র এবং ওরূপ সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীদের নানা কথা তিনি নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলেন। অভিনব সে সব তথ্য। আমার গুরুস্থানীয় উৎসাহদাতা পাটনার ব্যারিস্টার শচীপ্রসাদ বসু অধিবেশনের শেষে আমাকে নিজের অভিজ্ঞতা জানালেন—এই সন্ন্যাসী, উদাসী, ফকির জাতীয় মিস্টিকদের পরস্পরের যোগাযোগ, ভারতবর্ষ থেকে পশ্চিম এশিয়া, কায়রো পর্যন্ত বিস্তৃত, এখনো তা অব্যাহত। অদ্ভুত কথা। এ অধ্যায় আমার কল্পনাতেও আসে নি। কাজ যদি এদিকে করতে হয় তা হলে তো ভারত ছাড়িয়েও আমাকে যেতে হবে দূরে-দূরান্তরে—শুধু কি গবেষণার জন্য ? মিস্টিক সাধন, যোগাযোগ ও ইতিবৃত্তের সন্ধানে কি আমার সেরূপ যোগ্যতা ছিল ?

একটা কথায় আবার একটু সম্বিৎ ফিরে এল। এ সম্মেলনেই প্রথম দেখি ডঃ মঃ শহীদুল্লাহ সাহেবকে। আবাল্য শোনা নাম—কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে

বেদ পড়তে পান নি এম.-এ.তে, পণ্ডিত লক্ষ্মণ শাস্ত্রী অস্বীকার করেছিলেন। ছোটখাটো মানুষটি, সহজ, সহৃদয়, কথাবার্তায় sincere. কি কথা প্রসঙ্গে তিনি তুর্কদেশে তাঁর কী অভিজ্ঞতা হয়েছে বলেছিলেন। কিছুদিন পূর্বে সে-দেশে তিনি গিয়েছিলেন। তুর্ক মুসলমান কামালী-প্রেরণায় জীবন গড়তে চাইছে। সুনীতিবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, তা হলে ইসলাম সম্বন্ধে তাদের মনোভাব কী? যবদ্বীপে সুনীতিবাবু ইসলাম-এর এক অদ্ভুত সহনশীল মেজাজ দেখে এসেছিলেন। শহীদুল্লাহ্ সাহেব বুঝলেন, বললেন, তুর্কদের মনোভাব—ইসলাম আছে, থাকবে। তা নিয়ে মাথা ঘামাবার কী?

তখন (১৯৩০-এর শেষ।) স্বাধীনতার জন্য ভারতবর্ষ উদ্বেল। ওদিকে হিন্দু-মুসলমানের বিভেদও প্রায় বিরোধে গিয়ে পৌঁছচ্ছে। ধর্মের বিভিন্নতাতেই তো দু'সম্প্রদায়ের বিভিন্নতা। সুনীতিবাবু অল্প হেসে বললেন, 'ব্রাদার! হাউ ডু ইউ এক্স্‌প্লেন্ ইট্? —আপনার কি মনে হয় ভারতবর্ষে আমাদের মুসলমানরাও ওরূপ ভাববে?' ডঃ শহীদুল্লাহ্, নিজে ধর্মপ্রাণ মুসলমান, সকলেই তা জানে; কিন্তু সাম্প্রদায়িকতা তাঁর কোথাও নেই। তিনি হেসে বললেন, 'না। ও আমাদের ইণ্ডিয়ান্ মাইণ্ড্।' 'ইণ্ডিয়ান্' বলে নিজের বুকের দিকে দেখালেন। তারপর জানালেন সহজভাবে 'অন্য দেশের মুসলমান' তাদের ধর্ম নিয়ে অত ব্যস্ত নয়, ভারতবর্ষের মানুষের কিন্তু ধর্মই সব'।

সত্যই, ভারতবাসী ধর্ম নিয়ে ব্যস্ত, সকলেই তা মানেন, তাতে একটু গৌরব বোধ করেন। আলাপ অন্য দিকে চলে গেছল—ওঁরাও অন্যদিকে চলে গেলেন। সদস্যরা সম্মেলন উপলক্ষে পরস্পরে আলাপে-পরিচয়ে আগ্রহী। এক-আধজন 'বাণিজ্যও' করেন। অপরিচিতদের সঙ্গে আলাপে আমার দুর্জয় সঙ্কোচ। পণ্ডিতদের কাছে আবার সেই সঙ্গে আছে ভীতি। একা পড়লাম—দেখতে লাগলাম বিদগ্ধমণ্ডলীর সেই মেলামেশা। নীরব দ্রষ্টা। নির্জন না হলেও একান্তে নিজের সঙ্গেই কথা-জিজ্ঞাসা, internal monologue-নোয়াখালীতে তো-হিন্দু-মুসলমানদের ধর্মগত উগ্রতা ও অসহিষ্ণুতা দেখেছি। মন জিজ্ঞাসা করলে, 'ইণ্ডিয়ান মাইণ্ড' ধর্ম নিয়ে অত ব্যস্ত না হলে কী ক্ষতি হ'ত ইণ্ডিয়ার? হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়ই তো ইণ্ডিয়ান, ইণ্ডিয়ান মাইণ্ডের অংশীদার। ধর্মের প্রভেদে দুয়ের প্রভেদ। আর সেই বিভেদে বিদ্বেষ-বিরোধ—ধর্মের জন্য 'ব্যস্ততার' এই তো ফল। ইণ্ডিয়ান মাইণ্ডের বৈশিষ্ট্য কি এই ধর্ম? নিজেকেই জিজ্ঞাসা করি।—আচ্ছা, ইণ্ডিয়ান মাইণ্ড কী বস্তু? 'যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহংতেন কুর্যাম্'। এই কি সেই ইণ্ডিয়ান মাইণ্ডের নিগূঢ় কথা? এই সম্মেলন দেখে কী মনে হয়—এই যে ইণ্ডিয়ান

বিদ্বানরা, পণ্ডিতরা, ইণ্ডিয়ান মাইণ্ডের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধিরা, এ'রা—এ'রা কে'তাই খুঁজছেন—সেই অমৃত ?

ভাগ্যিস্, পুরুষার্থই মানুষের বেশি কাম্য—সকল দেশে সকল কালেই, ইণ্ডিয়ান মাইণ্ডেরও ওয়েস্টার্ন মাইণ্ডেরও। বরং ওয়েস্টার্ণ মাইণ্ড-এর আর্থিক বনিয়াদটা দৃঢ়, তাই তাদের পুরুষার্থও প্রবল—এমন কি, বিদ্যানুরাগও সুস্থ এবং সবল, বৈজ্ঞানিক নিরাসক্তি বেশি, হ্যাংলামিও কম। আর দেখছি তো চারদিকে আমাদের পণ্ডিতদের অনেকের কাণ্ড, নামের কাঙালপনা, যশের কাঙালপনা, পদপ্রতিষ্ঠার কাঙালপনা, টাকাকড়ির কাঙালপনা। আমাদের পণ্ডিতদের অবস্থা—'অল্প লইয়া থাকি তাই যা হারাই তা হারাই।' হাসির ব্যাপারও বটে দুঃখের ব্যাপারও বটে। আবার নিজেকে জানাই—একটু গৌরবেরও কিন্তু। ব্রাউনিঙের 'গ্রামেরিয়ান্‌স্ ফিয়্যুনারল্' তো তোমার এককালে আদৃত কবিতা। এ'দের মধ্যেও তেমন বৈয়াকরণ এক-আধজন থাকতে পারেন না কি ? পাণিনির দেশ। শুধু পাণিনিরই বা কেন ? গৌতম বুদ্ধের, কৌটিল্যের, কপিলের, শঙ্করের—আবার বাৎস্যায়নের। তাও যাক—ভাবো তো অজণ্টা, এলোড়া, ওড়িষ্যা ও দক্ষিণের মন্দিরের কথা—কিম্বা বহির্ভারতের ভারতীয় কীর্তির কথা—Positive Sciences of the Hindus ও ছিল, ইণ্ডিয়ান্ মাইণ্ড সেরূপ ইণ্ডিয়ান জীবন-রচনাও করেছে। উত্তর নিজেই দিই—এবং হাজার বছর ধরে প্রধানতঃ করেছে Negation of life, মনুপরাশরের ধারা বেয়ে একাদশী তত্ত্ব, প্রায়শ্চিত্ত বিধান—আলাবু-ভক্ষণের বিধি নিষেধ ; গোবর ন্যাতা, শিরোমণি মশায় ও পাদি পিসির রাজত্ব ! 'সত্য সেলুকাস, কী বিচিত্র এই দেশ।' তারও উত্তর জানি ঃ—পরিহাস নয়। সত্যই তা-ই বিচিত্র এ দেশ। হয়তো সব দেশই বিচিত্র, তবু অত বিচিত্র সব দেশও নয়। কোনো একটা 'বাদে' ভারতবর্ষকে বাঁধা যায় না—ইণ্ডিয়ান লাইফকেও না ইণ্ডিয়ান্ মাইণ্ডকেও না ;—তবু সবশুদ্ধ আবার তা 'ইণ্ডিয়ান্'। কী ভাবে ? ভূগোল-ইতিহাসে মিলিয়ে। এই আকাশের তলে এই মাটির পৃথিবীর এই বিচিত্র কোণে, এই 'ফ্লোরা এণ্ড ফনা'র সঙ্গে যোগাযোগে, নানা জাতির ঘাত-প্রতিঘাতে এখানকার মানুষ খেয়েছে, পরেছে, বেঁচেছে,—স্বপ্নও দেখেছে। প্রাণ-যাত্রা জীবন-যাত্রা নির্বাহ করেছে—যেমন সকল মানুষ সর্বত্র করে, এখানকার মানুষও এখানকার মত করে [illegible] একবার খেই হারিয়েছে, কিন্তু নিজেকে একেবারে বদলাতে বদলাতে এক [illegible]য়েও ফেলে নি—এই মাত্র বলতে পারি। নতুন করে পাই বলে হারাই ক্ষণে [illegible]রতাম, বো[illegible] ভারতবর্ষের মানুষের অভিব্যক্তি বিংশ তবে শতকেই বা থামবে কেন ? [illegible]লাইফ' [illegible]।

তার নতুনতর অভিব্যক্তিতে বাধা কি ? সেই নতুন করে পাওয়ার জন্যই কি এই মহাসমুদ্রের উপকূলে দেখছি তার পণ্ডিতকুলের সমাবেশ ?

আমি তো কূলের মানুষ। 'ভব নই গহন গম্ভীর বেগেঁ বহী,' সাঁকো গড়ে দিয়েছেন গুরু—কিন্তু তাতে পা দিই না। গবেষণার জগৎ আমার সামনে দিয়ে বয়ে চলে যায়। তার ছোঁয়া আমার মনে লাগে, আবার লাগেও না।

কলকাতায় অন্ততঃ বৎসর দুই ১১টা থেকে ৭টা আমার কেটেছে তখনকার ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে তার রিডিং রুম-এ। একটু গদ্য করেই বলি—লাইব্রেরিতে মনটা বেশ বসে গেছল। তখনকার ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি ছিল এসপ্লানেডে—এক কালে লর্ড কিচ্‌নারের অফিস তা। এগারোটায় গিয়ে বসতাম। সন্ধ্যায় তা বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত কতদিন কেটেছে তার রিডিং রুম-এ। খোলা তাক থেকে তখন রিসার্চের দামী বইও হাতের কাছে পাওয়া যেত। নামিয়ে নিয়ে পড়ে আবার তুলে রাখা নিয়ম। শুধু ভাষাতত্ত্ব নয়, একটা বিদ্যা থেকে অন্যটায় দৃষ্টি যেত—সকল বিদ্যার সঙ্গে সকল বিদ্যার যোগাযোগ অনুভব করতে হয়। যত কিছু গবেষণা-মূলক জিনিস, সব জিনিসেই লোভ যেত। নিজের খুশিতে পড়েছি—বাধা নেই। উত্তর প্রান্তে রিডিং রুমের তখনকার অধ্যক্ষ সুরেনকুমার একটু উঁচু প্লাটফর্মে বসেছেন। প্রিয়দর্শন মানুষ নয়—বেশ কালো, নাক-মুখেও বিশেষ শ্রী নেই। কিন্তু স্বভাবটি কোমল, কেউ কথাবার্তা বললে, কানে গেলে শব্দ করতেন 'হি—স্‌-স্‌-স্‌', নিয়মভঙ্গ হচ্ছে। কিন্তু তা কদাচিৎ। একমনে তিনি নিজে বই-এর পর বই পড়ছেন। কেউ জানতে চাইলে তাকে সাহায্য করছেন। স্কলারলি ব্যক্তিত্ব। সাহস হ'ত না কথা বলি। একবার শুধু একটি বই পাবার জন্য তাঁর কাছে যাই। ডাঃ শহীদুল্লাহ্‌র 'লা সাঙ্‌' মিস্টিক্‌ দ্য-কন্‌হ। লাইব্রেরিতে নতুন এসেছে—নম্বর পড়ে নি। কর্মীরা বললেন—কুমার সাহেব না বললে দেওয়া যাবে না। দুরন্ত কৌতূহলে, ভয়ে-ভয়ে তাঁর সামনে গেলাম, বললাম, দেখতে চাই—বইখানার নাম বললাম—

ও বই কোথায় ? নেই তো।

এসেছে নতুন বই-এর আলমারিতে, নম্বর পড়ে নি।

বটে। আমি তো জানি না।

তখনি ডাকলেন একজন কর্মীকে, বললেন ও বই এসেছে। আমি কর্মী নতুন বই-এর আলমারিতে আছে। বই-এর জন্য অপেক্ষা করছিলাম। কুমার মশায়ের চোখে কৌতূহল নেই জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি ফরাসী জানেন ?

ঠিক জানি না, তবে বুঝতে পারব বোধহয় একটু অভিধান দেখলে। বলতে পারলাম না ডঃ শহীদুল্লাহ'র বিশেষ মতটি জানতাম—ও-ডি-বি-এলেই তা পেয়েছি। তাঁর মতে চর্যাপদ ৭ম/৮ম শতাব্দীর রচনা, সুনীতিবাবুদের মতে ১০ম/১১দশ। তাই ফরাসীতে হলেও বক্তব্য আঁচ করা অসাধ্য হবে না। বই এল। কুমার মশায় খুশি হলেন। আমার দিকে প্রসন্ন চিত্তে তাকিয়ে বললেন, আজই চাই, না কাল পেলে চলবে?

আমি জানালাম, তা চলবে।

বেশ, কাল পাবেন। আমি দেখে নিই, তালিকায়ও উঠুক।

পরদিন পড়তে বসতেই দেখলাম—বই এসে গেল। লাইব্রেরির অন্য দু-চারজন কর্মীর সঙ্গেও আলাপ হ'ত। প্রায়ই বয়স্ক লোক। ও বাড়িতেই কর্মচারীদের জন্য একটা চায়ের দোকান ছিল। রুটিও তাতে পাওয়া যেত না। চা কদর্য। কর্মী কেরানিদের সঙ্গে দিনে বার দুই তাতে পিপাসা মেটাতে যেতাম। আলাপ হত কর্মচারীদের সঙ্গে দু-পাঁচ মিনিট। এ ছাড়া আর দেখতাম কিছু বই-পাগল মানুষ প্রতিদিনই যাঁরা পড়তে আসতেন। বছর দশ পরে জেল থেকে ফিরেও তাদের দু'জনাকে অন্ততঃ দেখেছি (লাইব্রেরি তখন সেন্ট্রাল এভিন্যুর আস্তানায়) তেমনি পড়ছেন। কে তাঁরা ও কী পড়ছেন জানতাম না। এখনো জানি না। সম্মান করতাম, অন্তত একজনকে একটু ক্ষ্যাপাও মনে হত।

এই লাইব্রেরির দিনগুলি দিয়েছে কত জিনিস। পারাবারের কত ঢেউ লাগত মনে তখন। পূর্বে বলেছি, সেদিকে কতবড় উৎস ছিল সুনীতিবাবুর বাড়ি।

লোক-শব্দ ও লোক-জীবন

এই ভাষাতত্ত্বের যাত্রায় আমার পথ ফুরিয়ে এল। বলা ঠিক—পথ না ফুরিয়ে এগিয়ে নিয়ে গেল আমাকে নানা দিকে। লোক-শব্দ, লোক-কাহিনী আমাকে নিয়ে চলত লোকজীবনের দিকে, শেষে সমাজতন্ত্রে। দু-এক সময় কথাটা বলেছি, আবার এখানে বলি—যিনি জেনে না-জেনে আমাকে এই কমিউনিজমের পথে এগিয়ে দিয়েছেন তিনি শুধু কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ও স্বামী বিবেকানন্দ নন্। আমার গবেষণার গুরু সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ও। সমাজতন্ত্রে যাঁর বিশেষ কোনো আকর্ষণ নেই—ছিলও না। তাঁর কথামত, আমি তখন লোক-শব্দ সংগ্রহ করতাম, বোধহয় ঔপজাতিক ভাষা-ভাবনার সঙ্গে; গ্রিয়ার্সনের 'বেহার পেজাণ্ট লাইফ' আদর্শ। মডেল ঠিকমত অনুসরণ না করে আমি বিক্রমপুর ও নোয়া-

খালির উপভাষার নানা ধরনের শব্দ সাজাচ্ছিলাম। আচার-আচরণ বিষয়ক শব্দ থেকে চলে গেছলাম—ভাব-ভাবনা, কল্পনামূলক শব্দে। সুনীতিবাবু তালিকা দেখছিলেন। বললেন—উঁ হুঁ। এ ধারা এখন নয়। প্রথম প্রয়োজন সাধারণ মানুষের জীবন-যাত্রার শব্দ। কী খায়-পরে তারা? সাধারণ খাদ্য, পানীয়, বস্ত্র, ঘর-দুয়ার ইত্যাদি। প্রাণ ধারণের জন্য যা প্রথম চাই তাই বুনিয়াদী (basic) শব্দ, হয়তো ভাষার প্রাচীনতম শব্দ, ওসব বস্তুমূল শব্দই ভাষারও basic material আইডিয়েশনাল কথা গৌণ, তা সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে আসে পরে। সহজ কথা, সুস্থ কথা। কিন্তু আচার্যের এই কথা ধ্রুব করে তুল্‌ল আমার কাছে সেই সত্য—জীবনের প্রাথমিক প্রয়োজন জীবিকা। জীবিকার সঙ্গে জীবন-সংগ্রাম। পরিশীলিত মানুষের ভাব ও ভাবনার কথাগুলি দেখা দেয় সভ্যতা এগুতে থাকলে। ভাবলাম—তা হলে শব্দ ব্রহ্মেরও মূলরূপ অন্নব্রহ্ম। গুরু জানতেনও না—শব্দাভিযান তাঁর ছাত্রকে নিয়ে গেল হিস্টোরিক্যাল মেটি-রিয়ালিজম-এর দিকে। ইন্দ্রকে নিপাত করার জন্য দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য বৃত্রাসুরকে মন্ত্র পড়াচ্ছিলেন—'ইন্দ্রশত্রু নিপাত'। ইন্দ্রনামীয় শত্রুর নিপাত হোক। সে বাক্যে ভুল ঝোঁক (accent) দেওয়ায় বৃত্তের উচ্চারিত কথার অর্থ দাঁড়াল—ইন্দ্রের শত্রুর নিপাত হোক্—বৃত্রেরই নিধন হ'ল। অথবা সজনীর একটি ব্যঙ্গ শ্লোক একটু বদলে বলা চলে—'তোমরা দেখেছ জগন্নাথ, আমি দেখছি নিম্ব'। কোথায় গেল শব্দব্রহ্ম—পেলাম অশ্বডিম্ব। শব্দতন্ত্রের ভেলায় ভাসতে গিয়ে লোক-শব্দ ছাড়িয়ে দেখা দিল লোক-জীবন—পড়ে গেলাম আবার পলিটিক্সের ঘূর্ণাবর্তে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

সাহিত্য সৈকতে

শান্তিনিকেতন থেকে এক ভদ্রলোক কলকাতা ফিরছিলেন। হাতে সেই মাসের 'প্রবাসী'। গাড়িতে একটি যুবক উঠেছিল। সামান্য কিছু সময় উসখুস্ করে সে যুবকটি আর পারল না, ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করতেই হবে।

মাপ কববেন, আপনি কি কলকাতা যাবেন?

হ্যাঁ।

সেখানেই থাকেন ?

ইত্যাদি। একটু পরেই যুবকটি ভদ্রলোককে বললে, কলকাতা তো আপনাব চেনা—আমার বেশি ধারণা নেই, বলতে পারেন, এ জায়গাটা কোথায়? —একখানা নাতিপুষ্ট মাসিকপত্র হাতে দিয়ে যুবকটি জিজ্ঞাসা করল, পত্রিকাটি দেখিয়ে।

ভদ্রলোক কাগজটি উল্টে নামটা দেখলেন, 'কল্লোল'। তারপর বললেন, ও তো জানি না। তবে—কি মনে পড়ল—বললেন, তুমি কি পড়াশুনো কর?

আমি এখন লিখি।...বেশ সগর্বে যুবক বলল।

ভদ্রলোক সামান্য একটু হেসে বললেন—ওঃ। বেশ! ও কাগজের ঠিকানা তো আমি জানি না, তবে এ কাগজটার ঠিকানা দিতে পারি—'প্রবাসী'খানা ভদ্রলোক যুবকের দিকে এগিয়ে দিলেন। সে সসম্ভ্রমে দেখল—ভারি, মোটা কাগজ। ভদ্রলোক বললেন, ঠিকানাটা টুকে নাও—আমি বলে দিচ্ছি কী করে যাবে আপার সার্কুলার রোড-এর অপিসে।

যুবক ঠিকানাটা টুকে নিলে, জেনে নিলে কি করে সেখানে যেতে হবে।

'কল্লোল' আপিসের উদ্দেশে রওনা হয়ে বীরভূম-রাইপুরের সজনীকান্ত দাস এভাবেই পৌঁছে গেল 'প্রবাসী' আপিসে।

গল্পটা শুনেছিলাম কবি বিষ্ণু দে র মুখে। বোধ হয় তাঁরই উদ্ভাবনা, এমন মার্জিত কৌতুক তাঁর পক্ষেই সহজ। গর-ঠিকানা 'কল্লোলী' হচ্ছেন 'শনিবারের চিঠি'র বিখ্যাত সম্পাদক শ্রীসজনীকান্ত দাস। কথাটা একেবারে উড়িয়ে দেবার মতো নয়—আমিও মানি। মনে মনে জানি—বিংশ শতকের বিংশতির দশকে প্রথম যুদ্ধোত্তর ইউরোপীয় সাহিত্য আমাদের বয়সের সকলেরই মনে চমক লাগায়। সজনীর কেন, আমারও। লিখতে জানলে, এবং

পারলে, সে চমকটুকু লেখায় ফোটানো বয়ঃসন্ধির পক্ষে, অর্থাৎ 'তরুণদের' পক্ষে স্বাভাবিক একটা উচ্চাশা। 'কল্লোলে' দাগা বুলোতে বুলোতে সে-স্তরে উপনীত হয়েও তখনকার তরুণরা সে ঘাটে ঠিক উপনীত হতে পারেন নি। আধুনিকতার মহাগুরু স্বয়ং সকৌতুকে 'মহুয়া'র পর 'পুনশ্চ' থেকে সেই 'রবীন্দ্রোত্তর' স্তরের 'শেষের কবিতা' পেরিয়ে বাংলা সাহিত্যকে পৌঁছে দেন মহৎ পরিণতির দিকে। অবশ্য 'অতি আধুনিক'-রাও ততোদিনে তাঁদের 'রবীন্দ্রধুত্তর' ক্ষোভ কাটিয়ে আর এক গ্রামে নিজ নিজ শক্তি মতো কৃতিত্বের কোঠায় গিয়ে পৌঁছেছেন। সেই 'সাহিত্যের হট্টগোল' কবেই নিস্তব্ধ।

কলকাতায় যখন এলাম তখন হট্টগোল না হোক সোরগোল বাধছে। 'শনিবারের চিঠি'র সোরগোল। সজনী 'শনিবারের চিঠি'র নামতঃ বোধ হয় সহকারী, কার্যতঃ প্রায় প্রধান কর্মাধ্যক্ষ। অমন দু'হাতে ঘুঁষি চালাবার সাধ্য আর কারও নেই, অতুলনীয় ক্ষিপ্রতা-স-ছন্দ পদ্যে আর স্বচ্ছন্দ গদ্যে। কাজেই সম্পাদক যোগানন্দ দাস ও মালিক উদ্যোক্তা অশোক চাটুজ্জের পক্ষে সে একাধারে ভীমার্জুন। মোহিতবাবুর সঙ্গে তৎপূর্বে নিজের আগ্রহে সজনী পরিচয় করে নিয়েছিল। 'প্রবাসী'তেও সে নিজের জোরেই প্রুফ রিডার থেকে হয়েছে সম্পাদকীয় কর্মী। সে পরিচয় করে দিতে জানে, আপনার করে নিতে ও আপনার হয়ে পড়তে পারে। তখনি 'প্রবাসী'র ও 'বিশ্বভারতী'র পরিচালকগোষ্ঠীর অনেকেরই সে স্নেহাদৃত। তা ছাড়া, মোহিত মজুমদার, সুনীতি চট্টোপাধ্যায়, কালিদাস নাগ ও অনেক অধ্যাপক, মানী গুণী সাহিত্যিক, লেখকের সঙ্গে তার পরিচয়। আমি এলাম কলকাতায়—ওসব সমাজের অজ্ঞাতকুলশীল। দু'-একটা গল্প-প্রবন্ধ 'ভারতবর্ষে' 'প্রবাসী'তে আগে বেরিয়েছে—কে তা পড়েছে? এক-আধটি লেখা 'সবুজপত্রে'ও বেরিয়েছে; সে পত্র কার চোখে পড়ে? সজনীরও আগে বোধ হয় আমার লেখা ছাপার অক্ষরে বেরোয়—কলেজ-জীবনে আমাদের সাহিত্য-চর্চায় আমরা সহযোগী। এক সময়ে আমি চুপ করে গেছলাম—না লিখে কি থাকতে পারি না? নোয়াখালিতে বসে সজনীর তাগিদেই তবু বাংলা লেখা ছাড়ি নি, ইংরেজি লেখাও লিখেছি। আমার সান্নিধ্য এ সময়ে (১৯২৫-২৬) সজনীর না হলেও চলত—সে সাহিত্যের পথে উঠবার মুখে। তার সান্নিধ্য বরং আমার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু দেখলাম, তারও প্রয়োজন।

মাঝখানে দেড়-দুই বছরের কথা; যা আমি কিছুটা জানি—কিছুটা খবরও রাখি নি,—তা বোধ হয় না জানালে আমিও ঠিক খেই পেতাম না। তা এখানেও না জানালে চলে না।

দেখে গেছলাম—বছর দুই (১৯২৩?) আগে 'শনিবারের চিঠি'র প্রথম

আবির্ভাব—একখানা চটি সাপ্তাহিক। আমার ছাত্রলীলা তখনও একেবারে সমাধা হয় নি। 'চিঠি' বেনামা ব্যঙ্গ-রচনার সাপ্তাহিক। কেম্ব্রিজ-প্রত্যাগত অশোক চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে তার প্রথম পরিকল্পনায় যুক্ত ছিলেন যোগানন্দ দাস, হেমন্ত চট্টোপাধ্যায় ও অমনি দু'-চারজন বন্ধু। 'প্রবাসী' গোষ্ঠীরই যুবক। 'আমাদের কোনো উদ্দেশ্য নেই'—এই ছিল তাঁদের ঘোষণা। অবশ্য এও বলেছিলেন—'উদ্দেশ্য আপনা থেকেই ফুটবে, অথবা ফুটবে না।' বেনামা ব্যঙ্গ-রচনায় দু' একটা উদ্দেশ্য তবু ক্রমেই দেখা দিয়েছিল—শুধু মজা করার উদ্দেশ্যেই রচিত নয়—স্বরাজ্য পার্টি ও চিত্তরঞ্জন দাশ তাঁদের ব্যঙ্গের আসল টার্গেট। 'গাজী আব্বাস বিটকেল'-এর নাম থেকে বোঝা যায় কাজী নজরুল (পলিটিক্সের বিকল্পে) সাহিত্যের টার্গেট। পলিটিক্সের টার্গেট স্বরাজ্য পার্টি। অশোকবাবু যতই পলিটিক্সে কার্যতঃ নিষ্ক্রিয় হোন, পলিটিক্সের ব্যাপারে তিনি নির্বিকার নন, নিরপেক্ষও নন। চিত্তরঞ্জন দাশের প্রতি বিরাগ তাঁর একার নয়—সম্ভবতঃ নতন নয়। ব্রাহ্ম সমাজের মধ্যে বছর দশ ধরেই তা জমে ছিল, চিত্তরঞ্জন হিন্দু মতে কন্যা অপর্ণা দেবীর বিবাহ দেওয়ার সময় থেকে। তাছাড়া, রবীন্দ্রনাথের বিষয়ে চিত্তরঞ্জনের বিরূপ আলোচনা ('বাংলার কথা'য়) ও চিত্তরঞ্জনের 'নিওবৈষ্ণবিজম' এবং 'নারায়ণ' পরিচালনা 'প্রবাসী'কেও বিরক্ত করেছিল। সেই চিত্তরঞ্জন ১৯২১-২২-এ হঠাৎ সব ছেড়ে গান্ধীজীর সঙ্গে নেমে পড়ায় তা দূর হয় নি—'প্রবাসী'র কুঞ্চিত ভ্রূ তাতে মসৃণ হ'ল না। চিত্তরঞ্জনের পলিটিক্যাল কাজকর্মে ও স্বরাজ্য পার্টি গঠনে—গোঁড়া-কংগ্রেসী 'আনন্দবাজারে'র দল তাঁর বিরুদ্ধে 'জেহাদ' চালাচ্ছিলেন। 'প্রবাসী গোষ্ঠী'র যুবকেরাও তাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে তাই চিত্তরঞ্জন ও তাঁর পলিটিক্সকে চাবুক মারবার সে সুযোগ ছাড়লেন না। শুধু প্রথম দিকে কেন, বরাবরই 'শনিবারের চিঠি 'স্বরাজীদের' হেয় করতে চেয়েছে। কেবল ১৯২৫-এর অর্ডিন্যান্সে স্বরাজীদের অনেকে কারারুদ্ধ হওয়ায়, আর একটু পরেই চিত্তরঞ্জনের মৃত্যু ঘটায়, সেই বিদ্রূপ-বাসনা বন্ধ রাখতে হয়। সেই সময়টাতেই 'শনিবারের চিঠি'তে পলিটিক্সের স্থান সাহিত্য অধিকার করে। প্রথমে নজরুলকে নিয়ে সামান্য কয়দিন,—তারপরে 'কল্লোল-কালিকলম-প্রগতি' হয় হট্টগোলের উৎস ; জোর চলে সে সোরগোল যতদিন আবার কারা-প্রত্যাগত সুভাষচন্দ্রকে না পাওয়া গেল। 'শনিবারের চিঠি'র এই পলিটিক্স নিগেটিভ—শুধু মজা করা নয়, একটু উদ্দেশ্য যুক্ত। আমার তাতে সায় থাকবে কেন ? তবে আমারও তখন পলিটিক্সে এসেছিল সাম্প্রদায়িকতার আঁধিতে হতাশা ও অবসাদ। ভাষাতত্ত্বে ও সাহিত্যে তা মুছে গেল না।

'শনিবারের চিঠি'র পূর্বজীবন যে এভাবে পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল তার

বিশদ খবর জানতাম না—প্রয়োজনও দেখি নি। মোহিতলাল-নজরুলের দ্বন্দ্বযুদ্ধ অবশ্য দেখে গেছলাম। কিন্তু তাতে যে 'শনিবারের চিঠি' বনাম 'কল্লোল'-'কালিকলম'-'প্রগতি' দু'টি ব্যূহ রচনা হবে তা অনুমান করি নি। আমি তো তার কারণও দেখি নি। কারণ, 'শনিবারের চিঠি' রঙ্গব্যঙ্গের কাগজ। 'কল্লোল' তার আগেই প্রকাশিত হয়েছিল, মামুলি মাসিকপত্র—এবং সাহিত্যপত্র। আমার মনে হয়েছিল—অনেকটা যেন তৎকালীন 'ভারতী'র মতো তার সাহিত্য-দৃষ্টি, কতকটা নতুনত্ব সন্ধানী। আমার ধারণা ছিল—'শনিবারের চিঠি' ও 'কল্লোলীরা' বরং জন্মসূত্রে সুহৃদ, পরস্পরের পরিপূরক হবারই কথা। একবৃন্তে দু'টি ফুল। কিন্তু মোহিতলাল-নজরুলের মল্লযুদ্ধেই তারা বৃন্তচ্যুত হ'ল। তার মূল কারণটা 'শনিবারের চিঠি'তে সজনীর লেখা নজরুলের বিদ্রূপ "আমি ব্যাং/লম্বা আমার ঠ্যাং।" নজরুল তা দেখে ভুল করে ভাবল—এ মোহিতলালের কাণ্ড। মোহিতলাল এককালে নজরুলের ছিলেন গুরু। কিন্তু 'বিদ্রোহী' কবিতা প্রকাশের পরে দুজনের মনান্তর হয়। তাই নজরুল শনিবারের চিঠির বিদ্রূপ কবিতা দেখে মোহিতলালকে দায়ী করে, তাঁকে কবিতায় 'কল্লোলে' আক্রমণ করল। মোহিতলাল তার থেকেই ক্ষিপ্ত হলেন। তাঁর অভিশাপ 'চিঠির' বিদ্রোহ সংখ্যার 'ক্রোড়পত্র' রূপে বেরুল। এমন রুষ্ট রুদ্র মূর্তি কম দেখা যায়। এই হ'ল মোহিতলাল-নজরুলের বিরোধের ইতিহাস।

পলিটিক্সের আসরটায় ঠিক এসময়ে অস্ত্রচালনা হ'ত দুর্বুদ্ধি—স্বরাজ্য পার্টির নেতারা অনেকে কারারুদ্ধ, পীড়িত চিত্তরঞ্জনও কালগ্রাসে পতিত। অন্যদিকে, সেই 'কামস্কাটকীয় ছন্দে' নজরুল-বিদ্রূপের পরে মোহিতলাল-নজরুলের দ্বন্দ্ব 'শনিবারের চিঠি'কে প্রয়োজনীয় একটা নতুন dimension দিল। 'শনিবারের চিঠি' 'বিদ্রোহ সংখ্যায়' তাই সাহিত্য-কলহের জের টেনে চলে। পলিটিক্স ছেড়ে সাহিত্য হয়ে উঠল এ ভাবে 'শনিবারের চিঠি'র প্রধান রণাঙ্গন। তাতেও কিন্তু 'কল্লোলে'র সঙ্গে 'শনিবারের চিঠি'র ফারাক ঘটার কারণ হ'ত না। কিন্তু শুধু নজরুলেও দিন চলে না। 'কল্লোলে' ঠিক সে সময়ে নতুন লেখকদের যে-লেখা প্রকাশিত হচ্ছিল তাকে ব্যঙ্গের উপজীব্য করা সম্ভব ছিল। সম্ভব হ'লও। এসব যোগাযোগে সাহিত্যের দ্বন্দ্বক্ষেত্র গড়ে উঠতে লাগল। তথাপি 'শনিবারের চিঠি'র সাপ্তাহিক জীবন শেষ হয়ে এল। অবশ্য রঙ্গ-ব্যঙ্গের আসর হিসাবে কিছু লেখক তৎপূর্বেই তার ভক্ত ;—'প্রবাসী'-সম্পর্কিত কিছু গুণিজনও তার সুহৃদ। শৈলজানন্দ ও প্রেমেন্দ্র মিত্র দু'জন 'কালিকলম' প্রকাশ করেন,—'কল্লোলে'র আসর জমবার পূর্বেই তাঁরা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত। শৈলজানন্দই তখন অগ্রগণ্য, প্রেমেন্দ্র অনুজ হলেও প্রতিভা-

চিহ্নিত। এ'দের লেখাকে ব্যঙ্গের উপকরণ করা সুসাধ্য নয়। তবে লেখার অভাবে কিছু কাঁচা লেখা নিশ্চয়ই তাঁরা 'কালিকলমে'র পৃষ্ঠায় ঠাঁই দিতেন। নতুন করে 'শনিবারের চিঠি' যখন প্রকাশিত হ'ল তখন ১৯২৬-এর হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গায় আবহাওয়া বিষাক্ত। সাহিত্য ব্যতীত আরেকটা যুদ্ধের আসরও 'শনিবারের চিঠির' আয়ত্ত হ'ল। বিশেষত মুসলমান সাম্প্রদায়িকতার কড়া বিরোধী রূপে সজনীর তখন একটা খ্যাতিও লাভ হয়েছে —'সারথি'তে (?) একটা কাঁচা লেখাতে এই 'খ্যাতি'। 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র সঙ্গেও সেই থেকে 'শনিবারের চিঠি'র বরাবর সাম্প্রদায়িকতার সৌহার্দ্য। কাগজটি তবু সচল হয়ে উঠতে পারল সাহিত্যের দ্বন্দ্বযুদ্ধে।

এ পর্যন্ত ব্যাপারটা আমি জানতাম। জানতাম সজনী সেই সাহিত্যিক-দ্বন্দ্বে উৎসাহী। তার বিদ্রূপের কলম শাণিত হয়ে উঠছে—'শনিবারের 'চিঠি'তে তার আদর বাড়া অবধারিত। বক্সিং-বিশারদ অশোকবাবু পেয়েছেন একজন হব-চ্যাম্পিয়ন। 'প্রবাসী' প্রতিষ্ঠানের কাজে সজনীকে তিনি অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছেন—সজনীর তাতে জীবিকার সংস্থানও হচ্ছে। কারণ, তার আগেই সজনী নিজের জোরে তাঁর 'শনিবারের চিঠি'র প্রধান pugilist. অশোকবাবুর হয়তো পরিকল্পনা ছিল তাঁর 'শনিবারের চিঠি' বাঙ্গলা 'পাঞ্চ্' হবে। তাঁর নিজের রঙ্গ-ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ লেখার একটা বিশেষ ক্ষমতা ছিল। ক্ষমতা তাঁর আরও অনেক দিকে ছিল—সঙ্গীত, শিল্পকলা, শরীরচর্চা, অর্থনীতির প্রবন্ধ লেখা,— রঙ্গরসে শুধু নয়, ব্যঙ্গ গল্পেও ছিল হাত। কিন্তু সময় ছিল না, মনোযোগও নয়। সপ্তাহে সপ্তাহে ব্যঙ্গ রচনা করার মতো শক্তি বেশি বাঙালি লেখকের নেই—এক 'দাদাঠাকুর' শরৎ পণ্ডিত মশায় সে অসাধ্য সাধন করতে পারতেন। বনবিহারী মুখোপাধ্যায়ের 'বেপরোয়া' আশ্চর্য ক্ষমতা দেখিয়েছিল, কিন্তু দু'চার সংখ্যার বেশি বোধহয় তা বেরোয় নি। সাপ্তাহিক 'শনিবারের চিঠির'ও মৃত্যু তাই অনিবার্য ছিল, হ'লও; এবং বোধহয় এক বৎসরের মধ্যেই। তবে তার পুনর্জন্ম হ'ল—প্রথম অনিয়মিত প্রকাশ; তারপর দ্বিতীয় জন্ম—মাসিকপত্র। এই পুনর্জন্মেরই একটা বড় উপলক্ষ—১৯২৬-এর গুড্ফ্রাইডের সময়কার কলকাতার প্রচণ্ড হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা। তার ঢেউ-এ আমরা নোয়াখালিতেও অস্থির হয়েছি। যে-উপলক্ষটা 'শনিবারের চিঠি'কে সচল করেছিল তা হিন্দু-মুসলমানদের সম্পর্ককে এমনই বিষাক্ত করে যে, তার থেকে বাঙালির রাজনৈতিক জীবনও পরে আর সুস্থ চেতনা লাভ করল না, সাহিত্যেও না। বিশেষ করে, আবার সেই বিষকে বৈষয়িক প্রয়োজনে বলবান বাঙালি হিন্দু পত্র-পত্রিকাও ক্রমে ব্যবহার করতে থাকে, আর নবজাত মুসলমান পত্র-পত্রিকারও

তাই হ'ল স্বার্থ। সাম্প্রদায়িকতার সেই ১৯২৬-এর আঁধিই ক্রমে সর্বত্র বিভাগের ব্যাধিতে পরিণত হয়; দাঙ্গার সে বিষের পরোক্ষ জ্বালায় আমি নোয়াখালি ছাড়ি, রাজনৈতিকভাবে হতাশ, সাম্প্রদায়িকভাবে যন্ত্রণায় অস্থির। কলকাতায় এসে দেখি, 'শনিবারের চিঠি' নবজন্ম লাভ করেছে সেই বিক্ষোভকে বিদ্রুপের অস্ত্রে সজ্জিত করে। সদ্যোজাত, মুসলমান দৈনিক 'ছোলতানে'র 'ছ' তখন বাঙলা 'স'কে বাতিল করছিল—'শনিবারের চিঠির' সাম্প্রদায়িক-পলিটিক্সে ও বিদ্রুপ-রঙ্গের খেলায় হিন্দু পাঠকদের একটা আমোদ ও তৃপ্তি হচ্ছিল। অন্যদিকে সাহিত্য-ক্ষেত্রে আক্রান্ত নতুন লেকখরা উত্তর দিচ্ছে 'রঙের' বদলে রাগ করে—কিন্তু তা জমে না।

মাণ্ডলিক

সজনী একদিন এল, তার হাতে একতাড়া লেখা, আমাকে শোনাবে। সেদিন পূর্ণিমার রাত্রি—বাইরে জ্যোৎস্নার বান ডেকেছে। এমন রাত্রিটা মাটি করতে তার দ্বিধা নেই। প্রথম শোনাল নজরুলের একটি কবিতার প্যারডি—তা 'কালিকলম'-এ (১৩৩০-৩১ বাং) সদ্য প্রকাশিত হয়েছিল। সজনী মূল কবিতাটি শোনাল। মূলটি সত্যই একটু কামকলার সুড়সুড়ি, কিন্তু কবিতাটি ছন্দ-কৌশলে চমৎকার। সজনীর ব্যাঙ্গানুকরণও ঠিক সেই কৌশলেই সার্থক। মূলের সুড়সুড়িটায় বেশ বেহায়া বৃত্তি ছিল; ব্যঙ্গের হুলটাও নিতান্ত নির্বিষ নয়। তবে দুই-ই-nothing serious। সজনী তার আরেকটা কবিতাও পড়ল, 'দ্রৌপদী',—তাতে সে very serious কবি। 'সবুজপত্রে' অতুলগুপ্ত মহাশয়ের 'দ্রৌপদী'র বিষয়ে অসামান্য লেখাটি তার পূর্বেই বেরিয়েছে। সে প্রবন্ধের মহাভারতোদ্ধৃতি অবলম্বন করে সজনীর কবিতাটি রচনা। মূল অংশটি কিন্তু স্পর্শ করার মতো। যা যখন মন স্পর্শ করুক, তাতেই সজনী সাড়া দিতে উদগ্রীব—পক্ষে বা বিপক্ষে। বুঝলাম তার 'দ্রৌপদী' কবিতাটিও ধ্বনি নয়, প্রতিধ্বনি। বোধহয় সেও তা বুঝেছিল। পরে ক্রমে ক্রমে হলেও সে নিজের কবি-মনের সংহতি নিজেও আবিষ্কার করেছে। সত্যই সে কবি—তবে কবিযশঃপ্রার্থীও ছিল। যাই হোক, সেদিনের প্রধান স্মৃতিটা যা মনে আছে তা এই: বাঙলা সাহিত্যে একটা লড়াই-এর বাজনা বাজছে, সজনী সেই বাজনার সঙ্গে আসরে নামছে, মনের মতো একটা কলম চালনার ক্ষেত্র পাচ্ছে, আপনার যোগ্যতা অনুযায়ী এক্ষেত্রেও সে নিজেই স্থান করে নিতে পারবে। 'কল্লোলে'র লেখকেরা রঙ্গ-নিপুণ নয়। তারা উতোর চালাল গল্পে-কবিতায় রঙের বদলে 'অঙ' (বীরভূমের অর্থে) বাড়িয়ে। বেশ মনে পড়ে দু'পক্ষ সাজতে লাগল। সজনীকে সামনে রেখে

মোহিতবাবু, অশোকবাবু, প্রভৃতি ক্রমশঃই বন্ধু-বান্ধবদের নিজেদের দলে টেনে নামালেন। অন্যদিকেও 'কল্লোল', 'কালিকলম', 'প্রগতি'রও একটা ফ্রণ্ট তৈরী হয়ে গেল। এভাবেই 'শনিবারের চিঠি'র আড্ডা জমল ('প্রবাসী'র আস্তানায়) —উল্টো দিকে 'কল্লোলের'ও।

একটু পরে, খুব হৈ চৈ করে 'বিচিত্রা' নতুন বেরিয়েছে—রবীন্দ্রনাথকে তারাই দখল করবে—'প্রবাসী' হবে তখন থেকে দুয়োরানী, 'বিচিত্রা' সুয়ো। রবীন্দ্রনাথ তাল রাখলেন—বিচিত্রায় 'যোগাযোগ', প্রবাসীতে 'শেষের কবিতা'। যাই হোক, বিচিত্রাতে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য-বিরোধের দিকে চোখ রেখে লিখলেন 'সাহিত্যধর্ম' (শ্রাবণ, ১৩৩৪)। তাদের কে হারল, কে জিতল, নিজেরা কেউ বুঝতে পারল না। আমি তার আগেই শব্দতত্ত্বের প্রাথমিক পাঠের ফাঁকে ফাঁকে 'প্রবাসী'র আড্ডায় জুটেছি—এমন সময়ে মোহিতলাল সেখানে টেনে এনে উপস্থিত করলেন নীরদ চৌধুরীকে, তিনি কিছু 'প্রসঙ্গ কথা' লেখেন (১৯৭২-এর অক্টোবরে ?), আর সেই তাঁর বাঙলায় প্রথম কলম ধরা। কলম তো নয়, এ যেন বিদ্যার, বুদ্ধির, রুচির বাক্‌বৈদগ্ধ্যের শাণিত তরবারি। সে মুহূর্তেই জ্বলে উঠল 'শনিবারের চিঠি'র দীপ্তি। সম্ভব 'ওয়েলফেয়ারে' আমি এ সময়েই একটা আধা-সময়ের কাজ পেয়েছি (কিম্বা অচিরেই পাই)। নীরদবাবু ইংরেজিতে লিখতে চান—সে ভাষাতেই তাঁর কলমের ধার পরীক্ষা করবেন। বাঙালির রুচিতে, নীতিতে, বুদ্ধিতে বিশ্বাস তখনো তিনি রাখতেন না। তবু অচিরেই তিনি হন 'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদক। সে কী লেখা ! তখন বনবিহারীবাবু, কবি যতীন সেন, রবি মৈত্র প্রভৃতির লেখায় 'শনিবারের চিঠি' ভাস্বর। কিন্তু নীরদবাবু বাঙলায় বীতরাগ। মাস কয়েক পরে 'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদকীয় কর্তব্য ত্যাগ করেন,—বাঙলা সাহিত্যেরই মূল্য নেই—'শনিবারের চিঠির'ই বা দাম কী ? মাস ছয় কতকটা সজনীই বেনামা কাণ্ডারী, আমি উৎসাহদাতা। নীরদবাবুকে 'মডার্ন রিভিয়ু' 'প্রবাসী'-র সম্পাদকীয় সহকারী করে নিতে অশোকবাবুর দেরী হয় নি। মোহিতবাবু তখন চলে গিয়েছেন ঢাকায়, অধ্যাপনা কর্মে। সেখান থেকে লেখেন 'সাহিত্য প্রসঙ্গ'। অনিয়মিত হয়ে পড়ে 'শনিবারের চিঠি'। কিন্তু তার পূর্বেই ও-পত্রিকার নাম সকলের মুখে, রঙদার লেখার ও রঙ্গদার ব্যঙ্গের জন্য তার উপর দাবী বহু বহু পাঠকের। আর, নিজের শক্তি, নিজের খ্যাতি এবং সম্ভাবিত প্রভাব-প্রতিপত্তির নেশা নিয়ে সজনী স্বয়ং হয়ে পড়ল 'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদক, কর্তা এবং স্বত্বাধিকারী। এসব যখন ঘটছে, এর মধ্যে আমিও কখন সেই অক্ষৌহিণীর মধ্যে এক পদাতিক হয়ে গিয়েছি। দাদাও 'শনিবারের চিঠি'তে লিখেছেন, দূর থেকে

(নোয়াখালি) সুরেশ চক্রবর্তীর লেখাও আনিয়ে দিয়েছেন। অন্যদিকে রাজশেখরবাবু, গিরীন্দ্রশেখরবাবু প্রভৃতি পর্যন্ত 'শনিবারের চিঠি'র লেখক—যতীন সেন ব্যঙ্গচিত্রকর। আমিও এক-আধটুকু লিখেছি। কিন্তু আমার ব্যঙ্গে ধার নেই, রঙ্গেও নেই স্বচ্ছতা। কাজেই আমার সে লেখা মনে রাখার মতো নয়, তবে দলাদলির দলিল বই কি—খুঁজে পেলে !

দলাদলিটা বাঙালিদের মধ্যে endemic—সাহিত্যের থেকেও বেশি সংক্রামক। না হলে 'শনিবারের চিঠি'র সজনী ব্যতীত সকলেই প্রায় আমার নতুন পরিচিত. কিন্তু সকলেই সে পত্রিকার ভক্ত। অবশ্য বিপক্ষেরও অধিকাংশই আমার অপরিচিত। দু'জন কিন্তু নয়,—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ও বুদ্ধদেব বসু। একটা সময়ে তাঁরাও ছিলেন নোয়াখালি শহরের ছেলে, আমিও। অচিন্ত্যবাবুর কথা আগেও বলেছি—আমরা প্রায় এক বয়সের। শহরের দু'স্কুলের দু'পাড়ার হলেও একেবারে যোগাযোগহীন নই—সাহিত্যিক ঝোঁক তাঁর উত্তরাধিকারসূত্রে। আমি তাঁর সাহিত্য-শক্তিতে প্রথমাবধি বিশ্বাসী, এখনও; এবং গর্বিত পাঠক—যদিও তাঁর আধ্যাত্ম-মহিমা আমার মনে হয় ফিকে, সাহিত্যিক শব্দ-মহিমায় তা বর্ণোজ্জ্বল। বুদ্ধদেববাবু আমাদের দু'জনার থেকে বয়ঃকনিষ্ঠ—সে বয়সে, যে বয়সে বড়তে ছোটতে সেতুবন্ধন দুঃসাধ্য—বারতে-আঠারোতে অন্তরঙ্গতা অসম্ভব; চোদ্দতে-বিশেও তফাৎ দুস্তর,—বিশেষত যখন পাড়ার ব্যবধানও ছিল অনেকটা। আবার, সে সময়ে আমার জীবন কেটেছে কলকাতার কলেজে অথবা নোয়াখালির সবুজ উন্মাদনায়। বুদ্ধদেব বাবু (যতদূর জানি) মাতামহ-মাতামহীর স্নেহ-আদরের সুনিভৃত নীড়ে পালিত। মাতামহ পুলিশের ইন্‌সপেক্টর, সজ্জন। কলকাতা থেকে শহরে এলে খ্যাতি শুনতাম তাঁর 'বারো বৎসর' বয়সের দৌহিত্রের সাহিত্য-প্রীতির। সাহিত্য পাঠে ও লেখায় তখনি সে বালক prodigy. দু'এক সময়ে সে বাড়ির বারান্দায় তাকে দেখেছি—তিনি আমায় তখন জানতেনও না। তিনি ভীতু সলজ্জ বালক, আর আমি শহরের দুর্দান্ত ছেলে। তাই অত একান্ত-পালিত-সুশীল বালকের সঙ্গে সাক্ষাতের কারণ ছিল না। তবে যা শুনেছি তাতে অন্যদের মতো তাঁর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বড় আশাই তখনো পোষণ করেছি। ১৯২৬-২৭-এ কলকাতায় এঁদের সঙ্গে আমার পুনঃপরিচয়ই হ'ত স্বাভাবিক—স্থান ও কালের নিয়মে। একই নোয়াখালির নারকেল বাগান—ঝাউসারের ছায়ায়—খোলা মাঠ, ভরা দীঘি, বান-ডাকা নদীর ডাক আমরা শুনেছি,—তা কি যথেষ্ট বন্ধন নয় ? তা ছাড়া, আমরা তো একই কালের মানুষ—বয়সের তফাতই বা এমন বেশি কী ? প্রথম যুদ্ধান্তের সে কাল মানুষকে জিজ্ঞাসায় অশান্ত করে, অভিযানে দুঃসাহসী করে। তবু একই কালের

মানুষ কেমন করে হয়ে রইলাম ভিন্ন দলের মানুষ, আমাদের যোগাযোগের সহজ পথ আর গড়ে উঠল না। আরও অনেকের সঙ্গেও এরূপ কারণে প্রায় ব্যবধানই রইল অব্যাহত। মনীশ ঘটকের মনেও নেই, ছুটিতে বাড়ি ফেরার পথে গোয়ালন্দ-চাঁদপুরের স্টীমারে দাদার সঙ্গে তাঁর আলাপ-পরিচয়ের সময়ে আমার উপস্থিতি। পদ্মার ওপরে বিকাল গড়িয়ে সন্ধ্যা হয়ে গেল, মেঘনার কালো জলের মধ্যে রাত্রি ঘনিয়ে আসে। পরে সে কথা আমিও মনে করিয়ে দিই নি, তাঁরও মনে নেই। নজরুলকে তো প্রায় আমি চোখেই দেখি নি সে যুগে, যখন সে দিগ্বিজয়ী বিদ্রোহী, আর আমি তাঁর কবিতা বুঝতাম। কবিতায় নতুন পথে আমি এখনও বিভ্রান্ত ; তখনকার দিনে 'ঝরা পালক'-এর জীবনানন্দকে কিন্তু আমি গুরুত্ব দিই নি—'ধূসর পাণ্ডুলিপি'কে বোধ হয়েছিল ঊষর নয়। যেন ডব্‌লু. বি. ইয়েটস্‌-এর ছায়ায় স্বপথ-সন্ধান। সত্য কথা, নতুনের হয়ে উঠতে যেমন সময় লাগে, নতুনকে বুঝে উঠতেও লাগে সময়। কিন্তু শৈলজানন্দ ও প্রেমেন্দ্রের বিষয়ে সে সংশয় ছিল না। একজনকে দলাদলির মধ্যেও আমার মনে হ'ত নতুন পথিকৃৎ, আর অন্য জনকে প্রথমাবধি মনে হ'ত অকৃত্রিম শিল্পী, মানবতায় প্রাণবান। তবু তাঁদের সঙ্গে সংযোগের সেতু পাই নি। এই সংযোগহীনতার প্রধান কারণ অবশ্য মতামত নয়, রুচিও নয়—এমনকি দলাদলিও নয়। সে কারণ, আমার সঙ্কোচ, আত্মসংশয়—আমি লোকচক্ষে না পড়লেই স্বস্তি পাই। আর একটি কথা ঃ দলাদলির মধ্যেও একেবারে তালকানা কিন্তু অনেকে হতেন না। প্রকাশ্যে না হলেও একান্ত আলোচনায় অনেকেরই গুণাগুণ স্বীকৃত হ'ত। অবশ্য বুদ্ধদেববাবু ও অচিন্ত্যবাবুর কবিতা নিয়েই 'শনিবারের চিঠি'র দলে বেশি পরিহাস কৌতুক ছিল, তবু তাঁদেরও ক্ষমতা অগ্রাহ্য হ'ত না। শৈলজানন্দ তৎপূর্বেই সর্বস্বীকৃত। প্রেমেন্দ্র মিত্রের জন্যও ছিল সকলের রীতিমতো মমতা, প্রীতি ও প্রত্যাশা। কিন্তু শেষ কথাটি এখানে বলি—'কল্লোল যুগ' অচিন্ত্যবাবুর রম্যরচনার রটনা—ইতিহাসের ঘটনা নয়। বছর পাঁচেকও (১৯২৩-২৮) তার আয়ু ছিল না। সে সময়কার মধ্যে বুদ্ধদেববাবু, অচিন্ত্যবাবু প্রভৃতি মূল 'কল্লোলী'দের লেখা কয়টি রচনা স্থায়ী ? দু'-চারটি কবিতা, দু'-চারটি ছোটগল্প—উপন্যাস তাঁরা বুঝতেনও না, নাটক তাঁরা লেখেন নি। এসব সে যুগে নেই। তবে সে-যুগটা 'যুগ' হ'ল কিসে ? আসলে 'যুগ' এসেছিল টি. এস্‌. এলিয়ট, প্রুস্ত, জয়েসেদের নিয়ে ; কিন্তু কল্লোলের এরা তখন তা জানতেনও না।

সজনীর সৌহার্দ্যও 'প্রবাসী' আপিসের অন্যান্যের সঙ্গে আমাকেও 'শনিবারের চিঠি'র পরিমণ্ডলের মাণ্ডলিক করে ফেলেছিল। আমি সেই চক্রের

মধ্যবর্তী হলেও চক্রবর্তী হয়ে উঠতে পারি নি কোনো সময়ে ; এবং চক্রধর হলেও সজনী কিন্তু তার চক্রবর্তী ছিল না মনে-প্রাণে। তাই একদিন যারা বাক্যবাণে পরস্পরকে ক্ষতবিক্ষত করেছে, তারাও একদিন আলাপে-আমোদে পরস্পরের সখা হয়ে উঠতে পেরেছিল। বিশেষ করে সজনী ও নজরুল। কারণ দু'জনারই ব্যক্তিত্বে ছিল না কুণ্ঠা-সঙ্কোচের লেশমাত্র অসুবিধা, মনে ছিল না হীনম্মন্যতা, সাহিত্যধর্মের সত্যকারের কোনও বৈষম্যজনিত বাধা।

কিন্তু 'শনিবারের চিঠি'র দলাদলি ও ভুয়ো 'কল্লোল যুগের' কথাই বা আমাকে বলতে হবে কেন ? কি দরকার ? সে কাহিনী যা বলবার দু'পক্ষের দু'জন তা ইতিপূর্বে বলেছেন—সজনী বলেছেন তাঁর 'আত্মস্মৃতি'তে, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত বলেছেন 'কল্লোল যুগে'। দু'খানা বই-ই সুখপাঠ্য। দুই-ই সত্য—দু'পক্ষের দু-কেন্দ্র থেকে দেখা—তাতে যতটুকু সত্য থাকে তা-ই। একটি তথ্যযুক্ত স্বচ্ছন্দ, প্রামাণিক লেখা—অন্যটি সরস, রম্য-রচনা। আমি কাছে থাকলেও ও দুই কেন্দ্র থেকে কিছু দেখি নি ; তাঁদের তুলনায় আমি বলবার অধিকারী নই—প্রান্তিক দর্শকমাত্র। তবে আমার মনে হয়, সজনী যদি হয় 'গরঠিকানা কল্লোলী', কল্লোল-যুগটাও কিন্তু 'যুগ' নয়, হুজুগ। আসলে বাংলা সাহিত্যপত্রে যুগ ঘটিয়েছে দু'টি পত্র—'বঙ্গদর্শন' ও 'সবুজপত্র'। আরেকটিও যুগান্তর ঘটিয়েছিল, কিন্তু সে ত্রৈমাসিক পত্র, 'পরিচয়'। আর বাংলা সাহিত্য-জীবনে ও জগতে আরেকটি কাগজ যুগিয়েছিল যুগ-জীবনের গতিপথ—সে রামানন্দবাবুর 'প্রবাসী'।

রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যিক হৈ চৈ-কে বলেছিলেন, 'সাহিত্যের হট্টগোল'— "পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে (তাঁর কথায়) সে হট্টগোল আছে। কারণ তাদের হাট আছে। আমাদের সাহিত্যে হাট নেই—আছে হট্টগোল" (সাহিত্যধর্ম, শ্রাবণ, ১৯৩৪ বাং)। মনে হয়েছে, আমাদের সাহিত্য তো সমুদ্র নয়, সমুদ্র-কল্লোলও তাতে নেই। এমন কি নদীর অনুচ্চ কুলুধ্বনিও না। বাঙলার নদীতে মৃদুমন্দ স্রোত যা আছে তাও জাগে পারাপারের জোয়ারের দৌলতে-দাপটে, তাতেই তা জিইয়ে ওঠে। না হলে বুঝি বা বাঙলা-সাহিত্য-স্রোত ডোবায় বাঁধা পড়ে যেত। 'কল্লোলে'র পিছনের সত্য এটুকু,—ইউরোপের যুদ্ধান্তের সাহিত্যের থেকে পাওয়া ওপারের উত্তেজনা ও তৎকালীন আধুনিকতা—চলার আকাঙ্ক্ষা। 'শনিবারের চিঠি'র পিছনে ছিল ভিন্ন সত্য—ওই বিদেশীয় ধার করা উত্তেজনার পিছনে নেই আমাদের মাটির যোগাযোগ, এবং তাই নেই সাহিত্যেরও প্রাণসত্য। তাই বলে, চলার আকাঙ্ক্ষাটা মিথ্যা নয়। কিন্তু বলার রীতিও জানা চাই। নতুন জীবন যে কী করে সত্যকে বলতে হয়, তা শেষে দেখিয়ে

দেন রবীন্দ্রনাথ। আগেও তিনি দেখিয়েছেন—পরেও তিনিই দেখালেন—'শেষের কবিতা' থেকে একেবারে 'শেষ লেখা' পর্যন্ত। সব সময়েই তিনি বাংলা সাহিত্যে আধুনিক—আবার সাহিত্যে সনাতন। 'অতি-আধুনিক'রা আধুনিকও নয়—রবীন্দ্রোত্তরী অতিচার সত্ত্বেও। এক অর্থে সেদিনের তরুণরাও অবশ্য রবীন্দ্রনাথেরই মানসপুত্র। কথাটা 'শনিবারের চিঠি'র ভাবসারথি মোহিতলাল ভাল করেই বুঝতেন। তাই কল্লোলীয়দের ছেড়ে শেষ অবধি রবীন্দ্র-প্রতিবাদী সাহিত্যের তিনি হলেন উন্মাদ গুরু। আর প্রচ্ছন্ন-কল্লোলী সজনী দাস ক্রমে তাঁর রবীন্দ্র-নিপাততন্ত্র ছেড়ে রবীন্দ্রানুগ্রহ প্রার্থী হয়ে হলেন স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত—রবীন্দ্র-সাহিত্যের তল্পীদার। এ-প্রসঙ্গ এখানেই শেষ করতে হলে ঐ কোলাহলে আমারও যে প্রাপ্তি ঘটেছে তা স্বীকার করতে হয়। সাহিত্যের কিছু স্রোতের স্পর্শ—'ভাগীরথী-নির্ঝর-শিকরকণাং 'বোঢ়া' সেই মন্দানিল এই সৈকতাশ্রয়ী প্রান্তিকের ললাট ছুঁয়ে যেত, আর পেতাম সাহিত্যের সেই উজান-ভাঁটায় যাত্রী কিছু বিজ্ঞ ও রসজ্ঞ মানুষের সজীব করস্পর্শ। তাঁদের কথা, গল্পে লেখায় আমাকে কি বারে বারে হাতছানি দিয়েছে—ডেকেছে, পার থেকে মোর গানের তরী দিতে খুলে সবার মাঝে ভাসিয়ে দিতে পালটি তুলে? কিন্তু আমার মনে সুর আসার আগেই গান গেল পালিয়ে—না, সৈকত ছেড়ে স্রোতে তখন এগুতে গিয়েও পিছিয়ে এসেছি?—তরীতে পা দিয়েছি, কি দিই নি।

শনিমণ্ডলের যাঁদের সান্নিধ্য আমাকে কৃতার্থ করেছে তাঁদের বিদ্যা, পাণ্ডিত্য, রসবোধের মতই তাঁদের স্নেহ, প্রীতি, সৌহার্দ্য আমার এক প্রাপ্তি। মোহিতলাল, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সুশীলকুমার দে, নীরদ চৌধুরী, অশোক চট্টোপাধ্যায় ইত্যাদি—এমন একটা সমাবেশ কি মিথ্যা হতে পারে? এমন সুধী সমাবেশ যে-কোনো লোককে ধন্য করত, আমাকেও না করে ছাড়ে নি। তাঁদের কারও কারও কথা তবু আমার পক্ষে বলা অসাধ্য—যেমন সজনী, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, রঙ্গীন হালদারদের। সজনীর কথা সে নিজেই বলেছে, আমিও বলেছি একবার (সজনী-স্মরণী সংখ্যা 'শনিবারের চিঠি'তে)। তবু আর একবার স্মরণ করি সহায়-সম্বলহীন সেই যুবককে, কলকাতার পরিশীলিত গোষ্ঠীতে আপন শক্তিতে যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে—সে নিশ্চয়ই অগ্রগণ্য pugilist; একজন প্রবীণ কবির ভাষায়, "একসঙ্গে সুরেশ সমাজপতি, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, পঞ্চানন্দ—এবং তারও বেশি।" এই "তারও বেশি" কথাটাই শত দোষের উপরে আরও সত্য। বাংলা সাহিত্যের ছাত্ররা তা মনে রাখবে। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় আমার তেমনই নিকটতম মানুষ—

যাঁরা আমার ব্যক্তিসত্তার পক্ষে অপরিমেয় ; আত্মার বন্ধনে আমার পরমাত্মীয়, যেখানেই থাকি জীবনসঙ্গী, আর সে, স্মৃতিও জীবনসঙ্গিনী। কূলে বা অকূলে বসে দেখতে পাই, তাঁরা শুধু স্রোতের ছবি নয়—এই অকবির অন্তরে তাঁরাই কবি।

মণ্ডলেশ্বর মোহিতলাল

মোহিতলাল মজুমদার ছিলেন 'শনিমণ্ডলের' বিশ্বামিত্র ঋষি এবং তখনকার বাঙলা সাহিত্যের দুর্বাসা। তাই ভারতীয় সাধনার গায়ত্রীমন্ত্র ছেড়ে বরং বাঙালি তন্ত্রের ওঁ, হ্রীং, ক্লীং প্রভৃতির বীরাচারীমন্ত্র প্রচার তাঁর 'মিশন' হয়ে ওঠে। এ পরিণতি অনিবার্য ছিল, কারণ, আসলে আজন্ম-আমৃত্যু তাঁর ধ্যান ছিল একটি মন্ত্র—বাঙলা সাহিত্য। আমার জীবনে সাহিত্যব্রতী লোক আরও দেখেছি, কিন্তু মোহিতলালের মতো সাহিত্যপ্রাণ লোক আর দ্বিতীয় দেখি নি। অবশ্য, তাঁর পূর্বজ ও পূজনীয় বঙ্কিমেরও তো তা'ই ধ্যান ছিল, কিন্তু তিনি বাঙালিতন্ত্র অপেক্ষা কোঁৎ-গীতার সমন্বয়ে তৈরী করেছিলেন 'ধর্মতত্ত্ব'—কোঁৎও বাঙালি নন, গীতাও একান্ত বাঙলার নয়—দুয়ে মিলে যা হয় তাতে বঙ্কিম ঠিক করেছিলেন—বাঙালির পক্ষেও 'মনুষ্যত্বই ধর্ম'। মোহিতলাল উল্টে বলতে চাইলেন—বাঙালির পক্ষে বাঙালিত্বেই মনুষ্যত্ব। অবশ্য 'শনিবারের চিঠি'র দিনে বঙ্কিমের সাধনাটুকুই ছিল মোহিতলালেরও সাধনা—কিন্তু বঙ্কিমের ধর্মতত্ত্ব নয়,—বঙ্কিমের বাঙলা সাহিত্য-সৃষ্টি, বঙ্কিমের সাহিত্য-শাসন, পালন, পোষণ। না হলে মোহিতলালও দেখতে পেতেন, বঙ্কিম ছিলেন ভারতীয় সাধনার ও (তৎকালীন) আধুনিক সাধনার পুরোহিত। রামমোহন ও রবীন্দ্রনাথ থেকে বঙ্কিমের পার্থক্যটা ধর্মতত্ত্বের ততটা নয়, যতটা ধর্মগণ্ডীর। কিন্তু এহো বাহ্য। মোহিতলালের আসল ধর্ম সাহিত্যানুরাগ। প্রথম পরিচয়েই তা অনুভব করি, আর তাঁকে ভালোবেসে ফেলি। এই সাহিত্যপ্রেম নির্ভেজাল একচ্ছত্র। শেষ দিকেও যখন তিনি দুর্ধর্ষ এ্যাণ্টি-কমিউনিস্ট, এ্যাণ্টি-রবীন্দ্রনাথ ইত্যাদি আরও অনেক 'এ্যাণ্টি', তখনো সে ভালোবাসা কিছুমাত্র হ্রাস পায় নি। শুনেছি, সেই মহর্ষি দুর্বাসাও এই পাপিষ্ঠের প্রতি একটু প্রীতি রাখতেন। দুর্মুখরা অনেকে সৎ ও সহৃদয়।

মোহিতলালের প্রথম উদ্দেশ পেয়েছিলাম ছাত্র-জীবনে 'ভারতী'তে তাঁর একটি কবিতায়—'নাদিরশাহ্'। পরে 'স্বপন-পশারি' বেরোয়, 'বিস্মরণী' আরও পরে। তাঁকে কবি বলেই জানতাম। 'ভারতী'র 'সত্যসুন্দর দাসের' দিকে তখনো কৌতূহল ছিল না। তাই কে তিনি, তা জানতাম না। ওপর-

ওপর পড়ে মনে হ'ত লেখা ও ভাবনা সহজবোধ্য নয়। তাঁর সাহিত্য-জিজ্ঞাসা যে শুধু জিজ্ঞাসা নয়, গভীর পিপাসা, দেখা হতেই বুঝলাম। সাহিত্য তাঁর passion—ইংরেজি রোমাণ্টিক সাহিত্যে তাঁর গভীর অভিনিবেশ, মুগ্ধ রসানুভূতি, সূক্ষ্ম দৃষ্টি। অবশ্য সকল যুগের ইংরেজি কবিতা বোধহয় তিনি সাদরে পড়েছিলেন, নাটকও। তবে, বিশেষ করে, রোমাণ্টিক ধারাতেই আগ্রহ বেশি। একেবারে সমসাময়িক টি. এস. এলিয়ট, এজরা পাউণ্ড প্রভৃতির নাম ১৯২০-২৫-এ বাঙালি সাহিত্যিক মহলে সুপ্রচলিত হয় নি; ইয়েটস্-ই আমাদের নিকট পরিচিত ছিল—তাতে ভাবের ধোঁয়া বেশি মনে হ'ত। কিন্তু সমকালীন সাহিত্য-সমালোচনা ও কাব্যভাবনা ছিল মোহিতবাবুর অধিগত, সেখানে ক্রোচের 'ইস্থেটিকস্' ছিল তাঁর গ্রাহ্য নন্দনতত্ত্ব। ল্যাসেল এবারকোম্বি ও মিডল্‌টন ম্যারির প্রতিও তাঁর আগ্রহ দেখতাম। অন্ততঃ মিডল্‌টন ম্যারির কথা সময় সময় বলতেন, তবে 'কীটস্ এ্যাণ্ড শেকস্‌পীয়ার'-এর কথা কম। সাহিত্যে ভাববাদ ও বিমূর্ত ভাবনা তাঁর কাছে অগ্রাহ্য; সৃষ্টি অর্থ রূপদান, objectification—ভাবকে রূপের মধ্যে ধরা। এ জন্যেই ধ্বনিবাদে তাঁর আপত্তি। অতুল গুপ্ত মশায়ের 'কাব্যজিজ্ঞাসা' আমাদের মনে সাড়া জাগিয়েছিল, এখনো জাগায়, মোহিতবাবু কিন্তু তাতে কৃতিত্ব দেখতেন না। ডঃ সুশীল দে-ও বোধহয় ভারতীয় সাহিত্যতত্ত্বের দিক থেকে 'কাব্যজিজ্ঞাসা'র ব্যাখ্যা ও সিদ্ধান্তকে তত গুরুতর মনে করতেন না—আর ডঃ দে ভারতীয় কাব্যতত্ত্বে কৃতবিদ্য। নিজে কত দিনের কত কথা-প্রসঙ্গে, আলোচনায় ও পরেকার শিল্প-সমালোচনায়, মোহিতলাল তাঁর নিজস্ব কথা লিপিবদ্ধ করেছেন। বাঙলা সমালোচনা-সাহিত্যের তা সম্পদ। বঙ্কিম, মধুসূদন কিম্বা 'শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র'—প্রত্যেকের সমালোচনাতেই তাঁর বিশিষ্ট সাহিত্যদৃষ্টি নতুন আলোকপাত করেছে। মোহিতলালের ভাব ও ভাষা যদি আরও স্বচ্ছ হ'ত তা হলে তা বহু সম্বর্ধিত হ'ত। লেখায় যে-ভাবোচ্ছ্বাস ও ভাষায় যে-আভিজাত্য দেখা যেত, কথার ক্ষেত্রে তাতে বাধা জন্মাত না। কারণ, তাঁর ব্যক্তিত্ব তাঁর কথাকে প্রাণবন্ত করে তুলত। সে-ব্যক্তিত্ব সাহিত্যরসে তন্ময় মানুষের অকৃত্রিমতা। মনে পড়ে, আমি তখন ফেণী কলেজে,—তিনি ঢাকায়, বড়দিনের ছুটিতে আমি তাঁর অতিথি—সেই রাত্রি কয়টি। যখন হ্যাজলিটের ও রোমাণ্টিক কবি-সমালোচকদের আলোচনা ও কবিতা পাঠে, আবৃত্তিতে মধ্যরাত্রি এসে শেষরাত্রিতে ঠেকত—আর বাইরে রমনার খোলা মাঠে ফিনিক-ফোটা জ্যোৎস্নার সঙ্গে খানিকক্ষণ মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমরা শেষে শুতে যেতাম—অল্প দু'চার ঘণ্টার জন্য। শিল্প-সাহিত্যের স্নিগ্ধ

জ্যোৎস্নায় অভিষিক্ত সেই রাত্রি কয়টি অবিস্মরণীয়। কিন্তু বাঙলা সাহিত্যে মোহিতলালের প্রধান নেশা—প্রায় মিশন, মাইকেল থেকে একেবারে তাঁর সমসাময়িক কাল পর্যন্ত। বিশেষ করে কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন ছিলেন তাঁর প্রিয়। দেবেন্দ্রনাথের কবিতা কতবার কত আড্ডায় যে আলোচনা করতে করতে আবৃত্তি করেছেন তার ঠিক নেই। বিশেষ করে বাঙালি রমণীর 'মলের' ধ্বনির মধ্য দিয়ে এক-একটি রমণীয় রূপ-চরিত্র দেবেন্দ্রনাথ ধরে দিয়েছিলেন যে-কবিতায়, মোহিতলালের আবৃত্তিতে তা জীবন্ত হয়ে উঠত। সে কবিতাটির অস্তিত্ব না-হলে আমার কাছে অজ্ঞাত থেকে যেত। অমন আরও অনেক কবিতারই অর্থ থাকত অসম্পূর্ণ—মোহিতবাবুর মুখে আবৃত্তি না শুনলে, গল্পে আলোচনায় উদ্বুদ্ধ তাঁর ব্যাখ্যা না জানলে। তাঁর 'কালা-পাহাড়'ও তাঁর মুখে মনে হ'ত অগ্নিমন্থনিকা। সুনীতিবাবু সেই idol-breaker-এর প্রশস্তিতে আপত্তি করতেন; মোহিতবাবু হতাশ হয়ে বলতেন—'আপনার রসবোধ নেই'। সুনীতিবাবু বলতেন—'না থাক এ জাতীয় রসবোধ, তাতে আমি দুঃখিত নই, idol-breaking একটা স্থূল, crude কাজ।' এরূপ কত মজার কাণ্ড দিনের পর দিন আমরা উপভোগ করেছি, এক-আধ ঘণ্টা নয় শুধু—অনেক অনেক ঘণ্টা।

শুনেছিলাম নীরদবাবুদের দু'ভাই-এর স্কুলজীবনে তাঁদের গৃহশিক্ষক ছিলেন মোহিতবাবু। ভাগ্যবান ছাত্র, ভাগ্যবান গুরু। নীরদবাবু বরাবরই তাঁকে বলতেন 'মাস্টারমশায়'। একটু পরিচয়ের পরেই আমার কাছেও তাঁর সেই নাম হয়—যদিও আমার তাতে দাবী ছিল না, তবে কিছু অধিকার জন্মেছিল—যে-অর্থে অনুজ ভক্তরা বলতে পারে অগ্রজ সিদ্ধ-লেখককে 'মাস্টার'—সে অর্থেই মোহিতবাবু আমারও 'মাস্টারমশায়' হন। ছাত্রের মতো শ্রদ্ধা নিয়ে আমি অনুধাবন করতাম তাঁর লেখা—তাঁর কাব্যভাবনা ও সাহিত্য-ভাবনা। কিন্তু তাঁর সমাজ-ভাবনা, জীবন-ভাবনা তখনো আমি গ্রহণ করতাম না। প্রথম দিকে সে-সব জানতামও না, পরের দিকে জানার পরে—মানতামও না। আগে একটু-একটু আপত্তি জানাতাম, সঙ্কোচে তর্ক করতাম, পরে তাঁর স্নেহের প্রশ্রয় পেয়ে পরিহাস করতাম, রঙ্গ-তামাসাও করতাম—জানতাম, ক্ষমা সুলভ। যেমন, 'শনিমণ্ডলী' যখন জমে উঠেছে তখন বেশ তাগিদ পড়েছে একটা কিছু বিগ্রহ খাড়া করার। জাতীয় সংস্কৃতির 'বিগ্রহ' চাই—আধুনিক হ্যাংলামির বিরুদ্ধে। রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ অবধি মনীষীরা বাঙালি জাতির প্রতি সুবিচার করেন নি, বাঙালিত্বের তাতে অপকার হয়েছে।—ব্রাহ্মধারাটাই বাঙালির সমাজ ও মূল প্রকৃতির বিরোধী। ঠিক এ ভাবে নয়, অনেক বেশি

সুমার্জিত ও সুগঠিত যুক্তি-প্রলেপের মধ্য দিয়ে এ মতটি ডঃ সুশীলকুমার দে প্রতিপাদন করতেন। 'প্রবাসী' আপিসেই কথাটা আলোচিত হ'ত—একটু সতর্ক ভাবে, অশোকবাবু বা ওরূপ ব্রাহ্মবন্ধু কেউ না থাকলেই হ'ল—বিরোধ বেধে যাবে তা হলে। বিষয়টি যেন একটা সাংস্কৃতিক সমস্যা মাত্র—নৈর্ব্যক্তিক ও নিরপেক্ষ ব্যাপার—এভাবেই কথা প্রথম চলত। আসলে কিন্তু মোহিতলালের অন্তরের বিশ্বাস—ব্রাহ্মধারা একটা বিভ্রান্তি;—এমন কি, চিরন্তন বাঙালি-চেতনার বিকৃতি। বলতে বাধা নেই, পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু ভদ্রলোক ব্রাহ্ম-সমাজের জন্মদাতা; কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুসমাজ ব্রাহ্মসমাজকে বিশেষ শ্রদ্ধা করত না। অথচ মোহিতবাবুর এ সম্বন্ধে দৃঢ়মত যে, পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা ও সাহিত্যের স্পর্শলাভেই বাঙালি জাগ্রত হয়েছে, বাঙালিপ্রাণ নিজ প্রাণশক্তির খোঁজ পেয়েছে। সেই সঙ্গেই তাঁর ধারণা—পাশ্চাত্ত্য যুক্তিবাদ ও পাশ্চাত্ত্যের অনুকরণবুদ্ধি এসে বাঙালির স্বভাবকে এবং প্রাণধর্মকে বিকৃত করছে। ব্রাহ্মচিন্তা ও জীবন-ধারা এই পাশ্চাত্ত্যের abstract চিন্তা-ভাবনায় বাধা পড়ে। ব্রাহ্মরা তাই উপনিষদ ও নিরাকার (abstract) ভারতীয় সাধনার উপর জোর দেন। কিন্তু বাঙালি-সাধনা তা নয়—তা মূর্ত (concrete), তা সাকার, তা রক্তমাংস-ভরা বাস্তব, জীবনমুখী। ভারতবাসী হলেও বাঙালির বাঙালিত্ব তাই ভারতীয়ত্বের থেকে পৃথক বস্তু। এ ধরনের ধারণা মোহিতলালের আন্তরিক ও অকৃত্রিম, প্রায় স্বভাবগত। বাঙলা সাহিত্যকে এই বাঙালিত্বের উপর দাঁড় করাতে হবে—এই কথাটাতে রক্ষণশীল হিন্দু ভদ্রলোকদের একটা সহজ সম্মতি ছিল। মোহিত-লালের দৃঢ় মত এই—ভাগীরথীর দুই তীরই বাঙলা; সে দুই তীরের 'ভাগীরথ ক্যালচর'ই বাঙালিত্ব—অন্ততঃ মধ্যযুগ থেকে তা স্পষ্ট। ইংরেজ আমলে সে 'ভাগীরথ ক্যালচর'-ই নতুন করে আত্মপ্রকাশ করতে পেরেছিল পাশ্চাত্ত্যের ঘাত-প্রতিঘাতে। এই কথাটিতে ভদ্রলোকদের অনেকের সম্মতি ছিল—বাঙালিত্ব একটা স্বতন্ত্র সম্পদ—এ মত সুশীলবাবু, সুনীতিবাবুরও। কিন্তু বাঙালিত্ব সত্যই কী, আর সত্যই 'ভাগীরথ ক্যালচর'ই বা কী তার বিশ্লেষণ তখন হ'ত না; হলে হয়তো এঁদের কারও সঙ্গে কারও মত মিলত না। রবীন্দ্র-মানবিকতাপন্থী সুনীতিবাবুর সঙ্গে এঁদের অনেকেরই মতের অমিল হওয়ার কথা, কারণ রবীন্দ্র-দর্শন—সর্বজাতিকতায় পুষ্ট। মোহিতবাবুর চিরন্তন বাঙালিত্বকে ও 'ভাগীরথ ক্যালচর'কে, তর্ক হলে, নীরদ চৌধুরী নস্যাৎ করতেন হাস্য-বিদ্রূপে। আর ডঃ দে-ও ভারতীয় সংস্কৃতি-চেতনা ও বাঙালি-চেতনার সহগামিতায় (coexistence-এর) সম্ভবতঃ অনিবার্য বিরোধ দেখতেন না। তবু মাঝে মাঝে আপোসে এঁদের মতদ্বৈধও হ'ত। আমি সে-সব ক্ষেত্রে ধর্তব্যের মধ্যে নই, অবশ্য শুধু

শ্রোতা ও জিজ্ঞাসুও নই, একান্তে এক-আধটুকু তর্কও জুড়ে দিই ; যেমন, বলি —অন্ততঃ আধুনিক কালে যুগধর্মটা ওসব জাতিধর্মের থেকে প্রবলতর। মোহিতবাবু মানেন না, তবে শোনেন। একদিন দুপুরে 'প্রবাসী' আপিসে আমাকে ঢুকতে দেখেই একটু স্মিত পরিহাসে বললেন, 'এদিকে তো পায়ে বিদ্যাসাগরী চটি, গায়ে খদ্দরের-ধুতি-পাঞ্জাবি চাদর—অত সাহেবী মেজাজ (পাশ্চাত্ত্য পন্থা) চান কেন তবে ?' কথাগুলি আমার তৎকালীন বেশভূষার প্রতি একটু সানুগ্রহ কটাক্ষ। অন্যদের সে কথায় বেশি কান নেই—প্যারীবাবু ও প্রবোধবাবু বোধহয় কাজ করছেন, সজনী অন্যত্র। আমি বললাম, 'বিদ্যাসাগরের মতো যথার্থ বাঙালি হতে চাই বলে।' কিছু দিন ধরে ব্রজেন দা (ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়) তখন সংস্কৃত কলেজের পুরনো কাগজপত্র ঘাটছিলেন, এবং বলেছিলেন, "ও গোপাল, বিদ্যাসাগরকে বাঙালি বলছ কি ? তিনি তো আস্ত সাহেব, বেদ-বেদান্ত সবকিছু সংস্কৃত কলেজে পড়া বন্ধ করতে চেয়েছিলেন।" বিদ্যাসাগরের শিক্ষাদৃষ্টি ঠিক তখনি পুনরাবিষ্কৃত হচ্ছিল। অনেকের নিকটই তা নতুন শোনাত। আমার মনে হ'ল—আমার ধারণার ভালো একটা খুঁটি বিদ্যাসাগর। তাই মোহিতবাবুকে আমি ওই জবাব দিলাম—'বিদ্যাসাগর চাল-চলনে বাঙালি আর জীবন-দৃষ্টিতে যুগধর্মী'। মোহিতবাবুর সঙ্গে তখন বাঙালিত্ব নিয়ে আরও কিছু সাধারণ কথা হ'ল। এখনকার দিনে হলে অন্যভাবে বলতাম, তখনকার দিনে বলেছিলাম অনেকটা এরূপ ঃ "আপনার বাঙালিত্ব যা বলছেন তা কী ?— ইতিহাসে তার expression কী ? সম্ভবতঃ নব্যন্যায়, তন্ত্র, এবং চৈতন্যধর্ম।' মোহিতলালের কথাটা মনে ধরল—"হ্যাঁ, চৈতন্যের ভাববাদ থেকেও তন্ত্রের ব্যাপারটাই বোধহয় বেশি জীবননিষ্ঠ। তন্ত্রটা আমাদের বুঝে দেখা দরকার।" তন্ত্রের সম্বন্ধে মোহিতবাবু ক্রমেই নতুন করে সচেতন হলেন, পরে তা তাঁকে পেয়ে বসল।

সেদিন আরও একটু কথা হয়—জাতিধর্ম—যদি কিছু থাকে—তাও যুগধর্মের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে না নিলে বাঁচে না। রামমোহনের সম্বন্ধে তাঁদের আপত্তি করা তাই নিষ্ফল, নির্বুদ্ধিতা তো নিশ্চয়ই। "কাকে ধরবেন আপনার বাঙালি বিগ্রহরূপে—রামমোহন-রবীন্দ্রনাথের পাশ কাটতে চাইলে ? মানুষ তো থাকে আর তিনজন হিন্দু, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম, বিবেকানন্দ। এঁদের মধ্যেও অমিল অনেক, মিল যুগবোধে, আর সবল পৌরুষে।" শেষ কথাটা মোহিতবাবুর মনে ধরল--এই তিন জন লোকের মধ্যে শক্তি ছিল, তবে সাহিত্যের গুরু হিসাবে বঙ্কিমই বেশি গ্রাহ্য।

এই ভাবনা আমারও না ছিল তা নয়, আমারও মনে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি ছিল প্রচুর ভক্তি—কার না থাকে? উপন্যাসই অবশ্য তার প্রথম উপকরণ। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা আরও কত বড়, তাঁর অন্য লেখা পড়তে পড়তে তা অনুভব করেছিলাম,—সব তখনো পড়ি নি। তবু সেদিনের জাতীয়তাবাদের দৃষ্টিতে বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ লিখেছিলাম, প্রবন্ধটি প্রবাসীতে ছাপা হয়। আমাদের জাতীয়তাবাদ যে হিন্দু জাতীয়তাবাদ, তা বুঝেও মানতে চাইতাম না। কারণ, ও-জাতীয়তাবাদ ভিন্ন আমাদের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার যে আর কোনো নির্ভর করবার মতো উৎস ছিল না। মোহিতবাবু তখন ঢাকায়। প্রবন্ধটা পড়ে ভাবলেন, আমি বুঝি তাঁরই ভাবনায় চালিত হয়ে বাঙলা সাহিত্যের সেবা করব। তাঁকে চিঠি লিখতাম, দীর্ঘ দীর্ঘ উত্তর তিনি লিখতেন আমাকে। কিন্তু গোয়েন্দা পুলিশের দপ্তরে তা হয় বিনষ্ট, নয় বিলুপ্ত—আমার মা-বাবা পুলিশ-ত্রাসে তার কিছু ভস্মীভূত করেন। এখন তা শুধু স্মৃতির অস্পষ্ট সম্পদ, না হলে সে-সব পত্র সাহিত্যেরও উজ্জ্বল সম্পদ হ'ত।

সেদিন কিন্তু আমি মোহিতবাবুকে বলেছিলাম—বছর বারো-চৌদ্দ আগে বিপিন পাল চিত্তরঞ্জন দাশকে নিয়ে 'নারায়ণ'-এ বঙ্কিমবিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। মোহিতবাবু তখন 'ভারতী'র লেখক ছিলেন, 'নারায়ণ' তাঁর অগ্রাহ্য। কিন্তু আরও কারণ ছিল। "দু'জনাই ওঁরা (বিপিনচন্দ্র-চিত্তরঞ্জন) বাঙাল। 'ভাগীরথ ক্যালচর'-এর সঙ্গে ওঁদের নাড়ীর যোগ ছিল না। ওরা বঙ্কিমের কি বুঝবে?"

মোহিতলালের ভদ্রাসন কাঁচড়াপাড়া—সেখানে একদিন বিকালে গিয়ে পরদিন বাড়ি ফিরছিলাম। তিনি ভাবলেন—বঙ্কিমের তো তিনিই জন্মসূত্রে উত্তর-সাধক, বাঙালদের মধ্যে সে বাঙালিত্ব নেই। কথাটা আমার মতো বাঙালকে তখন ঠাট্টা করেই বলা, কিন্তু সম্পূর্ণ পরিহাস নয়। ক্রমে তা 'ডগমা' হয়ে দেখা দেয়। শুনেছি—ঢাকার লোকদের বাঙলা উচ্চারণ অশুদ্ধ বলে মোহিতলাল ছেলেদের সেখানে স্কুলেও পড়ান নি। ঢাকার ছাত্ররা তাঁকে ভালবাসলেও অনেকেই তাঁকে গ্রহণ করতে পারে নি,—বক্তব্যই কি গ্রহণ করেছিল? বহু বহু দিন পরে (১৯৪১), প্রায় বারো-চৌদ্দ বছর পরে—মোহিত-বাবুর সেই রূপ যখন প্রকট, তখন আমার পক্ষে তা আরো অদ্ভুত ঠেকেছে। তখন হিটলারের জয়জয়কার। মোহিতলাল প্রায় বাঙালি ব্লাড-থিওরিতে বিশ্বাসী—বাঙালিত্ব শুধু স্থানের (ভাগীরথীকূল) জিনিসও নয়, বাঙালি-রক্তেরও গুণ। বাগনানের বাড়িতে আমি তাঁকে ঠাট্টা করে বললাম, "কিন্তু সে রক্তের গুণ কি বাঙালদের আছে? দেখেছেন তাঁদের বাঙলা উচ্চারণ কত অশুদ্ধ?"

মোহিতবাবু বুঝলেন, হাসলেন, বললেন, "ওগুলো পতিত-বাঙালি—আপনার তাতে কি? আপনারা যে রাঢ়ীয়-বিক্রমপুরী—প্রাণের ভেতরে এখনো বাঙালি!" আমি বললাম, "না, ব্রাহ্মণ বাঙালদের মধ্যে বারেন্দ্র আছে, বৈদিক আছে, কায়স্থদের মধ্যে বঙ্গজ,—আর অন্য জাতগুলো কি হবে? আর আমিই বা রাঢ়ীয় হব কেন? এ একেবারে মধ্যোত্তর এশিয়ার আর্য—'ভারদ্বাজ, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য।" তিনিও পরিহাস করলেনঃ "তা কি মনে আছে? গায়ত্রী জানেন?"—"বোধহয়। মনে আছে বলেই তো রাঢ়ীয় বলে নিজেকে মানি না—বলি একেবারে 'ঢাকাই বাঙাল'। গায়ত্রী? যে দেশে তা যাবে সে দেশই তার। পদ্মা-পারই বা কি, সিন্ধু-পারই বা কি, ক্যলচর তাতে ক্ষয় হয় না। কিন্তু আপনার কাছে বাঙাল-ব্লাড 'বাঙালি ক্যলচরে'র থেকে বেশি ঘন (thicker)।"

পরিহাসচ্ছলেই আবার একদিন কথা উঠল। বললাম, "আচ্ছা, আপনার মতে বাঙালিত্ব তো বাঙালদের ভেতরে ভেতরে আছে, বাঙালি-ব্লাড যাবে কোথায়, না? খ্রীস্টান হয়েও মাইকেলের যায় নি। কিন্তু বলুন তো মুসলমান হলে কি সে বাঙালিত্ব থাকে? না সে ব্লাড্ বদলে যায়।" তখন লীগের উৎপাত—মোহিতবাবু এখানে রীতিমতো পরাজয় মানলেন। "ও মশায়! ওদের (মুসলমানদের) কথা তুলবেন না, কী যে মুসলমান ধর্মের শক্তি। সব বদলে ফেলে।" (আজ) মোহিতলাল জীবিত থাকলে বলতে পারতেন—সব বদলেও বাঙালিই থাকে, বাঙলা ভাষার জোরে, আর বাঙাল ব্লাডের জোরে। পাঞ্জাবি হতে চায় না। বাঙলা ভাষা, বাঙলার মাটি, বাঙলার জল নিয়েই বাঙলাদেশ। তবু ধর্ম আবার তাকে খণ্ডিত করে। মুসলমান বাঙালির কি দ্বৈতসত্তা?

একদিন বাগনানের বাড়িতে আমি ও সজনী গিয়েছিলাম। তখন 'শনিবারের চিঠি'র সজনীর প্রতি তিনি অপ্রসন্ন, তা আর তাঁর মুখপাত্র নয়। সজনী ব্যক্তিগত ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার বশে মোহিতবাবুকে চেয়েছিল কতকটা শান্ত করতে। বিকাল ও রাত্রি সেখানে সাহিত্যিক আড্ডায় কাটিয়ে পরদিন কলকাতা ফিরি। সে সন্ধ্যায় যথারীতি তিনি কমিউনিস্টদের 'শ্রাদ্ধ'ও করেন। আমি হাসি, "কী করবেন—যদুবংশ ধ্বংস হবে—যাদব নারীরাও চলে যাবে দস্যুদের সঙ্গে।" মোহিতবাবুর তখন ধারণা ইউরোপের ত্রাতা হিটলার। কিন্তু শুধু তাঁর কেন, তখন শিক্ষিত দশ আনা বাঙালির, দশ আনা wishful thinking হিটলারের জয়। তবে মোহিতবাবুর ভরসা—না, সুভাষবাবু নন, 'তিনি তো অল ইণ্ডিয়া মার্কা রাজনীতিক'; তাই মোহিতবাবুর নিকট সুভাষ-

বাবু অগ্রাহ্য। মোহিতবাবুর ভরসা—'বাঙালির ভরসা—শ্যামাপ্রসাদ।' কিন্তু এসব নিয়ে বাগনানে সে রাতে বিশেষ তর্ক করি নি। কারণ, তখনি দেখছিলাম—মোহিতবাবু বেশ অসুস্থ, রক্তের চাপে ভুগছেন ; মনেও ক্ষোভ, মুখে কঠোর উক্তি। তাঁর অভিযোগ প্রায় বাঙলাদেশের সকল সাহিত্যিকের বিরুদ্ধে—তাঁরা তাঁকে পূর্ণ সাহিত্যিক মর্যাদা দিতে কৃপণ, একটা চক্রান্ত আছে তাঁর বিরুদ্ধে—সজনীও সে চক্রান্ত নীরবে দেখে। শনিবারের চিঠি ও সজনী তখন তাঁর সঙ্গে নেই। সজনীর বিরুদ্ধে এ কথা কিন্তু সুবিচার নয়—সে মোহিতবাবুকে মানত, কিন্তু তখন আর সে রবীন্দ্র-বিরোধী নয়। যাক্, মোহিত-বাবুর সান্ত্বনা ছিল—কিছু ছাত্র ও শিষ্য শেষ দিন পর্যন্ত তাঁকেই মানত 'Master' বলে—আমি নই, আমি সব সময়ে পলিটিক্স করি, বিশেষতঃ কমিউনিস্ট—তাঁর ভক্ত-দলে নেই ; তবে পাপিষ্ঠ নই, পাষণ্ডী। কিন্তু দেখে আমিও খুশি হই—আজ তাঁর সাহিত্য-ভাবনার জন্য তিনি অবিস্মরণীয়, 'বিস্মরণী'র কবিও অ-বিস্মৃত।

মোহিতবাবুর পরেই সেদিন যাঁরা শনিমণ্ডলের 'জ্যোতিষ্ক—তাঁদের মধ্যে অনেকেই একভাবে না একভাবে সম-দ্যুতিমান—যেমন, সুশীল দে, নীরদচন্দ্র চৌধুরী। সজনী, সুনীতিবাবু ও রঙ্গীন হালদারের কথা পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। —কালিদাস নাগ, অশোক চট্টোপাধ্যায়, (মধুকর কুমার কাঞ্জিলাল), কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়, ব্যঙ্গচিত্রশিল্পী হরিপদ রায়, অকালমৃত রবি মৈত্র (দিবাকর শর্মা), বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়, হেম বাগচী, (কলেজ বন্ধ থাকলে) প্রিন্সিপাল গিরিধর চক্রবর্তী, মোহিতবাবুর বন্ধু কৃষ্ণকালি রায়—প্রমুখ। এঁদের অনেককে শনিমণ্ডলের ফটোগ্রাফে একত্র পাওয়া যাবে। (সজনীকান্ত স্মরণী শনিবারের চিঠিতে তাম্রমুদ্রিত হয়েছিল)। কেউ কেউ তাতে অনুপস্থিত, কিন্তু সেই মণ্ডলীতে অনিয়মিত হলেও অংশীদারদের মধ্যে অগ্রগণ্য, ডঃ সুশীলকুমার দে।

সুপরিশীলিত সুশীল দে

সুশীল দে অবশ্য স্থির আভিজাত্যে ও স্থির ব্যক্তিত্বে স্বতন্ত্র, পাণ্ডিত্যে ও গবেষণায় স্থিরচিত্ত ও অভিনিবেশে অক্লান্ত। তিনি মোহিতলালের কলেজ-জীবনের বন্ধু ছিলেন, আর আজীবন ছিলেন তাঁর হিতাকাঙ্ক্ষী। অথচ মোহিতবাবুর অপেক্ষা অনেক বিষয়ে তিনি স্বতন্ত্র। উচ্ছ্বাস কখনো দেখি নি। সমস্ত বাক্যে ও আলোচনায় উত্তাপহীন। বিরূপ সমালোচনায় যুক্তি-নিষ্ঠ এবং সাহিত্য-শিল্পের মানদণ্ডে নিজের বিরূপতাকে সংযত বাক্যে

প্রতিষ্ঠিত করা তাঁর রুচি ও নীতি। তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের ও তথ্যসমৃদ্ধ গবেষণার মূল্য পরিমাপ আমার সাধ্যাতীত। অলঙ্কার শাস্ত্র, বৈষ্ণব মতবাদ, মহাভারত সম্পাদনা থেকে বাঙলা-ইংরেজি বহু দিকে তাঁর বিদ্যা সুবিস্তৃত ; আবার সুসীমিত বিস্তার ও সংহতি, দুই-ই। সুশীল দে-র পাণ্ডিত্যের পদ্ধতি শ্রেষ্ঠ ইউরোপীয় স্কলারদের মতো। তা সুস্থির, আবেগ-উত্তাপহীন, অভ্রান্ত-তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ; খণ্ডনে-মণ্ডনে সূক্ষ্মযুক্তি ও বাহুল্য বর্জিত। শ্রেষ্ঠ বাঙালি-বুদ্ধি এক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি দ্বারা পরিচালিত, আপন উদ্দিষ্ট ক্ষেত্রে নিবিষ্ট ; বিষয়ান্তরে উদাসীন নয়, কিন্তু নিরুদ্দেশ যাত্রায় অনিচ্ছুক। এই পদ্ধতির সঙ্গে আরেকটি ছিল তাঁর বিশেষ সম্পদ—ইংরেজি বাঙলা দু'ভাষায় ছিল সুশীল দে-র অসাধারণ লিপি-নৈপুণ্য। তাঁর গবেষণার লেখাও সাহিত্যের মতো সুখপাঠ্য, সাহিত্য-সমালোচনা যেমন বিচার-বুদ্ধিতে পরিচ্ছন্ন, তেমনি ভাষার সংযম-সৌন্দর্যে সমুজ্জ্বল। আমার ধারণা, এই-ই আসল ক্লাসিক গুণ,—অনেকটা মোহিতলালের বিপরীত গুণান্বিত—মোহিতলালের ভাষার ঐশ্বর্য ও ভাবের গাম্ভীর্য পরিচ্ছন্ন নয়, আচ্ছন্ন। আবার বাইরে থেকে মনে হয়, অধ্যাপক সুশীল দে শুধু তাও নন, বাইরে থেকে সযত্ন ক্যালচরের পরিমিতি-বোধে মার্জিত রুচির ও স্থির বুদ্ধির বাঙালি অভিজাত, আবেগ-উচ্ছ্বাসে যাঁরা আত্মহারা হন না, এবং রঙ্গ-ব্যঙ্গে রসগ্রাহী। সুশীলবাবু নিশ্চয়ই তা ; এবং আরো একটু বেশি। বাঙালি-আবেগ, বাঙালি-কল্পনা, বাঙালি হৃদয়োচ্ছ্বাসও থাকত তাঁর সত্তার তলায় সঞ্চিত। তিনি কবিতাও লিখেছেন, কবিত্বও তাঁর ব্যক্তিত্বের একটি গোপন দিক। কবিতা ও হৃদয়োন্মোচনে দু'এক স্থলে কৃপণ নন বন্ধুগোষ্ঠীতে। সর্বসময়েই সংযত-সামাজিকতায় সহজ ও সহৃদয় রুচিতে অনর্গল না হোন,—সুরসিক মানুষ। শনিমণ্ডলে তাঁর এই রূপও দেখেছি ; এবং এই রূপ বোধহয় খুব বেশি অন্যে দেখতে পেত না। আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় হতে আমি প্রথমেই বিনীতভাবে তাঁকে জানালাম, "আমি কিন্তু এম. এ. ক্লাশে আপনার ছাত্র ছিলাম—ঢাকা যাবার আগে যে-কয়মাস আপনি কলকাতায় পড়িয়েছিলেন।" তিনি প্রসন্ন মুখে বললেন, "তাই নাকি ? তা ওসব এখন ভুলে যাও—ওই ছাত্র-অধ্যাপক সম্পর্ক। এখানে এক গোষ্ঠীর মানুষ।" তাঁর সঙ্গে সহজভাবে কথায়, জিজ্ঞাসায়, আলোচনায় কোনদিন বাধা হয় নি। মনে হ'ত—স্নেহ এবং প্রীতিশীল সুহৃদ। আমার সঙ্কোচ-কুণ্ঠা যে উড়ে গেছল সেটা এই অভিজাত অধ্যাপকেরই আন্তরিক সহৃদয়তায়। বোধহয় ক্লাসিক রুচির মানুষ বলে সুশীল দে সেই 'কল্লোল'-'প্রগতির' আতিশয্যে শ্রদ্ধাহীন ছিলেন। আরেকটি কারণও ছিল—তিনি বাঙালী চারিত্র্যধর্মেও বিদগ্ধ

সহমর্মী। তাঁর প্রথমপাদের উনিশ শতকের বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস ও পরেকার দীনবন্ধু-বঙ্কিম প্রভৃতির সমালোচনা, বিশেষ করে দীনবন্ধুর সমালোচনা, সাহিত্য-বিচারের ও স্বচ্ছ রচনাশৈলীর উৎকৃষ্ট আদর্শ। তিনি বোধহয় নিজেকেও ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালি জাগরণের উত্তরাধিকারী এবং উত্তরসাধক রূপে মনে মনে বিবেচনা করতেন। মাতৃকুলে তিনি ছিলেন কিশোরীচাঁদ মিত্রের ও শোভাবাজারের দেব-দের সঙ্গে সম্পর্কিত—প্যারীচাঁদ মিত্র, কিশোরীচাঁদ মিত্র শুধু সেদিনের দুই উজ্জ্বল নক্ষত্র নন, তাঁরা বাঙলায়-ইংরেজীতে সেদিনের বাঙালি আকাশের চার্টও রেখে গিয়েছেন। সুশীলবাবু সে চার্টকে গ্রাহ্য করতেন। তাই রামমোহনের সম্বন্ধে প্রচলিত অনেক কাহিনীকেই সুশীল দে অলীক বলে মনে করতেন। এবং 'রামমোহন মিথ্' তাঁর কাছে ছিল অগ্রাহ্য। —রামমোহন বাঙলা ভাষার স্রষ্টা দূরে থাক, খুল্লতাতও নন, মৃত্যুঞ্জয়ই সে সময়কার শ্রেষ্ঠ বাঙলা শিল্পী। সুচতুর তার্কিক রামমোহন মধ্যযুগের স্কুলম্যান; ইউরোপীয়দের মতো 'ডীইস্ট', অদ্বৈতবাদী নন, হিউম্যানিস্টও নন, 'religious Benthamite'। রামমোহনের 'স্বজীবনী' ও ইংরেজি লেখা সন্দেহাতীত নয়,—ইত্যাদি। এসব কথা অন্যেরা আগে বা পরে বলে থাকবেন, কিন্তু শনিমণ্ডলে সুশীল দে-ই তা প্রতিপাদন করেন। কথায়, তথ্যে ও যুক্তিতে রামমোহনকে 'মর্নিং স্টার অব ইণ্ডিয়ান রিনাসেন্স' বলে আমাদের জানাটা ভুল জানা—কতকটা ব্রাহ্মদের প্রচারেই তা চালু। এ মর্মের কথা 'শনিবারের চিঠি'র আমাদের মতো কারুর কারুর মনে একটা ছোটখাটো সংশয়ের ঢেউ তুলত। সুশীলবাবু ইংরেজি সাহিত্যের কৃতী ছাত্র, ইংরেজির অধ্যাপক—পরে সংস্কৃতেরও। ইংরেজি ভাবধারায় নবোদ্বুদ্ধ ১৯শ শতকের বাঙালিকেও সুশীল দে জানতেন পূর্বজ রূপে,—আর মনে করতেন আধুনিক বাঙলা হবে সেই নবোদ্বুদ্ধ বাঙালি স্বভাবেরই অনুসরণে গতিমান। ইংরেজি-ফরাসী-সংস্কৃত-বাঙলা প্রভৃতি সাহিত্যে এই কৃতীপুরুষের দৃষ্টির সঙ্গে এইখানেই ছিল মোহিতলালেরও দৃষ্টির মিল; আর তা-ই অনেকাংশে 'শনিবারের চিঠি' ও দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিণত হয়—যখন একটা 'দৃষ্টিভঙ্গি' তার দেখা দেয়। শনিমণ্ডলের অভ্যন্তরে রামমোহন ও ব্রাহ্ম মিথ-এর বিরুদ্ধে একটা স্রোত বইলেও তা প্রকাশ্যে পরিস্ফুট হতে বাধাও ছিল। কারণ, অশোক চট্টোপাধ্যায় ও 'প্রবাসী'র বিশিষ্ট সহযোগী, ব্রাহ্ম-বন্ধুরা ছিলেন শনিমণ্ডলের পরিচালক। সুশীলবাবুর বোধহয় মত প্রকাশ ছাড়িয়ে মত প্রচারে ইচ্ছাও ছিল না। সুশীল দে'র মাত্রাজ্ঞান স্বভাব-সিদ্ধ, মোহিতবাবুর মতো 'ডগ্‌মায়' ডোবা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। এমন কি, তাঁর বিরক্তির মাত্রাও ছিল

সুস্থির। তাঁর ১৯ শতকের বাঙলা সাহিত্যের আদি পর্বের ইতিহাস যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন 'সবুজপত্রে' প্রমথ চৌধুরী মশায় তাঁকে খোঁচা দিয়েছিলেন তাতে রামমোহনের অনুল্লেখ দেখে। সুশীলবাবু তাঁর বই-এর 'ভূমিকা'তে নির্দেশ করেছিলেন, কেন রামমোহন তাঁর বই-এর উদ্দিষ্ট পর্বের অন্তর্গত নয়। কিন্তু চৌধুরী মশায় সে 'ভূমিকা' পাঠ করেন নি—গ্রন্থটির ওপর তাই তাঁর বক্রোক্তি। সুশীলবাবুর উত্তরে সে ত্রুটি চৌধুরী মশায়কে স্বীকার করতে হয়। কাগজ-পত্রে সেখানেই ও-ব্যাপারের ইতি। সুশীলবাবু বোধহয় প্রমথ চৌধুরী মশায়ের লেখার আর গুণগ্রাহী হতে পারেন নি। 'শনিবারের চিঠি'তে চৌধুরী মশায়ের ওপর যখন ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের সমালোচনা আরম্ভ হয় তখন সেই চৌধুরী-কৃতিকে প্রথম শরজালে পরিম্লান করেছিলেন দ্বিতীয় এক চৌধুরী—নীরদচন্দ্র। ও সময়ে বেরিডেল কীথ্-এর সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস অবলম্বনে প্রমথ চৌধুরী মশায় একটি সুখপাঠ্য আলোচনা লেখেন। তখন সুশীল দে সে-লেখার ত্রুটিবিচ্যুতি দেখে বলেন, 'বেরিডেল কীথ্ অসাবধানী লেখক নন; এ বাঙালি লেখকের (প্রমথ চৌধুরীর) স্বকীয় কীর্তি—বিষয়-প্রবেশ অপেক্ষা ওপর-চালই তাঁর স্বভাব।' সুশীল দে তখন নিজে কলম ধরেন নি. সে কাজ করেছিলেন তরুণ গবেষক বটকৃষ্ণ ঘোষ। তাঁর নাম তখনো সাধারণ্যে অজ্ঞাত। ত্রুটিসন্ধানে তাঁর কুশলতা দেখেছি অসামান্য, উৎসাহও দেখেছি তদ্রূপ। সেই বিনীত মানুষটির সে উৎসাহ 'শনিমণ্ডলের' যোগ্য। অকাল-মৃত্যু সত্ত্বেও বটকৃষ্ণ ঘোষ ভাষা-বিজ্ঞানে খ্যাত হয়েছিলেন। প্রমথ চৌধুরী মশায় কি 'শনিবারের চিঠি'র সমালোচনায় একটু বাক্যের ধার খুইয়েছিলেন, না, ওটা বয়োধর্মে?

'ভূরিদ' সুহৃদ নীরদচন্দ্র

নীরদচন্দ্র চৌধুরী 'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদক ছিলেন স্বল্পকাল। আত্ম-জীবনের সেই অধ্যায়ের কথা বোধহয় এখনো তিনি লেখেন নি। মিলিটারি একাউন্টস্ আপিসের চাকরি আগেই ছেড়ে দিয়েছেন; লেখাপড়া ছাড়া আর কোনো কাজেই উৎসাহ নেই এবং সে লেখাপড়াও প্রধানতঃ ইংরেজি-ফরাসীতে, কিছু পরিমাণে বাঙলা সাহিত্যে,—কিন্তু সমসাময়িক বাঙলা সাহিত্যের প্রতি তাঁর অসামান্য বিরূপতা, বাঙলা লেখায় আগ্রহহীন; ইংরেজি লিখছেন, ইংরেজি লেখাতেই আস্থা। এবং এক-একটি লেখা তখনি দশ-বারো বার লিখছেন, কিন্তু প্রকাশ যথার্থ কিছুই করেন নি। কারণ, হয় মনে করেছেন সে বিষয়ে তাঁর অধ্যয়ন অসম্পূর্ণ, নয় সে লেখা, দশ-বারো বারের পরিমার্জনায়ও, তাঁর মতে

অপরিস্ফুট। নিজের এই স্বভাবের কথা তিনি অল্পবিস্তর জানিয়েছেন, কিন্তু যা তিনিও জানান নি—তাঁর মতো করে না হোক, আমাদের মতো করে, বলা উচিত—লেখাগুলির প্রতি তিনি অবিচার করতেন। তাঁর সম্পাদনায় সেই স্বল্পকালেই 'শনিবারের চিঠি' বাঙলা পত্রিকা-সাহিত্যে প্রতিষ্ঠালাভ করে, আর ঔৎসুক্যের ও সবিস্মিত উৎসাহের সঞ্চার করে—'কে এই 'বলাহক নন্দী' ?' (নীরদচন্দ্রের লৈখনিক নাম)।

সেদিনকার একটি প্রবন্ধ মাত্র ইদানীং সংকলিত হয়েছে, অন্যগুলি সংকলিত হলে ও-সময়ের সাহিত্যিক তর্ক ও কলহের একটা হেতু বোঝা যেত। যে কয় মাসের পত্রিকা তিনি সম্পাদন করেন, (তাঁর যেমন স্বভাব) সে কয়মাস আগাগোড়া পত্রিকার লেখা নির্বাচন, সংস্কার, পত্রিকার রূপায়ণ—তার মুদ্রণ শোভা, তার লেখার মার্জিন, তার ছবির কালি—সবই তিনি নিজে স্থির না করে শান্ত হতেন না। ওই ছিল তখন তাঁর দিন-রাত্রির কাজ। মনে আছে, 'শনিবারের চিঠি'র প্রচ্ছদপটে লড়কু মোরগের আবির্ভাব,—তাও তাঁরই আয়োজনে। ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে 'ডিজাইনে'র অনেক বার্ষিক ঘেঁটে ঘেঁটে ঘেঁটে ওরূপ একটি ডিজাইন তাঁর মনঃপূত হয়। আর সেই মূলটিকে স্বয়ং 'শনিবারের চিঠি'র উপযোগী করে আঁকতে বসেন, আঁকেন এবং তার ব্লক নির্মাণের সমস্ত খুঁটিনাটি স্থির করে দেন। তার পরে ছাপার কালে দাঁড়িয়ে থেকে তা ছাপা নির্বাহ করেন। পাঁচ-ছয় মাস পরে তিনি অবশ্য সে পত্রের সম্পাদনা ছাড়েন, বাঙলা ভাষা বা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে (বিশ্বাস আগেও ছিল না) উৎসাহ হারান, চিরাগত সাহিত্যের তিনি ভক্ত। তবে মোহিতবাবুর সঙ্গে তো সম্পর্ক ছাড়তে পারেন না, সজনীর সঙ্গেও না, এবং আমার মতো আর কারও কারও সঙ্গেও নয়। প্রবাসী আপিসে তিনি সম্পাদনা কর্মে সাদরে গৃহীত হন, তাই শনিমণ্ডলের একেবারে দূরে physically থাকেন নি।

ব্যক্তিগতভাবে এই দুর্জয় মেধাবী মানুষটির সঙ্গলাভ আমার অপরিমিত সৌভাগ্য। আমি কত কথা সেই 'Unknown Indian'-এর মুখে শুনেছি, তাঁর কাছে শিখেছি—সাহিত্য, সঙ্গীত, শিল্প, (চীনা শিল্পকলা, জাপানী শিল্পকলা, রিনাসেন্স শিল্পকলা, আধুনিকতম স্থাপত্য শিল্প) ইতিহাস, প্রাগৈতিহাস, আধুনিক আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির বিচার-বিশ্লেষণ, সমরশাস্ত্র ইত্যাদি, ইত্যাদি অসংখ্য বিষয়ে যা শুনেছি, তার এক-দশমাংশও আমি স্মৃতিতে সঞ্চয় করতে পারি নি, অবশ্য তাঁর মতের এক-দশমাংশও পারি নি মনে অঙ্গীকার করতে। কিন্তু তাঁর সেই মনীষা, শিল্পানুরাগ, সাহিত্যানুরাগ,

মেধা, স্মরণশক্তি প্রভৃতির ব্যাপারে আমার মুগ্ধ বিশ্বাস বন্ধুগোষ্ঠীরও অনেকের নিকট অবিশ্বাস্য ও পরিহাসযোগ্য ছিল—যতদিন 'Unknown Indian' অপ্রকাশিত ছিলেন। তা প্রকাশের পরে, নীরদচন্দ্র চৌধুরীর বাক্যবাণে যতই যাঁর আপত্তি থাক, দেশ-বিদেশে তিনি সর্বস্বীকৃত—আমার গুণমুগ্ধ অভিনন্দন তাতে বাহুল্য। সানন্দ কৃতজ্ঞতা কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে একবার জ্ঞাপন করলেও পুনর্বার জ্ঞাপন অবান্তর হবে না। নীরদবাবু শুধু সুহৃদ নন, ভূরিদ। সেই 'শনিবারের চিঠি'র সময়কার প্রথম পরিচয়ের দিন থেকে বহু দিনের আমাদের দেখাশোনা—সম্ভবতঃ নীরদবাবু তাঁর প্রতিটি দিনের তথ্য নিজের স্মৃতি থেকে আহরণ করে দিতে পারবেন অনায়াসে, আর সে তথ্য নির্ভুলও হবে, দ্বিতীয় আর একটি লোকেরও পক্ষে এরূপ কাজ সম্ভব হবে না।

আমি বাবা-মাকে শুদ্ধ নীরদবাবুদের মাণিকতলার বাসার একাংশ ভাড়া নিয়ে কাটিয়েছি বোধহয় এক বৎসর কাল,—তাঁর সহৃদয় পিতা ও সুবিদগ্ধ ভ্রাতাদের সাহচর্য পেয়েছি। তিনিও পরে আমাদের বাড়িতে (ভবনাথ সেন স্ট্রীটে) বেশ কয় মাস একটি ঘর ভাড়া নিয়ে ছিলেন একা। সেখানে তাঁরই সৌজন্যে ক্রিস্টোফার এ্যাক্রয়েড, ও বোধহয় বিষ্ণু দে মহাশয়দের সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভ করেছিলাম। সে বাড়ি থেকেই তিনি বিবাহে যাত্রা করেন—আর কিছুকাল পরে আমি করি জেলে যাত্রা। জেল-পর্বের পরে তাঁর দিল্লী গমনের সময় পর্যন্ত প্রতি সপ্তাহে দু-চার দিন তাঁর সঙ্গে দেখা না হলেই চলত না। প্রায় সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসরের সৌহার্দ্য, সৌজন্য, আন্তরিক সহানুভূতি আমার অবিস্মরণীয় সম্পদ। শত পৃষ্ঠায়ও তার তথ্য বা তার মূল্য পরিস্ফুট করা সাধ্যাতীত।

'চিঠি' পুনশ্চ

আরও কত জিনিসই তো 'শনিবারের চিঠি'কে অবলম্বন করে ঘটেছে: 'সংবাদ-সাহিত্যে' ছোট-বড় নানা লোকের ন্যায়-অন্যায়ভাবে নাক-কাটা ছিল সজনীর প্রধান কাজ, আর পাঠকদের নিকট তা শনিবারের চিঠির সংকলিত 'মণি-মুক্তা'র (অক্ষম লেখকদের উক্তি) মতোই মুখরোচক। কিন্তু উল্লেখযোগ্য বললে বলতে হয় শরৎচন্দ্র, দীনেশ সেন, প্রমথ চৌধুরী প্রভৃতিদের নিয়ে 'শনিবারের চিঠি'র সব্যঙ্গ আলোচনা,—তাতে অবশ্য তাঁদের সত্যকার কৃতিত্ব খর্ব হয় নি। তবে সাহিত্যে ভারসাম্য স্থাপনের জন্য কিছুটা ওরূপ সমালোচনারও প্রয়োজন। প্রমথ চৌধুরী মশায়ের ওপর আক্রমণটা ছিল

একটু বিস্ময়কর। 'শনিবারের চিঠি' তখন রবীন্দ্রভক্ত, তাই প্রমথ চৌধুরীও মাননীয়। কিন্তু চৌধুরী মশায় নিজস্ব মুরুব্বিয়ানার বশে একটি লেখায় দু-পক্ষের সাহিত্যিকদের পিঠ চাপড়ানোর ছলে বলেন 'র-রিক্রুট'। আর যায় কোথায়! মোহিতবাবু ক্রোধে উদ্দীপ্ত হন্, সুশীলবাবুরও ওরূপ মন্তব্যে যথেষ্ট বিরক্তি। নীরদবাবু তখন সম্পাদক। তিনি ফরাসী জ্ঞানে প্রমথ চৌধুরীর সগোত্র—দু'জনাই বোধহয় ভারতচন্দ্রের admirer, তবে নীরদ চৌধুরী শুধু তা নন। প্রমথ চৌধুরী শত হলেও 'বাঙালি পেট্রিয়ট' আর নীরদবাবু 'বাঙাল. পেট্রিয়ট' হতে পারেন কিন্তু বাঙালিও নন, সেরূপ পেট্রিয়টও নন—ইনটেলেকচুয়াল নীরদবাবুর ক্ষুরধার কলম প্রমথ চৌধুরীকে ভারতচন্দ্রের গোত্রীয় বলে 'persiflage'-এর পসারী রূপে চিহ্নিত করলে। এ লেখা প্রমথ চৌধুরী মশায়কে মর্মাহত করে বলে শুনেছিলাম। অন্ততঃ এ লেখার পরেই নীরেন্দ্রনাথ রায় ও প্রভাত গাঙ্গুলী মহাশয় প্রকাশ করেন 'রবিবারের লাঠি'। তাতে প্রমথ চৌধুরীর পক্ষ সমর্থন ছিল, আর তার উদ্দেশ্য ছিল—'শনিবারের চিঠি'কে তারই অস্ত্রে—ব্যঙ্গে-বিদ্রূপে নাজেহাল করা। কিন্তু তা সম্ভব হয় নি। লাঠির রঙ্গ ও ব্যঙ্গের চেষ্টা একেবারেই লাঠিমারা রসিকতা। হবে কি করে? বাঙলা লেখকদের মধ্যে বিদ্যায়, মনস্বিতায় দ্বিতীয় নীরদচন্দ্র চৌধুরী ছিল না, বিদ্রূপে ব্যঙ্গে সজনী দাসও না। 'রবিবারের লাঠি' বোধহয় মোট দু'সংখ্যা বেরিয়েছিল—'শনিবারের চিঠি'র আরও কিছু ব্যঙ্গের ও বিদ্রূপের মালমসলা যুগিয়ে তা বন্ধ হয়। আজও নীরদচন্দ্র চৌধুরীর সে লেখা এবং আধুনিক লেখা উল্লেখ করে পুরনো 'সবুজপত্রে'র একজন প্রবীণ লেখক বলেন, 'চৌধুরী নম্বর টু চৌধুরী নম্বর ওয়ানকে, ওয়ানের নিজের ক্ষেত্রেই, ঘায়েল করার মত শক্তি রাখতেন।'

'শনিবারের চিঠি'র নকুড় ঠাকুরের আশ্রমের লেখাটার একটা সামাজিক উদ্দেশ্য ছিল, তার জন্য অর্থদণ্ড হয়। এ গুরুবাদের দেশে কার সাধ্য নতুন পুরাতন নকুড় ঠাকুরদের পশার কিছুমাত্র খর্ব করে? আরও একটা বিষয়ে চিঠির সমালোচনা ছিল সঙ্গত। কিন্তু তার থেকে যে-দৃষ্টিভঙ্গীটি 'চিঠি'র মধ্যে উৎপন্ন হ'ল তা নিশ্চয়ই ছিল অসঙ্গত। সিটি কলেজ হোস্টেলে হিন্দু ছাত্রদের সরস্বতী পূজার চেষ্টাটা নিশ্চয়ই অসমীচীন। কলেজের ব্রাহ্ম-কর্তৃপক্ষ তাতে বিশেষ বিপর্যস্ত হন। সুভাষবাবু ছাত্রদের সে চেষ্টায় জড়িত হয়ে তখন নিজের রাজনীতিক অভিজ্ঞতার পরিচয় দেন নি, এও সত্য। 'প্রবাসী' তখন ব্রাহ্মপক্ষ রক্ষায় যত্নপর হ'ল, 'শনিবারের চিঠি'র সজনী লাগল তেমনি ব্রাহ্ম-সমর্থনে। ভেতরে ভেতরে যে রামমোহন-বিরূপতা ছিল এভাবে তা চাপা

পড়ে যাওয়ার ভালোই হয়। অশোক চট্টোপাধ্যায়, যোগানন্দ দাস প্রমুখ ব্রহ্মরা সুভাষবাবুর ওপরে আরও ক্ষুব্ধ হয়ে থাকেন। সেই ক্ষোভের প্রকাশ ক্ষেত্র হ'ল 'শনিবারের চিঠি', তার অস্ত্র—রঙ্গ ও ব্যঙ্গ। অশোকবাবুর-যোগানন্দদের সুভাষ-বিরোধী মনোভাবটা বহুদিন থেকে। 'চিঠি'র পক্ষে নজরুল অনেক আগেই নেই, কল্লোলাদি ক্রমেই অনেকটা নিমীলিত। সুভাষচন্দ্র ও তাঁর রাজনীতি 'শনিবারের চিঠি'র রঙ্গ-ব্যঙ্গের একটা জুৎসই লক্ষ্য হয়ে উঠল। অশোকবাবু ও যোগানন্দবাবুরা সুভাষবাবুর সমসাময়িক ছাত্র। অনেক সময়ে আমাদেরই মতো একজনাকে হঠাৎ জনদৃষ্টিতে বিখ্যাত হয়ে উঠতে দেখলে আমরা তারিণী কবরেজের মতো ভাবি—'ন্যাপ্‌লা—ন্যাপ্‌লা আবার ডাগডর হ'ল কবে?' —এই মনোভাবটা কতটা অশোকবাবু, যোগানন্দবাবু ও সঙ্গে সঙ্গে সজনীকে চালিয়েছে জানি না। সুভাষ-ইতিহাস আরম্ভ হয়েছিল ছাত্রদের পক্ষ নিয়ে তাঁর (সাময়িক) ব্রাহ্ম-কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বিবাদ থেকে। এর জের টেনে 'শনিবারের চিঠি'-র সাময়িক non political দৃষ্টিভঙ্গী আবার পুরনো anti-চিত্তরঞ্জন anti-স্বরাজী ধারায় যে anti-Congress, বিশেষতঃ anti-Subhas দৃষ্টিভঙ্গী হয়ে উঠেছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই—আগেই তা উল্লেখ করেছি। দলে পড়ে আমিও তাতে সায় দিতে চাইতাম, তা মিথ্যা নয়। অন্ততঃ ১৯২৮-এর কলকাতা কংগ্রেস পর্যন্ত 'খোকা ভগবান' ও 'গক্‌' (G.O.C)-এর বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ থামে নি। সে অধিবেশনে সুভাষবাবু একা পূর্ণ স্বাধীনতার স্বপক্ষে দাঁড়ান, 'চিঠি'র কাছে তাও শ্রদ্ধালাভ করে নি। 'চিঠি'র বেপরোয়া মজা করার ঝোঁক এভাবে একটু-একটু করে একটা মতের আকার নিয়েছিল।

'শনিবারের চিঠি'র কথা আর ইতিহাস আমার বিষয় নয়। তার আবহাওয়া ও তার কেন্দ্রীয় মানুষদের সঙ্গটাই এখানে আমার বিষয়। তাতেও যোগানন্দ দাস ও অশোক চট্টোপাধ্যায়ের কথা বলা হয় নি—দু'জন গুণান্বিত পুরুষ। যোগানন্দবাবু অস্থির শক্তির লেখক। অশোক চট্টোপাধ্যায় লেখায় মন দেন নি—তাই অস্থির, না হলে তিনি সুদৃঢ় মন ও মতের মানুষ, স্থির শক্তির অধিকারী। তাঁর কথা স্মরণীয় অন্য প্রসঙ্গে। এখানে এ প্রসঙ্গ শেষ করতে চাই সে সময়কার অন্যরূপ দু'-একটি কথা উল্লেখ করে। সেদিনের লেখকরা উল্লেখ করেছেন—'বিচিত্রা'-ভবনে রবীন্দ্রনাথের দরবারে 'শনিবারের চিঠি' ও 'কল্লোলের' সেই সাহিত্যিক বিবাদের মীমাংসার চেষ্টা। সে বোধহয় চৈত্রমাস, ১৩৩৪। রবীন্দ্রনাথের সেদিনের ভাষণই পরে লেখায় রূপ নেয়, 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হয় 'সাহিত্যরূপ' ও 'সাহিত্য সমালোচনা' নামে—যদিও লেখার ভাষা একেবারে নতুন। সে সভার একটি পার্শ্বদৃশ্যের উল্লেখ কেউ করেছেন কিনা জানি না।

দু'পক্ষের সওয়াল-জবাব চলছে, কী অনাচার যে সাহিত্যে চলেছে তা কবিকে জানানো হচ্ছে। পরিস্থিতি বেশ tense, দু'পক্ষ উত্তেজিত। কবি শান্ত, নির্বাক শ্রোতা—সকলের মতোই গম্ভীর। নীরদবাবু এক পক্ষের মুখপাত্র—পড়ে শোনাচ্ছেন অন্য পক্ষের একটি লেখা থেকে তাদের দুর্নীতির প্রমাণ : "বিবাহিত দম্পতির মধ্যে প্রেম একটা সংস্কার (অভ্যাস ?) মাত্র—"। বোধহয় 'প্রগতি'তে বুদ্ধদেববাবুর লেখা। কবি হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওহে, অবিবাহিতা দম্পতিও আছে নাকি ?'—চোখে সকৌতুক দুষ্টু হাসি। একমুহূর্ত কথাটা বুঝতে গেল—তারপর আসর ফেটে পড়ল হাসিতে। আর সমস্ত উত্তেজনা এমন উবে গেল যে তার বাষ্পও আর সভায় রইল না। সেদিনের একটি স্মৃতিচিত্র যদি কেউ লিখতেন তা সত্যিই উপাদেয় হ'ত। গুরুতর কিছু নয়, ছোট ছোট ঘটনার মধ্য দিয়ে পাওয়া যেত নানা সাহিত্যিকের মন ও মতের ঝলক। উপাদেয় হ'ত।

সজনীর 'আত্মস্মৃতি'তে 'শনিবারের চিঠি' ও 'রঞ্জন প্রকাশালয়ে'র কথা বিবৃত হয়েছে। 'শনিরঞ্জন প্রেসে'র পত্তন এবং শেষ অবধি 'শনিবারের চিঠি'র 'প্রবাসী' থেকে অপসরণ সজনীর সমস্ত স্বত্ব-স্বামিত্ব শুদ্ধ 'শনিবারের চিঠি'র দায়িত্ব-ভার গ্রহণ—আমারও তার ওসব দিকে যোগাযোগ ইত্যাদি। আমরা দু'জনায় বিনা দ্বিধায় বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালি'র প্রকাশে সংকল্প করি—আমি দিই লেখককে দেয় রয়্যলটি বা দক্ষিণা, সজনী দেয় তার উদ্যোগ ও পরিশ্রম। দু'জনায় হই রঞ্জন প্রকাশালয়ের অংশীদার। সে গ্রন্থ মুদ্রিত হয় 'প্রবাসী' প্রেসে। সেই প্রকাশে নীরদবাবুর পরামর্শ ও সংস্কার যে সামান্য ছিল না, তা হয়তো সাধারণের অজ্ঞাত। সেরূপই এই অনভিজ্ঞ দুই 'মালি-কের' 'পথের পাঁচালি'র সাহিত্যমূল্য সম্বন্ধে সুদৃঢ় প্রত্যয়ও এখন আর কারও মনে রাখবার বিষয় নয়। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে রসিক সমাজে বিভূতিবাবুর সম্বর্ধনা —তাঁর ডায়েরিতেই লিপিবদ্ধ। তাতে অনেক সময়ে উপস্থিতও থাকতে পারি নি—কারণ আমি তখন সাহিত্যের সীমানা ছাড়িয়ে যাচ্ছি। বহু পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে 'শনিবারের চিঠি'র ও 'রঞ্জন প্রকাশালয়ে'র ক্রম-শ্রীবৃদ্ধি সজনীর পুরুষকার ও বন্ধুভাগ্যেই সম্পন্ন হয়। আমি যখন অনুপস্থিত তখন বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, বনফুল প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের আসর হয় 'শনিবারের চিঠি' ও 'রঞ্জন প্রকাশালয়'—আমারও কোন দায় আর সে সবে ছিল না, অংশীদারীত্বও প্রচ্ছন্ন ছিল। তবু সেদিনের 'পথের পাঁচালি' ও 'রঞ্জন প্রকাশালয়ে' আমার যে গোড়ায় এমন একটা যোগ ছিল, তা আজও আমার আত্মপ্রসাদের কারণ। টাকা ফিরে নিই নি, কিন্তু সে দাবীও রাখি নি,

বিভূতিবাবুর মতো কবি-প্রকৃতির সামান্য-অসামান্য প্রবণতায় জড়িত মানুষকে বাস্তবে জানতে পারাও কি কম উপভোগ্য ? না, কম ভাগ্য ?

'শনিবারের চিঠি'-র সাহিত্যিক সুযশ প্রতিষ্ঠিত হয় আমাদের কালের শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকদের লেখায়—যেমন, তারাশঙ্কর, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, বনফুল, শেষে অমলা দেবী প্রভৃতির দানে। এ পর্বে নয়—আমি যখন জেলে 'চিঠি'র তখন (১৯৩৫ ?) সেই সাহিত্যিক রূপান্তর। আর কতটা তা সজনীর, কতটা পরিমল গোস্বামীর উদ্যোগে সম্ভব হয়, তা আমার জানা নেই। জেল থেকে ফিরে (১৯৩৭-৩৮) আমি সেই নবরূপায়ণ দেখেছি—আর তার অন্দরে যাই নি। তখন 'শনিবারের চিঠি' বিশিষ্ট সাহিত্যপত্র, সজনী স্বভাবানুযায়ী রবীন্দ্রানুগত, ক্ষমতাবান নানা গোষ্ঠীর মিত্র, এবং তাই কমিউনিস্টদেরও বিরোধী। কোন সময়েই বন্ধুত্ব একেবারে ছিন্ন না হলেও সময়ে অসময়ে দায়িত্বহীন, মজা করার বুদ্ধিতে সে আমাকেও তাই প্রায় নিষ্কৃতি দেয় নি। নিজেও জানত আমাদের মধ্যে সম্পর্কটা ছিল তার চেয়ে গভীরতর—তার মজা করা সত্ত্বেও টিকবে।

একটা সাধারণ কৌতূহলের উত্তর দিতে এখনো হয়, তাই এখানে তা কালি-কলমে মিটিয়ে দিতে চাই। অনেকই জিজ্ঞাসা করেছেন—"আপনিই তো 'শনিবারের চিঠি'র 'গোপালদা' ?" এর সহজ উত্তর হচ্ছে 'পনেরো আনা তিন পয়সা, না—এক পয়সা, হ্যাঁ।' গোড়ায় এক-আধটা লেখায় গোপালদা-র দু' একটি অভ্যাস সকৌতুকে যা ব্যাখ্যা করা হয়েছে তার সঙ্গে একটি জীবিত মানুষের সংযোগ থাকতে পারে,—কিন্তু কখনো গোপালদা'র বক্তব্য সে মানুষের বক্তব্য নয়। অন্ততঃ অযাচিত এই গৌরবে আমার দাবী নেই। ক্রমে সজনী-কান্তের গভীর, সরস ও উদ্ভট প্রয়োজনানুরূপ সকল রকমের কথা ও মনের মুখপাত্র হয় 'শনিবারের চিঠি'র 'গোপাল দা'—যেমন বঙ্কিম 'বঙ্গদর্শনে' মুখপাত্র করেছিলেন 'কমলাকান্ত'কে—বোধহয় সে দৃষ্টান্তও সজনীর মনে ছিল। মাসে মাসে কাগজ চালনার প্রয়োজনে বুদ্ধিমান সম্পাদকের আজগুবি ও বেনামা মুখপাত্রের প্রয়োজন হয়—যে-মুখপাত্রের মন, মত, কথার জন্য সম্পাদককে দায়ী হতে হবে না, অথচ সম্পাদকেরই ভাবনার সে আংশিক মুখপাত্র হবে।

বাঙলা সাহিত্যে স্রোতাবর্তনের দিকে জানা-না-জানায় তখন এগিয়ে চলেছে সাহিত্যের সৈকত থেকেও তা অনুভব করা যেত, রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিও ছিল গতিময় ও নবায়মান। কিন্তু আমাদের সাহিত্যে প্রকৃত কালান্তরের তখনো প্রায় বছর দশেক ছিল দেরী ; আর তার সেই ভাবী রূপ ছিল আমাদের ভাবনাতীত। ইয়েট্স্-এর পরে টি. এস্. এলিয়ট্-এর নাম যদি বা শোনা

যাচ্ছিল। কথা-সাহিত্যে প্রুস্ত বা জয়েসের দিগুন্মোচন ছিল প্রায় অলক্ষিত, ডি. এইচ্. লরেন্স প্রায় অজ্ঞাত। আসলে যাকে বলছিলাম আমরা অতি-আধুনিক সে নিতান্তই 'রবীন্দ্রোত্তরতা'র প্রয়াস—হয়তো অভিনবতার অস্পষ্ট অনুসন্ধান।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

'চোদ্দ নম্বর'

'১৪ নং পার্শিবাগান' এখন ভিন্ন নম্বর, গোটা বাড়িটা বিভক্ত ; 'উৎকেন্দ্রিক' নামও বিলুপ্ত। এক সময়ে '১৪ নং' ও 'উৎকেন্দ্রিক' সমার্থক না হোক কলকাতার সুধী সমাজে প্রায় সমোল্লেখিত হ'ত। অথবা 'উৎকেন্দ্রিক' নাম অপেক্ষা '১৪ নং'-এর আড্ডা বলেই পরিচয় ছিল প্রচলিত। ভাগ্যবান বসু ভ্রাতাদের তা পৈতৃক ভবন—পিতা চন্দ্রশেখর বসু বোধহয় এই বাড়ি নির্মাণ করে দ্বারভাঙ্গা থেকে এখানে বাস করতে আসেন। 'বড়দা' শশিশেখর বসু, 'মেজদা' রাজশেখর বসু, তৃতীয় কৃষ্ণশেখর বসু এবং কনিষ্ঠ ডাক্তার গিরীন্দ্রশেখর বসু—এই চার ভ্রাতার বাসভবন। একমাত্র কৃষ্ণশেখর বসু বোধহয় লেখায় হাত দেন নি —সরকারি কাজ ছাড়া, এই স্বল্পভাষী মানুষটি হাত দিয়েছিলেন পল্লীসংস্কারে, তাঁর সে চেষ্টায় পূর্বপুরুষের গ্রাম উলো নবজন্ম পেয়েছে 'বীরনগরে'। অন্য ভ্রাতাদের নাম বাঙলা সাহিত্যের পাঠকদের পরিচিত।

১৪ নং পার্শিবাগানে আড্ডা শুধু সাহিত্যের নয়, তৎকালীন বাঙালির সাংস্কৃতিক জীবনের এক প্রেরণাক্ষেত্র ছিল। ক্লাব ইংরেজদের জাতীয় জীবনধারার অঙ্গ, ইংরেজি সাহিত্যেরও পৃষ্ঠভূমি—অন্ততঃ সেই 'মারমেড্ টেভার্নে'র যুগ থেকে তার ঐতিহ্য অবিচ্ছিন্ন। কালের নিয়মে আমরাও এদেশে ক্লাব গড়তে যাই, কিন্তু তা জমে না। 'রবিবাসরে'র মতো সভা কখনো জেগে বসে, কখনো ঝিমোয়। আমাদের সমাজে জমে যা সে 'আড্ডা'—সে গ্রামে হোক, শহরে হোক, চণ্ডীমণ্ডপে হোক, সাময়িক পত্রের আপিসে হোক, কিম্বা হোক রাজনৈতিক দলের দপ্তরে বা পাড়ার কোনো সম্পন্ন সামাজিক মানুষের বৈঠকখানায়। কেউ তা গড়তে পারে না, তা গড়ে ওঠে আপনার নিয়মে—কেউ তার হিসেবও রাখে না। বাঙালির বৈশিষ্ট্য আড্ডা—এবং বাঙালির তা দুরারোগ্য ব্যাধি। বাঙালি সংস্কৃতির যাত্রা, কবিগান, তরজা বা থিয়েটারের মতোই 'আড্ডা তার একটি ইনস্টিটিউশন'। আমি একটা লঘুরচনা লিখেছিলাম মধ্যচল্লিশে—যুদ্ধের মধ্যভাগে—আর 'আড্ডা' নামে একটা বইও লিখে ফেলেছিলাম তখন। '১৪ নং পার্শিবাগানের' উল্লেখ তাতেও আছে। উল্লেখই আছে, কিন্তু কথা নেই। উল্লেখ ছিল তখনকার জলজ্যান্ত 'প্রবাসী'র আড্ডা, 'শনিবারের চিঠি'র আড্ডারও—যে-সময়কার কথা (১৯২০-১৯৩০) কেউ ঠিক লেখেন নি।

১৪ নং পার্শিবাগানের সেই আড্ডা সত্যিই তখন কী ভাবে গড়ে উঠেছিল আমি তা জানি না, জানবার কথাও নয়। জানে, এমন লোক আজ বোধহয় কেউ নেই। কিন্তু 'পরশুরামের' সাহিত্যে আবির্ভাবের পূর্বেই ১৪ নং পার্শিবাগানে 'উৎকেন্দ্রিক ক্লাব' গড়ে উঠেছিল, আমার তা স্থির বিশ্বাস। অর্থাৎ, অন্ততঃ ১৯১৯-২০-রও বেশ আগে। আর, শিল্পী যতীন্দ্রকুমার সেন ছিলেন বোধহয় তার কাণ্ডারী। ১৯২০-২৪-এও আমরা দেখেছি তিনিই তার চায়ের ভাণ্ডারী। আমি অবশ্য তখনো 'রঙ্গিনবাবুর ভাই'—'সঙ্গে এসেছি' রূপেই সস্নেহ সঙ্গলাভে ধন্য। চায়ের যে-ভাণ্ডারী, আড্ডার সে-ই কাণ্ডারী—এই স্বাভাবিক নিয়ম। ১৪ নং-এর ফটক দিয়ে দক্ষিণের বারান্দায় উঠলে—সামনে ডাঃ বসুর চিকিৎসা-গৃহ, ডাইনে উপরে যাবার সিঁড়ি, বামে উত্তর-দক্ষিণে লম্বা ঘর—জোড়া তক্তপোসের ওপর শতরঞ্জি, শাদা চাদর বিছানো দিশী ফরাস। কলকাতার অবস্থাপন্ন বাঙালি ভদ্রলোকের গৃহে আজ কি আর 'বৈঠকখানা' আছে ? না, তা পালন করা সম্ভব ? সম্ভব হলে আজ নিশ্চয় সে ঘর সোফায়-সেটিতে 'ড্রয়িং রুম' হয়ে গিয়েছে, সেই ঢালা ফরাস, ঢালা গল্প আড্ডা শুদ্ধ বৈঠকখানা এখন লোকান্তরিত। ১৪ নং-এর সেই বৈঠকখানায় দুপুরের পর থেকে অপরাহ্নের দিকে যেমন খুশি আসবেন সেখানকার বন্ধু-গোষ্ঠী—যতীন্দ্রকুমার পূর্বেই এসেছেন। প্রায়ই তারপরে আসবেন 'ভারতবর্ষ' আপিসে যাবার পূর্বে সম্পাদক জলধর সেন। আরও একটু পরে মধ্যাহ্ন তখন নিস্তেজ, 'বড়দা' শশিশেখরবাবু, পাড়ার দু-একজন শিক্ষিত লোক, 'প্রবাসী'র কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, পার্শ্বের বিজ্ঞান কলেজের কোনো অধ্যাপক বা বসুবিজ্ঞান মন্দিরের মধ্যবয়স্ক গবেষক, বেঙ্গল কেমিক্যালের শহুরে আপিসের ফেরতা তার ম্যানেজার রাজশেখর বসু, রোগী দেখবার অবকাশে ডাক্তার গিরীন্দ্রশেখর বসু, তাঁর বন্ধু ডাঃ সত্য রায়, কিম্বা রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। পাঁচটা না বাজতেই ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, মাঝে মধ্যে 'প্রবাসী'র তাঁদের সহকর্মীরা ও সজনী দাস. অশোকবাবু প্রভৃতি, আর নিজ নিজ আপিস শেষে আরও দু-একজন নিষ্কর্মা বাঙালি ভদ্রলোক একে একে আসবেন। সহজ ভাবেই আসত শিল্পীরা, কবিরা, সাহিত্যকরা, বিজ্ঞানের অধ্যাপকরা এবং তাঁদের মিত্রবদাচরিত ছাত্ররা, আরও কত কে। জুতো ছেড়ে ফরাসে উঠে বসতেন, তাকিয়াও এক-আধজন আশ্রয় করতেন, ইচ্ছা হলে তর্কে যোগ দেবেন, সিগারেট খেলে যতীনদা এগিয়ে দিতেন।

শিল্পী যতীন্দ্রকুমার

যতীন্দ্রকুমার সেন সে-সময়কার কমার্শিয়াল আর্টিস্ট, সেদিকেও তাঁর সমকক্ষ কেউ ছিলেন না, উঁচু দরের শিল্পী, যথার্থ কমার্শিয়ালও নন। অর্থার্জনেও যতীনদার আগ্রহ ছিল সীমাবদ্ধ। বাঁধা চাকরি অগ্রাহ্য, স্বাধীন বৃত্তির শিল্পী। অবশ্য একটি বাঁধা গ্রাহক ছিল বেঙ্গল কেমিক্যাল, রাজশেখর বসু যার ম্যানেজার। এখনো বেঙ্গল কেমিক্যালের কোনো কোনো পুরনো বিজ্ঞাপন চোখ জুড়োয় ; দেখেই বোঝা যায়, কার কাজ। অবশ্য কার, তা আজ ক'জনা জানে ? যতীনদার নিজস্ব ছাপ বা স্টাইল তারা চেনে না। তাঁর অনেক অসামান্য কৃতিত্বও তাই বিস্মৃত, হয়তো বা বিনষ্ট। আমাদের মাসিক পত্রে সেদিন বেঙ্গল কেমিক্যালের বিজ্ঞাপন ছিল সবচেয়ে রুচি-সার্থক ছবির বিজ্ঞাপন। তাদের আগে 'কুন্তলীনে'র এচ্. বোস সে দিকে পদার্পণ করেছিলেন। কিন্তু ১৯২০-র দিককার বাঙলা মাসিকপত্রগুলিতে, বিশেষ করে তার শারদীয়াতে, বেঙ্গল কেমিক্যালের সচিত্র বিজ্ঞাপনী ফর্মা মুদ্রিত ও গ্রথিত হ'ত। পূজার ছবি ও লেখার থেকে সেই বিজ্ঞাপনী চিত্র বেশি আকর্ষণীয় ছিল, এ কথা কয়জনা জানেন ? কেউ কি সেই বিজ্ঞাপনী চিত্র রক্ষা করেছেন ?

প্রাচীন ভারতীয় জীবনযাত্রা বা অজন্টা বা বাঘের গুহাচিত্র থেকে যেন জীইয়ে উঠছে বাঙালি তরুণীর বেণী-রচনা ও কেশ-বিন্যাস। 'এখন যাঁরা বর্তমানে আছেন মর্ত্যধামে' তাঁরাও যেন সেই বর্তমানের বঙ্গদেশে কালিদাসের কালকে জীইয়ে তুলছেন অন্ততঃ শিল্পীর শিল্পরেখার দৌলতে। নব্য ভারতীয় শিল্পকে বিজ্ঞাপন-শিল্পের স্থূলতা বাঁচিয়ে যতীন্দ্রকুমার সেন অপূর্ব সার্থকভাবে প্রয়োগ করেছিলেন প্রচারশিল্পে ; সে তাঁর এক অভিনব কৃতিত্ব। তাঁর আরেক কৃতিত্ব তাঁর ব্যঙ্গচিত্র বা কার্টুন। প্রধানতঃ সামাজিক ব্যঙ্গচিত্র। আপন খুশিতে তিনি তা আঁকতেন। অনেকটা আবার তা ইলাস্ট্রেশন। পরশুরামের 'গড্ডলিকা' 'কজ্জলি', প্রভৃতিতে যতীন সেনের ব্যঙ্গচিত্র এখনো লেখাকে রেখায় সরসতা দিচ্ছে। এরূপ ব্যঙ্গচিত্রে গগনেন্দ্রনাথের পরে তিনি ছিলেন প্রধান। চঞ্চল চট্টোপাধ্যায় তখনি খ্যাত। যতীনদা পরবর্তী কার্টুনিস্টদের অনেকের পথপ্রদর্শক। চারু রায় ও দীনেশ দাস (কল্লোলের) তাঁর সমকালীন। হরিপদ রায়কে আমি প্রথম দেখি '১৪নং পার্শিবাগানে', তার স্কেচে যতীনদার সাহায্য ও পরামর্শ নিচ্ছেন হাতে-কলমে। হরিপদ রায় ক্রমে 'শনিবারের চিঠি'র আড্ডায় বাঁধা কার্টুনিস্ট হন, যতীনদাও খুশি মতো 'চিঠি'র শৌখীন যোগানদার। আমার ফেণী কলেজের সহকর্মী ইতিহাসের

অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র লাহিড়ীও ('পি. সি. এল'. 'কাফী খাঁ') পরে এসে তাঁদের সঙ্গে 'চিঠি'তে যোগ দেন। পরে তাঁকে একালের 'দৈনিক-কর্তারা' লুফে নেন, শুষে নেন। যতীন সেনের জন্যই ১৪নং ছিল 'শিল্পপীঠ'। যতীন সেনকেই তাই বলা চলে ১৪নং-এর কাণ্ডারী। 'উৎকেন্দ্রিক' নামকরণটাও বোধ হয় তাঁরই উদ্ভাবিত, অথবা আহৃত। অন্ততঃ শব্দটা তাঁর মন ও মেজাজের যথার্থ পরিচায়ক। তাঁর নিজের এবং সমবেতভাবে '১৪নং-এর'ও।

একটা মজার কথা মনে পড়ছে—'বিচিত্রা' তখন প্রথম প্রকাশিত হচ্ছে, ঢাক-ঢোল পিটিয়ে আগমনী ; বাজার গরম গল্প-গুজবে। তার প্রথম প্রচ্ছদপট আঁকছেন যতীন সেন—সাত রঙের সাতটি সূর্যরশ্মি মূর্ত হয়েছে নৃত্যপরা সাতটি নায়িকা রূপে—কী বলব তাদের, 'সপ্তরূপসী' না, সপ্তরশ্মি ? যা-ই বলি 'ইট উইল স্মেল অ্যাজ সুইট'। ভারতবর্ষের সম্পাদক জলধরদা সিগার-মুখে জিজ্ঞাসা করছিলেন, 'যতীন, 'বিচিত্রা'র কী করছ ?' যতীনদা আঁকতে আঁকতেই মুখ না তুলে সকৌতুকে উত্তর দিলেন। জলধরদা কান দিয়ে শোনেন না, চোখ দিয়ে শোনেন। সেরূপে শুনেই অন্যদের স্মিতহাস্যে যোগদান করলেন। যারা কান দিয়ে শুনেছে তারা জানে উত্তরটি ছাপায় অচল কিন্তু ১৪নং-এর মেজাজে তার জলচল অবাধ।

১৪নং-এর সে মেজাজ কিসে গড়ে উঠেছিল, বলা সহজ নয়। সে আসরে কেউ প্রবীণ বয়স্ক, কেউ সদ্য প্রাপ্তবয়স্ক, আসলে সবাই সমবয়স্ক। কথা উঠত হাজার বিষয়ের, কথায় কথায় যা উঠে পড়ে। কথা মানেই তর্ক, তাতেও অবাধ অধিকার সকলের। ধরাবাঁধা কিছু নয়, যাকে বলে নির্দিষ্ট আলোচনা, তা নয়। সেরূপ আলোচনাও দু-এক সময়ে না হ'ত তা নয়। যেমন, ব্রজেন্দ্রনাথ বোধহয় উদ্যোগী হয়ে একদিন নিমন্ত্রণ করে নিয়ে এসে-ছিলেন আচার্য যদুনাথ সরকারকে—তাঁর কাছ থেকে মুঘল যুগের কিছু কথা সকলে শুনবেন। কেউ এক-আধটি জিজ্ঞাসাও উপস্থিত করলেন। অবশ্য অন্য আলাপও হ'ল। সভ্য সদালাপ। একবার দেখেছি নৃ-বিজ্ঞানের বিশেষজ্ঞ বিরজাশঙ্কর গুহকে। সদ্য উত্তর-দক্ষিণ আমেরিকা ঘুরে এসেছেন, এক রাশি ফটো দেখাচ্ছেন মায়া, য়িকুতা প্রভৃতি জাতির লুপ্ত সভ্যতার রূপ-মূর্তির মন্দির-নগর। দু-একটি কথায় মাঝে মাঝে তা বুঝিয়ে দিচ্ছেন। স্বল্পভাষী মানুষ—আড্ডা জমাবার মতো নন। গিরীন্দ্রশেখরবাবু ও অন্য দু-একজন মাত্র আগ্রহী শ্রোতা, শুনতেও উৎসুক। কিছুটা আলাপও চলল। তখনো ওসব সভ্যতার কথা এ দেশে শিক্ষিতদেরও নিকট জনশ্রুতি। কিন্তু এ রকম ভব্য আলোচনা বেশি হলে ১৪নং-এর মেজাজে সইত না। তবে মাঝে মধ্যে জ্ঞান-

বুদ্ধিতে এক-আধটুকু শাণ না দিলে শিক্ষিত বাঙালির মন তাকে খোঁচা দেয়। এক-আধ দিন চাই ওরূপ আলাপন। ১৪ নং-এ ওরকম আলাপন নৈমিত্তিক কর্ম। নিত্য কর্ম—আড্ডা, গল্প, কথা—কথা থেকে কথায় যা এগিয়ে যায়; তর্কের ছোটখাটো ঢেউ তুলে দেয়। দৈনিক সংবাদ,—রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, যে দিনকার যা খবর বা গুজব, তা কথা হয়ে ভেসে ওঠে, তারপর মিলিয়ে যায়। কিন্তু হাস্যপরিহাসের ছটা তার মাথায় ঝিক্‌মিক্‌ করে। তারই মাঝে-মধ্যে ওরকম রসিকতার ক্ষণস্থায়ী ঝিলিক্—ছাপায় উপেক্ষিত হলেও সে-রসিকতা সকৌতুক সম্বর্ধনা পেত আড্ডায়। অবশ্য রুচির মাত্রা তাতেও একটা থাকত। ফ্রয়েডীয় অধ্যাপক ডাক্তার বসু ওরকম স্বচ্ছন্দ রঙ্গ-পরিহাসের সমর্থক। অবশ্য তাঁর নিজের মুখে অন্তরের প্রসন্ন হাসি ও অমায়িক কথা ছাড়া কিছু ফুট্‌ত না। কিন্তু তাঁর বৈজ্ঞানিক মতো এই—মুখের লাগামে এক-আধটুকু ঢিলে দেওয়া ভালো। সামাজিক বিধিনিষেধের ফাঁস তাতে সহনীয় হয়। কারণ, লাইফ্ ইজ্ হার্ড টু এন্ডিওর। জীবনের চারদিকে সুনীতি-দুর্নীতির 'নিষেধ' ও কড়াকড়ি। ক্যাথার্সিস-এ দুঃখ সহনীয় হয়, বিধি-নিষেধের কড়াকড়িও হাল্কা হয়। ১৪ নং পাশিবাগান মানত না আসলে শুচিবায়ুর বাড়াবাড়ি। এই কৃত্রিম বেড়া-ভাঙার কাজে রাখালদাস বাঁড়ুজ্জের সহজ খ্যাতি ছিল। কিন্তু কলকাতায় তাঁর তখন উপস্থিতি বিরল।

শশিশেখর

নির্বিকার রসিকতায় অগ্রণী ছিলেন, অগ্রজ শশিশেখর বসু। বোধহয় তখন তিনি পঞ্চাশোর্ধ্ব। কী তিনি করতেন আগে, জানি না। শুনেছি এক সময়ে ইংলিশম্যান, পাইওনিয়র প্রভৃতি সেকালের সাহেবী পত্রিকায় ইংরেজিতে লিখতেন স্কেচ্ বা রেখাচিত্র—স্কেচ্ মানে মজার দৃষ্টিতে দেখা মানুষ ও পৃথিবীকে, আর হাল্কা দু-এক টানে তা আঁকা। সাহেবদের ওরূপ লেখায় সহজ রুচি। শশিশেখরবাবুর লেখাও তাদের চোখে উৎরেছিল। কিন্তু ধরা-বাঁধা চাকুরি বোধহয় শশিশেখরবাবু করেন নি—করবার মতো লোকও নন—সাহেবদের সঙ্গে বনিবনা হ'ত না। স্বচ্ছন্দ মানুষ; বোধহয় সকলের ছন্দকে সমভাবে বুঝতেন বলে দেশী-বিদেশী কারও মুরুব্বিয়ানার ছন্দে নিজেকে মেশাতে চাইতেন না। একেই তো বলে উৎকেন্দ্রিক, না? তা হলে শশিশেখর-বাবুই 'উৎকেন্দ্রিক ক্লাবে'র জ্যেষ্ঠ-উৎকেন্দ্রিক; যতীন সেন তাঁর অনুবর্তী। তথাপি শশিশেখরবাবু ১৪ নং-এও 'কেন্দ্রী' নন—হাসিরঙ্গে বিশ্রামভোগী,

বিশ্রম্ভালাপী—কলমে হাত দেন না, মুখে অমায়িক, হাসি-রঙ্গে কৃত্রিমতার পরোয়া নেই। কথা হতেই পায়ের তেলোতে হাত বাজিয়ে শুনিয়ে দিতেন পাঞ্জাব মেল হাওড়া ছেড়ে রওনা হ'ল। তুফানের মতো ছুটল—তাই ধ্বনির ছেদ নেই; স্টেশন আসছে, ধ্বনির তাই একটু মাত্রা কমে, গতি একটু সংহত হয়ে স্টেশনে না থেমে প্লাটফর্ম পেরিয়ে যাবে দপ্ দপ্ দপ্ শব্দ তুলে, আবার দ্রুতগতি, শব্দের ঝড়,—এমনি করে শেষে বর্ধমান—থামল ট্রেন। তবলায় ওস্তাদরা যা দেখিয়ে শ্রোতাদের তাক্ লাগান, পায়ের তেলোতে শশিশেখরবাবু তুলতেন সেই বোল। মজার কাণ্ড। আসলে, সব জিনিসের মজার দিকটাতে ছিল তাঁর নজর। তখন 'সীতা'র বিখ্যাত অভিনয়ে বাঙালির বৈঠকখানা সরগরম। ১৪ নং-এও উৎসাহ যথেষ্ট। পরিচ্ছদ-অলঙ্কারেরও প্রশংসা সকলের মুখে। তবে রামচন্দ্রের গহনা পরা যেন মাত্রাতিরিক্ত। শশিশেখর-বাবু বললেন, "তা নয়তো কি? তোর ছোট ভাই-এর বউ উর্মিলা, তাকে একখানা গয়না দিতে পারলি না। আর যত গহনা কি, তোর পো—।" আঃ, শশিশেখরবাবুর 'unprintable' কথাগুলি যদি পরিবেশন করা যেত। অন্ততঃ তা না করাতে শশিশেখরবাবুর নির্বিকার অকৃত্রিম সরসতা অজ্ঞাত থাকল। সে খেদ অবশ্য এখন ততটা নেই। কারণ অনেক পরে শশিশেখরবাবু আবার হাতে কলম নিয়েছিলেন। তখন বোধহয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। পাটনায় থাকতেন, তাঁর একমাত্র পুত্র সেখানে পশু চিকিৎসালয়ের অধ্যাপক। সেখানকার অধ্যাপক যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ তখন অবসর নিয়ে 'বিহার হেরাল্ড'-এর সম্পাদনার ভার বহন করছেন। চমৎকার তাঁরও ইংরেজির কলম। অফুরন্ত উইট্। রঙ্গীন হালদারের থেকে শশিশেখরবাবুর তিনি সন্ধান পেলেন, তাঁকে আবার লেখায় প্রবৃত্ত করানো যায় না? চেষ্টা সার্থক হ'ল—'এসবোস্'-এর ইংরেজি স্কেচ্ 'বিহার হেরাল্ডে' দেখা দিল। সেদিনের কথা এদিনের কথা নানা দিনের কথা, পুরনো বিহারের স্মৃতিচিত্র-রেখা, নতুন বিহারের রেখাচিত্র—মজার চিত্র। শশিশেখরবাবু আবার কলম তুলে নিয়েছেন। ইংরেজি কলম, সমসাময়িক সাংবাদিকতার কালিতে ডোবানো। মজার হাসিতে স্বচ্ছন্দ গতি। সপ্তাহের পর সপ্তাহ বিহার হেরাল্ডে তা দেখা দিত। যুদ্ধের শেষে ছেলের সঙ্গে শশিশেখরবাবু কলকাতায় ফেরেন—১৪ নং-এ নয়। মানিকতলার বাজারের নিকটে বিবেকানন্দ রোডের ভাড়াটে ফ্ল্যাট। ইংরেজি লেখা তখনো চলছে। এমন সময় আরেকজন এসে তাঁর হাতে তুলে দিলেন বাঙলা কলম; শ্রীপরিমল গোস্বামী গুণং বেত্তি। রবিবারের 'যুগান্তরে' তিনি শশিশেখরবাবুকে নামালেন। যাঁর চোখ আছে, মন আছে,

হাত আছে, তাঁর হাতে ইংরেজিতে যা ফোটে বাঙলায় তা কম ফুটবে কেন ?—এ আমারও ধারণা। তবে শশিশেখর তখন বৃদ্ধ ? কে বললে ? মনে-মেজাজে তিনি চিরদিনকার ১৪ নং-এর উৎকেন্দ্রিক, সহজ স্বচ্ছন্দচিত্ত, সব জিনিসের মজার দিকটি খুশি মনে দেখে খুশি। 'যুগান্তরে'র সে-সব শশি-লেখা শুনেছি সঞ্চিত ও প্রকাশিত হয়েছে। যাই হোক্ এবারে পরিমল গোস্বামীর কৃতিত্ব এই গুপ্তরত্ন আবিষ্কার। না হলে ১৪ নম্বরের এই জ্যেষ্ঠ বসুবন্ধুর কথা বাঙলা সাহিত্যে কেউ জানতে পারত না। মেজ বসুবন্ধু রাজশেখর বসু ও কনিষ্ঠ বসুবন্ধু গিরীন্দ্রশেখর বসুর থেকে জ্যেষ্ঠ মনে-মেজাজে, ভাবেভাষায় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, অথচ সহোদর নিঃসন্দেহে। রাজশেখরবাবুর মন বৈজ্ঞানিকের মন, গিরীন্দ্রশেখরবাবুর মনও তা-ই। বুদ্ধির আলোক-ছটায় মার্জিত, অমায়িকতায় পরিচ্ছন্ন ; সেইজন্যে সহৃদয়তায় ও রসদৃষ্টিতে তিন জনই সহোদর।

রাজশেখর

রাজশেখরবাবুর শান্ত ও স্বল্পবাক গাম্ভীর্য সর্বজনবিদিত। ১৪নং-এও তা অটুট থাকত। সেখানেও তিনি দ্রষ্টা, কিন্তু উপভোক্তাও বটেন, তবে প্রচ্ছন্ন মনে। কৌতুক রসের অনেক সিদ্ধ সাধকের মতো রাজশেখর বসুও মিতভাষী। দেখলেই সমীহ করতে হয়। কিন্তু কথা শুনলে সঙ্কোচ কাটত—সৌজন্য-স্নিগ্ধ কণ্ঠ শ্রোতাকে আশ্বস্ত করত। জীবনের শেষ দিকে গাম্ভীর্যের অপেক্ষা এই অনুচ্ছ্বসিত অমায়িকতাতে এসে তাঁর ব্যক্তিত্ব আরও সহজতর হয়ে উঠেছিল। কিন্তু গোড়ায় ও মধ্যযুগে তবু ভাবা দুষ্কর হ'ত এ মানুষ গম্ভীর রস ছাড়া আর কিছু সইবেন। হয়তো ১৪নং-এর আড্ডাই তাঁর ব্যক্তিত্বকে এই পরিণতি দিয়েছিল। শুনেছি, 'পরশুরামের' প্রথম রঙ্গ-রচনা যতীন সেনের হাত দিয়ে যখন জলধর সেনের হাতে পৌছয় তখন 'ভারতবর্ষে'র সম্পাদক মানতে চান নি তা রাজশেখর বসুর লেখা, ধরে নিয়েছিলেন তা ব্যঙ্গচিত্রকর যতীন্দ্রকুমার সেনের নাম ভাড়িয়ে লেখার রাজ্যে প্রবেশ। আবিষ্কারে দেরি হ'ল না ; বোঝা গেল—না, যতীন সেনের নয়। রাজশেখর বসুর সম্বন্ধে প্রচলিত যা ধারণা তাও কিন্তু মিথ্যা নয়—তাঁর প্রবন্ধ, আলোচনা, এমন কি, 'চলন্তিকা' রচনায়ও তা প্রমাণিত হয়েছে। রঙ্গ-রচনায়ও কি সে আভাস অনুপস্থিত ? তিনি যুক্তি-মার্জিত বৈজ্ঞানিক চেতনার মানুষ। আমার ধারণা তাই আদর্শবাদী হলেও বস্তুবাদী বলেই একটু সংশয়বাদীও। আবার, বস্তুবাদী বলেই জীবনযাত্রার আভ্যন্তরীণ অসঙ্গতি সম্বন্ধে সচেতন ; অসঙ্গতি দেখে তাঁর কৌতুকবোধ জাগ্রত হয়। স্বভাবগুণে রসের আবেদন মানেন, রসবস্তুকেও

রসবস্তু রূপে দেখেন। বৈজ্ঞানিক নিশ্চয়তার মতোই শিক্ষা, রুচি ও অনুভূতির স্বচ্ছতায় তাঁর মন পুষ্ট ও মার্জিত, মুক্ত ও শান্ত। একবার আধুনিক কবিতা নিয়ে কথা উঠতে বলেছিলেন, 'আমি ধরতে পারছি না বলেই কি তা বাজে ? —দেখেছি তো বুদ্ধিতে কাব্যবোধে ওরা (বিশেষ করে এই সর্বনামের আড়ালে উদ্দিষ্ট ছিলেন কবি বিষ্ণু দে) কিছুমাত্র খাটো নয়।' সে অবশ্য পরেকার কথা। ব্যক্তিগত ভাবে আমি পর্যন্ত ওঁর থেকে তখনও ১৪নং-এর দিনেও উৎসাহ পেতাম। সে সময়ে (১৯২৫।২৬ ?) বৌদ্ধ কাহিনী ও ইতিহাস প্রভৃতিতে আমারও প্রবল ঝোঁক। বিম্বিসারের মৃত্যু ও কপিলবস্তুর ধ্বংস নিয়ে দু-দুটো কাব্যনাট্যও লিখে ফেলেছিলাম। পাণ্ডুলিপি থেকে তা পড়ে আমাকে তিনি সস্নেহে প্রচুর উৎসাহ দিয়েছিলেন। মাথা খারাপ হতে পারত, কিন্তু হয় নি, আমি ওসব ছাপাই নি--কারণ, মনে হয়েছে ওঁর উৎসাহের উৎস আমার লেখা নয়, বৌদ্ধযুগের শান্তশ্রী, তার প্রতি ওঁর অন্তরের অনুরাগ ; পাণ্ডুলিপিতে তারই ছায়া দেখেছিলেন তাঁর নিজের চোখের গুণে—লেখকের লেখার জন্য নয়। প্রাচীন ভারত ও সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁর গভীর অনুরাগ কেন, প্রেমই ছিল। গুপ্ত প্রেম নয়, ব্যক্ত প্রেমও। মেঘদূতের অনুবাদ, রামায়ণ-মহাভারাতের বাঙলা সারানুবাদে দেখা যায় সে প্রেমের সাক্ষ্য। কিন্তু দেখা যায় সেই প্রেমেও তাঁর বাস্তব বুদ্ধি আচ্ছন্ন হয় নি, রসবোধও না। জাবালির উপাখ্যান, হনুমানের স্বপ্ন প্রভৃতিতে দেখি অনুরাগের সঙ্গেই কৌতুক-দৃষ্টির সহাবস্থান, লঘু-গুরুর সমাবেশে। জীবন চিরদিনই জীবন—রামের যুগে এবং সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেডের দুর্যুগেও। মূল প্যাটার্নটা কিসের ? বোধ হয় ('গড্ডলিকা'য় কথিত) সেই 'দি ক্যাট'-এর। গল্পটা এই- বুনতে বুনতে গৃহিণীর উলের টান পড়ে যায়, তাই ভিন্ন রঙের উল দিয়েই বোনাটা শেষ করতে হয়। আর নিচে পশমি অক্ষরে লিখে দিতে হয় 'দি ক্যাট',—কার সাধ্য না হলে তা বোঝে কী। রাজশেখরবাবু তা মেনে নিতেন কিনা কে জানে। জগৎ প্রপঞ্চেও প্যাটার্ন আছে, কিন্তু উলে কুলোয় না। মানুষকে দিয়ে জাগতিক পশমে মহাগৃহিণী লিখিয়ে নেন—'দি ক্যাট', তারই নাম 'দর্শন'।

ভারতীয় সভ্যতার প্রতি অনুরাগ রাজশেখরবাবুর আধুনিক কালের বিজ্ঞানানুরাগের থেকে কম ছিল না। গিরীন্দ্রশেখরবাবুর মুখে শুনেছি—একবার তিনি (গিরীন্দ্রবাবু) উপস্থিত অনেককে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—'কোন্ যুগে জন্মালে তুমি খুশি হও—অতীতে, না, ভবিষ্যতে ?' (ওটা বোধহয় তাঁর মনোবিশ্লেষণের একটা জিজ্ঞাস্য প্রশ্ন)। রাজশেখরবাবু জানিয়েছিলেন—'অতীতে', কিন্তু যুগটা আমাকে বেছে নিতে দিতে হবে—গুপ্তযুগের পরে নয়।'

গিরীন্দ্রবাবু নিজে কিন্তু চাইতেন—'ভবিষ্যতে, কারণ, আরও কত কী দেখতে পাব।' তখনকার দিনে আমারও মন সায় দিত রাজশেখরবাবুর সঙ্গে, আর এখন দেয় গিরীন্দ্রশেখরবাবুর সঙ্গে—তবে এই বিংশ শতাব্দীর রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীর যুগটাতে এদেশে জন্মে নিতান্ত ঠকি নি—অবশ্য ১৯৬০-এর পরে 'ইণ্ডিয়া দ্যাট ইজ ভারত'ও ধাঁধাঁ লাগায়ে। আর স্পুটনিক উড়ছে, কিন্তু মহাকাশী অস্ত্রও বাড়ছে।

গিরীন্দ্রশেখর

কিন্তু এখানে ওকথা নয়—প্রাচীন ভারতের প্রতি বসু ভ্রাতাদের অনুরাগ পৈতৃক উত্তরাধিকারে। শুনেছি, পিতা চন্দ্রশেখর বসু গীতার ভাষ্য রচনা করেছিলেন। গিরীন্দ্রশেখরবাবুও মনোবিশ্লেষণের দিক থেকে গীতা ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর 'পুরাণ প্রবেশ' নিশ্চয়ই তাঁর গভীর অধ্যয়ন ও অনুসন্ধিৎসার প্রমাণ। ইণ্ডোলজিস্টরা গিরীন্দ্রবাবুর পুরাণ-বিচার মানেন না। ওসব বিষয়ের বিচারে ভারতীয়দের কাণ্ডজ্ঞান রক্ষা করা সহজ নয়। কে তা হারিয়েছেন, সাইকোএনালিস্ট না ইণ্ডোলজিস্ট, কোন্ পক্ষ, সে বিচারের আমরা কি বুঝব? তবে সাধারণ পাঠকের সাধারণ বুদ্ধিতে আমার মনে হয়—ডাঃ বসুর যুক্তিধারা ভেবে দেখবার মতো। অবশ্য তাঁর পুবাণের সিদ্ধান্ত গ্রাহ্য না হলেও ডাঃ বসুর মনীষা অগ্রাহ্য হবার নয়। তাঁর প্রতিষ্ঠা-মনোবিদ্যায়। ফ্রয়েডের পূর্বেই তিনি ফ্রয়েডীয় ধারায় 'বিজ্ঞান' ও 'ইচ্ছার' 'অন্তর্বিরোধের' তত্ত্বের গবেষণা প্রকাশিত করেছিলেন—'দি কন্সেপ্ট অব্ অপোজিট উইশ'কে ফ্রয়েডও সাদরে অভিনন্দিত করেছিলেন। ওঁর প্রধান পরিচয় মনোবিদ্যার অধ্যাপনায় ও মনোরোগের চিকিৎসায়—আর ওঁর সহাস্য সহৃদয়তায়। বলেছি, ওঁদের শাস্ত্রের চিকিৎসার জন্য প্রথম প্রয়োজন—রোগীর বিশ্বাস অর্জন, রোগীর হৃদয়বেদ্যতা। তাই সর্বাগ্রে চিকিৎসকের নিজের চাই সহর্মিতা, সেই সঙ্গে সহৃদয়তা; এবং সেরূপই বৈজ্ঞানিক স্থির বুদ্ধি। গোড়ার কথা—মানুষকে বোঝা, তাই বোধহয় শেষ কথাও;—প্রজ্ঞা। অথবা, আমাদের অবৈজ্ঞানিক বুদ্ধিতে বলতে পারি—প্রথম প্রেম, দ্বিতীয় প্রজ্ঞা। এ দুয়ের বেশ কিছু পরিমাণে মিলন তা হলে ঘটেছিল ডাঃ গিরীন্দ্র-শেখর বসুর চরিত্রে। মানুষকে বুঝতেন সুহৃদসম্মত সহৃদয়তার। দু-একটা কথায় আভাস দিই।—কে একজন পদস্থ ঘরের বিধবা মহিলা সকাল থেকে হেঁটে হেঁটে গঙ্গাস্নান আর মন্দিরে মন্দিরে ঠাকুর প্রণাম না করে গৃহে ফেরেন না। পথে-ঘাটে পায়ে হেঁটে সর্বত্র যাচ্ছেন। আভিজাত্য ও মান-অপমানের

খেয়াল নেই—বুঝি পাগল হয়ে যাবেন। আত্মীয়রা যত বলেন শুনবেন না—'গঙ্গাস্নানে ও ঠাকুর মন্দিরে কি গাড়ি করে যায়?' আত্মীয়রা দুর্ভাবনাগ্রস্ত। সময় থাকতে ডাঃ বসুর কাছে নিয়ে এসেছেন। ডাঃ বসু তাঁদের বুঝিয়ে বলেন, 'ক্ষতি হচ্ছে কি কারো? তা না হলে ওঁকে এভাবেই থাকতে দাও। জীবনের চাপ নিজের মতো করে উনি মানিয়ে নিচ্ছেন। এ ভাবে যদি তা মানিয়ে নেওয়া সম্ভব হয় তা হলে তাই ওঁর পক্ষে ভালো; তোমরা কিছু চাপিয়ে দিয়ে সেই চাপ বাড়িও না।'

অন্য একজনা নিঃসন্তানা মহিলার চিকিৎসাতে তিনি বিড়াল ছানা পুষবার ব্যবস্থা দেন—বাচ্চাটাকে খাইয়ে-পরিয়ে, সাজিয়ে-গুছিয়ে ভদ্রমহিলার দিন কেটে যেত। খুব মামুলী ব্যবস্থা মনে হবে। কিন্তু এরূপ অনেক ক্ষেত্রে তার বেশি কিছু করা মানুষের অসাধ্য—সমাজানুমোদিত পথে প্রবৃত্তিকে স্বস্তি দিতে পারাই তখন রোগের চিকিৎসা। অবশ্য রোগের যথার্থ কারণটা নির্জ্ঞান মনে প্রবৃত্তির দুর্দমনীয়তা; সে বিষয়ে রোগীকে সজ্ঞান করাই নাকি মনোবিশ্লেষকদের চিকিৎসার অঙ্গ। জানি না, সজ্ঞান হলেও মন বুঝ মানে কিনা। একটা হাসির কথা মনে পড়ল। এক বয়স্কা মহিলার মাথা প্রায় খারাপ হতে যাচ্ছে—স্বামীর চরিত্রে তাঁর সন্দেহ। ভদ্রলোকেরও বয়সটা তখন কম নয়—ষাটের ওপরে। ভদ্রমহিলাকে আমাদের মা-জেঠিমারা বোঝাতে চেষ্টা করেন—তাঁর (স্ত্রীর) বয়স হয়েছে, ভদ্রলোকেরও বয়স হয়েছে, ওসব কী ছাই-ভস্ম ভাবেন তিনি? ভদ্রমহিলা শোনেন, চুপ করে থাকেন; তারপর গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে সরবে বলে ওঠেন, "বুঝি গো বুঝি, কিন্তু মন তো বোঝে না।" কথাটা, মনকে বোঝালেই কি মন বোঝে? না, বুঝলেই বুঝ মানে?

এমন ভাবে তা হলে বোঝাতে হবে যাতে মন বোঝে। অর্থাৎ মন বুঝ মানে। সেভাবে বোঝাবেন যিনি তাঁর ওপর রোগীর থাকা চাই পূর্ণ বিশ্বাস—গীতায় অর্জুনের যেমন ছিল শ্রীকৃষ্ণের ওপর। সর্বধর্মান্ পরিত্যাজ্য একমাত্র শ্রীকৃষ্ণে শরণং ব্রজ। সেরূপ কৃষ্ণকল্প ব্যক্তিত্ব চাই—বিশ্বরূপ দর্শন নয়, মানুষের আত্মরূপ দর্শন,—আর তাতে আস্থা জাগিয়ে দেওয়া। এ ব্যক্তিত্ব প্রতাপ বিস্তার করে না, মৃদু আলোকে আশ্বস্ত করে তোলে চারদিক। গিরীন্দ্রশেখরবাবুর ব্যক্তিত্ব ছিল তেমনি;—সহর্মর্মিতায় আস্থা অর্জন, তারপর বিশ্লেষণ-শেষে রোগীর আত্মদৃষ্টি জন্মানো এবং নিজের শক্তিতে আস্থা জাগিয়ে দেওয়া তাতে সুসম্ভব হ'ত। আর একটি ব্যাপার বলি—চিকিৎসা-ঘটিত না হোক, তাও তো সেরূপই ফলদায়ক। হিন্দু-মুসলমান বিরোধ নিয়ে কথা হচ্ছিল।

নানা স্থানে দাঙ্গা। আমি তো নোয়াখালির মানুষ, আমার মাথায় ওটা চেপে থাকত। কথায় কথায় তা বললাম—'ব্যক্তিগতভাবে আমার পক্ষে এ এক অস্বস্তিকর চেতনা'। ডাঃ বসু যা বললেন সংক্ষেপে তার মর্ম এরূপ ঃ কেন ? হিন্দুরা বলবে, মুসলমানরা খুব পরমতঅসহিষ্ণু। হয়তো কথাটা কতকটা ঠিক, কিন্তু সর্বক্ষেত্রে ঠিক নয়। আর সম্পূর্ণ ঠিক হলেও তা নিয়ে তোমার বিশেষ উষ্মার কারণ নেই। দশটা আপত্তিকর জিনিসের মতোই এই আপত্তিটাও উষ্মাহীন মন নিয়ে মেনে নিতে পার। যে-বিষয়ে তোমার যতটা উষ্মা, প্রায়ই জানবে তোমারও মনে আছে সে বিষয়ে ততটা অবুঝপনা। এক্ষেত্রে তোমারও মনে মনে আছে অসহিষ্ণুতা মুসলমান বা অন্যদের সম্বন্ধে। নিজের সেই অসহিষ্ণুতা ছাপিয়ে যেতে তা চাপিয়ে দিচ্ছ মুসলমান-নামক সম্প্রদায়ের ওপর। আসলে দোষটা তোমারই ভেতরে, মূল অন্যত্র নয়, দোষটা অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে নিজের উষ্মাকেই সঙ্গত বলে মনে করছ।—স্কেপ গোট করে পাপ হালকা করা—পুরনো পদ্ধতি এবং তত্ত্বটা কিন্তু শোনায় নতুন। —একেবারে উল্টোকথা ! মানতে আমারও বাধা হওয়া উচিত। কিন্তু 'না' মানেই 'হাঁ', বরং যতোই বলবো 'না' ততই বেশি করে বলা হবে 'হাঁ'—এই হ'ল মনোবিশ্লেষণের আরেক সিদ্ধান্ত। যাই হোক, ওব্যাপারে 'না' বলতে কিন্তু আমারই দ্বিধা হ'ল। তত্ত্বটা এমন সহজ persuasive ভাবে গিরীন্দ্রশেখরবাবু আমার সামনে ধরে দিলেন যে, আপত্তি করবার ঝোঁক জাগল না। সেইটাই ওঁর ব্যক্তিত্বের গুণ, আঁর চিকিৎসাবিদ্যার মূল। মনে হ'ল—ঠিক, এদিকটা ভেবে দেখা দরকার। ভাবতে গিয়ে আর তা মিথ্যা মনে হ'ল না। নিজের ব্যক্তিগত ধারণায় ও আচরণে ও রকম ব্যাপারে সেদিন থেকে আমি গিরীন্দ্রবাবুর বিশ্লেষণ গ্রাহ্য করতে চেয়েছি। আচরণে সব সময়ে নিশ্চয়ই পারি নি, কিন্তু মনে গ্রাহ্য করেছি। তবে, হিন্দু-মুসলমান সমস্যাটা তো ব্যক্তিগত সমস্যা নয়। ওটা 'গ্রুপগত' সমস্যা। ব্যক্তির ক্রোধ-শান্তির প্রেসকৃপশনে সামূহিক বা কালেকটিভ রোগ দূর হয় না। তা কি ডাক্তার বসু বুঝতেন না ? বুঝতেন, কিন্তু সামাজিক রোগ প্রশমনের দাবাই তাঁর হাতে নেই। কারও হাতেই নেই—বিধাতা থাকলে তারই এ নষ্টামি।

ডাক্তার বসু দশ জনের ক্রোধ-ক্ষোভ দেখতেন, অন্যদের উত্তেজনায় সহজ মৃদু হাসি হাসতেন। হয়তো এজন্যই বিশেষ কোনো আন্দোলনে যোগ দিতে উৎসাহ বোধ করতেন না। আন্দোলনটা তো বাহ্য। মূলতঃ তা একটা বর্ণ-চোরা রিপুর বাড়াবাড়ি। এ তত্ত্বের হাস্যকর ব্যাখ্যাও কেউ কেউ সেদিনে না করেছেন তা নয়। যেমন, সন্ত্রাসবাদীদের রাজদ্রোহ আসলে পিতৃদ্রোহ, 'ঈদিপাস-

কমপ্লেকস'! এরূপ ফ্রয়েডীয় মতে জাহাজ থেকে ঝাণ্ডা পর্যন্ত সবই হয় স্ত্রী, নয় পুরুষ চিহ্নের প্রতীক। মিতভাষী রাজশেখরবাবু তাই বলেছিলেন, 'উপায় নেই, পৃথিবীর সব কিছুই হয় লম্বা নয় চ্যাপ্টা। বিধাতারই এই নষ্টামি।

সব কিছুরই মাত্রা আছে। মাত্রা পেরিয়ে গেলে তত্ত্ব কেন, সত্যও আর সত্য থাকে না। অতি-উৎসাহও মনেরই রোগ, কম বা বেশি; আর তা সেই 'ঈদের' ছলনা। বলা বাহুল্য, ওরকম বাড়াবাড়ি বসুদের মেজাজে ছিল না। স্বচ্ছবুদ্ধি, পরিশীলিত মন, সৌজন্য ও সরসতা,—এসব গুণে বসু ভ্রাতারা যতটা স্বচ্ছন্দ মানসিকতা নিজেদের চারদিকে বিকীরণ করা সম্ভব তা সহজ ভাবেই করে গিয়েছেন। তা বিশেষ জানানও নি। 'লুম্বিনী পার্কের' (নামটি লক্ষণীয়, বুদ্ধের স্মৃতিবহ) মনোরোগের চিকিৎসালয় ডাঃ বোসের কীর্তি, শুনেছি রাজশেখরবাবুও তাতে বেশ কিছু অর্থ দান করেছিলেন (১৪ নং পার্শিবাগানের একাংশে অনুরূপ 'গিরীন্দ্র ক্লিনিক' স্থাপনা তাঁদের মনোবিজ্ঞান সমিতির কৃতিত্ব, তার পরিচালনা বোধহয় ভ্রাতুষ্পুত্র ডাঃ বিজয়কেতু বসুর দায়িত্ব)। উত্তেজনা, উদ্দীপনাতে ওঁদের রুচি না থাকা স্বভাবগত। ১৪ নং পার্শিবাগানেও তর্কে উত্তেজনা তাঁদের ছিল না। অথচ সকল কথায় তাঁরা স্বচ্ছন্দভাবে যোগ দিতেন। 'বাঙালি ভদ্রলোকের মতো'—তার বেশি নয়।

অবশ্য '১৪নং পার্শিবাগানের আড্ডার মেজাজ বসুদের তৈরী করতে হয় নি। তাঁদের চেয়ে অন্যেরাই বেশি তৈরী করেছেন,—অথবা কেউ তৈরী করে নি, তৈরী হয়ে উঠেছে আড্ডার নিয়মে। তবে এ'দের অনেকের নাম 'পরশুরামে'র গল্পে সুরক্ষিত, কিন্তু নামগুলি আরোপিত, চরিত্র নামানুযায়ী নয়। কেদার চাটুজ্জে মানুষটি গল্পের কেদার চাটুজ্জে নন, তা সকলেই জানেন। তবে নামে নয়, আড্ডার বেশ দু-একজনাকে নাম ছাড়াও চেনা যায় যতীন সেনের রেখাচিত্রে। বিশেষ করে রাজশেখরবাবুকে। শুনেছি, রাজশেখরবাবুর স্ত্রীর, ও বাড়ির মেয়েদের কারও কারও মুখের আদল আছে দু-একটি রেখাচিত্রে—অবশ্য তাঁরা অন্তঃপুরিকা, আত্মীয়-পরিজনদের মাত্র দেখা। তবে মিসেস বসুর কথা শুনেছি। আমার বোন লক্ষ্মীকে তিনি বিশেষ স্নেহ করতেন। মিসেস বসু ছিলেন প্রাণময়ী গৃহকর্ত্রী, রাজশেখরবাবু যেন স্থিতপ্রজ্ঞ দর্শক। বসুগৃহিণী আলাপে-আপ্যায়নে-কৌতুকে সানন্দ, ব্যক্তিত্বময়ী ও মহিমময়ী। ডাক্তার বসুর স্ত্রীর কথাও শুনেছি। কোথায় এক ইংরেজ অধ্যাপককে ডাক্তার বসু সস্ত্রীক নিমন্ত্রণ করেছেন। সাহেব মিসেস বসুকে কী ইংরেজিতে জিজ্ঞাসা করছিলেন। ডাঃ বসু জানান উনি ইংরেজি জানেন

না। সাহেব ক্ষমা চেয়ে বললেন, "আপনি ইংরেজি শিখে নিলেন না কেন?" ডাঃ বসু তা অনুবাদ করে দিতেই মিসেস বসু বাঙলায় বললেন, "বলো উনিই বা বাঙলাটা শিখলেন না কেন? বিশ বছরের ওপর তো বাঙলা দেশে আছেন।" সকল রকমেই সদুত্তর, বুদ্ধিতে ও মর্যাদাবোধেও। সাহেবকেই মানতে হ'ল ত্রুটিটা আসলে তাঁরই।

১৪ নং আড্ডার জম-জমাটের দিনে, বোধ হয় ১৯২৮-এ, একবার মহোৎসাহে 'উৎকেন্দ্রিক' দল অভিনয় করেন 'চিকিৎসা সংকট'। মাত্র একরাত্রির অভিনয়—বাঙলা নাট্যমঞ্চের ইতিহাসে তাই তা অধ্যায় নয়। কিন্তু অনুচ্ছেদ হওয়া উচিত। কলকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটের সেই অভিনয়-সন্ধ্যা স্মরণীয়। উদ্যোক্তা, প্রযোজক যা-ই বলি, যতীন সেনই 'অধিকারী'। মহড়া, রূপসজ্জা সবই তাঁর ব্যবস্থাপনা। অভিনেতারা অবশ্য সবাই শৌখীন, আর 'উৎকেন্দ্রিক'—চমৎকার অভিনয়, সঙ্গে হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়ের ছিল 'পুঁটিমাছের গান', আর হেকিম সাহেবের দরবারে আমাদের বন্ধু বিনয় মুখুজ্জের গজল। বেশ জমেছিল অভিনয়-গুণে সেই কমিডি,—অ্যালোপ্যাথ, হোমিওপ্যাথ, কবিরাজ, হেকিম, আর শেষে ডঃ বিপুলা মল্লিক—একমাত্র স্ত্রী ভূমিকা। সে ভূমিকায় দ্বিজুবাবু (অধ্যাপক দ্বিজেন গাঙ্‌লী), মনোবিজ্ঞানের স্নাতকোত্তর ছাত্র, বোধ হয় বয়ঃকনিষ্ঠ—আমার থেকেও হয়তো বয়সে ছোট, বরাবর '১৪ নং'-এর একজন। বিপুলা মল্লিকের ভূমিকায় তাকে বেশ মানিয়েছিল।—ও চরিত্রের পক্ষে একটু বেশি সুশ্রী, আর একটু কম বিপুলা। সব শুদ্ধ '১৪ নং' অভিনয়ে সমুত্তীর্ণ।

তবে '১৪নং' পার্শিবাগানে নাটকের অপেক্ষা সাহিত্য ও চিত্রকলারই গল্প আলোচনা বেশি হ'ত। 'পরশুরামে'র লেখা সেখানে অনেক সময় প্রথম পঠিত হ'ত, তারপর 'নারদ' (যতীন সেন) চিত্রিত করতেন। পাঠ-কালে বা ছবির শেষে ব্যঙ্গ-রসিকতারও অভাব হ'ত না—রাজশেখরবাবু সকৌতুকে শুনতেন, স্বল্পতম কথায় সাড়াও দিতেন। তা ছাড়াও, তখনকার বাঙালি জীবনের সাহিত্যের ও চিত্রের সব খবরই ১৪নং-এ পৌঁছত, আড্ডার বিষয়ও হ'ত। আবার, সাহিত্য-শিল্পের নানা আইডিয়ার প্রেরণার ও পরিকল্পনার পক্ষে সেই আড্ডা ছিল এক পীঠস্থান। ওখানকার কথা ও তাড়নাতেই 'ভারতবর্ষে' প্রথম দাদার (রঙ্গীন হালদারের) 'মনোবিকার' প্রবন্ধমালা লেখা হচ্ছিল—বাঙলায় তা বোধ হয় মনস্তত্ত্বের প্রথম আলোচনা। আমার মতো আরও দু-একজনার কাঁচা হাতের গল্প-প্রবন্ধও ওখানকার সম্পর্কেই 'ভারতবর্ষে' দাখিল ও গ্রাহ্য হয়। অবশ্য আমার হাত কাঁচা

হলেও আমার বয়সের কেউ কেউ তখন সাহিত্যে 'উদীয়মান' থেকে প্রতিষ্ঠিত-প্রায়। আমি স্রোতের নুড়ি—প্রতিষ্ঠিত ছেড়ে স্থিতও নই, স্রোতের ধাক্কায় এখানে-ওখানে ঠোকর খেতেই অভ্যস্ত।

'১৪ নং' পার্শিবাগানেও কিছুটা ঠাঁই পেয়েছিলাম—না হলে একটা দিক দেখা সম্পূর্ণ হ'ত না। মধ্যবিত্ত জীবনের তিক্ততাহীন একটা রূপ। চারদিক তখন ওজিনিসটা তত স্বস্থ নেই। '১৪ নং' মোটামুটি সচ্ছল ভদ্রলোকদের আড্ডা। ইংরেজি শিক্ষা-দীক্ষায় যাদের উদ্ভব ও প্রসার, জীবনে যাদের স্থিতিবোধ আছে, নিশ্চিন্ত এবং নিরভিমান' আলাপে মেলামেশায় যাঁরা জানেন বাঙালি ভদ্রলোকের জীবন এভাবেই নিরাপদে ও নিরুদ্বেগে গড়ে উঠেছে, এ ভাবেই চলেছে এবং বরাবর এই ভাবেই চলবে। কোনো কিছু নিয়ে বেশি বাড়াবাড়ি মাতামাতি করাটা আদিখ্যেতেপনা। একটা সহজ sense of belonging আছে কিন্তু তা commitment নয়। এই বাঙালি ভদ্রলোকের সেই নিরুদ্বিগ্ন, শিক্ষা সংস্কৃতির একটা পাদপীঠ ছিল '১৪নং'—যে ১৪ নং আজ বস্তুতঃ নেই, প্রতীক হিসাবেও আধুনিক ভাষায় 'প্রয়াত', আমাদের ভাষায় 'বিগত',—অথবা বিলুপ্ত বাঙালি ভদ্রলোকের প্রতীক।

নবম পরিচ্ছেদ

প্রবাসীর পাথেয়

ঘোরা পথে আমি সাংবাদিকতায় গিয়ে পৌঁছুই—দু'দুবার—১৯২৭-এ, ও ১৯৪০-৪১। বাবা আগে তার বিরোধী ছিলেন, ১৯২৭-এও উৎসাহ দেন নি। তবে আপত্তি করলেন না। বোধ হয় ভাবলেন, প্রবাসী-মডার্ন রিভিয়্যু জর্ন্যাল, কিন্তু দৈনিকপত্র নয়, ওয়েলফেয়ারও তাই। 'ওয়েলফেয়ার' প্রবাসী-প্রতিষ্ঠানের ইংরেজি সাপ্তাহিক ; অশোক চট্টোপাধ্যায়ের নিজস্ব সন্তান। সেই গোষ্ঠীর নতুন সন্তান হিন্দী মাসিকপত্র বিশাল ভারত, কিছুকাল পূর্বে ভূমিষ্ঠ হয়েছে। পণ্ডিত বনারসীদাস চতুর্বেদী তার সম্পাদক ; রামানন্দবাবু 'সঞ্চালক'। কুলকে তা পবিত্র ও প্রতিষ্ঠানকে কৃতার্থ করবে, এই ছিল প্রবাসী কর্তৃপক্ষের স্বপ্ন। অন্যায় স্বপ্ন নয়। কুল পবিত্র হয়েছিল, কিন্তু প্রতিষ্ঠান বৈষয়িকভাবে কৃতার্থ হয় নি। কেন, তা বোঝা অসম্ভব। হিন্দী-সংসারে বিশাল ভারত উচ্চাঙ্গের সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক পত্র হয়েছিল, তাতে সন্দেহ নেই। সম্পাদক চতুর্বেদীজী সৎ, দায়িত্ববান্ ও সর্বসম্মানিত লেখক ও সম্পাদক। তাঁর হিন্দী সহকর্মীরাও সুযোগ্য ছিলেন। 'সঞ্চালক' রামানন্দবাবুও প্রবাসীর সমস্ত সম্পদ দিয়ে অকুণ্ঠিতে বিশাল ভারতের পুষ্টিবিধান করতেন। বাঙলা প্রবাসীর থেকে হিন্দী বিশাল ভারত কোনো অংশে ন্যূন ছিল না। কেন তবু বৈষয়িক সাফল্য লাভ করল না? হয়তো হিন্দী শিক্ষিত পাঠকের বিশেষ রুচিকে তা আকৃষ্ট করত না ;—অন্ততঃ তখনো করতে পারে নি। যাই হোক, ওয়েলফেয়ার-এর সম্বন্ধে প্রবাসী প্রতিষ্ঠানের কোনো আশা পূর্বে ছিল কিনা জানি না ; অন্ততঃ তখন আর ছিল না। অশোক চট্টোপাধ্যায়ের উৎসাহ ওয়েলফেয়ার থেকে শনিবারের চিঠিতে আগেই চলে গিয়েছিল। আমি সম্পাদকীয় কর্মে নিযুক্ত হলাম—কাগজটাকে করলেন সাপ্তাহিক। আমিও যে খুব উৎসাহিত বোধ করেছিলাম তা নয়। তবে প্রবাসীর লেখাতে আমি আবাল্য পুষ্ট, ও-প্রতিষ্ঠানে যুক্ত হতে তাই আগ্রহ ছিল। লোভও ছিল—প্রবাসীর ছত্রচ্ছায়ায় শনিচক্রের সাহিত্য আসরে। প্রবাসী তো নিশ্চয়ই, মডার্ন রিভিয়্যুর এলাকাও দুষ্প্রবেশ্য নয়। তখনো প্রবাসীতে লেখা ছিল বাঙালি লেখকের গর্ব। মডার্ন রিভিয়্যুতে লেখা বেরুলে তো মনে করতে পারতেন দেশের বুদ্ধিজীবীদের নিকট তার জন্য দ্বার এখন উন্মুক্ত হচ্ছে। প্রবাসীতে অবশ্য আমি আগেও লিখেছি। মডার্ন

রিভিয়্যুতে খুচরো এক-আধ লাইন লিখেও তবু কম গর্ব বোধ করতাম না। এক-আধ লাইনের বেশি লেখার সুযোগও ছিল না। আমি খাশ কর্মী ওয়েলফেয়ারের। প্রবাসী-মডার্ন রিভিয়্যুর কর্মী তো সেই সুবাদে। প্রবাসী-মডার্ন রিভিয়্যুর সম্পাদকীয় কর্মীদের সম্পাদন ব্যাপারে কিছু করতে হ'ত না, লিখতে হ'ত না, লেখা বাছাই করতেও হ'ত না,—লেখা পাঠিয়ে দিতে হ'ত সম্পাদকের গৃহে। সম্পাদকীয় কর্মীদের প্রধান কাজ প্রুফ্ দেখা, এবং কিছু কিছু কাঁচি চালানো—দেশ-বিদেশের নানা পত্র থেকে কিছু তথ্য সংকলন করা ; সে-সব তথ্য কিছুটা বাছাই করা এবং পণ্যশস্য, দেশ-বিদেশের কথা প্রভৃতি যে-সব সম্পাদকীয় বিভাগ আছে দরকার মত তাতে ওসব কাঁচি-কাটা উদ্ধৃতি জুড়ে দেওয়া। কিন্তু একটা সুযোগ তাতে অফুরন্ত—দেশ-বিদেশের শ্রেষ্ঠ সাময়িক পত্রের সঙ্গে পরিচয়ের। ও-আফিসের সেই পত্র-পত্রিকাগুলির ওপরে ছিল আমার বিষম লোভ। প্রায় অসংযত ও অসংহত আসক্তি। রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতি—বিজ্ঞানের আবিষ্কার ও প্রগতি,—ওসব পত্র থেকে সকল প্রসঙ্গ গোগ্রাসে গিলতাম। তাতে কোনো বিষয়েই সত্যিকার অধিকার জন্মাবার কথা নয়—জন্মেও নি। জন্মে পল্লবগ্রাহিতা। আমার ক্ষেত্রে তা বোধ হয় নতুন জন্মাল না, সুযোগের প্রাচুর্যে দুর্দান্ত রকমে বৃদ্ধি পেল।

আমাদের দেশের সাংবাদিকদের তখনো পল্লবগ্রাহিতা ছিল বিধিলিপি। এক মুর্গী নানা দরগাতে মানত না করলে মালিকদের চলত না। সাংবাদিকদের বাধ্য হয়ে হতে হ'ত জ্যাক্ অব অল্ ট্রেড্স্, সব বিষয়ে কলম চালাবার মত মানুষ। অবশ্য সেরূপ মানুষ দৈনিক পত্রেরই প্রয়োজন—মাসিক পত্রের নয়, সাপ্তাহিক পত্রেরও নয়। ওয়েলফেয়ার গোড়ায় ছিল অশোক চট্টোপাধ্যায়ের দেহচর্চার কাগজ,—কিন্তু জমছিল না। দেহচর্চার কাগজ থেকে আমার নিজের ঝোঁকে ক্রমেই নানা চর্চার কাগজ হয়ে পড়ছিল—সম্পাদক অশোক চট্টোপাধ্যায়েরও শুধু মুষ্টিযোগ নয়, নানা দিকেই ঝোঁক ছিল। কলম চালাতে-চালাতে আমি পল্লবগ্রাহিতা রপ্ত করছিলাম। আমার চোখ ছিল সেদিনের 'নেশন এ্যাণ্ড এ্যাথিজিয়মে'র দিকে, আর মার্কিনী সাপ্তাহিক 'নিউ রিপাবলিক'-এর দিকে। ভালো লাগত তাদের রাজনীতিক, সাংস্কৃতিক নিবন্ধ, এবং 'এসে' ধরনের লঘু কলমের লেখাও। কিন্তু তা ইংরেজিতে লেখা আমাদের অসাধ্য, বাঙলায় তখনো তার দিন আসে নি। অথবা, তার দিন চলে গিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের 'মাভৈঃ', 'পাগল' প্রভৃতি লেখা বা 'পঞ্চভূত' প্রমাণ, দিন একদিন এসেছিল। পঞ্চভূতের উপযুক্ত আসর বোধহয় বাঙলায় কেন কোনো সাহিত্যেই কোনো

কালে আসে নি। তার ক্ষেত্র রবীন্দ্রনাথের মন। বাঙলায় অবশ্য যথার্থ সাপ্তাহিক কোনো দিনই জন্মাল না—সেরূপ ইংরেজি ভাষার সাপ্তাহিকই বা জন্মাল কই আমাদের দেশে ? এদেশের সাহেবরা 'ক্যাপিটেল' চালাতেন, চুটকিও লিখতেন। ভারতীয়দের এক-আধখানা সাপ্তাহিক ছিল, তবে তা অন্য চরিত্রের, যেমন গান্ধীজীর 'ইয়ং ইণ্ডিয়া'। কিম্বা, পরে সুভাষবাবুর 'ফরওয়ার্ড ব্লক'—তাতে আমিও কলম চালিয়েছি। 'ওয়েলফেয়ারে'র তো ওরকম কিছু হবার সম্ভাবনা ছিল না ; তা হতে চাইত নানা বিষয়ের কাগজ।—রাজনৈতিক সামাজিক মন্তব্যই বেশি, সাংস্কৃতিক সাহিত্যিক রচনার স্পর্ধাও এক-আধটুকু রাখতাম। একটা ভরসা—রামানন্দবাবু ছাড়া কেউ সে লেখা পড়বে কিনা সন্দেহ। অশোকবাবু দেখবেন, কিন্তু পড়বার সময় পাবেন কখন ? প্রবাসী প্রতিষ্ঠানের পরিচালনার ভার তাঁর ওপর ; শনিবারের চিঠির তিনি উৎসাহী পেট্রন ও কর্তা, মাঝে-মাঝে ব্যঙ্গ-রচনাকার। তা ছাড়া, বক্সিং-এ ব্যায়ামে, সঙ্গীতে শিল্পে—হাজার রকমের সামাজিক আয়াসে এবং আয়োজনে—কিসে তার আগ্রহ কম ? চলা-ফেরায় ব্যস্তবাগীশ একেবারেই নন, কিন্তু সত্যই ব্যস্ত মানুষ। 'ওয়েলফেয়ার' তিনি পড়বেন কখন ? তবে রামানন্দবাবুর দৃষ্টি থাকত, তা বুঝতাম। প্রতিদিন সকাল থেকে দৈনিক পত্রগুলি আগা-গোড়া দেখা, পড়া, প্রয়োজনীয় অংশ লাল পেন্সিল দিয়ে দাগানো—'মডার্ন রিভিয়্যু'র নোটস্ ও 'প্রবাসী'র বিবিধ প্রসঙ্গের উপকরণ হয় সে-সব তথ্য ;—দেশ-বিদেশের সাময়িক পত্রও তেমনি দাগ দিয়ে 'টিক্' দিয়ে পড়া—ইংরেজি বাঙলা দু' কাগজের সংকলন বিভাগের ব্যবহারের জন্য ;—দু' কাগজের জন্য দু' হাতে সম্পাদকীয় লেখা—নিশ্বাস না ফেলে ; এবং নিশ্বাস ফেলার অবসর করে একবার করে আফিসে আসা, আর কিছু না হোক নিজের (ও পরের) লেখার প্রুফ্ দেখে সেই অবসরটুকুও নিঃশ্ছিদ্র করে ফেলা ;—প্রতিদিনের এই সাধারণ রুটিনের মধ্যেও দেখেছি বৃদ্ধ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের দু'একবার সময় হ'ত—'ওয়েলফেয়ারে'র কোনো লেখা কোনো বিদেশী-কাগজে উদ্ধৃত হলে বা উল্লেখিত হলে লাল পেন্সিলে দাগ দিয়ে তা আপিসে আমাকে পাঠিয়ে দেওয়ার। কৃতজ্ঞ বোধ করতাম ; কিন্তু নিশ্চিত জানতাম—এদেশের আর কারও চোখে তা পড়ে নি। প্রথম থেকেই আমি একথাও তাই বুঝেছিলাম—'ওয়েলফেয়ার' চলছে না, চলবে না। লেখায় অবশ্য আমার আলস্য হয় নি ; কিন্তু কলম চালাতে তত উৎসাহ বোধও করি নি। কী লাভ হয়েছিল কার, জানি না, তবে কাগজটা লোকসান দিয়ে আমাকে ইংরেজি লেখা অভ্যাস করিয়েছিল। বৎসর পনের পরে 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড'-এর সম্পাদকীয় লেখার

বেলায়ও অভ্যাসটা বোধ হয় খোয়াই নি, কিন্তু এখন অনভ্যাসে তার কিছু অবশিষ্ট নেই। তবু আমি এখনো কৃতজ্ঞ।

কৃতজ্ঞতার কারণ—প্রবাসী প্রতিষ্ঠানের সম্পর্কে এসে আমার প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে অনেক মনীষীদের জানবার সুযোগ হয়। সে অফিসে সাহিত্যিকরা আসতেন কম ; সাহিত্যিকদের তো অন্যত্রও দেখেছি। কিন্তু প্রবাসীর অফিস ঘরে যাদের দেখেছি তাদের অন্যত্র দেখা সহজ ছিল না। এখানে কাজে-অকাজে এত জ্ঞানীগুণীর পদার্পণ ঘটত যে, তাদের দেখাও একটা সৌভাগ্য। কেউ কেউ আবার রামানন্দবাবুর সুহৃদ—আমাদের নমস্য, বিচিত্র জ্ঞানী ও পণ্ডিত।

মেজর বি. ডি. বসু কি আজ বিস্মৃত নাম ? ঐতিহাসিকরা সেদিনেও 'রাইজ অব্ দি ক্রিশ্চিয়ান্ পাওয়ার' সম্বন্ধে নীরব থাকতেন। সম্ভবতঃ মেজর বসুর একপেশে দৃষ্টির জন্য। একপেশে ঠিক—কিন্তু সেই 'পাশটা' দেখাবার মত সাহস ও সঙ্কল্প তখন আর ক'জনার ছিল ? আর এমন দৃষ্টিই বা কার ছিল ? পরাধীনতার মর্মদাহে তাঁর মনপ্রাণ জ্বলত বলেই 'মেজর বি. ডি. বসু আই. এম. এস্.', কিছুতেই মেনে নিতে পারেন নি বড় চাকরির মাইনে, বিস্তৃত সুবিধা, ইংরেজ সহকর্মীদের অপমানজনক প্রভুত্ব। অবসর অকালে নিয়ে লাগলেন ঐ ইতিহাস রচনায় ; বিরাট ক'খণ্ডে লেখেন ভারতে ইংরেজ শাসনের তথ্যভিত্তিক বিবরণ—যার সকল তথ্যই ইংরেজদের দলিলপত্রাদির উদ্ধৃতি ও সংকলন। সে তথ্য কারও অস্বীকৃত নয়। তবে তাঁর দিনে বুর্জোয়া শোষণের বিশ্বব্যাপী পরিণতির ও সাম্রাজ্যবাদের চরিত্রের প্রেক্ষাপটে ভারতের জাতীয় পতনের ইতিহাসকে স্থাপন না করাতে অসম্পূর্ণতা সে ইতিহাসে থেকে গিয়েছে। কিন্তু অন্য পথটিও, যথা, ভিন্সেণ্ট্ স্মিথ্ বা কেম্ব্রিজ হিস্ট্রি অব্ ইণ্ডিয়ার ঐতিহাসিকদের ইতিহাস-দৃষ্টি ডঃ বসুর থেকে কম অসম্পূর্ণ নয়—অথচ তাদের বেলা তা সম্পূর্ণ বলেই সম্মানিত। 'ওয়েলফেয়ারে'ও বি. ডি. বসুর লেখা বেরিয়েছিল—'নবেল' পরিচয়ে একটা লেখা। কিন্তু মেজর বসুকে দেখলাম কি করে ?

বড়দিনের ছুটিতে অফিস বন্ধ। প্রেসে কাজ চলছে। ঘরে আমরা জন চার-পাঁচ সকালবেলা দশটা নাগাদ আড্ডা জমিয়েছি, শান্তিনিকেতনের প্রভাত-কুমার মুখোপাধ্যায়ও আছেন,—তাঁর প্রাচীন উৎকল জীবনের ওপর লেখা বই সে প্রেসে তখন ছাপা হচ্ছিল। নীচের তলা থেকে এই সময়ে কে এসে জানালে 'বড়বাবু'—রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। তাঁর আবির্ভাব ছুটির দিনে অপ্রত্যাশিত। ওই সকালে কেন ? আমরাও ত্রস্ত। সিগারেট নিবিয়ে ফেলতে দেরী হ'ল না। শুনলাম—কাকে প্রেস প্রভৃতি দেখাচ্ছেন—এলাহাবাদ থেকে কে এসেছেন।

বি. ডি. বসু ? সবাই সভ্যভব্য হয়ে বসেছি—তবে সিগারেটের ধোঁয়া একেবারে যায় নি। রামান্দবাবু বন্ধুকে নিয়ে এলেন—মেজর বসু বেঁটেখাটো প্রবীণ মানুষ। মাথায় টাক, মোটেই দুর্বল প্রকৃতির নয়। সকলকে তাঁর সঙ্গে রামানন্দবাবু পরিচয় করিয়ে দিলেন। প্রভাতবাবু মেজর বসুকে বললেন, 'আপনার সঙ্গে আগে একবার আমার দেখা হয়েছে'। মেজর বসুর চোখে ছানি পড়েছে। এক চোখেও কিছুটা দেখেন। দেখার চেষ্টা করে বললেন, 'আমার সঙ্গে ? কোথায় ?'

প্রভাতবাবু জানালেন, এলাহাবাদে—সে অনেকদিন আগে—

'এলাহাবাদে—ও'। হাঁ হাঁ, অনেক বৎসর হ'ল।—এই একুশ বৎসর—আগে—

প্রভাতবাবুও আমাদের মত একটু চমকিত হলেন,—'তা ঠিক মনে নেই।'

মেজর বসু—"হাঁ, ঠিক একুশ বৎসর। এমনি শীতকালে বড়দিনে। হাঁ, ঠিক এই পঁচিশে ডিসেম্বর—"

সকলেই বিস্ময়-চমৎকৃত। একটু পরে মেজর বসুরা চলে গেলেন। কিছুক্ষণ আমাদের বিস্ময় কাটল না—স্মৃতিশক্তি বটে!—অসামান্য স্মৃতিধর লোক আরও দেখেছি। সজনী নিজেও কম নয়, সুনীতিবাবুও আছেন। আছেন ডক্টর মহাদেব সাহা, কিম্বা রাধারমণ মিত্র। তবে এই গোষ্ঠীতেও বোধ হয় নীরদচন্দ্র চৌধুরী অগ্রগণ্য—'আজ ক'তারিখ ? গত বৎসর এ তারিখে আপনি কী করেছিলেন ? প্রথম কী করলেন, তারপরে—'

জানি না মেজর বামনদাস বসুও এতটা আপনার কথা আপনাকেই তাঁর স্মৃতি থেকে উদ্ধার করে দিতে পারতেন কিনা ; নীরদবাবু পারেন।

যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধিকেও একদিন দেখেছিলাম। অবশ্য তাঁকে শেষ দেখি বাঁকুড়ায় তাঁর নিজ গৃহে। ৯৯ বৎসর বয়স্ক বিদ্যানিধিকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ডি-লিট্ উপাধি প্রদান করে। উপাচার্য নির্মল সিদ্ধান্ত মহাশয় স্বহস্তে তা বিদ্যানিধি মহাশয়ের হাতে অর্পণ করলেন। সিণ্ডিকেটের পক্ষ থেকে আমরা ও শিক্ষকরাও গিয়েছিলাম। একটা পুণ্যকর্ম করেছে বিশ্ববিদ্যালয় তার ইতিহাসে লেখা থাকবে। কিন্তু সেই প্রথম দর্শনের স্মৃতিটা সামান্য। আমার ছাড়া মনে আছে নিশ্চয়ই আরেক জনার, নীরদচন্দ্র চৌধুরীর স্মৃতিকে কিছুই ফাঁকি দিতে পারে না—তাঁর দেখা বা না দেখা, শোনা বা পঠিত, কিছু না। তখন 'শনিবারের চিঠি'র আলোকোজ্জ্বল মধ্যাহ্ন—নীরদবাবু স্বয়ং সম্পাদক ; লিখতেন 'বলাহক নন্দী' নামে। রামানন্দবাবুর সঙ্গে বিদ্যানিধি মহাশয় এসেছেন ৯৯ নং আপার সার্কুলার রোডে। প্রবেশ-ঘরে সদ্যপ্রকাশিত কাগজ স্তূপীকৃত—হকারের হাতে ও ডাকে প্রেরিত হচ্ছে।

সে ঘরেই রামানন্দবাবু আপিসের কর্মীদের ডেকে পাঠালেন। আমি তখনো কর্মী নই,—তবু গেলাম। দেখলাম দীর্ঘ সমুন্নত দেহ, বৃষস্কন্ধ, ব্যূঢ়োরস্ক, প্রবীণ পুরুষ, দেখলে নিজেদের জন্য লজ্জা হয়,—তুলনায় আমরা বাঙালী জাতটার তুচ্ছ নিদর্শন। রামানন্দবাবু পরিচয় করিয়ে দিলেন নীরদবাবুর—'ইনি সম্পাদক'। বলাহক নন্দী? স্নেহ-মিশ্রিত কৌতূহলে বিদ্যানিধি মহাশয়ের মুখে একটু হাসি ফুটল—'বলাহক নন্দী'! এই এতটুকু!'

জানি নীরদবাবুর চোখ এড়ায় নি, শেষ উক্তিটি যে কানে যায় নি তাও নয়। বিদ্যানিধি মহাশয়ের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা—জ্ঞানতপস্বী। বিনীত হাস্যে সেই শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম অক্ষুণ্ণ রেখে—জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি 'শনিবারের চিঠি' পড়েন?

স্বচ্ছন্দ সুন্দরভাবে এরূপ দু'-একটি মিনিটের আলাপ হয়, তার কিছুই মনে নেই। যা মনে পড়ছে তা এই—বিদ্যানিধি মহাশয়ের ওই হাসি, ওই উক্তি। যতই স্নেহ-নির্দোষ হোক তা নীরদবাবুর বিরূপতা জাগ্রত করবার মত; কিন্তু করে নি। এও একটু ব্যতিক্রম বলেই মনে রাখবার মত।—উচ্চতায় ছয় ফুট হলে আপনা থেকেই সবার ওপরে মাথা উচু করে দাঁড়ানো যায়—দেখেই সকলে মানে—পুরুষোচিত। তার থেকে আধ ফুট কম হলেও সাধারণ জীবনে পার পাওয়া যায়। কিন্তু চতুর্দশ লুই ও নেপোলিয়নেরও তাতে অসুবিধা ঘটত। আমাদের মত অভাজনদের স্বপক্ষেও নজির আছে। আমার অগ্রজ বন্ধু পঙ্কজ গুপ্ত তো কত ছয় ফুটি স্পোর্টস্‌ম্যান ও স্পোর্টস-ম্যানেজারকে আজীবন খেলিয়ে বেড়ালেন। বরং মাথায় খাটো হলে বিশেষ সুবিধাও হয়ে যেতে পারে—ওরূপ এক প্রতিষ্ঠিত লোকের মুখেই শুনেছি—অবশ্য বিদেশীয়। শিক্ষিত রসিক মানুষ, স্মার্টও। প্রথম জীবনে যার সঙ্গে তার খাতির জমেছিল সে ভদ্রমহিলাও তার প্রতি ছিলেন আকৃষ্ট, বিবাহই হতে পারত। কিন্তু ভদ্রলোক বিবাহের প্রস্তাব করলে ভদ্রমহিলা তাকে প্রত্যাখ্যান করলেন। সম্মতি হ'ত —'If you were five inches taller.' ভদ্রলোককে দেখলাম স্ত্রী-কন্যাদি নিয়ে সুখী পরিবারের গৃহকর্তা। ওই উচ্চতার প্রশ্ন আর ওঠে নি। উঠেছিল আরেকবার· তিনি বলতেন,—"I am lucky, I escaped conscription, and being an unknown soldier." বিদ্যানিধি মহাশয় কি করে বুঝবেন বিধাতার মর্জি—মাথায় আরো পাঁচ ইঞ্চি উ'চু হলে আমরা হয়তো 'আননোন ইণ্ডিয়ান্'কে পেতাম না, 'নিও আরিয়ান'কেও না, এবং সাম্রাজ্যবিজয়ী ইংরেজ পেত না তাদের 'লাস্ট ইংলিশম্যান্‌কে'।—বিদ্যানিধি মশায়ের সেই প্রথম দর্শন এ কারণে যতটা এখনো মনে জেগে রয়েছে, শেষ-দর্শন ততটা নেই।

বাঁকুড়ায় তাঁর সম্বর্ধনাকালে চপলা ভট্টাচার্য ৯৯ বৎসরের বৃদ্ধ বিদ্যানিধি মশায়কে বলেছিলেন, 'আপনি তো ঋষি ?' শুনে বিদ্যানিধি মশায় আপত্তি করেছিলেন: 'চোখ নেই, কান নেই—ঋষি !' তাঁর আপত্তি ঋষিত্ব সম্বন্ধে তাঁর ধারণার জন্য। আমরা সে ধারণা মানি না। ৯৯ বছরে কোন্ ঋষির 'অতটা চোখ কান থাকত !' কিম্বা মানসিক সামর্থ্য ? তা ছাড়া, এমন জ্ঞান-তপস্যাই বা ক'জন ঋষির ছিল ?

প্রবাসী-মডার্ন রিভিয়্যুর আপিসে অবশ্য এ রকম মানুষ প্রতিদিন দেখতাম না,—তবুও দেখতাম। অন্যত্র দেখা থাকলেও সি. এফ. এণ্ড্রুজ্‌কে একদিন ওখানে দেখেছিলাম—তাঁর সমুচিত পরিবেশে। অবশ্য 'ওখানে' অর্থ প্রবাসীর বাদুড় বাগানের আপিসে, এবং 'বিশাল ভারতের' বিশেষ হেতু। 'বিশাল ভারত' কখনো বৈষয়িক সাফল্যের সন্ধান পায় নি। কিন্তু পণ্ডিত বনারসীদাস চতুর্বেদীর মত মানুষের সম্পাদনায় ও আদর্শনিষ্ঠায় তা হিন্দীর সাহিত্যে ও ভারতের জাতীয় জীবনে মহৎ প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছে। 'সমুদ্রপারের ভারত-বাসীর' সেবায় যাঁরা স্বেচ্ছায় অক্লান্ত, তাঁদের মধ্যে নিরভিমান চতুর্বেদীজী অগ্রগণ্য। গান্ধীজী, এণ্ড্রুজ প্রভৃতি মহাপ্রাণ মানুষদের নিকটও তিনি আদর লাভ করে-ছিলেন। আর ওকাজে শ্রীনিবাস শাস্ত্রী, সরোজিনী নাইডু, স্যর রাজা আলী প্রভৃতি সরকারী-বেসরকারী কর্তা ও নেতাদের কাছেও তাঁর সেবাপরায়ণতার জন্য সম্মান ছিল। আমাদেরও চতুর্বেদীজীর নৈকট্যে সমুদ্রপারের ভারতবাসীদের সমস্যা সম্বন্ধে ধারণা কিছু স্পষ্ট হয়। আর অস্পষ্ট ভাবে এ বোধটাও আসে 'নিজ বাসভূমে যারা পরবাসী' তাদের পক্ষে প্রবাসে মানুষের মত ব্যবহার লাভের আশা তো দুরাশাই, স্বাধীনতা পেলে সেই স্বদেশের আশ্রয়চ্যুত সন্তানদের জন্য সে মর্যাদা আদায় করাও ভারতের পক্ষে সহজ হবে না। কিসে হবে—? শ্বেতাঙ্গ আধিপত্যের অবসানে ? বিশ্ববিপ্লবে ? ওই দিকে ঘুরে ঘুরে আবার মন চলে যেত এসব প্রশ্নে—স্বাধীনতা না থাকলে বুঝি জাতীয় আত্মমর্যাদারও ভিত্তি রচনা করা যায় না। ভবিষ্যৎ ভারত থাক—বর্তমান অবস্থাটা সে সময়ে বুঝতে হ'ত—চতুর্বেদীজীর চরিত্রগুণে আর স্থির কর্মনিষ্ঠায়। তাঁর সাহচর্যে আরও কত কথাই যে ওরূপে স্বচ্ছন্দ আলাপ-গল্পে জানা হয়ে যেত, তা বলে শেষ করা যায় না। তাঁর হিন্দী সহকারীদের সঙ্গেও আমাদের প্রীতি গড়ে ওঠে। হিন্দী সাহিত্যের জগৎ ও হিন্দীর পুরনো-নতুন সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয়ের ভূমিকা ওভাবেই হয়ে যায়। সামান্য কথা নয়, প্রেমচন্দের কথা ও লেখা তাতেই জানি। ব্রজভাষার প্রভাব ও সুর করে পড়ার রেওয়াজ তখন হিন্দী কবিতা কাটিয়ে উঠছে। তখনো কবিতায় মৈথিলী শরণ গুপ্তের যুগ। জয়শঙ্কর

'প্রসাদ', মহাদেবী বর্মার প্রারম্ভ, 'নিরালা', সুমিত্রানন্দন পন্থ-এর এক-আধটুকু পরিচয়ও পাই। শুধু কি তাই? পণ্ডিতজী এককালে ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন, তুর্গেনেফ তলস্তয়ের ভক্ত, তবে বেশি ভক্ত 'গুরুদেবের'। পণ্ডিতজী নিজে চমৎকার জীবনীচরিত্র বা স্কেচ্ লিখতেন হিন্দীতে;—বাঙ্গলায় বোধহয় কেউ তাঁর সমকক্ষ ছিলেন না। এমন অকৃত্রিম চরিত্রের উদার-দৃষ্টি মানুষের সংস্পর্শে আসা সৌভাগ্য। তাতে হিন্দী ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি ভালবাসা জন্মে। আর জেনেছিলাম ভারতবর্ষ কত বিশাল। তা বইতে জানলেও অনুভব করতাম চতুর্বেদীজীর কাজে ও তাঁর নিকট সমাগতদের দেখে। এঁরই মধ্যে এণ্ড্রুজ একজন। পণ্ডিতজী তাঁকে যেমন সহজভাবে ভালবাসতেন ও শ্রদ্ধা করতেন এমন বোধহয় অন্য কাউকে করতেন না। আর, সহজ ভাবে না হলে বোধহয় আত্মভোলা খ্রীস্টভক্ত এণ্ড্রুজকে কেউ গ্রহণ করতে পারে না।

কি একটা গোলমালে—ফিজি না ত্রিনিদাদ থেকে—তখন অনেক ভারতবাসী দেশে ফিরছে, কলকাতায় এসে ভিড় করছে। একপাল ওরকম বিদেশ-বহিষ্কৃত ভারতীয় নারী-পুরুষ বালক-বৃদ্ধ—পণ্ডিতজীর সন্ধান পেয়ে প্রবাসীর আঙ্গিনাও ছেয়ে ফেলেছে—সেখানেই নাকি প্রবাসীর এক বিহারী দরওয়ানের সঙ্গে সেবার মিলন হয়ে গেল তাঁর বহু বৎসর আগে গ্রামত্যাগী চুক্তিবদ্ধ মজুর স্ত্রী-পুত্রের। যাই হোক, ভিড় যেমন, কোলাহলও তেমন। সুদৃশ্য নয়—হতভাগ্য লোকগুলি সভ্যও নয়। যাতনা-বেদনার ভাগই প্রায় শতকরা নব্বুই অংশের প্রাপ্য। খোঁজ পেয়ে এণ্ড্রুজ কলকাতায় রওনা হয়েছিলেন,—এসে উপস্থিত প্রবাসীর আঙ্গিনার ভিড়ের মধ্যে। মুহূর্ত মধ্যে কী যে আশা-আনন্দের একটা উত্তেজনা বয়ে গেল ভিড়ের মধ্যে! কোলাহল—কলরব—'সাহেব এসেছে রে, সাহেব এসেছে'! যেন যাদের কেউ নেই ভগবানের দূত তাদেরই কাছে এসে গিয়েছে—এমনি একটা ভরসার ধ্বনি। এণ্ড্রুজকে সবাই ছেঁকে ধরেছে! আগে তো, আমাদের শিক্ষিত ভদ্রলোকদের এণ্ড্রুজ সম্বন্ধে কত কিছু সন্দেহ তামাশা ছিল। আমাদেরই শিক্ষিত দুর্বুদ্ধির তা উদ্ভাবনা। মানুষ যেখানে শুধু মানুষ,—নিরক্ষর নিঃসম্বল অসহায়, সেখানে এণ্ড্রুজ তাদের আপনার জন—যেমন বিদ্যাসাগর হতেন সাঁওতালদের কাছে। শুধু সেবাপরায়ণ মানুষটির সম্বন্ধে সন্দেহের বাষ্পও সেখানে জন্মাতেই পায় না। ওই কৃত্রিম সন্দেহের উৎস আমাদের কৃত্রিম শিক্ষা-দীক্ষা। ইংরেজ শাসনের একটা ফল ইংরেজমাত্রেরই প্রতি আমাদের অবিশ্বাস; কিন্তু অন্যদিকে এ যে মানুষের মনুষ্যত্বে অবিশ্বাস, আমারই ভিতরের ক্ষুদ্রতার একটা বর্ণচোরা রূপ—ডঃ গিরীন্দ্রশেখর বসুর এই বিশ্লেষণটা একেবারে মিথ্যা নয়। রবীন্দ্রনাথেরও কথায় জানি 'বড় ইংরেজ' আমাদের চক্ষে

ঢাকা পড়ে যায় 'ছোট ইংরেজে'র দাম্ভিকতায়। ছোট ইংরেজের থেকে ছোট বাঙালি বা ছোট ভারতবাসী তো সংখ্যায় বা ইতরতায় কম নয়, বরং বড় বাঙালি, বড় ভারতবাসীই কম। অবশ্য আমাদের ছোটরা আমাদেরই মারতে জানে—তার বেশি সুযোগ তাদের নেই। পৃথিবীতে অন্যদের তারা নাগাল পায় না। আমাদের বড়দেরও সেরূপ বাধা। তাই বাধা ঠেলে যখন তারা সত্যই বড় হয়ে ওঠেন তখন তাঁরা গান্ধীজী, রবীন্দ্রনাথ—পৃথিবীতেই বড়। এ যুগের শ্রেষ্ঠ দুই মহান মানুষ আমাদের দেশে আমাদের মধ্যেই জন্মেছেন—এ কি নিতান্ত দৈব ঘটনা? কিন্তু প্রদীপের তলার অন্ধকার তা সত্ত্বেও জমে আছে,—থাকবে। আমরা ভদ্রলোকেরা সেই মশাল থেকে নিজেদের দীপ জ্বালিয়ে নিয়ে একটু 'আলোক দেখাতে পারি কি? প্রবাসী-মডার্ন রিভিয়্যুর মত' সাময়িক পত্রগুলি সে চেষ্টা করে; কিন্তু আমাদের দৈনিক পত্রের সে দৃষ্টি নেই; বিশেষ করে তখন তো তা দলাদলির বিবাদপত্র। মূল বিবাদ ইংরেজের সঙ্গে, কিন্তু তা চাপা দিয়ে বিবাদ তখন পরিবর্তিত মুসলমান-হিন্দুতে। সংবাদপত্র তো নয়, সব যেন বিসম্বাদপত্র। তাই সেই সঙ্গে বিবাদ সুভাষ বনাম সেনগুপ্তে। আলোক জ্বালা কোথায়, ধোঁয়ার জ্বালাই বেশি। তাদের যেন ধোঁয়াতেই স্বার্থ—ভবিষ্যতের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ—আত্মভ্রষ্ট, অস্পষ্ট দৃষ্টি।

প্রবাসীতে আরেক লাভ হয়েছিল প্রেসকর্মীদের সৌহার্দ্য। সে অবশ্য লাভ হয়েছিল অনিল ঘোষালের জন্য। অনিল ঘোষাল সম্পর্কে আমার ভাই। মেট্রিকুলেশন পাশ করে কাজে ঢুকতে চায়। অশোকবাবুকে বলতে তিনি বললেন, 'পারবে? প্রেসম্যানদের মত কলার প্রিণ্টিং শিখতে?' প্রেসম্যানরা রাজা বাজারের সাধারণ মুসলমান—'লেখাপড়া জানে না।' মেশিন চালায়, কলার প্রিটিং এবং কাজ শিখে মাসে রোজগার করে বাবুদের দ্বিগুণ-তিনগুণ। অনিল রাজি। কালো রং-এর ট্রাউজার পরে প্রেসের কালি-ঝুলি মেখে, কাজ শিখতে লাগল। প্রথম প্রথম হানিফ প্রভৃতি তো তার ওপরে সন্দিগ্ধ, দূরে দূরে রাখে, জিজ্ঞাসা করলে অনিলকে কাজ দেখাতে বা শেখাতে খুব ইচ্ছুক নয়। অনিল বুদ্ধিমান, নিজেই এগিয়ে যায়—তাদের সঙ্গে এক হয়ে নেবে। ক্রমে তা হয়—সত্যই তাদের সঙ্গে অনিল এক হতে পারল। কাজ তো শিখলই, সহকর্মী হয়ে ক্রমে হ'ল তাদের সুহৃৎ। আর সেই সঙ্গে আমিও হলাম সেই হানিফ প্রভৃতি মেশিনম্যানদের আত্মীয়। তাদের ঈদ পর্বে অনিলের সঙ্গে আমারও দাওয়াৎ মিলত। আবার আমাদের বাড়ির উৎসবের কাজেও তারা আমাদের অতিথি হ'ত। কম্পোজিটারদের সঙ্গেও আমার এরূপই আত্মীয়তা জমে উঠেছিল। লেখার প্রুফ্ প্রভৃতি নিয়ে আমার সঙ্গে তাদের

পরিচয় ঘটা স্বাভাবিক। কিন্তু পরিচয়টা সহজ ও বন্ধুত্বের হয়ে ওঠে তাঁদেরই গুণে। জোর দিয়েই বলতে পারি, প্রবাসী প্রেসের সেই নিরক্ষর মেশিনম্যান হানিফদের সঙ্গে, কিম্বা কম্পোজিটার নিবারণবাবু অতুলবাবুদের সঙ্গে এই বন্ধুত্বটা না গড়ে উঠলে আমিই ঠকতাম। জীবনে কোথাও না কোথাও অজ্ঞাতে একটা ছেদ থেকে যেত। এটিও প্রবাসীর প্রদত্ত পাথেয়।

অবশ্য 'প্রবাসী'তে আমার অনেক বেশি হয়েছিল সেখানকার সহযোগীদের সঙ্গলাভ ঃ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নীরদচন্দ্র চৌধুরী, যোগেশচন্দ্র বাগল বাঙালির নিকট বিশিষ্ট নাম। শুধু লেখার গুণে নয়, আমি জানি, চরিত্র-গুণেও প্রত্যেকে বিশিষ্ট। সাংবাদিকতার পল্লবগ্রাহিতা এঁদের স্পর্শও করতে পারে নি। নীরদবাবু অবশ্য বহুমুখী বিদ্যা ও জিজ্ঞাসায়ও encyclopaedic, এবং তাই আত্মস্থ হয়ে আত্মপ্রকাশে ও আত্মপ্রতিষ্ঠায় তাঁর বিলম্ব ঘটেছে। কিন্তু ব্রজেন্দ্রনাথ ও যোগেশ বাগল আশ্চর্য রকমের একাগ্র ও একনিষ্ঠ—নিজস্ব ক্ষেত্রে আত্ম-নিবেদিত। শিক্ষণীয় ছিল এ আত্মনিবেদন,—কিন্তু শিখতে পারি নি। বরং নীরদচন্দ্র চৌধুরীর সাহচর্যে আকর্ষণীয় হয়েছিল ওই জ্ঞানের বহুমুখিতার বিস্ময়কর বিস্তৃতি সম্বন্ধে নীরদবাবুর সতত আগ্রহ। তাঁর মেধার গুণে তাঁর বিদ্যা হয়েছিল encyclopaedic ও আত্মবিশ্বাসে সুদৃঢ়। তাতে আমার পল্লবগ্রাহিতাও কতকটা নিরস্ত হয়। অন্যদিকে তাঁর অপাত নৈতিবাদী তীক্ষ্ণতা আমার রাজনৈতিক বুদ্ধি ও বিশ্বাসকে আত্মসংশয়ে খণ্ডিত, আবার আত্ম-জিজ্ঞাসায় উচ্চকিত করে তোলে। দেশ-কালের সীমাবদ্ধতা স্বীকার, নীরদচন্দ্র চৌধুরীর চোখে, কূপমণ্ডূকদেব কাজ। দুর্জয় বিদ্যা ও দুর্বার রসনায় প্রবাসী ও মডার্ন রিভিয়্যুর কর্মীদের সকলকে তিনি চমৎকৃত করে রাখতেন। তাঁর সিনিয়র-সহযোগী ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সকলের প্রতি যেমন, নীরদবাবুর প্রতিও তেমনি স্নেহশীল, নীরদবাবুও তাঁর গুণগ্রাহী। অথচ, আপিসের প্রুফ ছাড়া ব্রজেনদা'র নিকট একমাত্র গ্রাহ্য ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙলা, —দেশকালের অতি-সীমিত একটি অংশ। নীরদবাবুর দৃষ্টিতে সেই অংশটির একমাত্র গুরুত্ব—তা ইংরেজ সভ্যতার একটা ফুট্‌নোট্। কিন্তু নবীন যুবক যোগেশচন্দ্র বাগল ব্রজেনদার সঙ্গে জুটে অবিলম্বে প্রবীণ গবেষক হয়ে উঠতে লাগলেন। শেষ অবধি সজনীও গিয়েছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর সন্ধানকর্মে—বিংশ শতাব্দীর একমাত্র কাজ ঊনবিংশ শতাব্দীর অনুসন্ধান। এ মনোভাবটা তখন আমাকে পেলে অন্যায় হ'ত না—আমারই করবার কথা গবেষণার কাজ। কিন্তু ওরকম ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালির গবেষণায় একাগ্র আত্মনিয়োগ আমার দ্বারা সম্ভব হ'ল না। আমার কাছে বিংশ শতাব্দী আরও বড় সত্য—সে

শতাব্দীর সন্তান আমরা, তাঁর দাবী আমাদের সর্বথা মান্য। প্রবাসীর আবহাওয়ায় আর নীরদ চৌধুরীর সর্বগ্রাসী বৈদগ্ধ্যের টানে আমাকে তখন পেয়েছিল নানা জিজ্ঞাসা ও সংশয়, আর ফিরে ফিরে সংশয় ও জিজ্ঞাসা।

এ সংশয়ের প্রধান বিষয় হয়েছিল আমাদের জাতীয় জীবন ও তখনকার রাজনৈতিক আন্দোলনের বিবাদ-বিসম্বাদ। 'ক্রিটিকে'র চক্ষে আমিও দেখি, সে-সব,—না দেখে পারি না ; তবু 'প্রবাসী'র চক্ষেও তা দেখতে পারি না। তাই শনিচক্রের বক্রদৃষ্টিতে দেশের নেতাদের বিদ্রূপ করতে চেয়েছি, কিন্তু দৃষ্টির বক্রতা যে দৃষ্টির বিকৃতি, তা অনুভব না করে পারি নি। অবশ্য রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় uncommitted থাকতে চাইতেন। কার্যতঃ, কিন্তু মনোভাবে তিনি গভীররূপে committed ছিলেন অন্ততঃ দুটি নীতিতে—জাতীয় স্বাধীনতায় এবং সেইরূপই রবীন্দ্রদর্শনে—আন্তর্জাতিকতায়। কিন্তু প্রবাসীর সুরে ক্রমেই এসেছিল 'ক্রিটিকের নৈতিবাদ' একথা নীরদচন্দ্র চৌধুরীও বুঝতেন। যদিও নীরদচন্দ্র চৌধুরী নিজেও দেশ ও কালের সব কিছু আন্দোলন প্রচেষ্টাকেই মনে করতেন কৃত্রিম। আমার মনে এ ধারণাটির সঙ্গে আর একটি প্রশ্নও তিনি জাগিয়ে তোলেন, কেন সেই কৃত্রিমতা? সাংবাদিকতার পথ-পরিক্রমায় ক্রমেই দেখছি—সংবাদপত্র বাঙলাদেশে বিসম্বাদপত্র—প্রথমত, এদল-ওদলের ; কিন্তু প্রধানত, ইংরেজের ও ভারতীয়দের নয়, বরং হিন্দু ও মুসলমানের।—নীরদবাবুর সাহচর্যে পেতাম পৃথিবীর আর এক সংবাদ—মানুষের সৃজন-সমৃদ্ধির। না, পৃথিবীটা এ দেশের এই আবর্জনার স্তূপে সীমাবদ্ধ নয়। কিন্তু এ দেশটা কি শুধু আবর্জনার স্তূপ? এই পলিটিক্স কি শুধুই মিথ্যা? আমরা কি একালের পৃথিবীতে 'অবান্তর'? হাঁ, মিথ্যা তাতে কম না, কিন্তু তবু তার মধ্যেই যুগের সত্য ফুটতে চাইছে। হাজার জিনিসে তো আমাদের দেশের জীবন ছড়ানো। কলকাতার পথঘাট, আলোবাতাস, লোকের ভীড়, ময়দান, গঙ্গার তীর, জাতীয় গ্রন্থাগারের ধ্যানশুদ্ধ নির্জনতা, রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' অভিনয়, উদয়-শঙ্করের নৃত্য—এসবও তো মিথ্যা নয়। এসবের প্রত্যেকেরও একটা নিজস্ব আবেদন আছে। তাও ইতিহাসের উপাদান। নীরদ চৌধুরীরই গৃহে দেখা তাঁর মহামূল্য বই, শোনা তাঁর সাহিত্য-পাঠ ও চীনা চিত্রকলার আলোচনা,—সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের গৃহে প্রাণভরে অফুরন্ত শোনা তাঁর সরস আলাপন—ভারত সংস্কৃতি, গ্রীক সাহিত্য ও শিল্পকলা থেকে চীনা কবিতা, চিত্রকলা, নিগ্রো আর্টের রূপরহস্য, এবং রবীন্দ্র-সঙ্গমে বলিদ্বীপে, যবদ্বীপে, সুমাত্রায় তাঁদের পরমানন্দকর অভিজ্ঞতা,—এসবের মধ্য দিয়ে সমকালীন বাঙালি জীবনের যে আস্বাদন তখন লাভ করতাম তাকে তো বিস্বাদ বলতে পারি না। —তবে কি

তা কৃত্রিম ? তাও যদি হয়—'যদি' কেন, নিশ্চয়ই তা কিছুটা কৃত্রিম,—তার মধ্যেই তো আমার অস্তিত্ব—আমি তো তার বাইরে নই ;—আমার পুরনো ঝোঁকে হঠাৎ দেখা পলিটিক্যাল বন্ধুর সঙ্গে হাস্য-পরিহাস—কিম্বা, নানাস্থানে চেষ্টা আরও বড় আকর্ষণে—আড্ডার টানে—পলিটিক্যাল তত্ত্ব ও আন্দোলনের তর্ক—অথবা বই, চিত্রপ্রদর্শনী, গানের বৈঠক—এ সবের আকর্ষণ উপাদেয়। একি আমার আত্মছলনা—বৈদগ্ধ্য-বিলাস ? এরূপ নানা প্রশ্ন মনে ওঠা অনিবার্য। কিন্তু সে-সব আকর্ষণ তবু সামান্য ছিল না। আকর্ষণ বহুমুখী, আকর্ষণ দেশ-বিদেশের নানা ঘটনাও চিন্তার, আকর্ষণ কলকাতার জীবনের বা সে সময়কার বাঙালি জীবনের নানা সমস্যার, নানা জটিলতার, নানা বৈষম্যের ও বৈসাদৃশ্যের শুধু নয়, যুগসত্যের !—প্রবাসী প্রতিষ্ঠানের আবহাওয়ায় গোপনে গোপনে আসছিল সংশয়, একটা অতৃপ্তি জন্মাছিল—তাদের কালচারাল purposelessness-এ। আবার, কতকটা এই কলকাতা মহানগরীর জীবনের নিয়মে এই অদ্ভুত অশেষ বৈচিত্র্যভরা কালের রূপও আমার সামনে খুলে খুলে যাচ্ছিল—সংশয়-জিজ্ঞাসার মধ্য দিয়েও বিশেষ করে দেখছিলাম—রঙ্গ ভরা বঙ্গ দেশ। সংশয় হচ্ছিল—সবই যেন রঙ্‌চটা—তার বাক্ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। জিজ্ঞাসা জাগছিল। নাড়ীর যোগ তবু গোপনে বাড়তে লাগল। কি তা ? একটি sense of belonging-এর অনুভূতি। প্রবাসীর পরিবেশেরই এই পাথেয়।

দশম পরিচ্ছেদ

ফেরারীর ঘরে ফেরা

ভেবেছিলাম ফিরব নারে—অন্তত শীঘ্র না। কিন্তু এক নাগাড়ে কলকাতা সেবার বছর দেড়েক কাটিয়ে ভাবলাম, একবার ঘুরে আসি—মাও লিখেছেন বারে বারে। ছুটি ঠিক ; এমন সময় হঠাৎ অশোকবাবু বললেন—তা পিছিয়ে দেবেন পনের দিন। আমার যেন আশাভঙ্গ হ'ল—অস্থির হয়ে উঠল প্রাণ। হঠাৎ ডাক দিল সেই নদী, সেই ঝাউয়ের সার, সেই ছায়া-ঢাকা লাল সড়ক, সেই নারকেলের মাথায় সূর্য-চন্দ্রের ঝিকিমিকি খেলা। ফেরারীর মন কেঁদে ওঠে। সানুনয়ে বললাম, না। না, চোখে জল আসে নি। কিন্তু সজনী অশোকবাবুকে বললেন, এই কেঁদে ফেলছে? না, যেতে দিন! বলুক। ছুটি মুলতুবি রইল না, রওনা হলাম। রাত্রিশেষে নোয়াখালি, কিন্তু সেই ঘুমের চোখ খুলবার আগেই, দিন-দুপুরে গোয়ালন্দ ঘাটে এসে বলে উঠলাম ঃ এই যে! পদ্মা!—যে পদ্মার কোলে আমি জন্মেছি। তারপর?—বোধহয় সেই দর্শনের অনুভূতিটা যা-ই হোক, কোনো পশ্চিমবাঙলাবাসীর হাতে ছেড়ে দেওয়াই ভালো এই গোয়ালন্দ আবিষ্কার। স্টীমার দেখতে না দেখতে পার ছেড়ে যেতে—ডাইনের ঘাসে ছাওয়া পাড় শেষ হতে না হতেই দু'কূল হারা নদী—পারাপার নেই—মাঝে মাঝে চর—স্টীমারের ঢেউ তার ঘাসের ও কাশের বনে লাফিয়ে পড়ে। ঘুরে আবার অকূল পেরিয়ে এল হয়তো লৌহজং—'দুধ, দুধ, গরম দুধ, পাতক্ষীর—একটা হুড়াহুড়ি। বাঙাল দেশের কথা যেন গালাগালি। সব ছাড়িয়ে পশ্চিমবঙ্গীয় যাত্রীরা অনেকেই এখনো পদ্মা-গামী স্টীমারের সেই 'চিকেন-কারি' বিস্মৃত হতে পারেন না। আমিও পারি না। তবু সেদিন তখন দু'চোখ মেলে দ্বিপ্রহরের আকাশের তলে সেই পদ্মার সঙ্গে মুখোমুখি করা ছিল অনেক বেশি জরুরী।

সকালে-সন্ধ্যায় দ্বিপ্রহরে যখনি দেখা যায় পদ্মা-পদ্মাই!

স্টীমারে সেদিন ভীড় কম। আমি সর্বদাই থার্ড ক্লাশের যাত্রী—কদাচ ইণ্টারের। এ স্টীমারে দু'য়ের মধ্যে তফাৎ শুধু পয়সার। ডেকে বসবার জায়গা থাকলেও বেশিক্ষণই ঘুরে বেড়াই নিচতলায় ও উপরতলায়। বিশেষ করে অভ্যাস দোতলার ফার্স্ট ক্লাশের ডেকের দিকটার সিঁড়ির উপকণ্ঠে চোখ মেলে দাঁড়িয়ে থাকা। পিছনেই তারে-ঘেরা ইণ্টার ক্লাশের খানাঘর—প্রায় খানার খাঁচা! খোদ ফার্স্ট ক্লাশের কুর্সি-পাতা ডেক স্টীমারের পুরোভাগে দোতলায়—সে তো স্টীমারের স্বর্গলোক। সাহেব-মেমসাহেব থাকলে ফার্স্ট ক্লাশের কালা

আদমীও সেখানে সতর্ক ও সশঙ্ক। যাত্রী থাক না থাক, সেখানে নিচু ক্লাশের যাত্রীর পদার্পণ নিষিদ্ধ। কিন্তু সামনে প্রবাহিতা সেই পদ্মা! সে যে অপূর্ব, অপূর্ব, অপূর্ব! ছাদের ওপর সারেঙ-এর কামরা—সে বুঝি সেদিনের ইন্দ্রলোক। সেখানে যাত্রীদের উঠবার প্রশ্ন ওঠে না—মাল্লাদেরই শুধু সারেঙ-এর সান্নিধ্য লাভ সম্ভব। সারেঙদের দেখতাম—প্রায়ই প্রৌঢ় বা বৃদ্ধ, কাঁচা-পাকা দাড়ি-গোঁফে স্থূলকায় বিশিষ্ট পুরুষ। ঘাটে স্টীমার ছাড়বার ও ভিড়বার সময় তা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিয়ন্ত্রিত করেন, সবল গলায় হুকুম দেন, 'গেরাফি কর'—'সিঁড়ি নামা,' 'সিঁড়ি ওঠা।' কখনো কালবৈশাখীর ঝড়ের সম্মুখে দু'-একবার দেখেছি—সতর্ক, দাড়ি উড়ছে, জামা-কাপড় উড়ছে, উচ্চ কণ্ঠের ক্রুদ্ধ আদেশও ঝঙ্কৃত হচ্ছে মাঝি-মাল্লার উদ্দেশে। ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বৎসর মাঝি-মাল্লা-শুখানি—সেকেণ্ড সারেঙ রূপে ডিব্রুগড় থেকে কলকাতা বা পাটনা থেকে বারাণসী পর্যন্ত পূর্বভারতের নদ-নদীকে তারা কররেখার মত চিনে চিনে বর্ষায়, গ্রীষ্মে, ঝড়ে-বাদলে বুদ্ধির পরীক্ষা, কর্ম-পটুতার পরীক্ষা দিয়ে—আর সঙ্গে সঙ্গে গলার জোরে, বপুর বিশিষ্টতায় আপন ব্যক্তিত্বকে অবিসংবাদিত করে তুলে,—তারা তবে হয় সারেঙ্—হাজার হাজার যাত্রীর জীবনের কাণ্ডারী।

দ্বিপ্রহরের সূর্য মাথাব ওপরে অথবা ছাদের ওপরে। যাত্রীদের চোখে তাই অদৃশ্য। পৃথিবীর চারদিকে রৌদ্রের দুর্বার দাহ ছড়িয়ে সে-ই সত্য। তাই তো চারদিকে একটা শুভ্র-উজ্জ্বল দাহ ও দীপ্তির পরিমণ্ডল। আর নদীর জলের ও ওপরের সূর্যালোকের মিলন-উদ্ভাসিত মাখামাখি—নিচেকার নদীর বুকে। রৌদ্রে আকাশের নীল প্রায় শাদায় মোড়া—পদ্মার তবু গেরুয়া রঙে জলপ্রবাহ ও ছোট-বড় তরঙ্গভঙ্গ। কিন্তু গর্বিতা নদীর দেহে সন্ন্যাসিনীর বৈরাগ্য নেই এক কণাও। পরিপুষ্ট যৌবনের গর্বিত সচেতনতায় অশান্ত প্রসারিত দোলায়িত তার লীলাতরঙ্গ। লক্ষ কোটি স্ফুলিঙ্গ ফুটছে জলে। শাণিত ফলকের মত তীব্র ছটা ছিটানো সর্বপ্রান্তে। চোখধাঁধানো সেই রৌদ্রের শাণিত রূপ। চোখ জুড়ানো সেই ঢেউ মেশানো জলের হাসি,—আর আকাশ পর্যন্ত প্রসারিত প্রবাহের নাতি-উদ্ধত সুনিশ্চিত মহিমা। রৌদ্রে, জলে, নদীতে-আকাশে চোখ মেলে দেখে দেখে মধ্যাহ্ন গড়িয়ে যাবে—যাবে অপেক্ষিত চিকেন কারির আস্বাদন-পরিতৃপ্ত অবকাশ। আর মাঝে মাঝে পদ্মার চর, এপারের শ্যাম বৃক্ষরেখা, ওপারের শ্যামল শীর্ষ তটরেখা চোখে দেবে ঝিলিক—তৃপ্তি আর স্ফূর্তি। অপরাহ্ণ আসবে আলোকে-জলে মায়া মিশিয়ে। আর সায়াহ্নের স্থির আগমনের পূর্বেই হঠাৎ নদী হয়ে

উঠবে অস্থির, গেরুয়াতে হয়ে উঠবে গম্ভীর, স্টীমার কম্পান্বিত, অদূরের নদীজলে দেখা দেবে ঘনীভূত কালিমার ভয়াল ভ্রূকুটি—মেঘনা ! তারপর সেই গেরুয়ায় কালিমায় ঝাঁপাঝাঁপি, চুম্বনে আলিঙ্গনে উদ্দাম সঙ্গম, গেরুয়া ছিঁড়ে মেঘনার কালোরূপ ছিটকে পড়ছে, কালোর বাপ্তিতে গেরুয়ার টুক্‌রো ছিন্ন ভিন্ন, স্টীমার কাঁপছে, কাঁপাচ্ছে, হাঁপাচ্ছে—দেহমনে দোলা খাচ্ছি। কালোতে আলোতে শ্বেত ফেনরেখার কল্লোলিত আভাস। তারপর একান্ত করে মেঘনার কালিমার বিলাস, কালো আর কালো। সমাগত সন্ধ্যার পক্ষচ্ছায়া বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে কালো মেঘনা আরও কালো। আরও বেশি কালো হয়ে মর্যাদা-গম্ভীর, শত শত ফেন-চূড়ায় জানায় আপন সীমাহীন অস্তিত্ব। হঠাৎ সার্চ লাইট জ্বলে ওঠে ! বিদ্যুচ্ছটায় ঝলকে উঠে কচুরিপানার ঝাঁক ক্ষণে ক্ষণে, আর পাল তোলা নৌকা। আলো-ঘেরা স্টীমার স্বপ্নময় হয় জলের ছবিতে, সব মিলিয়ে যায়, আবার আকাশ-জল জোড়া আঁধার। আর দূরে দূরে দেখা দেয় শেষে বিদ্যুৎ-বাতির ছিটানো নক্ষত্র,—চাঁদপুর।

এই পথের দক্ষিণা নিয়ে পৌঁছি শেষে নোয়াখালি—রাত্রি শেষে ঘুমের দেশে। সেই নোয়াখালি তখনি অনেক ক্ষয়িত—প্রায় রাহুগ্রস্ত। অথচ তার দক্ষিণে আর সেই 'শর'-ব্যাকুলিত নদী নেই—বিরাট 'প্রবীণ' চর এখন দুরন্ত-প্রসারী। যে জ্বরতপ্ত আবহাওয়ায় আমি তাকে ছেড়ে যাই সে জ্বর ছাড়বার নয়, কিন্তু আমাকে আর অতটা খিন্ন করে না। কয়দিনের মত তাই নিঃশ্বাস নিলাম বুক ভরে, নিঃশ্বাস ফেললাম বুক খালি করে। তখনকার অতি ট্রাফিক ভারাক্রান্ত ধূলোধূসর পথে, অতি-ভীড়াক্রান্ত পাড়ায় পাড়ায়, অনিশ্চয়তায় উৎপীড়িত গৃহে গৃহে আর সেই নোয়াখালির—শান্ত হোক, দুর্দান্ত হোক,—প্রাণভরা প্রকৃতি ও হাসিভরা মানুষকে পেলাম না—পেলাম তবু একটু তার সৌরভ—যা কলকাতায়ও আমার স্মৃতি হয়ে থাকে।

কিন্তু স্মৃতি ছেড়ে তা বাস্তবও হয়ে উঠতে চাইল আবার। যে-আহ্বানে আমি আগে কান দিই নি, বাবার নির্দেশে এবার তা স্বীকার করে নিই। একেবারে জুন মাসের শেষে ফিরলাম নোয়াখালি। নির্দেশটার কারণ নাকি কলকাতা থেকে রাজনৈতিক গুপ্ত রিপোর্ট। কিন্তু তা হলে সে রিপোর্ট সত্যই অমূলক। অবশ্য শিক্ষাকর্মে আমার আকর্ষণ, কি আমার রুচি বাবার এ অনুমান মিথ্যা নয়। দিন সাত পরে জুলাইর প্রারম্ভে এক সকালে আকাশ-ভাঙা বৃষ্টির মধ্যে দু-দুটি আমার ছাত্রবন্ধুর সহায়তায় নামলাম ফেণী স্টেশনে। এলাম সেখানকার কলেজে নতুন অধ্যাপক রূপে। কিন্তু এই পটপরিবর্তনের মূলে বাবা। আমি মনে মনে বললাম, এবার ফিরাও মোরে—সংস্কৃতি বিলাস

থেকে ; ঐ সাহিত্য-সৈকত থেকে,—এই স্বগৃহে—শিক্ষাদীক্ষার এলাকায়, যেখানে মানুষ-গড়ার রাজ্য।

ফেণী কলেজে দু'বছরের কিছু কম আমি কাজ করেছি। যুক্ত ছিলাম আরও দু'বছর ছুটি পেয়ে কলকাতায় ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপক (সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের) গবেষণা নবিশের বৃত্তি পেয়ে। কিন্তু সেই গবেষণার পর্বটা সম্পূর্ণ অন্যরূপ হয়, ফেণীর খাঁটি পর্বটিও যথেষ্ট অর্থপূর্ণ ; এই দুই অনুচ্ছেদ পরে বিশ্লেষণীয়। যা সহজ ও অনায়াসগামী শান্তশ্রী ফেণীর সেই মন্থর দিন-রজনীর ওপর দিয়ে বয়ে যায়, এক-আধটুকু সে দিকে তাকানো যাক—তারই মিলিয়ে যাওয়া বুদ্বুদের দিকে।

সকলেই ফেণীতে ছিলেন সুহৃদ্, সুস্থ বুদ্ধিতে একজনকে মনে হত নিজগুণে খাপছাড়া। কিম্বা মূলতঃ বিপরীত-বুদ্ধিতে অহমিকা-পরায়ণ। তাঁর সঙ্গে সম্পর্কটা নিকটতর হতে পারে নি। শেষ অবধি তাঁর জীবনটা যে শোচনীয়-ভাবে বিদীর্ণ হয়, তার জন্যই তাঁকে ভোলা যায় না—কিন্তু ভোলাই ভালো। অন্য অনেকের সঙ্গে সম্পর্কের ছেদ পড়েও সম্পর্ক অচ্ছেদ্য। সুরেশ চক্রবর্তী অবশ্য অপ্রমেয়। অন্যেরাও কেউ বিশেষ, কেউ অশেষ। অধ্যাপক নরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত শেষ অবধি সপরিবারে পণ্ডিচেরী আশ্রমেই স্থান নেন ; এবং শুনেছি সেখানেই বিগত। একহারা,—বুদ্ধিমান উজ্জ্বল দৃষ্টি, নরেন দাশগুপ্ত তখন স্বল্পভাষী, কারণ তখনি অরবিন্দ-পন্থার যাত্রী। তাঁর কল্যাণী স্ত্রী এবং চঞ্চল প্রকৃতির বালক স্বরাজ তখনো তাতে উৎসাহী নয়। সুরেশ চক্রবর্তীর পরেই নরেনবাবুর সঙ্গ ছিল আমার বিশেষ অভিপ্রেত—তর্কে-বিতর্কে তাঁকে কোনো কথা বোঝানো আমার সাধ্যাতীত। আমার বুদ্ধিকেই বরং তিনি শাণিয়ে দিতেন, সহৃদয় কথায় আমাকে প্রশ্রয় দিতেন। তাঁর কথায় নতুন করে অরবিন্দ চিন্তার আমি কিছু সন্ধান পাই—পল্লবগ্রাহীর আরেকটি হয় পল্লব-সংগ্রহ। ইংরেজির অধ্যাপক নরেন গাঙ্গুলীকেও সাহিত্য অপেক্ষা ওই ধর্মচিন্তা ও অরবিন্দ-ঝোঁকে পেয়েছিল, সাহিত্য হয়ে উঠেছিল গৌণ। হাস্য-পরিহাসে তাঁকে নিকটে পেতাম ; ভালো লাগত। সবচেয়ে স্বচ্ছন্দ-বুদ্ধি একটি সুহৃদ পেয়েছিলাম ইতিহাসের অধ্যাপক প্রফুল্ল লাহিড়ীকে—আজ যিনি 'পিসিএল'—'কাফী খাঁ'। এখনো তাঁর সঙ্গে আমার বন্ধন সরস ও আন্তরিক। জন্মগত হাত ছিল তাঁর অঙ্কনে, জন্মগত কৃতিত্ব ছিল অভিনয়-শিক্ষায় ; জন্মগত ছিল তাঁর বুদ্ধির প্রসার, আর সর্বোপরি অমায়িকতা। তিনি মনে করেন আমি তাঁকে অধ্যাপনা ছেড়ে ব্যঙ্গচিত্র-অঙ্কনে মতি বা গতি দিয়েছি। তা হলে, জীবনে আমিও একটা ভালো কাজ করেছি। তাঁর দেওয়া উপহার

একটি বলিষ্ঠ শ্রেষ্ঠ কার্টুন আজও আমার ঘরের বিশেষ সজ্জা—যামিনীরায়ের 'গোপিনী', সোমরাম হোড়ের 'যাত্রিনীর' সঙ্গে। ফেণী ছাড়লেও প্রফুল্লবাবুকে ছাড়তে হয় নি। কিন্তু সেখানকার গণিতের, সংস্কৃতের অধ্যাপক বন্ধুদের সঙ্গ হারিয়ে ফেলি।

ছাত্র-পড়ানো ছাত্র-ঠেঙানো বা সাহিত্যের নামে নিষ্ঠীবন নিক্ষেপে পরিপক্ক হবার পূর্বেই আমিও সাহিত্যের অধ্যাপক-বৃত্তি থেকে বিদায় নিয়েছিলাম। তবু, হঠাৎ শোনা 'স্যর' এই আহ্বানে কোনো প্রৌঢ় কলকাতার ফুটপাতে আমার পদধূলি নিতে নুয়ে পড়ে যখন তখন বিড়ম্বিত, চমৎকৃত চিত্ত কৃতজ্ঞ হয়ে ওঠে ফেণী কলেজের প্রতি,—জানতে চাই যাদের আর জানতে পারি নি সেই কয়েকটি অবিস্মৃত-মুখ তরুণের কথা। বিশেষ করে দু-একটি বুদ্ধিমান মুসলমান ছাত্রের সংবাদ—নামও হারিয়ে ফেলেছি, হারায় নি স্নেহ, আগ্রহ, সঙ্গে সঙ্গে একটু আশা তারা কি মুসলিম বাঙালির জন্য সত্যই সচেষ্ট? শুনি তারা কেউ কেউ পূর্বপাকিস্তানের (বাংলাদেশের) উচ্চ চাকরিতে আসীন বা অবসরপ্রাপ্ত। সুখী হই—কিন্তু নিরাশও হই, ভাবি—শুভ্রশীর্ষ, হয়তো শুভ্র শ্মশ্রু গুম্ফ, অর্জিত সাফল্যে পরিতৃপ্ত সেই স্নেহ-ভাজনরা কি এই স্বল্পকালীন শিক্ষকের সম্মুখে দাঁড়ালে মনে করবে এখন তারা এক দেশের আমি অন্য দেশের—আমরা পরদেশী? কি করেই বা তা পারবে—শত শত বৎসরের যোগ যাদের যুক্ত রাখে নি, দেড় দুই বৎসরের ক্লাশের পরিচয়ে কি তারা আর আমরা এখনো আত্মীয় আছি? হয় না, হয় না—পার্থক্য তো আমরা জন্মতে দিয়েছি। তবু একটা কথা জানি—কিশোর তরুণ মনগুলি চিনে নিতে পারে তাদের শিক্ষকের সদিচ্ছাকে, ক্লাশের সেই ক্ষণ-বন্ধনকে নিজেদের অন্তরে তারা করে তোলে অচ্ছেদ্য বন্ধুত্ব।—বুদ্ধির অতীত এ দেশের ছাত্রদের এই প্রাণধর্ম। ফেণী কলেজের ছাত্ররা কেউ কেউ আরও এক নিয়মে আমার আত্মীয়—আমার এখনো ঘনিষ্ঠ বন্ধু! সেই রাজনৈতিক সঙ্কল্প-শুদ্ধ ছাত্রকয়টির সঙ্গে আমার সেই বন্ধুত্ব কিন্তু তখন বিশেষ ঘটে নি, ঘটে পরে বন্দিত্বের বন্ধন-সূত্রে।

স্বরাজের সভাপর্ব আমাকে নিস্পৃহ করে তুলেছিল। সাহিত্যের ও সাংবাদিকতার পারিপার্শ্বিকে দেশের স্বাধীনতার সম্ভাবনায় আমিও হচ্ছিলাম আশাহীন। হাল্কা হাসিতে তাকে উড়িয়ে দিতে পারা যাবে সত্যই যদি সংস্কৃতির কোনো একটা পৈঁঠায় আশ্রয় পাই। পাই জীবনের প্রতি আস্থার অন্যতর স্থির ক্ষেত্র। শিল্প-সাহিত্যের আসর থেকে ফেণীতে এসেছি মানুষ গড়ার কারখানায়, তখনো তাতে নিরাশ হই নি। তাই লাহোর কংগ্রেসের পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাবটাকে মনে মনে সমর্থন করলেও সন্দেহ না করে পারি না।

অবশ্য তার পূর্বে আমি সেবার পূজোর ছুটিতে এসেছিলাম দক্ষিণ ভারতে ঘুরে—সে একটা অর্থপূর্ণ অধ্যায়। তার ফলেই হয়তো আমার মন পেয়েছিল জীবন-ঐশ্বর্যের একটা উৎস-সন্ধান। দেশের সমাজের চারদিকে এতদিন অসহ্য জঞ্জাল দেখছিলাম; তা ছাড়িয়েও তখন থেকে একটা শ্রদ্ধার ও প্রত্যয়ের মত কিছুর প্রত্যাশা করতে পারি, এরূপ মনে হয়েছিল। তা অন্ততঃ করতে হবে—'এবার ফিরাও মোরে', পৃথিবীর সঙ্গে আমাকে মোকাবিলা করতে হবে—ভারতের স্বাধীনতাই হ'ল তার পথ। সে সম্বন্ধে দ্বিধার জায়গা নেই। মঙ্গলকান্দিতে যেদিন যাই সেদিন প্রথম স্বাধীনতা দিবস—১৯৩০-এর ২৬-এ জানুয়ারি। দিন কয়েক পূর্বে স্বাধীনতার সঙ্কল্প বাণীটা পাঠ করে বেশ চমৎকৃত হই। ভাষায় ভাবে তার মধ্যে একটা গভীর জীবন-স্পর্শ পাই। যাই বলুন নীরদ চৌধুরী, মনের গভীর তলায় স্বাধীনতার সঙ্কল্প বাণী একটা অনুভব জাগায়। Sense of belonging থেকে যেন commitment-এর দিকে টানে। মনে হয় শুধু স্পর্ধা নয়, শুধু বাগাড়ম্বর নয়। কিন্তু তারপর প্রশ্ন করি—সক্রিয় কোনো একটা মর্যাদাময় কার্যক্রমে কি দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে কংগ্রেস? মানুষকে এগিয়ে যেতে শেখাবে দেশের নেতারা? কী সেই কার্যক্রম? দেশ-গড়া, মানুষ-গড়া সংগ্রামী সাধনা কী?

ছাত্র তাড়ানো আমাকে দিয়ে হ'ত না। ছাত্র পড়ানো কতটা হ'ত জানি না—মনের মত ছাত্র পেলে হ'ত। তেমন ছাত্র তো গড়ে নিতে হয়, সে যোগ্যতা আমার আছে কিনা সন্দেহ। 'স্বদেশী সমাজ' না হোক স্বদেশী ধাঁচে কিছু গড়া যায় না? আমার নতুন কিছু করার ইচ্ছা। একটা স্থানীয় সংগ্রহ-শালা (মিউজিয়াম), গড়ার পরিকল্পনা, আঞ্চলিক পুঁথি সন্ধানের চেষ্টা, সরে-জমিনে কোনো কোনো গ্রাম দেখার বাসনা,—শেষ অবধি এসব ইচ্ছাই থেকে গিয়েছে।—সঞ্জয়ের মহাভারত, শ্রীকর নন্দীর অশ্বমেধ পর্ব, এক-আধখানা পুঁথি ঘরে সঞ্চিত হয়েছিল, অবহেলিত মূর্তি বা কাঁথারপট ঘরে আসে নি। মঙ্গল-কান্দিতেও ওরূপ আশা নিয়ে যেদিন যাই—সেদিন প্রথম 'স্বাধীনতা দিবস'—সকালে পূর্ণ স্বাধীনতার সঙ্কল্প পাঠ আমার মনে নাড়া দিল—একি অক্ষমের স্পর্ধা? কী করে এ সম্ভব? পুঁথি সন্ধানে?

বিকালে সে গ্রামের কিছু অবজ্ঞাত ও অজ্ঞাত ঐতিহ্য দেখেছিলাম। বড় বড় গাছের ছায়ায় প্রায় অদৃশ্য একটি দীঘি—কি নাম? 'গোবিন্দমাণিক্যের দীঘি'—বিলনীয়ায় বিল্বন ঠাকুর বিস্মৃত, মঙ্গলকান্দিতে গোবিন্দমাণিক্যের দীঘি কেন? কারণ অজ্ঞাত। আমার চোখের সামনে দিয়ে চলে যায় শাহসুজা, গোবিন্দমাণিক্য, হুসেনশাহ, নসরৎশাহ, পরাগলপুরের পরাগল খাঁ—ছুটিখান

থেকে সমতট বঙ্গের বিলীয়মান বৌদ্ধ সমাজ, এবং আরও পিছনকার—কিন্তু কারা তারা—? কারা তারা ? বঙ্কিমের জিজ্ঞাসা ইতিহাস কই, রাজনীতি কই, সমাজনীতি কই, শিল্প কই, সংস্কৃতি কই ? মনে জাগে আমার প্রশ্ন, কই জাতীয় সংহতি ? কই মুসলমান-হিন্দুর আত্মীয়তা বোধ, কোথায় দরিদ্র সাধারণ মানুষের অধিকার ? কিম্বা, 'স্বদেশী সমাজ' বা 'স্বরাজ ফর নাইনটি পার্সেণ্টে'র কার্যক্রম ? আলো কই, আলো কই, আলো কই ? আঁধার গাঙের মধ্যে কই সেই 'স্রোতের দিয়া' ভারতের মানুষের জন্য।

পরাণ আমার স্রোতের দিয়া ভেসে চলল কোন্ অকূলের উদ্দেশে—তা কি জানতাম ? না। নিশ্চয়ই বাণিজ্য-যাত্রা নয়। একেবারে নিরুদ্দেশ যাত্রা নয়।

একাদশ পরিচ্ছেদ

ভ্রমণ ভারতী

ভ্রম্ ধাতু দু'মুখো ধাতু, ভ্রমণেও আছে ভ্রমে-বিভ্রমেও আছে। যেন যৌবনের জুরী। এক দিকে সে ভুল জুটোয়, আর দিকে সে ভ্রমণে ছুটিয়ে নিয়ে যায়। এ যুগে পৃথিবী এই ভ্রম ধাতুর দু'মুখো টানে ঘুর্ণী নাচ নাচছে। আমাদেরও নাড়ীতে নাড়ীতে বোধ হয় সে প্যাঁচের টান ক্রমশঃ বাড়ছে। যৌবনের তো কথাই নেই। না হলে আমার মাথায় এত ঘুর্ণী লাগত না, আর পায়েও জাগ্‌ত না এত অস্থিরতা। কারণ, আমরা কুণো প্রকৃতির বাঙালি ; আমি অন্ততঃ আড্ডা জমাতেই অভ্যস্ত। তবু আড্ডার আওতা ছেড়ে বাঙালিরাও এই বিংশ শতাব্দীতে বেরিয়ে না পড়ে পারে না। তাই, আড্ডাতেও আমার অরুচি ধরে নি, আবার এই 'বোতাম আঁটা জামার নিচে শান্তিতে শযান' প্রাণটাও বেশি ঝিমিয়ে পড়ে নি। ঘরের বাইরে পা বাড়াবার সুযোগ পেলে তা ছাড়ি না। তবে ঘরেই আবার ফিরে আসি—আসতে ভালো লাগে। কিন্তু এ বোধ নিয়েই ফিরে আসি—বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি! ভারতবর্ষেরই বা জানি কতটুকু? আর তার অর্থ—নিজেকেই বা জানার চেষ্টা কি করি?

বড় সুযোগ না হোক, ছোট সুযোগ আসতেই তাই ১৯২৩-এ প্রথম দিল্লী-আগ্রার ধূলি মেখে এসেছিলাম কংগ্রেস অধিবেশন উপলক্ষ করে, তা বলেছি। সেই প্রথম আমার ইতিহাসের ভারতবর্ষকে দেখা এবং জটিল এই মহাজাতির জীবন দেখা। ফলটা সামান্য হয় নি। সত্যই ভ্রমে-বিভ্রমে তা অবিস্মরণীয়। তবে অত সুযোগ প্রথম জীবনে আর বেশি হয় নি—পরজীবনে হয়েছে কখনো কংগ্রেস উপলক্ষ করে (করাচি, তারপর ত্রিপুরী, রামগড়)। আরও বেশি, জন-আন্দোলন লক্ষ্য করে ভারতের কোনো প্রদেশই প্রায় বাদ যায় নি, বাঙলারও প্রায় কোনো জিলা নয়,—কিন্তু সে সব যৌবন-শেষের কথা। রাজনীতিক কারণ ছাড়া প্রথম দিকে আমার প্রধান দৌড় ছিল বিহার পর্যন্ত—বিশেষ করে পাটনায়। সেখানে দাদা অধ্যাপক ; আর বিহারের অন্যত্র ছিলেন এক-আধজন আত্মীয় (মধুপুরে দাদা ডাঃ যোগেশচন্দ্র হালদার)। সেই সূত্রে প্রথম দেখি বিহার—ক্রমে বিহার হয়েছিল আমার বিহার-ভূমি। পাটনার কথা—বলবার আমার অনেক, এবং হয়তো অশেষ। তবে প্রথমবার যখন পাটনা যাই—সে ১৯২১-এ। জানতাম না তখনি আমার ভারত-দর্শনের আরম্ভ। গিয়েছিলাম পালামৌর গাঢ়োয়া নামক একটি বড় থানায়, পাটনা তার পথ। আমাদের পর্যায়ে আমাদের

পরিবারের জ্যেষ্ঠ ছিলেন ডাঃ যোগেশ হালদার। তিনি ও বউদি তখন গাড়োয়ায় (পরে তাঁরা বদলি হয়ে এসেছিলেন মধুপুরে, সেখানেই তাঁরা বাসিন্দা বনে যান। সেখানেও প্রায়ই যেতাম)। প্রথমবার দাদা-বউদি'র আহ্বানে আমি গ্রীষ্মের ছুটি আরম্ভ হতেই গাড়োয়ায় তাঁদের কাছে যাই। পথে পাটনায় ছিলাম দু' দিন এবং গাড়োয়াতে মাত্র দিন সাত। ১৯২১-এ সামান্য করে হলেও ভ্রমণ সেই প্রথম, অচেনা ভারতবর্ষকে দেখাও সেই প্রথম। অসামান্যকে সামান্য একটু দেখা। আমার কাছে পাটনাও কিন্তু সামান্য নয়—পরে তো তা থাকতেই পারে নি। কিন্তু ১৯২১-এর সময়ও পাটনা অসামান্য ছিল।

বিহারের বন্ধন

সকালের আলো ফুটবার আগেই সেই এপ্রিলের ভোরে পাটনা স্টেশনে নামলাম—টাঙ্গা নেই, 'তেজ' টমটম একজিবিশন রোড্ ধরে সগৌরবে এগিয়ে চল্‌ল। ভোরের হাওয়ার সরসতায় রাত-জাগা চোখেমুখে সজীবতা এল। সামানে দেখা দিল সেই ভোর বেলার খোলা ডিম্বাকৃতি মাঠ—এখন 'গান্ধী ময়দানে' নামান্তরিত। তবে পাটনার 'লন্' এখনো পূর্বনাম খোয়ায় নি ; অবশ্য সব দিকেই কিছুটা অঙ্গহানি হয়েছে। লোকের ভীড়ে, গাড়ি ও বাড়ির চাপে সেই শান্ত শ্রী বিগত। ১৯২১-এর এপ্রিলে আমি যখন দেখি ফস্টারের 'প্যাসেজ টু ইণ্ডিয়া' তখনো লেখা হয় নি। তার 'চন্দ্রপুরায়' তখনো গল্‌ফ খেলা হ'ত কিনা জানি না, তবে 'চন্দ্রপুরা'র মাঠের সেই পরিবেশ তখনো ছিল—যেমন ছিল 'চন্দ্রপুরা'র গঙ্গাতীরের বিসদৃশ শ্রীহীনতা। সামনের বারান্দার একটা চেয়ার টেনে নিয়ে আমি মৃদুমুগ্ধ দৃষ্টিতে 'লন' দেখতে লাগলাম—ভেতরে চা হচ্ছে,—পাটনা তখন লাখ খানেক মানুষের শহরও নয়। ঘর দুয়ারে পথঘাটে বিংশ শতাব্দীর দাগ পড়ে নি। তখন ইমাম ভ্রাতাদের গৌরবের যুগ ; রাজেন্দ্রপ্রসাদ মজহরুল হকদের স্বরাজ সাধনার সূচনাকাল। ইমামদের বাড়িঘরে ছিল বিলাতী ক্যাসলের দেশী দাপট। সুলতান আহমদ-এর শাদা প্যালেসে ছিল লক্ষ্ণৌর 'বারুক্'-এর চকমকি ; কাশীপ্রসাদ জয়সওয়ালের বাড়িতে ছিল প্রশস্ত শ্রী। কিন্তু তখনো পাটনার বেশির ভাগ বাড়িঘরই খাপ্‌রার, মধ্যে মধ্যে পাকা বাড়ি, দানাপুর বাঁকীপুরের দিকে বড়-বড় খোলা মাঠের মধ্যে এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান্ কায়দায় খাপরার বাংলো—ফায়ার-প্লেস পর্যন্ত। মিসেস্ উডের বাংলো তিনটিও সেরূপ। দু'নম্বর-এ ওয়াই-এম-সি-র একটি ছোট্ট ছাত্রাবাস, রঙ্গীন হালদার তখন তার সুপারিনটেনডেণ্ট। পাটনা, শুনেছি ঢাকা বা অন্য পুরনো শহরের মতই, গলিখুঁজি ধুলোবালি, ময়লা, অপরিচ্ছন্নতা, মশা

ও মাছিরই শহর—কলকাতা তখন পরিচ্ছন্ন শহর। ভোরবেলায় বাংলোর বারান্দায় বসে সেই শোনা-কথার পাটনার ছবি আমার মন থেকে মুছে গেল। —শীতল হাওয়া, এ দিকে ওদিকে মঞ্জরী-ধরা আমের বাগান আর সামনে মুক্ত মাঠ,—পাটনা মনে হ'ল শান্তশ্রী সুন্দরী,—একটু বয়সী। ভুল দেখি নি। কারণ, সত্যই বাঁকীপুর অংশের পাটনা ওরূপই ছিল। কিন্তু তা পাটনার সব নয়। গঙ্গা কী মেন রোড্, ও নীচেল সড়কের মধ্যেকার বাঁকীপুরকে নবাবী আমলের পাটনা-সিটি এসে একালে 'পাটনা' নাম দিয়েছে। অবশ্য প্রায় এ পাটনাতেই প্রাচীন পাটনাও সমাহিত। কুমরাহারের খননোবনেরচিত মৌর্য রাজ্সভা তখনো শিক্ষিতদের প্রায় অগোচর। মহেন্দ্রঘাট, 'বাঁকীপুর প্রভৃতি নাম শব্দতাত্ত্বিকের চিত্ত-চমকদায়ী অশোকের স্মৃতিবহ। অবশ্য কাশী তক্ষশিলা পাটলিপুত্র দিল্লী প্রভৃতি নামগুলি আশৈশব আমাদের মনে দোলা দিত খুব। পাটনা অসামান্য নাম নয়,—সেই প্রথম দর্শনে কিন্তু আমার মনে হয়েছিল তাও দোলা দেবে। তবে নামের জন্য নয়। পরে সে পাটনা আরও আকর্ষণীয় হয়ে যায় রূপেও নয়, নামেও নয়, মানুষের গুণে মানব-রসের গুণে। কিন্তু সে পরের কথা।

সেবার ছিলাম মাত্র দু'-একদিন। যাবার পথে, দেখা হয়েছিল দু-একজন আত্মীয়ের সঙ্গে। দাদাদের সহকর্মীদের দু'-একজনার সঙ্গে আর তার বন্ধুদের দু'-একজনার সঙ্গে।—ব্যারিস্টার শচীন্দ্রপ্রসাদ বসুকে (শচীদা) ও অধ্যাপক যোগেন্দ্রনাথ ঘোষকে (যোগেনদা) মাত্র তখন চক্ষে দেখি। সেবার সান্নিধ্য-লাভের সময় ছিল না। ভবিষ্যতে সম্ভাবনা হতে পারে, জানতাম, পরে দু'-বৎসরের মধ্যেই তা হয়ে গেল। আমার কাছে পাটনা বলতে যেমন তখন থেকে বোঝাত, পরেও বোঝায়, অন্ততঃ ওরূপ দু'-একজনার মনবুদ্ধি ও আন্তরিক প্রীতিও। পাটনার সঙ্গে আরও নিগূঢ় বন্ধন প্রচ্ছন্ন থাকতে পারে, আমার মনে সেই স্বপ্নও তখন ছিল না।—আমার তো নয়-ই ; কারুরই জানবার কথা নয়। পঁচিশ বৎসর পরে কী ঘটবে এ পৃথিবীতে বা জীবনে, আজ কোন্ সর্বজ্ঞ তা জানেন! কে-ই বা জানত—পঁচিশ বৎসর পরে এই পাটনায় ধরণীর মানবকন্যাদের কারও হবে এমন নির্বুদ্ধিতা, আমার মত চিরদিনের ফেল করা মানুষকে করবেন স্বীকার?—ইতিহাসের বিহারের বন্ধনই তখন ছিল প্রবল।

১৯২১-এ পাটনা শুধুই পথের দেখা। পাটনার মানুষ প্রায় তাও নয়। রাত্রির গাড়িতে চললাম শোন-ইস্টব্যাঙ্ক হয়ে শাখা-পথে পালামৌর দিকে। বিহারের গ্রীষ্মতাপ নাকি সেখানে প্রচণ্ডতম। ট্রেনের মধ্যেই রাত-জাগা চোখে সকালের রৌদ্রকে নমস্কার করলাম। দেখতে না-দেখতে তার জ্বালা উঠল। গঙ্গা ও শোনের পরিপালিত শ্যামলতার চিহ্ন ফুরিয়ে গিয়েছে,—

চারদিকে কোথাও বিশেষ শহর-গ্রাম নেই, ক্রমেই যেন উষ্ণতা বাড়ছে, রৌদ্র রুদ্র হয়ে উঠছে, পত্রহীন ফলগাছের মড়া-মড়া ডালগুলো ঊর্ধ্বে অঙ্গুলি ছড়িয়ে দয়া প্রার্থনা করছে—ওরই গায়ে হয়তো লাক্ষার পোকা থাকে, যে লাক্ষার ব্যবসা-কেন্দ্র নাকি গাড়োয়া। গাড়োয়া রোড রেল স্টেশনে যখন গাড়ি পৌঁছল তখন বেলা হয়তো সাড়ে দশটা—কিন্তু মধ্যাহ্নের রোষ-রক্ত রৌদ্র লু জাগিয়ে তুলেছে—অদূরে শুষ্ক নদীর বালুকণা ছুটছে।—আরও ছ'মাইল যেতে হবে। আমার জন্য প্রতীক্ষমাণ পরিচারক যা বলল তা দুর্বোধ্য। আহার্য রয়েছে, পানীয় পাঠিয়েছেন মাঈজী, নদীর বুক আঁচড়ে ঠাণ্ডা জলেই তৃষ্ণা মিটানো হ'ল। তারপর একা। পথ মন্দ নয়—কিন্তু পথের দু' পাশে যা দেখলাম তা যেন ঝলসে যাওয়া,—দূরে ছোট ছোট পাহাড়, মাঝে এক-আধটি ব্যবসায়ীর গাড়ি; আর বনের কাষ্ঠবাহিনী আদিবাসী রমণী—ছিন্ন-মলিন সামান্য বাস। এরূপ মানুষ নিয়েই ভারতবর্ষ—বিবেকানন্দ যাদের দেখে অস্থির হয়ে উঠেছিলেন, গান্ধীজী যাদের সেবায় স্থিরসঙ্কল্প। তাদের স্থান কোথায় মঠের উৎসবে, কংগ্রেসের দরবারে ? উগ্র উষ্ণ বাতাস, শ্যামলতার নাম নেই। কখনো কাছে, কখনো দূরে দীপ্যমান ধূম্রকুণ্ডলীর মত পাহাড় —যা আমার বাঙালি চোখে তখনো পুরাতন নয়। মনে কৌতূহল ছিল, প্রাণে অনির্দিষ্ট ভাবনা ছিল'—অগ্নিবর্ষী-আকাশের তলে তপ্ত ললাটে হাত রেখে পৃথিবী হাঁপাচ্ছে, জীবন তারই অঞ্চল-আশ্রয়ে আপনাকে কত ভাবে না রক্ষা ও পুষ্ট করে চলছে। কী অপরাজেয় সেই জীবন !

গাড়োয়া পৌঁছুলাম। অপেক্ষা করে ছিলেন দাদা-বউদি, ডাঃ যোগেশ চন্দ্র হালদার ও তদীয় পত্নী লীলাবতী। খুশি হলেও একটু উৎকণ্ঠিত ছিলেন। তাঁদের চোখে আমি তখনো ছোটদেরই একজন, বিশেষ করে যত্নে-মমতায় পালনীয়। এমন গরমে অনভ্যস্ত। কোনো দিকে তাই ত্রুটি হ'ল না—সর্বদাই দৃষ্টি কী খাওয়াবেন, কী ভাবে আরাম দেবেন। শত সত্ত্বেও কিন্তু আহার্য সবই দুর্ঘট। তবু ওঁরা দুজনাই কর্মপটু, নিজ নিজ কাজে কুশলী। কখনো সে কাজ তাড়াতাড়ি মিটিয়ে আমাকে সঙ্গ দিতে ওঁদের দেরী হয় না। আবার দু'-একজনার সঙ্গে আলাপ করিয়েও দেন। গ্রামের স্বচ্ছল মানুষ, বাজারের স্বচ্ছল ব্যাবসায়ী, বাইরের শিখ ঠিকাদার। আমার মনে মনে জিজ্ঞাসা—এই পালামৌ ? আর চোখে জিজ্ঞাসা—পাহাড় নিকট থেকে দেখতে কেমন ? আমার কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য দাদা হাতির পিঠে আমাকে পাঠিয়ে দিলেন নিকটের পাহাড়ের দিকে। যত যাই দেখি—যত নিকটে ভেবেছিলাম পাহাড়টা তত নিকট নয়। সকাল বেলা, রোদ তখনো কড়া নয়। হাওয়াও মিষ্টি। পথে

কোনো পাহাড়ীয়া মেয়ে দেখলাম না—আসলে সে পাহাড়ে কেউ থাকে না। লোকজন কোথাও কেউ নেই নিকটে বা দূরে। একখানে খোলা জায়গায় একটি নাতিবৃহৎ গাছ—একটু ছায়া। তলায় বসে একজন সাধু—একমাত্র মানুষ। বছর ত্রিশ হবে বয়স। গৈরিক বেশ, পরিচ্ছন্ন। নিজেও স্নানান্তে সজীব। ভাবনায় নিমগ্ন, কিছু দেখছিলেন না। আমার সঙ্গী কিন্তু তাঁকে নিজের অস্তিত্ব না জানিয়ে থাকতে পারলেন না। হাতির পিঠের থেকেই উচ্চ কণ্ঠে ভক্তি নিবেদন করলেন, 'গোড় লাগি, সাধুজী।'

চমকিত হলেন সাধুজী—এতক্ষণ আমাদের দেখেন নি। এবার তাকালেন, হাসলেন। স্নিগ্ধ সুনম্র হাসি—ভাবুক মানুষের শান্ত সুখের। পাহাড় দেখলাম, তা বিশেষ কিছু নয়। কিন্তু গাছতলার ওই সাধুর প্রসন্ন হাসিটি মনে লেগে রইল! এই হাসিতে বুঝি ছিল ভারতবর্ষের অনেক পুরনো রহস্যমুগ্ধ নিমগ্নতা। কোনো দিন তো দেখি নি; কী করে বলি এ হাসি আমি চিনি!

পালামৌ দেখা হ'ল—কিন্তু সঞ্জীবের দৃষ্টি-সরসিত পালামৌ ইজ নাইদার অন্ সী অর ল্যাণ্ড। তাও দেখি নি; তবু বলি তা চিনি!

এই প্রথম বাঙলার বাইরে ভারত দেখা। তারপরে বিহার অনেকবার গিয়েছি। সেখানে দাদার বন্ধুদের মধ্যে পাটনাতে আমিও একজন হয়ে উঠেছিলাম। অবশ্য বয়ঃকনিষ্ঠ কিন্তু স্বচ্ছন্দ। পাটনার আকর্ষণ বিশেষ হয়ে উঠেছিল প্রথমটি বুদ্ধদেবের জন্য, ও বৌদ্ধ-ইতিহাস ও কাহিনীর কেন্দ্র হিসাবে। কল্পনায় ওরাজ্যে আমি বিচরণ করতাম—বিশেষ করে বুদ্ধগয়া, রাজগীরে, নালন্দায়—বিম্বিসার-অজাতশত্রুর যুগে। এজন্য দায়ী 'জাতক' ও বুদ্ধ-কাহিনী। এবং রবীন্দ্রনাথও।

বোধহয় ১৯২৪-এর বড়দিনে তিন অগ্রজ অধ্যাপকের সঙ্গে আমিও চললাম রাজগীর ও নালন্দা—পাটনার যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ, কলিকাতার খগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, কাঠমণ্ডুর সুধীর চৌধুরী। তাঁরাও রাজগীর নালন্দায় প্রথম যাত্রী। মার্টিন কোম্পানীর ছোট লাইনের গাড়ি দুপুর ছাড়িয়ে অপরাহ্ণে পৌঁছল রাজগীর। বড়ই জনবিরল স্থান। জৈন ধর্মশালায় জিনিসপত্র রাখব—বুদ্ধদেবের মত মহাবীরও তখনকার রাজগৃহ ও এ অঞ্চলে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিলেন; জৈনদের তাই রাজগীর তীর্থ, তারা দু'-তিনটি ধর্মশালা নির্মাণ করেছে। 'সেপ্টেম্বর' (শ্বেতাম্বর) বা 'ডিসেম্বর' (দিগম্বর) একটা বেছে নাও—যোগেনবাবু বললেন। এই বৈজ্ঞানিক অধ্যাপকের বুদ্ধিশুভ্র কৌতুক বাক্যে ও লেখায় স্বতঃস্ফূর্ত। তাতে সমস্ত সময়টা বেশ কাটত। সেই পুরাকালীন প্রাচীর-পরিবেষ্টনী পার হয়ে চললাম তখনি পৌরাণিক গিরিব্রজপুরের দিকে।

পুথি-পড়া মন দিয়ে এক-একটা পাহাড়কে আবিষ্কার করতে ছাড়লাম না। এই বৈভার, এই গৃধ্রকূট, যেন কত চেনা। সবই সম্ভবত ভুল—অধ্যাপকরা আমার ছেলেমানুষি বুদ্ধিতে মজা পেলেন। পাহাড় ছেড়ে খুঁজে পেলাম কোথায় বেণুবন, কোথায় প্রথম মহাসঙ্গীতির স্থান। ফিরে এসে করলাম উষ্ণ প্রস্রবণে স্নান। রাজগীরের পুণ্যার্থীর আকর্ষণ এই প্রস্রবণগুলি। প্রস্রবণ সর্বত্রই। পাঁচ-ছয়টি একই স্থানে—কাছাকাছি, হয়তো মাটির তলে একই উৎস, ওপরে ভিন্ন ভিন্ন মুখ। স্নানস্থান প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। একটির জল বেশ গরম, ধোঁয়া উঠছে। প্রাচীর দিয়ে ঘেরা এক হেদুয়া, আবক্ষ পূর্ণ। সেই শীতের সন্ধ্যায় বিশেষ উপভোগ্য। দু'-একটি প্রস্রবণ তত সবল নেই। স্নান করতে করতে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেল। বাকি রইল আহার। তারপর নিদ্রা। সূর্য উঠতে না উঠতে চললাম আবার প্রাচীনতম রাজগৃহে—মহাভারতের গিরিব্রজপুর। কিন্তু সেদিনকে এদিনে খুঁজে বের করা সহজ নয়। প্রায়ই ছোট আগাছার জঙ্গল চারদিকে। মাঝে মাঝে পায়ে চলার পথরেখা—গোরু-ছাগল চরে—মানুষ কম, দু-একটি যাত্রী। আসে প্রস্রবণে—মারোয়াড়ী, গুজরাতী ও কিছু বিহারী স্নানার্থী, কোনো সময়েই তবু-স্নানার্থী দশ-বিশজনের বেশি নয়! স্নানান্তে রৌদ্রে পর্যটনে কারও আগ্রহ রইল না। জরাসন্ধের কারাগার দেখা হ'ল, —মুনিয়ার মঠের দিকে কিছুটা ঘুরলাম, গুহা দেখলাম—এখানেই কি সপ্তপদী গুহামুখে বসেছিল প্রথম বৌদ্ধ মহসঙ্গীতি? রইল পড়ে গৃধ্রকূটের ওপরে বুদ্ধদেবের পদচারণার পথ। দ্বিপ্রহরে চললাম ফেরত গাড়িতে!

মাইল ছয় দূরে নালন্দা। বারোশ বছর পূর্বে হিউএন ৎসাং যা দেখেছিলেন তা তো নেই—কী আছে? রূপ নেই, রসগন্ধ কি পাওয়া যায়? মাইল দেড়েক ধূলোভরা কাঁচা পথে বড়গাঁ—নালন্দা নাম তখন বিলুপ্ত—বড়গাঁ নামেই পরিচয়। বড়গাঁয়ের আগেই অন্তত আধ মাইল জুড়ে ভগ্নস্তূপের সার। তারও আগে পথের দু'দিকে অশ্বত্থতলায় দেখলাম বিশাল 'ভৈরোঁ মূর্তি।' আসলে ধ্যানাসনে বরাভয় মুদ্রার বুদ্ধমূর্তি। গ্রামের ভেতরে ভৈরব নিষিদ্ধ, তাই মূর্তি পরিত্যক্ত, তখনো অনাদৃত। পরে স্থির হয় এই মূর্তিটিই নালন্দার প্রধান ও বৃহত্তম মন্দিরের প্রধান বিগ্রহ। তার স্থান হয় পাটনা মিউজিয়মে। ১৯২৫-এ নালন্দার পথে এখানে-ওখানে ছোট-মাঝারি বুদ্ধমূর্তির অভাব ছিল না। দু'-একটি মাত্র মহাদেব ও বিষ্ণু হয়ে পূজা পাচ্ছিল। কিন্তু অধিকাংশই অনাদৃত—দেশে বা বিদেশে চোরাচালানের দিন আসে নি। আসলে বিহারের শিক্ষিত লোকদের মধ্যেও তখন পর্যন্ত ইতিহাস-চেতনা ক্ষীণ। রাজনৈতিক জাতীয় চেতনার সঙ্গে পুরাকীর্তির চেতনা ক্রমে বর্ধিত হয়েছে। ক্রমে

কীর্তিরক্ষার জন্য নালন্দায় মিউজিয়মও স্থাপিত হয়। ১৯২৫-এ নালন্দার ভগ্ন বিহার বা মূর্তি প্রভৃতির সম্বন্ধে উৎসাহ ও-অঞ্চলে বিশেষ জাগে নি। তখন খনন চলছিল—দু-একজন পুরাতত্ত্ব বিভাগীয় কর্মচারী জন দশ বিশ মজুর নিয়ে কাজ চালাচ্ছেন—ব্যস্ততা নেই। বৃহত্তম বিহারের মন্দির ও পার্শ্ববর্তী চৈত্য আংশিক খোদিত—পরিক্রমার পথগুলি পরিষ্কৃত। তাতে নেমে দরমার ফাঁকে ফাঁকে অনেক চৈত্য ও প্রাচীরে-খোদা বসানো 'স্টাকো' মূর্তি দেখলাম—এ সবের কথাই কি নানা গ্রন্থে উক্ত হয়েছে? এসব স্তূপ খনিত হলে তার অনেক কিছু পুনরাবিষ্কৃত হয়েছে—ভারতবর্ষ ছাড়িয়ে সমুদ্রপারের দেশ-বিদেশের বৌদ্ধ রাজাদের ও ভক্তদের নিবেদিত নানা ভক্তি-অর্ঘ্যের কথা রয়েছে উৎকীর্ণ। পাথরের ব্রোঞ্জের ছোটবড় মূর্তি। অবশ্য ইতিপূর্বেই খনিত ও পরিষ্কৃত হয়ে আছে উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত শিক্ষার্থী ভিক্ষুর বিহারগুলি, এক স্তরের নীচে অন্য স্তর, সাত যুগের সাত স্তর। এক স্তর পুরে গিয়েছিল, লো[illegible]। আবার. প্রকোষ্ঠের কুলুঙ্গিতে প্রদীপের শিখার দাগও অক্ষুন্ন। এক-একটি বিহারের প্রাঙ্গণ বা চত্বরের মধ্যে আচার্যের প্রশস্ত উচ্চ মঞ্চ—যেখানে দাঁড়িয়ে বা বসে নিজ নিজ বিহারে প্রধান আচার্যরা দেশ-দেশান্তরের সমবেত ভিক্ষুদের উপদেশ দিতেন। মহাবিহারে দশ হাজার ভিক্ষু এক সময়ে অধ্যয়ন করত। চারদিকের দু'শখানি গ্রাম (দেবত্রের তুল্য) বিহারের সম্পত্তি। তা যোগাত খাদ্য পানীয় অর্থ, এই শিক্ষার্থী সম্প্রদায়ের বৌদ্ধ ভিক্ষুদের। ভিক্ষা করে খাওয়া-পরা ভিক্ষুদের নিয়ম, তা এ'দের প্রয়োজন হ'ত না। শত চার-পাঁচ বছর ধরে সুদিন-দুর্দিনের শেষে নালন্দার কীর্তি যখন ম্লান হ'ল, ওদন্তপুরী বিহার, বিক্রমশীলা, যখন বাঁধিষ্ণু তখন তুর্ক আক্রমণের মুখে এ অঞ্চলের বিহারগুলি বিনষ্ট হয়ে ধ্বংসস্তূপ হয়ে গেল। বৌদ্ধ বিহার বহুল বলেই মগধের নাম 'বিহার' হয়ে যায়। বিহার শরীফ এখানকার এক মহকুমা শহর। শিক্ষিত পদস্থ মুসলমানদের প্রধান এক কেন্দ্র। তুর্ক বিজয়ের পরে বিহার শরীফ নাম হয়—সেখানকার প্রধান বিহারের পরিচয়ে। পাটলিপুত্র মৌর্যদের আগেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তুর্ক আক্রমণের অনেক আগেই প্রসিদ্ধি হারিয়েছিল। কতকটা ফিরে পায় পাঠান-মোগল রাজত্বে। 'পত্তন' হয় পাটনা, সেখানে 'পাটলীপুত্র' নাম উদ্ধারের চেষ্টা এখন প্রকট। 'গন্ধ' আছে নামে, কিন্তু 'রসের' স্বাদ কি এ'রা পেয়েছেন?

রাজগীর-নালন্দায় তারপরে আমি আরও অনেকবার গিয়েছি—অন্ততঃ ছয়-সাতবার। অন্য প্রাচীন কেন্দ্রও কিছু কিছু দেখেছি। বিহারের পুরাকীর্তি সমাদৃত হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে রাজগীর-নালন্দা বুদ্ধগয়ার।

প্রথম যখন গিয়েছি তখনো এ সুদিন অত নিকটে ভাবতে পারি নি—বিশেষ করে বুদ্ধগয়ার। আমি যখন (১৯২৩ ?) দেখি তখনো শৈব মহান্তের সম্পত্তি সে মন্দির। অবশ্য বর্তমান মন্দির প্রাচীন ফলক থেকে পুনর্নির্মিত—রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের কীর্তি—কিন্তু মূল কখনো লুপ্ত হয় নি। তীর্থযাত্রী বৌদ্ধরা তখন সেখানে অবাঞ্ছিত ছিল। কাঞ্চনমূল্যে অধিকার অর্জন করত। দেখলাম ভুটানের রাজকন্যার পুরোহিত লামা হাজার প্রদীপ জ্বালিয়ে বুদ্ধ-মূর্তিকে সমুজ্জ্বল করে তুলেছেন। প্রাঙ্গণের এক প্রান্তে নীরবে এক দীর্ঘদেহী লামা কয়েক দিন ধরে একবার দাঁড়িয়ে একবার ষাষ্ঠাঙ্গ হয়ে দিনে কয়েক সহস্রবার দণ্ডবৎ প্রণাম নিবেদন করছেন—মৃদু হাস্যে একবার আমাদের দিকে চোখ তুলে চাইলেন।—মন্দিরের পিছনে 'বজ্রাসন', 'বোধিদ্রুম'। একপার্শ্বে খানিকটা পাথরের রেলিং বুঝি সুঙ্গযুগের। মন্দির-প্রাঙ্গণের বাইরে একদিকে শষ্পঘেরা দীর্ঘিকা। এই কি সেই এক কালের পদ্ম-ভরা সরোবর—কিম্বা সে দীঘি যা বুদ্ধস্নানে পবিত্র ?—এখন নিস্তব্ধ, নির্জন, যেন প্রাণহীন। সোপানাবলী কি এমনি ছিল ? ওখান দিয়েই কি সুজাতার পায়াসান্ন গ্রহণ করে এসে স্নানান্তে গৌতম বুদ্ধ বসেছিলেন ওই বজ্রাসনে বুদ্ধত্বলাভের জন্য ? আমি পুরাতাত্ত্বিক নই। কিন্তু সেইদিন ওসব জিনিস ঘিরে মানুষ কী খুঁজত, যাতে মনে হয়—'কথা কও কথা কও—অনাদি অতীত'। প্রাচীন যুগ ফিরে আসে না—আসা অভিপ্রেত নয়। দশ হাজার ভিক্ষু বসে সেই নালন্দার মহাযান ও তান্ত্রিক বৌদ্ধশাস্ত্রে তোট তোট তোটয় করুক, কে চায় ? কিন্তু ইতিহাস-চেতনা প্রয়োজন। জয়সওয়াল বিহারে তাঁর বৈজ্ঞানিক অনুশীলনের গোড়াপত্তন করেছিলেন, তা ব্যর্থ হয় নি। স্বাধীনতার পরে প্রাচীন স্থানগুলি সুরক্ষিত, নামগুলিও নানা জিনিসের গায়ে আঁটা হয়। গায়েই, মনে নয়। কিন্তু মনে কি একালের নয়া নয়া বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠানের উপাধির মধ্য দিয়ে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের বিদ্যাই কিছু মাত্র প্রবেশ করে ? তবু সে যুগের ও এ যুগের বন্ধন আমার মনেও ক্ষয় হয় না। ঘুরে ঘুরে সেখানে আমি গিয়েছি তখনো। একালের আকর্ষণ—খোদাবক্স লাইব্রেরী বাদ দিলেও যা বাদ দেওয়া যায় না তা মিউজিয়ামে স্থাপিত 'দিদারগঞ্জে যক্ষিণীমূর্তি'—দু' হাজার বৎসর পরে বর্ষার মাটি-ধোয়া গঙ্গার বক্ষ থেকে মৌর্য যুগের যে মোহিনী দেখা দিলে, তাঁকে পাটনায় বাদ দেওয়া অসম্ভব। কিন্তু তার পরেও একালের পাটনায় আছে বিহারের কিছু মানুষ—কিছু বাঙালি ব্যক্তিচরিত্র, আর বিহারের কৃষক সাধারণ, গ্রামের মানুষ, আর পাটনার চারদিককার গ্রাম্য পথ, যাতে আমি দূরে দূরে হেঁটে গিয়েছি ; বিহারের

অম্রবন, তার ঘনশ্যাম রূপ—যে অম্রবন বিহারে সশিষ্য বুদ্ধদেবকে স্থান দিত, আর একালেও আমাদের চোখ জুড়োয়—যার দান রসনাও তৃপ্ত করে।

সেই ১৯২০-৩০-এর মধ্যে আমি কতবার পাটনা গিয়েছি তার হিসাব করা সহজ নয়। ১৯২৪-এর পরে প্রায় প্রতি বৎসরই শীতকালে সেখানে কাটাতাম, তার আগে পূজার সময় কাটিয়েছি মধুপুরে দাদা-বউদির কাছে। আমার রুচি সাধনায় নয়, পুরাতত্ত্বেও নয়, কিছুটা জিজ্ঞাসাতে ও কিছুটা জীবন-অনুভূতিতে। পাটনাতে সে রুচি পেত খোরাক বই-এর এবং পুরাকীর্তির পুণ্যস্থলীর। কুমরাহার থেকে রোটাস পর্যন্ত মন পর্যটন করত দক্ষিণ বিহারে; আর রস পেত একালের পাটনা অঞ্চলেব মানুষ ও মাটিতে, আড্ডায়, গল্পে ও পথচারণায়। আড্ডা জমত নাটক অভিনয়ে, পাটনায় বাঙলা সাহিত্যের একটা উৎসাহ সঞ্চার করেন রঙ্গীন হালদার। রবীন্দ্রসভার অনুষ্ঠানে ডাক পড়ত আমাদের বন্ধুদের, মনস্বীদেরও,—সুনীতিবাবুর, নীরদবাবুর ও মোহিতবাবুর। একটা কথা তখনি বুঝেছিলাম—পাটনায় ও বিহারে বাঙালিদের দুর্দিন আসছে। চাকরির জোরে তারা পদস্থ, তাই অচিরে অপদস্থ হতে বাধ্য—যোগ্যরাও এ সুযোগ না পেয়ে তা হলে হবে অপ্রতিষ্ঠ। তখন যোগ্য দেখেছি অনেককে—শচীপ্রসাদবাবুর মতো দেহে-মনে গভীরচরিত্র জ্ঞানী পুরুষকে, অধ্যাপক যোগেন্দ্রনাথ ঘোষের মতো কৃতবিদ্য সুরসিক কর্তব্যপরায়ণ মানুষকে, বয়োবৃদ্ধ মথুরানাথ সিংহের মতো সাহিত্যরসিক প্যাট্রিয়ার্ককে—একটু দূর থেকে যদুনাথ সরকারকে, ব্যারিস্টার পি. আর. দাসকে। কিন্তু সবচেয়ে স্মরণীয় শচীদা'র যোগেন্দ্রদা'র আড্ডা ও আতিথ্য; রাত্রিশেষে পাটনার গ্রামপথে তাঁদের সঙ্গে পদযাত্রা। তখন পর্যন্ত অমন করে আমি বাঙলাদেশও দেখি নি। সে তো দেখা নয়, দেশকেও পাওয়া। পথ-ঘাটের মানুষই তো দেশ।

দক্ষিণের দক্ষিণা

উত্তর ভারত একমাত্র ভাবতবর্ষ নয়—দক্ষিণ ভারতও আছে। পূজার ছুটি (১৯২৮-এ) হতে না হতেই সেবার ফেণী থেকে কলকাতা এসেছিলাম। সবে কলকাতার হাওয়ায় বুক ভরে নিঃশ্বাস গ্রহণ করছি, এমন সময় বিজয়ার পরদিন সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও রঙ্গীন হালদার দু'জনের আমি অনুচর হয়ে পড়লাম দক্ষিণের পথে। সুনীতিবাবুর আগেই এ পরিকল্পনা ছিল; রঙ্গীনদা তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়ে তা শুনলেন, আর তখুনি স্থির করলেন—ভালো সুযোগ, তিনিও হবেন সহযাত্রী। বাড়ি এসে বললেন, 'তুইও কেন চল না?' জেঠাইমা'ই আমার মন স্থির করালেন, 'তোর যাওয়া ভালো।'

যাত্রী থার্ড ক্লাশে, প্রত্যেকের একশ টাকাতেই হয়ে যাবে। সত্যই প্রায় হয়ে গেছল। ভ্রমণের সে অভিজ্ঞতা অমূল্য ; তার মূল দুই বিন্দু ভাবী তাৎপর্যে অফুরন্ত ও স্মরণীয় !

মাদ্রাজ মেলে থার্ড ক্লাশে রওনা হই—লোক ছিল, কিন্তু 'ভীড়' ঠিক নয়। মনে পড়ে, অধ্যাপক এম. সেনও (মণি সেন) ছিলেন কামরায়। তাঁর প্রকাশন-প্রবর্তনে যাচ্ছেন মাদ্রাজ। কৃতী অধ্যাপক, ও প্রতিষ্ঠাবান, নির্মল, শান্ত, সংযতবাক্, কর্তব্যপালনে একাগ্র, কিন্তু আমাদের পরিচয়-গ্রহণে নিরাগ্রহ। ঘণ্টাখানেক পরে তিনিও যে কামরায় আছেন তা আর মাদ্রাজ পর্যন্ত আমাদের মনে পড়ল না।

সাগর পারে পাড়ি দিতেও মন চায়—কিন্তু তখন ছাড়পত্র কে দেয় ? ভারতবর্ষের মধ্যেই আমাদের 'কণ্টিনেণ্টাল' ট্যুর সীমাবদ্ধ। উত্তর ভাবত কিছু দেখেছি, কিন্তু দক্ষিণ ভারত না দেখলে ভারতকে দেখা হয় কি ? জানতাম না কথাটা কত সত্য, আর এই দক্ষিণ ভারত দেখতে দেখতেই আমার মনে জেগে উঠল ভারতবর্ষের প্রতি দায়িত্ববোধ—সাম্প্রদায়িক ভেদপর্বেও যা আচ্ছন্ন হবে না।

বাঙলাদেশ যে ওড়িষ্যায় মিলে গিয়েছে তাতে বিশেষ বিস্ময় চোখে জাগে নি। সকাল বেলার আলোতে দেখেও মনে হয় ওড়িষ্যা বাঙলা দেহে-মনে এক পরিবার। কিন্তু চিল্কা ছাড়িয়ে ওড়িষ্যাও নওদার দিকে বদলাতে থাকে, বদলে বদলে অন্ধ্র হয়ে পড়ে। তখন নতুন ছাপ দেশের গায়ে, মানুষের বেশবাসে, ক্রমশঃ মুখে-চোখে পড়তে থাকে। সে ছাপ আরও ঘন হয়ে ওঠে যতই গাড়ি যায় অন্ধ্রের পূর্ব-উপকূল দিয়ে তামিলের দিকে। মাদ্রাজ শহরে তেলুগু-তামিল দুই ভাষীর দ্বন্দ্ব-মিলন আর মিলন-দ্বন্দ্ব। মাদ্রাজের পথে তা দেখতে দেখতে বুঝেছি অন্ধ্রের স্বাতন্ত্র্য স্বীকার না করাতে দ্বন্দ্বটা মিলনের অপেক্ষা প্রবলতর ও দুঃসহ হয়ে বর্তমান। এসবের আড়ালে বিশেষ করে তামিলদের কথা ও পরিচয় দুদিন ধরে মুখে মুখে শুনে এসেছি। একটা অদেখা পরিচয় তাই জানা হয়েছে। সে জিনিসটার সঙ্গে মাদ্রাজ মিউজিয়মে চোখাচোখি হ'ল—শোনা কথা চোখে দেখা দিল, চোখ থেকে মনে গেল, মনের মধ্যে তা গুঞ্জন তুলে দিল—এই সেই দ্রাবিড় সভ্যতার রূপ। শিল্পসভ্যতার দিক থেকে তো সেই সর্বভারতীয় বৌদ্ধ সভ্যতার, ব্রাহ্মণ সভ্যতারই প্রকাশ দক্ষিণেও সুবিস্তৃত। কিন্তু এ কথা আংশিক *সত্য। অব্রাহ্মণ দ্রাবিড় চিত্তের আত্মপ্রকাশ এই সত্ত্বেও অব্যাহত তার তামিল* সাহিত্যে, জীবন-চর্যায়, তার লোক-সমাজের চির-বাহিত ভাষায়, ঐতিহ্যে,

আচার-নিয়মে, দেবতার ধ্যানধারণায়, পূজায়-অর্চনায়, লৌকিক দেবতার অজস্র কথায়, 'স্থল-পুরাণে'র অফুরন্ত ঐশ্বর্যে—সে কথা তখনো বুঝতে বাকী ছিল। মাদ্রাজ মিউজিয়মের শিল্প-সম্ভারে বৌদ্ধ, জৈন, শৈব, বৈষ্ণব প্রভৃতি উচ্চ কোটির সংস্কৃতির নিদর্শন সংগ্রহ সত্যই তৃপ্তিদায়ক। বুঝলাম অন্ধ্র হোক তামিল হোক, হোক চের-চোল-পাণ্ড্য-ভূমির দ্রাবিড় দেশ, প্রত্যেকের রাজন্যগোষ্ঠী সংস্কৃতের ঐতিহ্যকে সংস্কৃতির অবলম্বন করতেন. ও ব্রাহ্মণ্য সভ্যতাকে নিজস্ব করে রাজন্য গৌরব বর্ধিত করতেন। তাই ব্রাহ্মণ্য প্রভাবের ভালোমন্দ, গৌরব ও উগ্রতা দক্ষিণাপথের সর্বত্র সুপ্রতিষ্ঠিত—এত কঠিন রূপে প্রতিষ্ঠিত যে সমাজ-জীবনে অব্রাহ্মণ অবজ্ঞাত, অথচ তারাই শ্রমশক্তি, তামিল 'সভ্যতার পিলসুজ।' ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি ছিল শাসক সংস্কৃতি, উত্তর ভারতের ভাব ও ভাষায় ছোপানো। কিন্তু প্রাচীন তামিল ও মধ্য তামিল সাহিত্য ছিল স্বাধীন, তবে উত্তরের সঙ্গে যথেষ্ট মিশ্রিত। তামিলের অব্রাহ্মণ সংস্কৃতি শাসিতের সংস্কৃতি; তাতে বহুলাংশে 'স্থল-পুরাণ' ও লোককৃতির সঙ্গে নিজ প্রাচীন তামিলের ঐতিহ্য রক্ষিত। শাসক ও শাসিতের এই জীবন-যাত্রার তফাতে দৃষ্টিভঙ্গির তফাৎও ঘটে থাকে। দ্রাবিড় রাজশক্তি লুপ্ত হয়ে গেলেও ইংরেজ আমলে দ্রাবিড়-জীবনে সমাজশক্তি হিসাবে ব্রাহ্মণরাই প্রধান থাকে—অনেকটা বাঙালি হিন্দু 'উচ্চবর্ণের মত'—বাঙালি মুসলমানের তুলনায়। ব্রাহ্মণরা গণ্য, মান্য, বুদ্ধিমান, শিক্ষিত এবং রাজকর্মেও প্রতিষ্ঠিত—অব্রাহ্মণদের মধ্যে কিছু চেট্টি, মুদালিয়ার প্রভৃতি বিষয়ীরাও ছিল গণনীয়; আর অন্যরা আমাদের হিন্দু 'ছোট জাতের' মতোই অর্থে-শিক্ষায়-দীক্ষায় নির্জিত।—অবশ্য অব্রাহ্মণদেরও বাইরে আছে 'পঞ্চমা' হরিজনরা। ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের বাইরে অন্য ধর্মীয় সংখ্যাল্প দাক্ষিণের মুসলমানরা আছে। ব্রিটিশ মালাবারে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ; তামিল দেশে তারা বিশিষ্ট ও গণনীয়; আর খ্রীস্টানরা শুধু গণনীয় নয় তারা সম্মানিত। এক কথায় বোধ হয় বলা যায়—দক্ষিণ ভারতে জাতীয় জীবনে গোল বেধেছে ব্রাহ্মণে-অব্রাহ্মণে—উত্তর ভারতে অনেকটা যেমন হিন্দু-মুসলমানে। অবশ্য এখনো সমস্ত কিছুই ব্রাহ্মণদের করায়ত্ত—কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ অব্রাহ্মণরা আর তা সহ্য করছে না। 'জাস্টিস্ পার্টি' যা-ই হোক—সত্যকারের জাস্টিস্ এবং ইতিহাস অব্রাহ্মণদের পক্ষে। তাই এখন তামিল ভাষা ও নাম থেকে সংস্কৃত তৎসম ও তদ্ভব শব্দ বিতাড়িত হচ্ছে।* তামিলের ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ বিরোধ আমাদের চক্ষে দুর্বোধ্য, ওদের চক্ষে

* জাস্টিস পার্টি ও সেল্ফ্ রেস্পেক্ট পার্টির ভিত্তি ছিল যে অব্রাহ্মণ শক্তি, তা নিয়ে, আর বেশ সংকীর্ণ তামিলবাদ আশ্রয় করে, গড়ে উঠেছে এখনকার ক্ষমতাপন্ন 'দ্রাবিড় মুণড্রা কাজগম' পার্টি।

আমাদের হিন্দু-মুসলমান বিরোধটাও তেমনি দুর্বোধ্য। বুঝছিলাম স্বার্থের বৈষম্যটা না বুঝলে দুই বিরোধই দুর্বোধ্য। কিন্তু আমরা করি কি ? আগে স্বরাজ, না, আগে শোষিত মানুষের অধিকার ? অবশ্য, শুধু শ্রেণীস্বার্থই তো বিভেদের ষোল আনা কারণ নয়, আরও নানা কারণ আছে,—সব ক্ষেত্রেই শ্রেণী-স্বার্থের সঙ্গে সে সবও জড়িয়ে থাকে ; সবে মিলে বৈষম্যটাকে আরও দুর্বোধ্য ও দুরতিক্রম্য করে। —দেখি না, কি সে সত্যও আমাদের বাঙালি জাতীয় জীবনে ?

এসব ভাবছিলাম ; তবে না ভাবলেও চলত। কারণ, পথে পথে প্রতিদিনই পটান্তর হয়। স্মৃতির পটে তার রূপরেখা এখন ঝাপ্‌সা ; অবশ্য মূল ফলশ্রুতি এখনো মনে করতে পারি, আর আমাদের ভ্রমণ-পর্বের কাঠামোটাও। দর্শনীয় যা তা দেখাই ছিল তখন মুখ্য কাজ। এই দর্শনীয়ের মধ্যে দু'একজন অধ্যাপকও ছিলেন সুনীতিবাবুর লক্ষ্য। প্রথমেই ছিলেন কলকাতার বন্ধু—মাদ্রাজ আর্ট কলেজের তখনকার প্রিন্সিপ্যাল সুবিখ্যাত শিল্পী দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী—তাঁর সঙ্গে আমাদের তিনজনার একসঙ্গে তোলা ফটো এখনো স্মরণ করিয়ে দেয় তাঁর গৃহে আমাদের একদিনের মধ্যাহ্নাহার ও বিশ্রম্ভালাপ। সারা সকালের পদ-যাত্রা ও 'বাণ্ডি'-যাত্রার শেষে প্রজ্বলিত জঠরাগ্নির পরিতৃপ্তি—লুচি ও উপাদেয় আধা-বাঙালি আহার্যে—কৃতিত্বটা অবশ্য শিল্পী গৃহস্বামী অপেক্ষা শিল্পী-ভার্যারই বেশি। দেবীপ্রসাদের আদর-প্রীতিও উপেক্ষার নয়—ওঁর কিছু পোর্ট্রেট, কিছু চিত্র, আর নির্মীয়মান আশুতোষের মূর্তি—যা এখন চৌরঙ্গী স্কোয়ারে দণ্ডায়মান—চক্ষু ভরে দেখা হ'ল। শিল্পকলার কথায় ও মাদ্রাজে তাঁর জীবনযাত্রা সম্বন্ধে বিশ্রম্ভালাপে অপরাহ্ন প্রায় গড়িয়ে গেছল।

দক্ষিণের ভ্রমণ ভারতী আরম্ভ হয় মাদ্রাজ মিউজিয়মে। অমরাবতী স্তূপের সুরক্ষিত শিল্প-সম্পদ অন্যত্রও বিতরিত হয়েছে। নাগার্জুনকোণ্ডার তখনো পুষ্কর-প্রবেশের সম্ভাবনা মনে হয় নি ; হলে নিশ্চয়ই সেখানে না গিয়ে শুধু মাদ্রাজ মিউজিয়মে অমরাবতীর নিদর্শন দর্শনে আমাদের নিষ্কৃতি ঘটত না। দুই-ই অন্ধ্র দেশের। অমরাবতীতে অবশ্য এই বৌদ্ধ শিল্পের সূচনা খ্রীস্টজন্মের পূর্বে ও পরের দু'শতাব্দী ধরে তা চলে বহুবহু বৎসর। কীর্তি কিন্তু রাজাদের তত নয়, যত ভক্ত মানুষের। রাজারা ছিলেন হিন্দু, কিন্তু রানীরা ছিলেন প্রায়ই বুদ্ধভক্ত ; অর্থাৎ চাঁদ বেনে যখন পৌরাণিক দেবতার উপাসক সনকা-বেহুলারা তখন মনসার ও চণ্ডীর পূজায় নিষ্ঠাবতী। কবেকার সেই শাতবাহন সাম্রাজ্য—মগধের মৌর্য যুগের সময় থেকে আরম্ভ করে সুদীর্ঘ তার গৌরবের ইতিহাস শকদের সঙ্গে সংগ্রামে শেষে ম্লান হয়—দেখছি লাবণ্যময়

চুণ-বালির সবুজ ধবল পাথরের ওপরে বুদ্ধজীবন ও জাতকের খোদিত মূর্তি ও দৃশ্যমালা ! অন্য দিকে মিউজিয়মে ছিল দক্ষিণের প্রসিদ্ধ ব্রোঞ্জ মূর্তিসমূহ ; অসংখ্য—ছোট বড় দেবমূর্তি, দীপলক্ষ্মী, সর্বোপরি—বই-এর ('ড্যান্স অব শিব') ছবিতে কুমারস্বামী ধরে দিয়েছিলেন যে-রহস্য-স্বপ্ন সেই চির-বন্দনীয় নটরাজের ব্রোঞ্জ মূর্তিসমূহ। আলোয়াড়দের বৈষ্ণব সাধনার সঙ্গীত এবং মাণিক্যভাস্‌সর-এর শিবস্তব তো শুনি নি, কিন্তু সুনীতিবাবুর অনুবাদে ট্রেনে তার কিছু পরিচয় ও রসাস্বাদন হয়েছিল। ক্রমশ, এই মিউজিয়ম থেকে আরম্ভ হয় শিল্পের মধ্য দিয়ে দ্রাবিড় সংস্কৃতির সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয়। ইতিহাসের পাতায় ধরা (দশম শতকের) বিশাল গোমত মূর্তি বা অমরাবতীর স্তূপের তেমনি এক একটি ক্ষুদ্র ছাপই তো উত্তর ভারতের আমাদের শিক্ষিতদের সম্বল ; সেই সঙ্গে পাই পরবর্তী কালের বিজয়নগর ও বাহ্‌মনী সাম্রাজ্যের কথা এবং চের চোল পাণ্ড্য রাজ্যের উল্লেখ। ও-ডি-বি-এল-এর (কথারম্ভে) ভারতীয় আর্যভাষায় দ্রাবিড় প্রভাবের কথা যা পড়েছি তার রূপের রসের আভাস এখন ভ্রমণ-কালে পাই—সুনীতিবাবুর সেই রেল-চল্‌তি কথার গল্প মন্তব্য প্রভৃতিতে মুখে-মুখে কৌতুক সরসতায় ও সূক্ষ্মতায় তার স্বাদ-লাভ করছিলাম। এক-একটি গল্প যেন এক-এক ঝলক আলোক। সে-সব কথায় গল্পে আবার পেরিয়ে আসা দেশ, তার মাটি-জল ও মানুষের মুখ রূপ পেয়েছে। একই ভারতবর্ষের বিচিত্র আরেক রূপ।

ওড়িষ্যা ছেড়ে এসেছিলাম অন্ধ্রদেশে (তখনো তা স্বতন্ত্র রাজ্য নয়) ; সেখান থেকে গিয়েছিলাম কোকোনদে (কাকীনাড়া) ; একদিন পরে চলি তামিল ভূমির উদ্দেশে মাদ্রাজ। পরিক্রমা-পথে এই মাদ্রাজ থেকে মহাবলীপুরম্ হয়ে মাদুরা, কাঞ্জীভরম, তাঞ্জুর, কুম্ভকোণম ত্রিচোনাপালি প্রভৃতি পেরিয়ে যাই রামেশ্বর ও মণ্ডপম। আবার উত্তরমুখো এসে রাত্রির ট্রেনে মালোয়ালামের দিকে—তখনো ত্রিবাঙ্কুর ও কোচিন দেশীয় রাজ্য। ত্রিবান্দ্রম-এর পরে ভেতরের খাড়ির (ব্যাক ওয়াটার) দিয়ে লঞ্চে কোচিনের রাজধানী এর্নাকুলম (অপূর্ব আতিথেয়তা-লাভ সেখানে ঘটে, পাই সুশিক্ষিত মেনন-পরিবারে কেরলের সুসভ্য শান্ত জীবনশ্রীর পরিচয়)। তারপর চলি নগর-কোয়েল হয়ে কন্যাকুমারী—সেখানে একটা অদ্ভুত ভারতীয়-বোধ মনে সঞ্চারিত না হয়ে পারে না। শেষে ত্রিচূড় পেরিয়ে উটকামুণ্ডে প্রত্নতাত্ত্বিক ডকট্‌র নিরঞ্জন চক্রবর্তী ও তাঁর আইরিশ স্ত্রীর আন্তরিক আতিথেয়তায় বলা চলে ভ্রমণ সম্পূর্ণ হয়। অবশ্য সমাপ্তি হ'ল তারপরে মাদ্রাজ ফিরে, মাদ্রাজ থেকে ট্রেন চেপে হাওড়ায় এলে।

পথে ট্রেনে, সাধারণ ও বিশিষ্ট বিবিধ লোকের বিচিত্র পরিচয়ে যে অভিজ্ঞতা তাতে লাভ হয়, তার অনেক তথ্য মুছে গিয়েছে। তবে অভিজ্ঞতা

হারিয়ে যায় না। সব তথ্য মুছে গিয়ে যা মনের তলায় থাকে তাই নাকি কালচার,— তা জীবন-দর্শনের অঙ্গ হয়ে যায়। তামিল দেশে ও কেরলাতে (১৯২৯-এ) দেখেছি ইংরেজ আমলের শহরের সভ্যতার ওপরে তখনো অবিলুপ্ত নিজ নিজ জীবনের ছাপ। ভারত জীবনের শ্রীছন্দ মাদ্রাজ থেকেও উঠে যায় নি —তামিল দেশের অন্যান্য শহর ও পল্লীজীবন থেকে তো যায়ই নি। মন্দিরের দেশ—সর্বত্র তা দৃশ্যমান, সে মন্দির তামিল শিক্ষিত-অশিক্ষিতদের জীবনের কেন্দ্রস্থল। সন্ধ্যায় পুরুষেরাও স্নানশুচি বেশে মন্দিরের পূজা-আরতিতে উপস্থিত হয়—ব্যবহারিক জীবনে তারা যেমন আবেগবাহুল্য-হীন কর্মপটু, অধ্যাত্ম জীবনে তেমনি স্বচ্ছন্দ ভক্তির বলে আতিশয্যহীন।—তামিল মেয়েরা নিশ্চয়ই সেই জীবন-শ্রীতে বেশি দর্শনীয়। তবে সাধারণ ভাবে কেরলেই মেয়েদের স্বচ্ছন্দ শ্রী ও কোমলতা বেশি স্পষ্ট। জড়তা তাদের আড়ষ্ট করে নি, তাদের গতিতে-রীতিতে আছে স্বাধীনতা ও স্বচ্ছন্দতা—বাড়াবাড়ির লেশও তাতে নেই।

দক্ষিণের মানুষ নিজের পুরনো জীবনযাত্রা একেবারে হারায় নি বলেই যেমন বহু অন্যায়কে বিনা দ্বিধায় গ্রহণ ও পোষণ করে এসেছে, তেমনি তাদের স্বভাবগত সৌন্দর্য, রুচিবোধ ও শ্রীবোধও অনেকটা আচার-নিয়মের বাঁধনে অবিকৃত থেকে গিয়েছে। অন্ততঃ তখনো দক্ষিণ ভারতীয় জীবনের দ্রাবিড়াংশ রঙচটা হয়ে যায় নি—তা রঙে ও রূপে তখনো সজীব ছিল। পদে পদেই এ সত্যও মন বুঝে নিয়েছে—ভারতবর্ষ এক হয়েও বিচিত্র। ভাষা জানি না, কথা বুঝি না। মূর্ধন্য ধ্বনির অদ্ভুত আধিক্যে রঙ্গও বোধ করেছি। মাদ্রাজে পথ জিজ্ঞাসার জন্য জিজ্ঞাসা করেছি—ব্রিজ (ব্যাকিংহাম ব্রিজ) কোথায়? উত্তর পেয়েছি—'তা তো অনেক দূর, মাউন্ট রোড পেরিয়ে—সমুদ্রতীর ইত্যাদি।' সুনীতিবাবু বললেন,—তা নয়; এ পাড়ায় একটা ছোট খাল, যার ওপরে পুল, ব্যাকিংহামের নামে—। এবার সোল্লাস উত্তর: 'ওঃ! ইয়ু মিন্ ব্রিড্জে—দ্যাট ইজা ওয়েরি নিয়ার'। পাওয়া গেল 'ব্রিড্জে'। ওরা মাথা নেড়ে 'না' বললে আমাদের 'হাঁ' বোঝায়। এসবে মজা পাই,—'আণ্ডুমাণি', 'এট্‌মাণি'ও বলতে শিখি। 'পক্ষিতীর্থ'কে 'পাক্ষিতীর্থ' না বলে 'তিরুক্কাজুকুণ্ড্রম্' বলার জন্য রীতিমতো মোহড়া দিই। ও প্রসঙ্গে সুনীতিবাবু বলেন একটা মজার গল্প—এচ্. জি. ওয়েলস-এর অভিজ্ঞতা। রাত বারোটার বের্লিনের একটি পথ-প্রদীপের তলায় এচ্. জি. ওয়েলস (১৯১২।১৩) দেখলেন, একদল ছাত্র কী বলছে আর আড্ডা জমাচ্ছে। কান পেতে শুনলেন, তারা 'রাভিণ্ডর নাঠ টাগোরে' নামটা বার বার উচ্চারণ করছে। সবে মাস কয় আগে রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন। বের্লিনের ছাত্রদের সাংস্কৃতিক চেতনায় ওয়েলস তাই খুব মুগ্ধ।

জিজ্ঞাসা করলে ওয়েলস জানতে পারলেন—ছাত্ররা বাজি রেখেছে ও নাম বিশুদ্ধ ভাবে উচ্চারণ করার জন্য। কম কথা নয়, ভারতীয় কবির নাম শুধু এই ছাত্রদের পরিচিত নয়, শুদ্ধভাবে ও নাম উচ্চারণ, ভালো ভাবে উচ্চারণ, করা চাই! জানা গেল রাত বারোটার দিকে রেস্টুরেন্ট থেকে তারা বেরিয়েছে—বিয়ারের শেষ বোতলটি সঙ্গে। বোতলটা তারই হবে প্রাপ্য যে সব থেকে ভালো করে উচ্চারণ করতে পারবে অমন দাঁতভাঙা নাম—'রাভিণ্ডর নাঠ টাগোরে।'—আমাদের অবশ্য অমন আকর্ষণীয় বা লোভনীয় প্রাপ্য ছিল না, তাই বাজি রাখি নি। তবু পক্ষিতীর্থম্ তামিলদের গ্রাহ্য সংস্কৃত নাম, তামিল নামটা উচ্চারণের চেষ্টা আমাদের পক্ষে দুঃসাহস নয়। কিন্তু যতবার যা বলি তামিলরা তা বোঝে না। মার্ক টোয়েন-এর কথিত গল্প মনে পড়ে। মার্ক টোয়েন জানাচ্ছেন, 'দেখলাম পারিসের লোকদের ফরাসী ভাষা যথেষ্ট জানা নেই। আমি গরগর করে ফরাসী বলছি বরাবর, আর তারা এক বর্ণও ফরাসী বুঝছে না'. দক্ষিণের পথে আমরা কোথায় যাচ্ছি, বাসের সহযাত্রী জিজ্ঞাসা করে। যতবার বলি 'তিরুক্কাজু কুণ্ডম্', তারা বলে সে কোথায়? তারা চেনে না। বুঝিয়ে বলি, পক্ষিতীর্থ—'পক্ষি তীর্থম্?—ও: 'তিরুকাজু কুণ্ডম্।' আমরা বলি, আমরাও তো তাই বলছি—তিরুক্কাজু কুণ্ডম্। ওরা উচ্চারণ শুদ্ধ করে দেয়—'তিরুক্কাজুকুণ্ডম্'। আমরাও পিছনে পিছনে শুদ্ধ করে বলি—তিরুক্কাজুকুণ্ডম্। ওরা হেসে আবার শুদ্ধ করে দেয়—'তিরুক্কাজুকুণ্ডম্।' আমরাও মেনে নিয়ে আবার শুদ্ধ করেই বলি, 'তিরুক্কাজুকুণ্ডম্।' ওরা শুদ্ধ করে আমাদের যা শেখায় আমরা শুদ্ধ করেই তা বলি, কিন্তু ওরা তামিল শুদ্ধ উচ্চারণ বলতে যদি বা পারে তা শুনে বুঝতে পারে না। এভাবে ওদের তামিল জ্ঞানের পরীক্ষা শেষ না হতেই এসে গেল পক্ষিতীর্থম্। পূর্বঘাটের নিচু নিচু পাহাড়ের মধ্যে বাস এসে দাঁড়ায় গন্তব্যস্থলে। যাত্রীরা নামে। বেলা ন'টার মতো। ঠিক দশটায় প্রতিদিন ওই উত্তর-পূর্বের পাহাড়-ঘেরা অধিত্যকার থেকে সামনের প্রায়-সমতল উঁচু প্রস্তরপৃষ্ঠ পাহাড়টির ওপরে এসে বসবে দুটি পাখি—দুই ঋষি। আবহমানকাল থেকে তাঁরা আসছেন। এখানকার পূজারীর প্রদত্ত নৈবেদ্য, আহার্য, পানীয় গ্রহণ করে যান। প্রতিদিন, বেলা দশটায়। আপিসের 'টাইম জ্ঞান' আছে, পাখিরা 'লেট' হন না।

দশটার ঘণ্টাখানেক দেরী আছে। ততক্ষণ আমরাই তাদের দর্শনার্থী—তীর্থের কাক। নিকটের অনুচ্চ পাহাড়ের দুটি ছোট-বড় পাথর-খোদা যাত্রী-গৃহে অপেক্ষা করি। তার পাথরের দেয়ালে নানা জাতের নানা হরফে যাত্রীদের স্বহস্ত উৎকীর্ণ নাম-তারিখ আছে। সবচেয়ে প্রাচীনটি রোমান হরফে লেখা

একটি ওলন্দাজ নাম, তারিখ (এখন যতদূর মনে পড়ে) পঞ্চদশ শতাব্দীর। তা হলে 'পক্ষিতীর্থম্'-এ তৎপূর্বেই যাত্রীর আগমন হ'ত—অবশ্য কলিযুগের এইটিই প্রথম প্রাপ্ত প্রামাণিক তারিখ। যথাকালে পূজারী নৈবেদ্য নিয়ে গেলেন যথাস্থানে। যাত্রীদের থেকে হাত চল্লিশ-পঞ্চাশ দূর—মাঝে একটু পাহাড়ের খাদ, তার কাছে যাওয়া যাত্রীদের নিষেধ। সসম্ভ্রমে তারা নির্বাক না হোক, নিম্নবাক। আশ্চর্য। এসে গেলেন সত্যই দশটার মিনিট দশের মধ্যে অধিত্যকা থেকে ঘুরে উড়ে একটি পক্ষী। তার মিনিট দুয়েকের মধ্যে দ্বিতীয়টি, পূর্বেকার পক্ষীটির থেকে অপেক্ষাকৃত বয়ঃকনিষ্ঠ, অন্ততঃ আকৃতিতে এবং প্রকৃতিতেও। প্রথম পক্ষী অকুতোভয়ে পূজা গ্রহণ করছেন। নিকটে হাত দুই দূরে বসে পূজারী, একটু সতর্ক ভাবে এগিয়ে এসে ঋষিবর গ্রহণ করেন ভোগ। দ্বিতীয় আকাশচারীও পরে গ্রহণ করেন। তবে চার পাঁচ হস্তেন মনুষ্যাণাং। পূজারী-প্রভু উচ্চকণ্ঠে আমাদের দর্শকদের জানান—এই দুই ঋষি সত্য ত্রেতা দ্বাপর ব্যাপী এভাবে একই স্থানে এসময়ে দর্শন দেন, এবং বরাবর পূজা গ্রহণ করেছেন। আমাদের মনে হ'ল ঋষিদ্বয় যেন আমাদের শঙ্খচিল ও শঙ্খচিলানী। সুনীতিবাবু জানালেন, য়ুরোপীয় পক্ষিতাত্ত্বিকরা বলেন এ জাতীয় পাখি জোড়া বেঁধে থাকে। তা হবে, ঋষিরাও তো সপত্নীকই তপস্যা করতেন। ঋষিদের পাখি হতে বাধা নেই। তবে বেলা দশটা তাদেরও আহারের টাইম। তা সমাধা হ'ল। মিনিট দশ পরে তাঁরা আবার উড়ে চলে গেলেন। আমাদেরও পক্ষিতীর্থের পুণ্য সঞ্চয় হ'ল—এখন বাঁও করে আরও মাইল সাতেক যেতে হবে—সমুদ্রতীরের মহাবলীপুরম্-এ। যাকে কেউ কেউ বলে মামল্লপুরম্—কেউ আবার মহামল্লপুরম্।

মহাবলীপুরম্

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে গাড়ি এসে দাঁড়ায় মহাবলীপুরম্-এর ইন্স্পেকশন বাংলোর সামনে। প্রখর রৌদ্র। সামনে জলশূন্য একটা নদী বা সমুদ্রের খাড়ি। তারপরে নিচু-নিচু পাহাড়ের ওপাশের গা ঘেঁষে সেদিনের মহাবলীপুরম্। পাহাড়ের এপার থেকে দেখা যায় না সে সমুদ্র, অনুভব করা যায়,—পাহাড়ের ওপারের আকাশের তলে বাতাসের গর্জন শোনা যায়, স্পর্শও পাওয়া যায়। কিন্তু বাংলোটি চমৎকার—বোধহয় বিশিষ্ট ও বিদেশীয় পর্যটকদের জন্য নির্মিত। আজ তারা কেউ নেই—আমরাই একমাত্র যাত্রী। তত্ত্বাবধায়ক অবসরপ্রাপ্ত তামিল সৈনিক—চলনে বলনে স্মার্ট ও দোরস্ত। জানিয়ে দিলে স্নানাহার-বিশ্রামের ব্যবস্থা তখুনি হয়ে যাবে। তারপরেও 'রথ' দেখবার সময় যথেষ্ট থাকবে

—রৌদ্রও কমবে। আহার লঘু ও পরিপাটি, সমুদ্রের হাওয়ায় গ্রীষ্ম-মধ্যাহ্নও আরামদায়ক। তবু অপরাহ্নের আগেই সে আরামের মায়া ছেড়ে যেতে হ'ল মহাবলীপুরম্-এর পুরমধ্যে। খাড়ি পেরিয়ে ছোট লম্বা পাহাড়—তার পরে প্রশস্ত সমতলভূমি সমুদ্রের মধ্যে ডুবে গিয়েছে—পাহাড় ও সমুদ্রের মাঝখানে মাইল দুয়েক জুড়ে ছিল মহাবলীপুরম্ বা মামল্লপুরম্। পল্লব রাজাদের রাজধানী কাঞ্চী অর্থাৎ কাঞ্চিপুর বা কাঞ্জিভরম্-এ। অজস্র পল্লব কীর্তি পরে সেখানে দেখেছি। এখানে ছিল বোধহয় বিশ্রামাবাস। তামিল দেশের ইতিহাস তো বেশি জানি না। কিন্তু এই পল্লব রাজবংশ সামান্য নয়, জানবার মতো তাঁদের কীর্তি। উত্তর ভারতে তখন হর্ষবর্ধনের কাল—চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীন্ হর্ষকে দক্ষিণের পথে প্রতিহত করেছিলেন ৫২০ খ্রীস্টাব্দে। তারই সমকালে আরও দক্ষিণে তখন পল্লবদের রাজ্য। অনেকটা মাদ্রাজ অঞ্চলে, চিংলিপুট, আরকট, ত্রিচোনাপালি, তাঞ্জুর প্রভৃতি জেলায় তা বিস্তৃত ছিল। কোথা থেকে অপরিচিত এ রাজবংশ যে জেগে উঠল তা বলা কঠিন। খ্রীস্টীয় ৬০০ অব্দের দিকে পল্লব রাজারা প্রবল। ৬৪২-এর দিকে তাদের হাতেই পুলকেশীন্ও পরাজিত হয়ে রাজ্য হারান। হিউএন্ ৎসাং তখন সেই অঞ্চলে। দাক্ষিণাত্যের কোনো ঔপজাতিক শক্তির জাগরণ কি পল্লবশক্তি ? দক্ষিণের ইতিহাসেও এ একটা অমীমাংসিত প্রশ্ন। শত দেড়েক বৎসর পরে (খ্রীঃ ৭৪০ অব্দে) আবার চালুক্যদেরই হাতে পরাজিত হয়ে ইতিহাসের মঞ্চ থেকে পল্লবরা সরে যায়। মহাবলীপুরম্ দেখাতেই পরে পণ্ডিচেরীর কলেজের অধ্যাপক জি. জুভো দ্যুব্রুইয়্ (Jouveau Dubreuil) মহাশয়ের 'দি পল্লবস' নামে ছোট্ট বইখানা পড়বার ঝোঁকও চেপেছিল। তবে পথে এবং উক্ত স্থল দেখতে দেখতে সুনীতিবাবুর মুখ থেকে সে-সব কথা শুনতে পাচ্ছিলাম, আর দেখতে দেখতে শোনা বলেই আস্বাদনে আনন্দ ছিল—মনে তা বাসা বেঁধে রইল।—মহেন্দ্রবর্মা প্রথম পল্লব রাজা (আনুমানিক খ্রীস্টীয় ৬০০-৬২৫-এর লোক) ; পর্বত কেটে মন্দির, গুহা, মণ্ডপ তিনিও করেছিলেন কিন্তু সে অন্যত্র। মহেন্দ্রের পরে নরসিংহ বর্মা (৬২৫-৬৪৩)। তারই হাতে চালুক্য পুলকেশীন-এর পরাজয় (৬৪২)—ঠিক দু বৎসর আগে (৬৪০) হিউএন ৎসাং পল্লব রাজধানী কাঞ্জীভরমে গিয়েছিলেন, তার এক বৎসর আগে পুলুকেশীন্-এর রাজসভায়ও তিনি ছিলেন। কাঞ্চীর তখন ঐশ্বর্যের যুগ। নরসিংহ বর্মণই আসলে মহাবলীপুরম্-এর প্রতিষ্ঠাতা—পাহাড় কেটে 'পাণ্ডব রথ'গুলি তাঁর নিযুক্ত শিল্পীদের কাজ। আর পাহাড়ের গায়ে পাথর কেটে মণ্ডপগুলিও তাঁরাই নির্মাণ করেন। নির্মাণ করেন অর্জুনের তপস্যা (বা ভগীরথের-গঙ্গা আনয়ন)

—পাহাড়ের গা-জোড়া প্রকাণ্ড বড় ভাস্কর্য-কীর্তি, এবং এখানে ওখানে ছোটখাটো নানা জিনিস। এ তথ্যটুকু জানা অবশ্য যথেষ্ট হ'ত না—আরও বেশি তথ্যতেও সে জানা শেষ হবার কথা নয়—কারণ চোখে যা দেখলাম ইতিহাসের দু'-দশ লাইনে ওসব তথ্য সেই যথার্থ মর্যাদা পায় না। বরং প্রত্যক্ষ দর্শনেই ইতিহাসের অক্ষর-পরিচয় সার্থক হয়। রাজা রাজবংশের সব তালিকা কার ভালো লাগে? কিন্তু মহাবলীপুরম্ দেখার পরে সে নামগুলিও মনে হয় প্রাণবন্ত—অবিস্মরণীয় অধিকারী তারা পল্লব-কীর্তির, আর সে পল্লব-কীর্তি ভারত-জীবনের ও ভারত-সংস্কৃতির ইতিহাসে,—গুপ্তযুগের ভাস্কর-কীর্তির মতোই মহিমাময়। উত্তর ভারতে তো ভারতীয় মূর্তিশিল্প অক্ষত থাকতে পায় নি—যা আছে তা বরং আছে দেখছি দক্ষিণ ভারতে।

মহাবলীপুরম্ নিশ্চয় ভারতবর্ষের গৌরব—শুধু বিদেশী দর্শনার্থীর দ্রষ্টব্য নয়। তার ভাস্কর্য স্থাপত্য সর্বত্র সুপরিচিত, তার পাণ্ডব রথ, অর্জুনের (বা ভগীরথের) তপস্যা, তার সমুদ্রতটের তরঙ্গাহত 'সৈকত মন্দির' এ সবের চিত্র আর্টের বই-এ এবং নানা সচিত্র সাময়িক পত্রেও সহজলভ্য। একালের সভ্যতা উৎকট হলেও এসব সৌভাগ্য অনেক মানুষকে জুগিয়েছে। পঞ্চাশ বৎসর আগেও নালন্দা রাজগৃহের কথা বা মহাবলীপুরমের কথা কত জন ততটা জানতে পারত? মধ্যযুগের দিল্লী, আগ্রা, কিম্বা প্রাচীনতর নালন্দা গয়া ছাড়া কতটুকু আমি দেখেছি ইতিপূর্বে? দেখলেও অবশ্য মর্মগ্রহণ সহজ হ'ত না—যদি চোখ খুলে দিতে জ্ঞানাঞ্জন শলাকা নিয়ে না থাকৃতেন তখনো সহৃদয় সঙ্গী। সঙ্গী না হয়ে তিনি যদি হতেন বিদ্বান্ বক্তা আর আমি শ্রোতা, তা হলেও কিছু আস্বাদন পেতাম। কিন্তু পথ চলায় ও সুহৃদের মতো কথায় আলাপে সুনীতিবাবুর কাছ থেকে যা পাওয়া যাচ্ছিল—তা শুধু শিল্পের রসাস্বাদন নয়, জ্ঞানের আলোক-স্পর্শও নয়,—সে সবই; সেই সঙ্গে আমাদের মনে উদ্বোধন হচ্ছিল ইতিহাসের রহস্যানুভূতির। মহাবলীপুরম্-এ এই রস-চেতনা আমাদের মনে দেখা দেয় তা অনুভব করি। আমাদের কালে আমাদের ভেতরে তা জেগেছিল—প্রথম কৈশোরে—অজন্তা-ইলোরার শিল্পাকর্ষণে বা অবনীন্দ্রনাথ-নন্দলালের চিত্রকলায়, আর যৌবনে 'গ্রেটার ইণ্ডিয়া সোসাইটি'র নবারব্ধ আন্দোলনের স্পর্শে। সকলের মূলে ছিল বোধ হয় রবীন্দ্র-সাহিত্য। সুনীতিবাবুর মুখে যবদ্বীপ-শ্যাম প্রভৃতিতে তাঁদের অভিজ্ঞতার কথা শুনৃতে শুনৃতে এক অদ্ভুত আভাস পেতাম, কিন্তু প্রত্যক্ষ দর্শনের শক্তি আরও অমোঘ। মহাবলীপুরম্-দর্শন সেদিক থেকেও এ জীবনের একটি দিক্‌চিহ্ন। আর এই শেষ বয়সে মনে পড়ে এই মহাবলীপুরম্-এর স্মৃতির পার্শ্বে আমার

স্মৃতিতে এখন সঞ্চিত তার সগোত্র আরেকটি দৃশ্য—সুনীতিকুমারের সঙ্গই দিয়েছিল আমাকে সে সৌভাগ্য—ত্রিশ বৎসর পরে তাঁর সঙ্গে চীনের লো-য়াং নদীর তীরে দেখি অনুরূপ পর্বত গাত্রে খোদিত চীনা-বৌদ্ধ ভাস্কর্যের অপরূপ দৃশ্যমালা—সে ১৯৬০-এর কথা—মহাবলীপুরম্‌ও বুঝি তার কাছে হার মানে। যদিও এখনো ভুলি নাই মহাবলীপুরমের রথসমূহ, সেই একই মণ্ডপে এক প্রাচীরে অনন্তশয়ানে বিষ্ণু (যেন শান্তরূপ বিধাতার), বিপরীত প্রাচীরে অসুরনাশিনী দুর্গা (অনন্তবীর্যবতী, বিধাতার গতিরূপের প্রতীক)। ভুলি নাই অর্জুনতপস্যা, ভুলি নাই 'গোবর্ধন ধারণ', ভুলি নাই মন্দিরের শিল্প কর্ম। ১৯২৯-এ মহাবলীপুরমে সে-সব কীর্তি দেখতে-দেখতে কী যেন হয়ে যাচ্ছিলাম—মুখে কথা সরছিল না। অবশ্য মহৎ আর্টের সামনে দাদার বাকস্ফূর্তি বাধা পায় না। বুদ্ধি ও বোধে সুনীতিবাবুও মুখর। চোখে-মুখে উৎসাহের ছাপ। চোখ দিয়ে যা দেখেন, মন দিয়ে দেখেন তারও বেশি—আর মুখেও কথায় ফোটে স্বতঃস্ফূর্ততার অকৃত্রিম প্রকাশ। গোবর্ধন-ধারণের মণ্ডপটিতে পৌঁছে তিনি এক আবিষ্কারের দ্বারে পৌঁছলেন। উৎসাহ আর চেপে রাখতে পারলেন না ঃ "জানেন তো, কৃষ্ণ-কাহিনীতে শ্রীরাধার উদয় একটা বড় রহস্য। ভাগবতে রাধার নাম নেই। কবে থেকে রাধার এ উদয়? পাহাড়ে খোদা ওই মণ্ডপের এক প্রাচীরে খোদা শ্রীকৃষ্ণের গোবর্ধন ধারণ। ভাস্কর্যে-শ্রীকৃষ্ণের হাতে তোলা গোবর্ধন। জীব-জগৎ ঊর্ধ্বোত্তোলিত পাহাড়ের তলে আশ্রয় নিচ্ছে। কৃষ্ণের পার্শ্বে তিন জন গোপী, ইন্দ্রের মেঘ-জল-প্লাবনের হাত থেকে শ্রীকৃষ্ণ তাদের রক্ষা করছেন। তিন জনের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের নিকটতম যিনি বোঝা যায় তিনি প্রধানা, আকারে একটু বড়, অন্য দু'জন তার থেকে একটু ছোট। শুধু তা নয়—কৃষ্ণের যিনি এই নিকটতমা তাঁর মুখে দেহ ভঙ্গীতে তেমনি একটি সানন্দলীলার ছাপ—তিনিই আদরিণী, কৃষ্ণের ওপর তাঁরই দাবী প্রধান—দয়িতের গর্বে গরবিনী, অন্য দু'জনা সে তুলনায় সঙ্গিনী, রূপহীনা নয়, সঙ্গীর গর্বে গর্বিতা, আর ভাগ্যবতী।" শুনছিলাম, 'তা হলে বোঝা যাচ্ছে এ সময় থেকেই অন্ততঃ ব্রজলীলার ব্রজগোপীদের মধ্যে একজন বিশিষ্ট ও প্রধানা হয়ে উঠেছেন, আর এরূপে একজন শ্রীকৃষ্ণের নিকটতমা হয়ে উঠ্‌তেই এ কাহিনীতে চিরন্তনী দ্বৈতলীলার রস জমবার মতো উপাদান বেড়ে গেল। অন্ততঃ এই মহাবলীপুরম্‌-এর গোবর্ধন-ধারণের শিল্পনিদর্শনে দেখছি কৃষ্ণলীলার এই বিকাশ দক্ষিণে তখন সুস্থির—সেই ব্রজমোহিনীর রাধা নাম তখনো স্থির হয়েছে কি হয় নি, তা তো এই ভাস্কর্যে লেখা নেই, তবে ভাস্কর্যে যা আঁকা—মাধুর্য—তাতে মনে হয় নাম শুদ্ধ, সেই ব্রজকিশোরী

তখন দাক্ষিণাত্যে প্রতিষ্ঠিতা,—প্রীতি ও ভক্তির মূর্ত বিগ্রহ।" শ্রীরাধার জন্মের সন তারিখ এখানে না থাক, ব্রজলীলার এরূপ পুরাতন আবির্ভাবের আভাস ভাস্কর্যে পাওয়া যায় পাহাড়পুরেও, সুনীতিবাবু পরে একথা নানাখানে উল্লেখ করেছেন, বৈজ্ঞানিক গবেষণায় ও সুস্থির ভাষায়। কিন্তু সেদিন ওখানে সে আবিষ্কারের আনন্দ ও সেই শিল্প উপভোগের আনন্দে তিনি ছিলেন আনন্দোচ্ছ্বাসিত—শব্দ-প্রয়োগে কিন্তু মাত্রাহীন নন। তবে চোখে-মুখে কতকটা মুখর; দাদাও তাঁর সহযোগী। উৎসাহের ঔজ্জ্বল্যে ও বাণীর আন্তরিকতায় সেই ছোঁয়াচটা এ অর্বাচীনের মনেও লেগেছিল, কিন্তু মুখে কথা যোগায় নি।

এই পল্লব সভ্যতার শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র ছিল কাঞ্চীভরম্—তার পুরাকীর্তির মহিমা অন্যত্রও। মাদুরা, তাঞ্জুর, চিদম্বরম্, কুম্ভকোনম্, রামেশ্বরম্ পর্যন্ত পথে পথে নানা যুগের তামিল (চোল ও পাণ্ড্য) সভ্যতার অজস্র কীর্তির নিদর্শন। দ্রাবিড় ভারতের প্রতি একটা সশ্রদ্ধ মমতাবোধ করছিলাম—ভারতবর্ষের মানুষ হিসাবে এঁদেরকে এমনি আত্মীয় বলে না জানলে আমাদের নিজেকেও জানা কত খণ্ডিত হয়ে থাকে। ভারতবাসী হিসাবে আমার মর্যাদা সামান্য নয়,—আর তাই দায়িত্বও সামান্য নয়,—দক্ষিণে এই দক্ষিণা সঞ্চয় করছিলাম।

আরও একটি দিক থেকে দক্ষিণা লাভের ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছিল। তখন যতটা বুঝেছিলাম তার থেকেও পরে তা বুঝতে পারি বেশি—না হলে হয়তো এ লাভ ভুলে যেতাম।

মহাবলীপুরম্ বা মামল্লপুরম্-এ অভিভূত হয়েছিলাম। ওখানে প্রাকৃতিক পরিবেশ বা মানুষের সৃষ্টি কোনোটাই সামান্য নয়, সঙ্গীদের দানও সে, পক্ষে গণনীয়, ইন্‌স্পেকশন্ বাংলোর বিশ্রাম ও ভোজ্য, তৃপ্তিকর ব্যবস্থাও আশাতীত। পাহাড়-খোদা মণ্ডপ, অর্জুন-তপস্যা, রথ'গুলির সেই রোমাঞ্চ বাড়ি ফিরেও একেবারে হারিয়ে গেল না। তাই লিখে ফেললাম একদিন একটা 'পদ্য'। আমি কবিতা লিখি, একথাটা 'কাবুলীওয়ালাও গান গায়'—এ তথ্যের থেকে, শরৎবাবুর না হোক্ আমার পরিচিত বন্ধু-সমাজে, কম কৌতুকের সঞ্চার করত না। তবে আরও এক কারণে কৌতুকের ও কৌতূহলের বিষয় তা হয়ে উঠেছিল। পদ্যখণ্ড প্রথামত লিখলাম, নাম দিলাম 'তাম্বুলকরঙ্কবাহিনী'। 'রথের' উৎকীর্ণ রাজা-রানীদের পিছনে পিছনে দেখছিলাম তাদের এক-আধজনকে, প্রাচীন ভারতের রাজ-ঐশ্বর্যের পরিচায়িকা এই পরিচারিকারাও। দেখতে নিশ্চয় তারা সুশ্রী হ'ত, শিল্পীও তাদের সে গৌরব ক্ষুন্ন করেন নি। কিন্তু শিল্পীরও সাধ্য ছিল না রাজরানীর

রূপকে খর্ব করে অনুচরীদের দেন প্রাধান্য—রূপে বা আকৃতিতে। আর, আমার মনটা যত সেই রাজরানীদের পায়ে লোটাচ্ছিল ততটা সেই পরিচারিকাদের দিকে তাকাতে তখন ব্যস্ত হয় নি। কিন্তু এই পরিচারিকাদের পদ-পরিচয়টা শব্দসম্পদে যতটা মনে চমক দিত কোনো মহিষী পট্টমহাদেবীর পদবীও তা দিত না। শব্দটা নতুন শোনা নয়, সংস্কৃত কাব্য-জগৎ থেকে পূর্বেই মনে সঞ্চিত। পল্লব রাজারানীর চরণ-চারণ এই গৌড়জনের মন থেকে যখন সম্রাট সম্রাজ্ঞীর রূপ-চমৎকৃতি পদ্য হয়ে উঠ্‌ল, তখন সাহস কোথায় বলি—এ পদ্য কাদের স্তব? ভীতু—এবং একটু রোমাণ্টিক গুঞ্জন মনে মনে পোষণ করেই, পদ্যখণ্ডের নাম দিয়েছিলাম 'তাম্বুলকরঙ্কবাহিনী।' তাতেও কারও আপত্তি করার কথা নয়—বোধহয় পল্লব রাজলক্ষ্মীদেরও হ'ত না—বিংশ শতকের এই প্রাকৃতজনদের দৌড় আর কতটা হবে? রাজরানীর অপেক্ষা এই অনুচরীদের কৃপাকটাক্ষেরই তো প্রার্থী হওয়া স্বাভাবিক এই প্রাকৃতজনের। কারও আপত্তি নেই—সে নামেই মহাবলীপুরের কাব্যিক গুঞ্জন কাগজস্থ থেকে গেছল খাতাপত্রের মধ্যে।

বছর দুয়েক পরে একদিন অপরাহ্ণে নীরদবাবু ও আমি আমাদের কলকাতার আস্তানায় ফিরেই দেখি—পুলিশ, তারা অনুসন্ধান রত। খুঁজে খুঁজে বের হ'ল সেই পদ্য-লেখা কাগজখণ্ড, না, খাতা, আর অমনি জিজ্ঞাসা শুরু হ'ল 'তাম্বুল-করঙ্কবাহিনী' কে? উত্তর দিয়ে তাদের কৌতূহল নিবৃত্ত করা সহজ ছিল না। নীরদ চৌধুরী উপস্থিত; তাঁকে বলতেই কৌতুকের রঙ্গ হাস্য ফুটল তাঁর মুখে। বুঝলাম, সেগুলি পরিহাসের সাময়িক সংস্করণ। পুলিশের থেকে অব্যাহতি পেলেও অতঃপর এ কাণ্ড যে বন্ধু সমাজের ও নীরদ চৌধুরীর সরস ব্যঙ্গের উপকরণ হয়ে থাকবে তাতে আমার সন্দেহ ছিল না। কিন্তু আপাততঃ নীরদবাবুই সস্মিত সজ্জনতায় গোয়েন্দা ও থানা পুলিশের দুই প্রভুকে বোঝাতে চাইলেন—'কে বা কাহারা' এই তাম্বুলকরঙ্কবাহিনী। —একালের কোনো সাহসিকা গোপনচারিণী নন, সেকালের, মহাবলীপুরমের পল্লবরাজত্বের বিদ্রোহিনীর রথগাত্রের প্রতীকও নন। কতটা তা পুলিশ সজ্জনেরা বুঝলেন জানি না, কিন্তু সম্পূর্ণ বিশ্বাস করলেন না তা বুঝলাম। পদ্যখণ্ড তাঁরা 'seize' করলেন। তারপরে খানাতল্লাসীতে প্রাপ্ত অপরাধজন প্রমাণপত্রের মতো সেই 'তাম্বুলকরঙ্কবাহিনী' হ'ল একদিকে তাদের অনুসন্ধেয় একজন; আর অন্যদিকে কাবুলীওয়ালার গান-গাওয়ার মতো এ পদ্য হ'ল বন্ধুদের পরিহাসের উপকরণ।

দক্ষিণের এ জাতীয় দক্ষিণা সে যাত্রায় পথে পথেই জুটে গিয়েছিল;

কিন্তু তা আমার নিজের কর্মে নয়; আর আমি একা তার পাত্র ছিলাম না, তিনজনই ছিলাম তার লক্ষ্য। কারণটা আর কিছু নয়—আমাদের পণ্ডিচেরী যাওয়া। মন্দিরের রাজ্যে পণ্ডিচেরী ব্যতিক্রম। পথে আমাদের তা দ্রষ্টব্য হ'ল ভারতে ফরাসীদের প্রধান নগর হিসাবে নয়, বরং দিলীপ রায়ের জন্য ও শ্রীঅরবিন্দের নামে। অবশ্য শ্রীঅরবিন্দ তখন কাউকে দর্শন দেন না জানতাম। পরে জেনেছিলাম তখনো বৎসরে দু'দিন তিনি দর্শন দিতেন। আমরা ধরেই নিয়েছিলাম শ্রীঅরবিন্দের দর্শন লাভ আমাদের ভাগ্যে নেই, আমাদের অবশ্য তাতে অধিকারও নেই। কিন্তু আমার নয়, আমার জ্যেষ্ঠদের যথেষ্ট পরিচয় ছিল শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায়ের সঙ্গে। ঔৎসুক্য ছিল অমন সদা-তৎপর সামাজিক মানুষটি শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে কী ভাবে আপনাকে খাপ খাইয়ে নিয়েছেন। অবশ্য তিনি তখনো ঠিক আশ্রমের অভ্যন্তরবাসী নন, আশ্রমের অদূরে একটি স্বতন্ত্র গৃহে তাঁর তখন বাস—আশ্রমেরই তা অঙ্গ। দ্বিতলে সম্ভবতঃ তিনি ও তাঁর অতিথি বা সুহৃদরা থাকেন কেউ কেউ, একতলায় অন্য একজন তামিল আশ্রমিক। যাই হোক, দিলীপবাবুর সঙ্গে ও'দের নিচেই দেখাশোনা হ'ল। তাঁরই অনুরোধে অপরাহ্ণে সাক্ষাতের ব্যবস্থা হয় শ্রীঅনিলবরণ রায় ও শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত মহাশয়ের সঙ্গে। সে আরেক কথা। কতকটা তাতে জানা হয় আশ্রমের উদ্দেশ্য ও তথ্য; জানা হলেই যে বোঝা যায়, তা নয়—মানা তো অনেক ভাগ্যের কথা। তারপরে, পণ্ডিচেরী—ফরাসী উপনিবেশ, ফরাসী রন্ধন-শিল্পের স্বাদগন্ধ কতটা লভ্য তা জানা এবং পরীক্ষা করা অত্যন্ত জরুরী। ভাগ্য ভালো, তাতে হতাশ হই নি। খানিকটা কৌতুক কৌতূহল মিলিয়ে পণ্ডিচেরী শহরও দেখা হ'ল। রাত্রিতে শয়ন হট্টমন্দিরে—স্টেশনের বারাণ্ডার মেজে। শেষ রাত্রিতে গাড়ি ছাড়বে। সেই অসময়েও আলাপ-আপ্যায়নে খবর সংগ্রহ করলে যে হিন্দীভাষী লুব্বে লোকটি (তামিল মুসলমান) বুঝতে অসুবিধা হয় নি সে গোয়েন্দা চর—ফরাসীর হোক কি ইংরেজের হোক। বহিরাগত যাত্রীদের গতায়াতের সংবাদ নেওয়া তার কাজ। আমরা তাতে চিন্তার কারণ দেখি নি। কৌতুক বোধ করেছি—বিপ্লবের কার্যক্রমে পণ্ডিচেরী আসি নি—সে লক্ষ্য আমাদের নয়। শ্রীঅরবিন্দেরও মিশন যে তখন নগদ রাজনীতি নয় ততদিনে (১৯২৯-৩০) ব্রিটিশ ও ফরাসী দু' সরকারেরই তা বোঝা উচিত। তবে ওদের তো ওই—খাতায় নাম ওঠে সহজে, কিন্তু সে নাম কাটা যায় না যমরাজের সাক্ষ্য না মিলতে। পণ্ডিচেরী পেছনে ফেলে আমরা তো দক্ষিণ-পরিক্রমা করে চললাম আরও কত শহর ও মন্দির দেখে দেখে, শেষে ত্রিবাঙ্কুর, কোচিন, কন্যাকুমারী, উট্‌কামুণ্ড,

আর শেষে ঘরমুখো হাওড়া—আরও দিন পঁচিশ পরে। প্রতি স্টেশনে, জংশনে নামা-ওঠার মধ্যে মধ্যে বুঝতে পাচ্ছিলাম আমরা চলছি একজন হেড কনেস্টবল ও একজন কনেস্টবল-এর পাহারায়। যখন যাদের অতিথি হয়েছি তাদের দুয়ার পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এই 'কনিষ্ঠ বল' ও তৎ-কনিষ্ঠ অনুচর আমাদের স্থাতব্য ও গন্তব্যের সংবাদ সংগ্রহ করছে, স্থানীয় থানায় তা জ্ঞাপিত করেছে, আর থানাও রেখেছে আমাদের সন্ধান, আমাদের অনুসরণের ব্যবস্থা। প্রতিপদে আমরা যাঁদের অতিথি তাঁদের নিকটে আমাদের অবাঞ্ছিত করে তোলার এমন চেষ্টা আর কি হতে পারত? চেষ্টা নিষ্ফল হয়েছে, কিন্তু লজ্জিত না বোধ করে পারি নি। মাদুরার না কোথায়, আমরা বাসে আসন স্থির করতেই বাসওয়ালা সহাস্যে আমাদের তামিল সহায়ককে জানালে—'আরও ২ জন যাত্রীও আমার তাহলে এসঙ্গে লাভ হ'ল।'—পাহারা বদল হ'ত জংশনে জংশনে। গাড়িতে আমাদের পাহারা দিত যারা তারা পাহারা জাগত অদূরের বেঞ্চে, আসনে—চোখ আমাদের দিকে যেমন আমাদের জিনিসপত্রের দিকেও তেমনি। আমরা নির্ভাবনা ছিলুম—কার সাধ্য মালপত্র চুরি করে। ভারী সুটকেশগুলি পিতলে ব্রোঞ্জের দীপলক্ষ্মীর পরিবর্তে বোমা পিস্তলেই ভারী, এ রূপই বোধ হয় তাদের সন্দেহ। সন্দেহের আরও কারণ নাকি আমার খদ্দরের জামাকাপড়। হায় রে অদৃষ্ট! যা আমার বন্ধুবান্ধবদের নিকট ছিল আমার নিরর্থক গান্ধীভক্তির চিহ্ন, তাই কিনা এখানে সহিংস স্বদেশীর অভিজ্ঞান। থাক্‌ গে, একেবারে হাওড়া স্টেশন পর্যন্ত এভাবে সমানে তিন বাঙালি সন্দেহভাজনদের তাড়া করে আমাদের ভারটা হাওড়ার গোয়েন্দাদের উপর দিয়ে চরদ্বয় আরামের নিঃশ্বাস ফেলে।—আমাদেরও তখন আরামের নিঃশ্বাস পড়ল—কলকাতা। কেউ আর আমাদের এখন আগলে বেড়াবে না—এখন মালপত্র শুদ্ধ নিজেদের দেহ আগলাবার জিম্মাদারী আমাদের নিজেদের।

পণ্ডিচেরীর এই 'পাদস্পর্শ' তাম্বুলকরঙ্কবাহিনীর মতো কলকাতার গোয়েন্দা দফতরের খাতায় ঠাঁই পেয়েছিল কিনা জানি না—তবে মনে রয়েছিল অনেকদিন গল্পে-কৌতুকে। আর সেই সূত্রেই মাঝে-মাঝে আসত নীরব আত্ম-জিজ্ঞাসা—ব্যাপারটা নয় পুলিশী মূঢ়তা। কোন্ দেশে মানুষকে সন্দেহ দৃষ্টিতে না দেখলে চলে গোয়েন্দাদের? তবু এই অমূলক সন্দেহের পুরস্কার মাথায় বহন করা শুধু কৌতুকের ব্যাপার তো নয়, একটু লজ্জার কথাও। এই তো স্বদেশে ভারতবাসীর মর্যাদা! তার চেয়ে দেশের জন্য একটু সন্দেহভাজন হলেই বা মন্দ হ'ত কি? বিশেষ করে সে ভাবটা মনে এসেছিল কন্যাকুমারীতে—কিন্তু তা ওই পুলিশ পাহারার জন্য নয়।

কোমল শ্রী কেরল

কন্যাকুমারীর পথে এর্নাকুলম্-এ যাই। কেরল মন্দিরের দেশ ঠিক নয়, তবে রূপের দেশ। সমুদ্রের খাড়ি দেশের ভেতরে ঢুকে গিয়েছে—বহুস্থলে তাই যাতায়াত জলপথেই, আর তাতে দর্শন হয় প্রকৃতির অপূর্ব শ্রী—শ্যামলে শ্যামল। সর্বত্র নারকেল গাছের সারি—ছোট ছোট গাছে বড় বড় ফল। সমস্ত মালাবার উপকূলের আর্থিক জীবন নারকেলের সম্পদে গঠিত, আর সেই গাছের মতো অন্যান্য গাছের শ্রীতে শ্যাম-সরস। মনে পড়েছে পূর্ববাঙলার কথা। বিশেষ করে তা মনে পড়ে—কেরলীয় নারী-পুরুষের দেহশ্রীতে—মুখের কোমল, নাতিশ্যাম, শ্রীময় লাবণ্যে। তবে স্বীকার করতে হবে—কেরল নারী চিরকাল স্বাধীনতায় লালিত, শান্ত মর্যাদাপূর্ণ লাবণ্যের অধিকারিণী, চলায় আচরণে অনেক বেশি স্বচ্ছন্দ, শালীনতায় সৌন্দর্যময়ী। তাদের সঙ্গে প্রেমে পড়তে হয়, 'প্রেম করা'র জন্য নয়, স্বচ্ছন্দ রূপকে সম্ভ্রম করতে হয় বলে। কেরলের পুরুষরাই কি রূপেগুণে কম ? আমি তো আমাদের এর্নাকুলমের গৃহকর্তা কৃষ্ণ মেনন মহাশয়ের স্নেহ ও সৌজন্যের কথা ভুলতে পারি না। নিজে তিনি কোচিনের হাইকোর্টের বিশিষ্ট এ্যাডভোকেট। সুশিক্ষিত পদস্থ লোক। তাঁর স্ত্রী উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে ইংরেজি অনুবাদ থেকে রমেশচন্দ্র দত্তের 'মাধবী কঙ্কণ' মালায়ালাম-এ অনুবাদ করেছিলেন, আমাদের তা দেখালেন। তাঁর ছেলে প্রিয়দর্শন শঙ্করন্ মেনন—ফর্সা, ছিপছিপে গড়ন, বছর পঁচিশের যুবক, অক্সফোর্ডের পাশ করা ছাত্র, রাজ কলেজের অধ্যাপক। জাহাজ-ঘাটা থেকে আমাদের অভ্যর্থনা করে তিনি আনলেন। তখন ইউরোপীয় পোশাকে ভূষিত বুদ্ধিমান যুবক। পিতা কোর্টে, তিনি না ফেরা পর্যন্ত পুত্রই অতিথি সৎকার করছেন। স্নানান্তে মধ্যাহ্নাহারে বসতে হ'ল—ততক্ষণে অক্সফোর্ডে পড়া যুবক (শাদা লুঙ্গি ও গলায় তোয়ালে) মালায়ালী পোশাকে প্রায় করজোড়ে অতিথিদের আসনের সামনে দাঁড়িয়ে রইলেন। আসনের সামনে ঘিয়ের প্রদীপ জ্বলছে—আহার্য মালায়ালাম পদ্ধতির, নিরামিষ। আশ্চর্য সৌজন্য, পুরাতন ভারত-সংস্কৃতি যেন জীবন্ত। অপরাহ্ন না হতেই পিতা এলেন। পঞ্চাশের উপরে বয়সের দীর্ঘদেহী বৃদ্ধ, শান্ত প্রসন্ন মুখ, সদালাপী। প্রত্যেকের পরিচয় গ্রহণ করে সঙ্গে সঙ্গে সুন্দর মাধুর্যে এক-আধটুকু প্রশ্ন ও মন্তব্য করেন। আমি তখন ফেণীতে কাজ করি। শুনে তিনি সহাস্যে বললেন "Feni of Osman Ali daroga and Mr. Penell." বুঝলাম, বাঙালি জীবন ও বাঙালি সংস্কৃতির তিনি কতটা

রসিক। সন্ধ্যায় মালয়ালী গানের রেকর্ড ও 'হরিকথা' শোনালেন, 'কথাকলি' সম্বন্ধে অনেক আলাপ হ'ল।—এমন সুপরিশীলিত মন বাঙালি ক'জন পাই? তাঁর কন্যা গৃহে ছিলেন—সংস্কৃতে অনার্স পাশ-করা সুশ্রী তরুণী, ডেকে পরিচয় করিয়ে দিলেন। শেষ রাত্রিতে গাড়ি, রাত্রি দশটায় যখন বিদায় নিলেন তখন বৃদ্ধ আমাকে বললেন—আমিই কনিষ্ঠ অতিথি,—"মাই সান্‌, দেশে পৌঁছে বাড়ি গিয়ে একখানা পোস্টকার্ড দিয়ে আমাকে জানিও—তুমি পৌঁচেছ।' আমি তা দিয়েছিলাম। বুঝেছিলাম এও ভারতবর্ষ—তার চিরদিনের পিতৃরূপ জীবন্ত।

কেরলে এই ভারতবর্ষ প্রথম শতাব্দীর দিকেই খ্রীস্টান, পরে য়িহুদী, আরব বণিক ও শেষে পর্তুগীজ সমাগতদের সকলকে সাদরে আলিঙ্গন করেছে—সকলের ধর্ম পেয়েছে অবাধ বিস্তারের মর্যাদা। এ রূপই কেরল সংস্কৃতিরও শ্রী। এখানে সকলে আলাদা থেকেও কেরলের আপনার হয়ে গেছল, হয়ে গিয়েছে কেরল সম্মান. ভারত-সত্যের আশ্চর্য প্রতিনিধি।

কন্যাকুমারীতে যখন বাস পোঁছল তখন বেলা প্রায় ১০টা ছাড়িয়ে ১১টা। রৌদ্র-সতেজ দিন। সামনে মন্দিরের দিকে বেশ প্রশস্ত একটি পথ, থেমে গিয়েছে সমুদ্রের সীমানায়। মন্দিরের চূড়াটাই দেখা যায়—ভিত্তি না, ঠিক সেখানকার সমুদ্র-সৈকতও না। অবশ্য অদূরে তিন দিকেই সমুদ্র রৌদ্রে ঝলমল করছে। যাত্রীরা নেমে চলল মন্দিরাভিমুখী পথে,—অধিকাংশই সাধারণ কেরলী মেয়ে-পুরুষ তীর্থযাত্রী। সরল অকৃত্রিম তাদের আগ্রহ,--সর্বত্রই তীর্থযাত্রীরা ওরূপ, কি উত্তরে কি দক্ষিণে। ইতিপূর্বে শিক্ষিত কেরল মনোহরণ করেছিল তাদের বেশভূষার সারল্যে, শিক্ষিত-অশিক্ষিতদের বিনয়-মাধুর্যে, স্ত্রী স্বাধীনতার স্বাভাবিক সুস্থ শ্রীতে। এখন আরও একটু সাধারণ স্তরের মানুষকেও দেখলাম।

স্ত্রী-স্বাধীনতা দক্ষিণে আবহমান কাল অক্ষুণ্ণ আছে, আমাদের তা অজ্ঞাত নয়। তবু আমাদের উত্তরাপথের লোকের চোখে তার রূপ অভিনব। অন্ধ্র ও তামিল দেশেও সে স্বাধীনতা দেখে এসেছি, নতুন নয়। তবে কেরলেতে মেয়েরা শিক্ষায়-দীক্ষায় ভারতের মধ্যে সর্বাগ্রগামিনী, কর্মক্ষেত্রেও পুরুষদের সহকর্মিণী। মহারাজার কলেজে সুনীতিবাবুর বক্তৃতায় ছাত্রীরা সারি বেঁধে হল-এ প্রবেশ করলে দেখলাম—স্ত্রী-স্বাধীনতার সহজাত অভ্যস্ত শালীনতা। ডাকঘরে নিজেই দেখেছি—মেয়েরা পোস্টকার্ড বিক্রী করছেন, দপ্তর চালাচ্ছেন পোস্ট-মিস্ট্রেস। অন্ধ্র-তামিল অঞ্চলে তা দেখি নি। হয়তো ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন দেশীয় রাজ্য না হলে সেখানকার সরকারী কাজেও মেয়েদের স্থান অব্যাহত

হ'ত না। অবশ্য কোচিন-ত্রিবাঙ্কুর কিছুটা মাতৃতান্ত্রিক সমাজের দেশ। দু' রাজ্যের রাজারা উত্তরাধিকার লাভ করেন মাতৃ-অধিকারে—মাতুলের বিত্তভোগী। পুরুষই রাজা, কিন্তু তিনি রাজা হন মাতুলের ভাগিনেয় রূপে। রাজভগ্নী ভাবী রাজার জননী, তিনি 'মহারানী'। ভগ্নীর অভাবে অথবা ভগ্নী পুত্রহীনা হলে রাজারা ভগ্নী দত্তক গ্রহণ করেন। তিনিও 'মহারানী'—তাঁর পুত্রই ভবিষ্যৎ-রাজা। ত্রিবাঙ্কুরের সে সময়কার 'দ্বিতীয় মহারানী'র নাম সংবাদপত্রে পড়তাম। বুঝতাম তিনি সুশিক্ষিতা, বিদ্যাবুদ্ধি ও সামাজিকতায় সুপটু, সর্ব-সমাদৃতা। ভাবতাম, তিনি রাজমহিষী, তবে প্রধানা নন। এদিকে এসে শুনলাম আসলে তিনি তখনকার রাজার দত্তক ভগ্নী ভাবী রাজার জননী। দু' রাজ্যের রাজারাই নায়ার গোষ্ঠীর—নায়ার সমাজে এইটিই সাধারণ নিয়ম। নায়ার, মেনন, ওয়াডিয়ার প্রভৃতি এঁদের কুল-পদবী। তাঁরা-'দক্ষিণ ক্ষত্রিয়' বলে সম্মানিত ও পরিচিত, লেখাপড়ায়ও শীর্ষস্থানীয়। সকলেই তাঁরা মাতৃ-সম্পর্কে মাতুলের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী। নায়ার উত্তরাধিকার আইন স্যর শঙ্করন্ নায়ার পাশ করিয়ে এ নীতি বদলাবার ব্যবস্থা করেন। নায়াররা এখন দরখাস্ত করে এই আইনের সুযোগ নিলে পিতার সম্পত্তিতে পুত্রকন্যার উত্তরাধিকার হয়—ভাগিনেয়র নয়। কিন্তু তখন পর্যন্ত নায়াররা তাঁদের পুরাতন ব্যবস্থা ছাড়তে উদ্যোগী হন নি, স্যর শঙ্করন্ ও তাঁর আত্মীয় গোষ্ঠীই শুধু নতুন আইন স্বাগত করেছিলেন। এখন কি অবস্থা পরিবর্তিত হয়েছে? জানি না—চল্লিশ বৎসর তো কম দিন নয়, কত পরিবর্তনই ইতিমধ্যে ঘটেছে। শুনেছি—নায়ার সমাজের 'মারামাক্কুত্রায়াম্' প্রথাও নাকি চলে গিয়েছে। সে ব্যবস্থা এক পুরাতন ঐতিহ্যের বাহক। নায়ার মেয়েদের প্রথম ঐতিহ্যগত শাস্ত্রীয় (?) বিবাহ হয় নাম্বুদ্রি কোনো পুরুষের সঙ্গে। তাকে বলে 'তালিবন্ধনম্' —আসলে যা শুধু বাগদানের মতোই একটা অনুষ্ঠান, তখনো নায়ার কন্যা স্বগৃহে থাকে, সেই ব্রাহ্মণের সঙ্গে তার আর সম্পর্ক থাকে না। তবু শাস্ত্র-দৃষ্টিতে সে নাম্বুদ্রি ব্রাহ্মণই কন্যার পতি। এর পরে হয় সামাজিক বিবাহ। অশাস্ত্রীয় (?) হলেও তা তাদের প্রকৃত বিবাহ—তা হয় যথাকালে নায়ার গোষ্ঠীর কোনো পাত্রের সঙ্গে—পৃথিবীর চক্ষে তিনিই এই নারীর স্বামী, তাঁর পরিচয়েই কন্যার পরিচয়। অবশ্য কন্যা তখনো স্বগৃহে থাকে, অর্থাৎ তার পিতা বা ভ্রাতার গৃহে। এ জন্যই কি আমরা আমাদের গৃহস্বামী মেনন মহাশয়ের গৃহে তাঁর কন্যার সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম, পুত্রবধূর দেখা পেলাম না? মাতুলালয়ে জাত নায়ার সন্তানরা হবে মাতুল-সম্পত্তির উত্তরাধিকারী। আমাদের উত্তরাপথের মানুষের চক্ষে নায়ার এবং তামিল উচ্চবর্ণের কন্যার মাতুল বা মাতুল পুত্রের সঙ্গে বিবাহ অদ্ভুত ঠেকে।

কিন্তু সমাজতাত্ত্বিকরা সামাজিক বিবর্তনের বিচিত্র সাক্ষ্য সকল সমাজেই দেখতে পান, তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। বেশভূষায়ও তেমনি বৈচিত্র্য আছে। সচরাচর কেরলের মেয়েরা তখনো বুক আবৃত করে বস্ত্র পরতেন না। সেরূপ বস্ত্র পরিধান ছিল সমাজে নিন্দনীয়। শহরে শিক্ষিত সমাজে কিন্তু পূর্বেকার এ নিয়ম আর নেই—আমাদের গৃহকর্তার গৃহই তার প্রমাণ। পথে-ঘাটেও অবশ্য পূর্বেকার নিন্দনীয় সজ্জাই খুব প্রচলিত হয়েছে, কিন্তু গৃহাভ্যন্তরে তা নয়। আবহমানকালের কেরলীয় রীতি সে ভূমির গ্রামাঞ্চলে অব্যাহত। কন্যাকুমারীর মন্দিরমুখী কেরল-নারীরাও পবিত্র চিত্তে সেই মুক্তবক্ষেই চলেছেন দেখেছি। মহাভারতের মুনি ঋষিদের কী হ'ত জানি না, নারীদের ওই সজ্জায় কেরলের নারী-পুরুষ কারো কিছুমাত্র চিত্তচাঞ্চল্যের সঞ্চার হয় না, তা নিঃসন্দেহ। তথাপি অধ্যাপক সুনীতি চাটুজ্জে চমকিত করলেন প্রাচীন ভারতীয শিল্পের সাক্ষ্য মনে করিয়ে দিয়ে—'নারীর ওরূপ বেশই ভারতীয় অনেক সমাজে একদিন স্বাভাবিক ছিল। বলিদ্বীপে এখনো রয়েছে।' বাঙলাদেশেও দেহ জড়িয়ে একখানা শাড়ী পরাই ছিল প্রথা—পশ্চিমবঙ্গে এক বেড়ে আর বাঙালদেশে দু'বেড়ে। মুসলমান ভদ্রগৃহে অবশ্য উত্তর ভারতীয় কাঁচুলি চলে থাকবে। উত্তর ভারতে মুসলমান প্রভাবে—না তারও আগে গ্রীক-ইরানী প্রভাবে?—ভদ্র পোশাক বদলেছে। একশ বৎসর পরেও বঙ্গদেশের শহর ছাড়িয়ে গ্রামে গেলে মেয়েদের সজ্জার স্বল্পতাই চোখে পড়ত। বিশেষ করে ভদ্রলোক-সমাজ ছেড়ে দিলে গ্রামের নিম্নবর্ণ হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে কতটা এসেছে একালের রীতি? অবশ্য আর্থিক সামর্থ্য থাকলে তারাও একালের রীতিই গ্রহণ করত। দশ গজ কাপড় মাথা পিছু আমাদের জোটে না, গরীবের মেয়েরা কী তাও পায় পরতে? অনাহারী অর্ধাহারী মানুষদের বস্ত্র কিনবার মত অর্থ কই? তা-ই গান্ধীজী বুঝেছিলেন। দেশটা কোথায়?

কিন্তু কথা হচ্ছিল দেশের দারিদ্র্যের নয়, দেশের বৈচিত্র্যের।

কন্যাকুমারী

কন্যাকুমারীতে বাস থেকে সাগ্রহ ও সজীব মন নিয়েই নেমেছিলাম—এই তো ভারতবর্ষের শেষ দক্ষিণ বিন্দু—তিন দিকে রৌদ্রঝলমল সমুদ্র। এখানে ভারতসমুদ্রে পূর্ব দিকের জলরাশি থেকে সূর্যের উদয়—সেদিনের মতো তা অনেক পূর্বে হয়ে গিয়েছে,—আবার এখানে সেই সমুদ্রের পশ্চিমের জলরাশিতে সূর্যের অস্ত,—অনেক দেরী আছে তার তখনো;—উদয়াস্তের দুই আকাশ প্রত্যক্ষ করা যায় ভারতের এই শেষ বিন্দু থেকে দাঁড়িয়ে। নিশ্চয় একটা phenomenon

এবং বহুকাম্য experience। হাজার হোক, সূর্যোদয় বা সূর্যাস্ত তো কোনো দিন বিস্ময় বস্তু না হয়ে পারে না। কোনো দেশেও তুচ্ছ নয়। আমাদের দেশটার কি সৌভাগ্য কম যে, প্রাত্যহিক সেই 'মিরাক্‌ল্‌' দেখবার এমন একটি ক্ষেত্র সে ধারণ করে আছে। অবশ্য, উপকূলে-উপকূলে এমন আরও জানা-অজানা স্থান ভারতবর্ষে নিশ্চয় আছে যেখানে ভূমিলক্ষ্মী গিয়েছেন সমুদ্রে এগিয়ে, আর প্রতিদিন প্রভাতে সায়াহ্নে সমুদ্রোত্থিত ও সমুদ্র-অন্তর্হিত সূর্যদেবকে তিনি জানান তাঁর প্রণাম। সমস্ত ভারতবর্ষের হয়ে কন্যাকুমারীর দেবী বুঝি সেই প্রণাম এখানে নিবেদন করছেন। প্রণামের জন্য যোগ্যতম স্থল এই দক্ষিণতম বিন্দুটি।

সহযাত্রীদের পিছনে পিছনে আমরা সিধা চলে গেলাম—মন্দিরের উদ্দেশ্যে। সমুদ্রের দিকে যে না তাকালাম তা নয়। কে না তাকিয়ে পারে ?—যেখানে সব ছাড়িয়ে আকাশ আর সমুদ্র এমন করে প্রসারিত—মাথার ওপরে, দক্ষিণে-বামে,—অন্তহীন বিস্তারের মধ্যে যেখানে নিজের মধ্যে মানুষ একই কালে জানে তার সামান্যতা আর অসামান্যতা। 'আকাশভরা সূর্যতারা বিশ্বভরা প্রাণ / তাহার মাঝখানে আমি পেয়েছি মোর স্থান'—। পেয়েছি সেই বিস্ময়-বোধের সঙ্গে আজ এই সৌভাগ্য—ভারতবর্ষের শেষ বিন্দুতে দাঁড়াবার সুযোগ, ভারত-বর্ষকে অন্তরের সত্যরূপে জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়ে অনুধাবন করবার আহ্বান। এই বেদি-সীমায় দেবতাত্মা হিমালয়ের ও শিবশঙ্করের ধ্যানগম্ভীর আশ্বাস সমুদ্র-মেখলা ভারতভূমির উদ্দেশ্যে ঝরে পড়ছে ; এ বেদির তটে মহাসমুদ্রের ধ্যানগম্ভীর স্তব আকাশে-বাতাসে আদিগন্ত প্রসারিত—হিমালয় কন্যার পদস্পর্শ করে মহাসাগর প্রণত। —মনের মধ্যে যে স্তব-গুঞ্জনই উঠুক, মাটির পৃথিবীতে হেঁটে গিয়ে পৌঁছুলাম মন্দিরের নিকটে, মুখে দু' একটি সাধারণ কথা ; মাত্রা-বোধের সঙ্গে নিজেদের বিস্ময়বোধকে স্থির তালে-লয়ে বেঁধে নেওয়ার চেষ্টা।

সমুদ্রে বোধহয় তখন ভাঁটা। নিকটে সমুদ্রের মধ্যে চারিদিকে ছোট বড় পাথর মাথা তুলে আছে—কোনোটি কূলের নিকটে, দু-এক পা জলে ডুবিয়ে গেলেই তার পৃষ্ঠে অধিষ্ঠান করা যায়। তার থেকে আবার আরও ওরকম দু'-এক পা এগিয়ে গেলে হয়তো আর একটি শিলাখণ্ড। এরূপই কোনো কোনো বড় শিলাখণ্ডের উপর মন্দির। মন্দির বড় নয়, সুউচ্চও নয়, হয়তো এই বিরাটের পরিবেশে বিরাট করে কিছু করা মানুষের পক্ষে হ'ত নির্বুদ্ধিতা।

১৯২৯-এ কন্যাকুমারী ছিল অপেক্ষাকৃত জনবিরল তীর্থ—যাত্রীর ভীড় নেই। টুরিস্টের উপস্থিতি দেখি নি ; পর্যটক সাধু-সন্ন্যাসীদের বিশেষ দেখেছি মনে হয় না। এখন, শুনেছি কন্যাকুমারী তা আর নেই। সেদিন কিন্তু বিবেকানন্দের নাম কন্যাকুমারীতে কারও মুখে শুনি নি। কেরল (ভাইকম্‌-এ

দেখেছি) তখনো শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের ভক্তির প্রধান এক উৎস ছিল। কিন্তু বিবেকানন্দ ও কন্যাকুমারীর স্মৃতি তাতে সংলগ্ন হয়ে ওঠে নি। আমাদের কালের অনেকের জীবনে বিবেকানন্দ একজন হিরো ; সুভাষবাবুরও তিনি হিরো ছিলেন। জানতাম যে, কন্যাকুমারীতেই স্বামীজীর মনে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন স্থাপনের স্বপ্ন জেগেছিল। কিন্তু কোথায় সে কথা পড়েছিলাম তখন তা আমার মনে নেই, আমার অগ্রজ সহযাত্রীদের তাই সে তথ্য যোগাতে পারি নি, তা মনে পড়ে। অন্যান্যদের পিছনে আমরাও অঙ্গন ও জগমোহন, পেরিয়ে গর্ভমন্দিরে প্রবেশ করলাম—বিগ্রহ পরিক্রমা ও প্রণাম করব। গর্ভ-মন্দিরে পদার্পণ করতে করতে দেবীমূর্তির রূপ স্পষ্ট হ'ল। বেদীর উপর হাত দুই উচ্চ প্রতিমা। কিন্তু তিনি আমাদের কামনানুযায়ী হিমাদ্রিমুখিনী নন—বরং সমুদ্রাভিমুখিনী,—সমস্ত ভারতভূমি তাঁর পশ্চাৎত পড়ে। আসতে আসতে কাহিনী শুনেছিলাম। কুমারী পার্বতী রাগ করে কৈলাশ (?) ছেড়ে চলে এসেছেন, এখানে এসে থেমেছেন, বাধা সমুদ্র—শিবের ইঙ্গিতে যিনি দেবীর চরণ-তটে শায়িত। এখানকার 'স্থল-পুরাণ' বা স্থানীয় কাহিনী অন্যরূপ—প্রত্যেক অঞ্চলেই পৌরাণিক দেব-দেবীদের কথা স্থানীয় নিজস্ব পুরাণের কথার সঙ্গে মিলিবে নেওয়া হয়,—ওটা ভারতীয় জিনিয়াস। মাদুরার মীনাক্ষী মন্দিরের দেবী এমনি করে গৌরীর মধ্যে একীভূত। কে জানে, হয়তো তিনি ছিলেন মাদুরা অঞ্চলের দ্রাবিড়দের, বিশেষ করে কোনো মৎস্যজীবী গোষ্ঠীর, প্রধান আরাধ্যা দেবী। হয়তো এখানে কেরলের এই শেষ বিন্দুতে কোনো স্থানীয় কন্যাদেবীও পার্বতীর মধ্যে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছেন। সে গল্পও শুনেছি—কোন্ এক অসুর রাত্রি প্রভাতে হিমাদ্রি কন্যাকে লাভ করবে, এ বর পায়। কুমারী দেবী শঙ্করেরই অভীষ্টা, তাই হরগৌরীর ছলনায় সে রাত্রি প্রভাতই হ'ল না—আমাদের মনে না ধরলেও এ ধরনের কাহিনী আছে। দেবচক্র বুঝতে আমার মতো একালীন মূর্খের ভরসা সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞান। আসল কথাটা তো এই—পার্বতী কন্যাকুমারী রূপে এখানে প্রতিষ্ঠিতা, স্থানীয় লোক-মানসে যাই থাক এক সময়ে, তাঁর নাম এইরূপে কীর্তিত যে তিনি হিমালয়-দুহিতা কুমারী। যে হিন্দু-কল্পনা হিমালয়ে তাঁর পিতৃগৃহ ও কৈলাশে তাঁর সংসার পাতিয়েছে, কোন্ সূত্র ধরে তা ভারতবর্ষের এমন শেষ বিন্দুতে সেই পার্বতীকে এনে প্রতিষ্ঠিত করেছিল ? অশেষ বৈচিত্র্য ও বিভেদে-ভরা সমগ্র দেশটাকে সে হিন্দুমন একটা ঐক্য-বন্ধনে সংযুক্ত করে দেখেছিল—একটা অবিচ্ছেদ্য সূত্রে সেই ঐক্যধারণাকে চিরন্তন করে রেখে গিয়েছিল, এ কি সত্য ? না, এ neo-Hind কল্পনা, মিথ্ ? নিশ্চয়ই এসব মিথ্, কিন্তু মিথ্

তো মিথ্যা নয়, বাস্তবে না হোক অন্তরের সত্যে পুষ্ট। বাস্তবে-কল্পনায় মিশ্রিত এই আশ্চর্য মিথ্‌-এর পিছনে একটা সাংস্কৃতিক ও অতিসহজ ভৌগোলিক ঐক্যবোধ যে এই উপমহাদেশে গড়ে উঠেছিল তাতে সন্দেহ নেই। এত শত বৎসর পরেও সে মিথ্‌ কী সুন্দর এক সত্য, সবল এক ঐশ্বর্য, পরম এক প্রেরণা। বিবেকানন্দের অন্তরে সেই সত্যই উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল; ভারতবর্ষকে তিনি প্রাণদান করতে চেয়েছিলেন জ্ঞানে ও কর্মে।

কন্যাকুমারীতে মন্দির চোখে দেখা নয়, 'ভাবে'র চোখে ভাবাই বরং বড় জিনিস। দেখার জিনিস বলতে গেলে সমুদ্র। সারা দিন বসে তা দেখা সম্ভব। দেখলামও। কিন্তু তারও মধ্যে সারা সময়টা মনে গুঞ্জন করতে লাগল—ঐ আইডিয়াটা, ভারতবর্ষকে এক বলে অনুভব করার এই প্রয়াস কি কম সত্য! তার সাক্ষ্য অবশ্য আমাদের তীর্থগুলির বিন্যাসেও আছে। পূর্ব-পশ্চিম দুই উপকূলে এইসব দেবস্থল প্রসারিত, একে কি বলব?—মেঘচুম্বী শিখরে দণ্ডায়মানা ভারতলক্ষ্মী, যার দুই প্রসারিত বাহু সমগ্র ভারতবাসীকে বুকে আলিঙ্গিত করে এসে মিলেছে এই দক্ষিণে—বিশ্বের মানব মহালক্ষ্মীর আহ্বানে?—অথবা সে ভারতলক্ষ্মী এখানে যুক্তকর মহামানবের উদ্দেশ্যে নমস্কারে—একটি নমস্কারে প্রভু একটি নমস্কারে।*

স্বামী বিবেকানন্দ বোধহয় ভারতবর্ষ সম্বন্ধে প্রাণ দিয়ে কিছু অনুভব করেছিলেন। এখানে এসে তাঁর মনে সেই মহৎ উপলব্ধি মূর্ত হয় নিজের কাছে—ভারতভূমির এক ধ্যানরূপ তিনি লাভ করেন। হয়তো তার পূর্বেই ভারত পর্যটন-সময়ে দেখতে দেখতে তা অঙ্কুরিত হচ্ছিল—তা'ই তাঁর ভ্রমণ ভারতী; এখানে এসে সঙ্কল্প করেন তাঁর ধ্যানের রূপকে ভাবলোকে অমূর্ত না রেখে তিনি সংগঠনের মধ্যে মূর্ত করবেন। তাঁর যুগের পরে আমাদের যুগে পৃথিবী আরও পথ উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে, মহামানবের যুগ এসেছে। তখনো ভারতীয় পরিস্থিতি ও বিশ্বজীবন এত সংশয় জাগিয়ে তুলত না। হিন্দু-প্রধান দেশে ও হিন্দুপ্রধান জাতীয় ঐতিহ্যে হিন্দু সাধনার অনেকটা স্বীকৃতিও তখন মিলত। কিন্তু এখন এই বহুধর্মের দেশে এখানকার অন্যধর্মীরা কেন

*কন্যাকুমারীতে, বিবেকানন্দের মূর্তি স্থাপনের বিপুল আয়োজন চলছে, হয়েছেও, আপত্তি নেই। কিন্তু 'এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে' মূর্তি যদি স্থাপন করতে হয় তা হলে স্থাপন করা উচিত হ'ত—আমেরিকার 'লিবার্টি' মূর্তির মতো—ভারত-লক্ষ্মীর মূর্তি (বিবেকানন্দ তাঁর পদতলে ধ্যানরত থাকতে পারতেন), যে 'ভারতলক্ষ্মী' বিশ্বমানবের উদ্দেশ্যে দাঁড়াবেন যুক্তকরে প্রদীপ নিয়ে—বিশ্বমানবকে আহ্বান করে; অথবা দাঁড়াবেন (বুদ্ধদেবের মত) বরাভয় মুদ্রায়।

মানবে হিন্দুত্বের একান্ত পরিমণ্ডল ? বহুজাতির দেশে ধর্ম জিনিসটাকে কার্যত গণনার বাইরে না রাখতে পারলে সবাই সবাইকার বিরোধী হয়। অন্ততঃ আমার মর্মে এই অভিজ্ঞতা তো জ্বলন্ত অক্ষরে লেখা ; দেশের বুকেও রক্তাক্ষরে তা লেখা চলছে প্রতিদিন। বলতে বাধ্য, ধর্মনিরপেক্ষ মানব-ধর্মের পথই ভারত পথ। তা'ই যুগধর্মও। এখন চাই সেই যুগধর্মে ভারতবর্ষকে মূর্ত করা। কিন্তু কী করে ?—কন্যাকুমারীতে আরো চোখে পড়ল—সমুদ্রতীরে ছোট এক মসজিদ, আর বেশ জীবন্ত এক গীর্জা। কেউ হয়তো বলবেন, এই তো প্রকৃত ভারতবর্ষ—ধর্মকে নিয়েই ভারতবর্ষ, আর সকল ধর্মকে সমান ভাবে মিলিত করেই ভারতবর্ষ ভারতবর্ষ। সত্য হলে খুশি হতাম, ভাবতে পারলেও খুশি হই। কিন্তু ভারতবর্ষে ধর্মের বাঁধন কতটুকু মানুষের মিলন ঘটিয়েছে, আর কতখানি ঘটিয়েছে মানুষে মানুষে বিরোধ ? আমার অভিজ্ঞতা কী, তা জানি, তা মিথ্যাও নয়।

বাব বার মনে পড়ে, 'এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে'। মন গুঞ্জন করে চলে 'হেথায় দাঁড়ায়ে দুবাহু বাড়ায়ে নমি নরদেবতারে'—মন্দিরের দেবতা, মসজিদের দেবতা, চার্চের দেবতা—সে প্রণাম নাই বা নিলেন।—সম্মুখে সমুদ্র, নির্মল আকাশের রৌদ্র নীলের ওপর রূপার বন্যা ঢেলে দিয়েছে। যতদূর চোখ যায় রূপার ঝিকিমিকি। আকাশের নীলও রৌদ্রে মোড়া। এরও মধ্যে সমুদ্র রঙ বদলিয়েছে, পলে পলে বদলাচ্ছে—সূক্ষ্ম ও অলক্ষিত সূর্যকরের কোণ পরিবর্তনে। নিকটের পাথরগুলির পার্শ্বে সমুদ্র এখন একটু আকুলি-বিকুলি করছে--কখন জোয়ার এসেছে, না ? মৃদু কল্লোল শোনা যায়। পাথরে আহত ছোট ছোট তরঙ্গে বুদ্বুদ ফোটে। বিচ্ছিন্ন ফেন-স্তবকও ম্লান পুষ্পস্তবকের মতো ভাসছে পাথরের কাছাকাছি। উঁচু মাথা-জাগানো পাথরগুলির গায়ে পূর্বদিকে ঘন ছায়ারেখা, সমুদ্রের জলে তার প্রতিলিপি, একটা ঘন কালোর ছোপ।—তীরের পাথরগুলির ওপর বসে আমরা সমুদ্র দেখছিলাম। শান্ত, কিছুটা শ্রান্ত, উদাস দৃষ্টি তিন জনারই চোখে, এবং মনও উদাস। মুখে মৃদু মন্তব্য কখনো—কী এই ভারতবর্ষ যার এই প্রকাশ। শত খণ্ডতার মধ্যে, বৈষম্যের মধ্যেও এখানে এক-একটা বড় আইডিয়া এক-একবার দেখা দেয়, ঝলক দেয়, কিছুদিনের মতো থাকে তার ঝিকিমিকি। গুপ্ত সাম্রাজ্যের গরিমা, তামিল পল্লব সাম্রাজ্যের কীর্তিমালা, চালুক্য-চোল রাজ্যের নিজস্ব বিকাশ ;—সমুদ্র পেরিয়ে আরেক ভারত-সভ্যতার বিকাশ—বরবুদর, প্রাম্বানান, আঙ্করভাট। আবার, এই কেরল জীবনের শুভ্র শান্ত শ্রী বারে বারে মনে করিয়ে দেয় নদী-খাল-বিল-হাওরের পূর্ব-বাঙলাকে। তার নারকেল-সুপারির ঘনায়িত ঘেরের মধ্যে গ্রাম্য

কুটির ; বাগান-ঘেরা বাড়িঘর। নানা ভাবনার ও চিন্তার মধ্যে মনে মনে অনুচ্চ গুঞ্জন ওঠে 'এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে'…।

ভাবনার প্রবাহে যে ভেসে যাচ্ছিলাম, তাও নয়। নানা কথায় ও আলাপের মধ্যে ওরূপ ভাব ও অনুভূতি মনের তলায় দেখা দেয়। কিন্তু মাত্রাবোধ ও কৌতুকবুদ্ধি তাতে আচ্ছন্ন হয় না ; বরং অনুভূতি স্বচ্ছন্দ হয়।

"হিমালয়ের আর মহেশ্বরের স্থান দেশের শিয়রে—আর এই প্রান্তে হিমাদ্রি কন্যা শিব-গৃহিণী পার্বতী—অবশ্য কুমারী। দেশটাকে ওঁরা পাহারা দিচ্ছেন।"

"কিন্তু মজা দেখুন—পার্বতী মুখ ফিরিয়ে আছেন। ভারতবর্ষের প্রতি বিমুখ—বোধ হয় দু-এক শত বৎসর কেন, হাজার খানেক বৎসর ধরেই, বিমুখ।"

"তা ঠিক! তবে তিনি যাবেন কোথায় ? পাগল স্বামীটির ওপরে রাগ করে পিত্রালয়ে যেতে হলেও ফিরে যেতে হবে। আর রাগ পড়লে কৈলাশে যেতে হলেও তা'ই। পিতৃকুল-পতিকুল ছাড়া তৃতীয় কুল নেই তো ঠাকুরানীর।"

"নেই। তাই বোধ হয় এসেছিলেন—সমুদ্রে ঝাঁপ দেবেন। আগুনে ঝাঁপ দিয়েছিলেন দক্ষের উপর রাগ করে সতী—ইনি করবেন কী ?"

"ইনি কুমারী, সংসার পেতে বসেন নি। ছেলেমেয়ের ফাঁদে জড়িয়ে পড়েন নি। হয়তো অপেক্ষা করছেন, মনে মনে সঙ্কল্প সমুদ্রের ওপার থেকে কেউ আসবে—আই-সি-এস কি ব্যারিস্টার। কুমারী তার ঘাড় ভাঙবেন। মেয়েটি কলির ভারত কুমারীদের প্রতীক, প্রগতির পাইওনিয়র।'

হাস্য-পরিহাসের কখনো অভাব ছিল না। দক্ষিণের সমস্ত দিনগুলি মনকে সে খোরাক জোটাত। উদরের খোরাকটা এতদিন ব্রাহ্মণ হোটেলে মিটেছে যেমন, কন্যাকুমারীতেও তেমনি, অন্নম-সম্বর প্রভৃতিতে। সপ্তাহে দু-এক-দিন (যেমন, পণ্ডিচেরীতে, মণ্ডপম-এ) ভালো বিলিতী রেস্টুরেণ্টে যথেষ্ট রকমে মুখ বদলে নেওয়া হ'ত। আমরা বলতাম, ভারতবর্ষে আসল ঐক্য প্রতিষ্ঠা করেছে ইংরেজ আমলের রেলওয়ে আর ইংরেজি ধরনের রেস্টুরেণ্ট। চৌলট্রি, 'চটি', ধর্মশালা দেশের ঐক্য চায় না—স্বপাক বা স্বরুচির উপর যাত্রীদের ছেড়ে দেয়। দেশী হোটেল নিতান্তই parochial—প্রদেশে প্রদেশে রান্নার প্রাদেশিকতায়, মশলার বিভিন্নতায়, পাকের গুণে যাত্রীদের বিপাকে ফেলে। যথার্থ তেলুগু বা তামিল হোটেল লঙ্কা ও তেঁতুলের রসায়নে এমন বাধা সৃষ্টি করেছে যার তুলনায় বিন্ধ্যাচলও কিছু না—কোনো অগস্ত্যঋষির দক্ষিণে কলোনি করা আর সম্ভব হবে না। কিন্তু শুধু প্রদেশে-প্রদেশেই কি বিভিন্নতা ? একই প্রদেশের একই caste-এর, বিভিন্ন পরিবারের ঝাল-

তেঁতুলের মাত্রায় কি কোনো সাম্য আছে ? অন্ততঃ বাঙালি সমাজে রান্নায় প্রতি পরিবারে ভিন্ন মাত্রা, ভিন্ন স্টাইল। ইংরেজ রেস্টুরেণ্টে সর্বত্র এক মাত্রা, এক স্টাইল—অর্থাৎ unity in ভোজ-ব্যবস্থায়। আবার উদারনীতিকও,—প্রত্যেকে নিজের রুচিমতো মেশাও তাতে নুন ঝাল মাস্টার্ড সস,—diversity guaranteed শাশ্বত ভারতীয় আদর্শের সাধন-তীর্থ হচ্ছে ইংরেজি ধরনের রেস্টুরেণ্ট ; তার নীতি Unity in diversity. 'ভারতপথিক' তাঁরাই হবেন যাঁরা পাশ্চাত্ত্য খানার স্বাদ পেয়েছেন। দক্ষিণে আমরা অন্ততঃ বুঝেছিলাম—'পশ্চিম আজি খুলিয়াছে দ্বার, সেথা হতে সবে আনে উপহার—'। দেশী কারি অন্নম্, কিন্তু বিলিতী ডিনার,—এই না থাকলে দক্ষিণে আমাদেরও মেজাজ বিগড়ে যাবার গুরুতর কারণ থাকত—বিশেষতঃ অধ্যাপক চ্যাটুজ্জের ও তৎ-সহযোগী অধ্যাপক হালদারের। আমি অবশ্য তাঁদের অনুগামী, তবে মানতাম 'পশ্চিম আজি খুলিয়াছে দ্বার'। রবীন্দ্রনাথ সত্যই ঋষি কবি। ভারততীর্থ কিছুতেই ফ্লারিশ করবে না যদি এ সত্য উপলব্ধি না করে। ভালো হোটেল ও ভালো খানা এবং পানীয় না পেলে কোন্ টুরিস্ট আসবে এই তীর্থে ? ভারততীর্থের জন্য পাশ্চাত্ত্য খানা is a must.

আরেকটা must-ও আছে—এ কালচর ইজ্ নোন্ বাই ইট্‌স্ ল্যাব্'স্—(শৌচাগার)। উত্তর ভারতের বিদেশী যাত্রীরা জানে ভারতবর্ষ মেডিটেশান-এর দেশ। সকাল হতেই রেললাইনের দু পাশে দেখা যাবে লোটা নিয়ে দাঁতন করতে করতে ধ্যানী সাধকরা বসে আছে ; কারো কারো কানে পবিত্র যজ্ঞসূত্রও,—তাৎপর্য পরিষ্কার, ট্রান্সিডেণ্টাল ম্যাস্-মেডিটেশন। এখানে বেস্ট ল্যাব্‌স্ রেললাইন-এর উঁচু জমি। দক্ষিণে তামিল-তেলুগু দেশে বুঝেছি তার বেস্ট ল্যাব্‌স্ তার রেলগাড়ির শৌচাগার। পূর্ববঙ্গে তো আমরা জানতাম—গাছ আর খালবিলের দেশে নৌকোর গলুই প্রশস্ত।—এসব তত্ত্ব নিয়ে গভীর গবেষণায়ও আমাদের বাধা ছিল না। তবে ফিরে ফিরে এ সিদ্ধান্তে আসতে হ'ত—পশ্চিম আজি খুলিয়াছে দ্বার। স্যানিটি ও স্যানিটেশন ওরা যোগাতে পারে।

এরূপে বারেবারেই হাস্য-পরিহাসের সূত্রে কথাটা ফিরে আসত—পশ্চিম আজি খুলিয়াছে দ্বার।—একটা চিঠি লেখা দরকার হয়ে পড়েছিল—আমি বেরিয়েছিলাম এক শত টাকা নিয়ে। মাস্টারমশায়ও বলেছিলেন—'ওতেই হয়ে যাবে। না হলে আমাদের সঙ্গেও তো কিছু আছে।' কিন্তু উদ্বৃত্ত থাকার সম্ভাবনা সকলেরই পক্ষে ক্রমে কমে আসছিল। সুনীতিবাবুর বই কেনার থেকে বেশি নেশা পুরোনো দোকানে শিল্পবস্তু কেনা—মাদ্রাজ মাদুরা তাঞ্জুর কেন, প্রতি শহরেই বাজারে হানা দিয়ে তা খুঁজতেন। ত্রিবান্দ্রম-এ এর্নাকুলমএ

সে ঝোঁক আরও ব্যয়সাধ্য হ'ল। কারণ তখন তাঁর অনুসন্ধানের বস্তু শুধু ব্রোঞ্জ মূর্তি নয়, আইভরি, হাতির দাঁতের শিল্পবস্তু। ওঁর কিউরিও হ্যাণ্ট নানা শাখায় বিস্তৃত, তা আগেও জানতাম; কিন্তু এ যাত্রায় তা আরও প্রত্যক্ষ করলাম। সঙ্গদোষে দাদা রঙ্গীন হালদারেরও দেখলাম চোখে নেশা লাগল, আমারও সামান্য লোভ গজাল। ফলে কারও পকেট আর ভারী থাকল না। বুঝে-শুনে সুনীতিবাবু বললেন—'তা লিখুন উটকামুণ্ডের ঠিকানায় সামান্য কিছু পাঠাক। দরকার নাও হতে পারে, তবু—'। পঁচিশ টাকা মনি অর্ডার করবার জন্য কলকাতায় সজনীকে লিখব। পোস্টকার্ড নিয়ে আসতে দাদা বললেন, 'জায়গা রাখিস, সবাই এক লাইন করে জুড়ে দোব।' পোস্টকার্ড খানাও কিউরিও হ'ল। পত্রের মর্ম মনে আছে, ভাষা মনে নেই, যথা, দক্ষিণে সমুদ্রের শিয়রে হিমালয়ের কন্যা,—উত্তরে স্বয়ং হিমালয় ও মহেশ্বর। সমগ্র ভারতবর্ষকে এভাবে এক করে দেখা হিন্দুদের পক্ষে সাধ্যায়ত্ত হয়েছিল কি করে, কে জানে। কিন্তু সমগ্র ভারতবর্ষকে এক করে ফেলা সাধ্যায়ত্ত হয়েছে ইংরেজের পক্ষেই —দ্যাখো না, এই এক পয়সার (না, দু' পয়সার) পোস্টকার্ডে সুদূর কন্যাকুমারী থেকে কলকাতাতেও তোমাকে তাড়না দিচ্ছি—গিরিশীর্ষ উটকামুণ্ডে নিম্নোক্ত ঠিকানায় পাঠানো চাই পঁচিশ টাকার এম্. ও।—দক্ষিণ প্রদক্ষিণ সুনির্বাহিত হবে।" দাদা ও সুনীতিবাবুর জন্য পোস্টকার্ডের কায়াতে জায়গা ছিল, স্ব স্ব স্বাক্ষরের ওপরে দু এক অক্ষর তাঁরাও জুড়ে দিয়েছিলেন। বলা নিষ্প্রয়োজন—টাকা যথারীতি প্রেরিত হয়েছিল, আর টাকা কখনো কি উদ্বৃত্ত হয়? প্রত্যক্ষ হ'ল কথাটা—'এই ভারতের মহাসাগরের সাগরতীরে' আর 'পশ্চিম আজি খুলিয়াছে দ্বার'—ডাকঘর। ডাকে তারে শাসনে শোষণে তাই আমরা ঐক্যবদ্ধ।

অপরাহ্ণে বাস-এ আমরা ফিরে চললাম কন্যাকুমারীকে পিছনে ফেলে। দেবী কন্যাকুমারী রইলেন ভারতবর্ষকে পিছনে ফেলে। মনে গুঞ্জন চলল—এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে বিবেকানন্দ একটা সত্যের সন্ধান পেয়েছিলেন—সঙ্কল্পকে রূপও তিনি দিয়েছেন। কিন্তু তাঁর পরেকার পঁচিশ বৎসর যদি মিথ্যা না হয়, আমরা কি করছি? মনে পড়ে, 'Here and here did England help me, how can I help England'...এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে আমি—এই ব্যক্তি আমি—সত্যই কী কিছু ওরূপ দায়িত্ব উপলব্ধি করছি? না ফিরে যাচ্ছি সেই গতানুগতিকতায়, ভ্রান্তি-বিভ্রান্তিতে আপনার অশ্রদ্ধার গহ্বরে, সেই হিন্দু-মুসলমানের বিবাদাচ্ছন্ন জীবনের মধ্যে, আপন বিচ্ছিন্নতার ঔদ্ধত্যে রাজনীতির প্রতি, 'স্বদেশীর' প্রতি বিশ্বাসহীন শূন্যতার অতল আবর্তে?

কলকাতায় যখন ফিরলাম তখন এই অনুভূতির ধার কমে এসেছে, কিন্তু গোয়েন্দা চরেরাই মনে করিয়ে দিল ভারতবর্ষের পরাধীনতা প্রত্যেকের পক্ষে গঞ্জনা ; সেই গ্লানি বিস্মৃত হওয়া কঠিন।

আমার ভ্রমণ ভারতী দেশের সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়ে আমার মনে রেখে গেল দেশের মানুষের সঙ্গে আত্মীয়তাবোধ, ভারতবর্ষের জন্য গৌরব-বোধ আর সেই সঙ্গেই তার দুর্ভাগ্যের জন্য গ্লানি-বোধ।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

রাজপথ-জনপথ

বোধ হয় ১৯২৩ সালের শেষ দিকে বিপ্লবী দাদারা একজন আমাকে ডেকে পাঠালেন। তিনি নোয়াখালির কেউ নন। কিন্তু ওখানকার দলেরই সহকর্মী অথবা গোষ্ঠীর একজন। ১৯১৫।১৬ সালে নোয়াখালিতে বিপ্লবী রাজনীতির পথে পদার্পণ করেছিলাম। তা থেকে সরে এসেছিলাম অনেকদিন। প্রধানতঃ রবীন্দ্র সমাজ-দৃষ্টি ও 'স্বদেশী-সমাজে'র প্রভাবে। স্কুলের পাঠ শেষ না হতে (১৯১৮তে) এবং কলেজে পা না দিতেই, রুশ বিপ্লবের স্বরূপ বুঝবার আগেই সে বিপ্লবের সর্বজাতিক ও সর্বজনীন আদর্শ ও কর্মকীর্তির কথায় উদ্‌গ্রীব হই। ১৯২১-এর সূচনাতে দেশে গান্ধী রাজনীতির জোয়ার লাগল। রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রচিন্তা ও রুশ বিপ্লবের কর্মপন্থা মোটেই এক নয়। কিন্তু এই দু' পথেরই আকর্ষণ সমান, দুয়েরই মধ্যে কাছাকাছি একটা পথ মনের চোখে আব্‌ছা ভাবে দেখা দিত—জনপথ। তাই সাধারণ মানুষকে সচেতন করে জন-আন্দোলন—এটাই মনে হ'ত স্বাধীনতার রাজপথ। ১৯২০-২১-এ জন-জীবনে জাগরণ এসেছে, কংগ্রেস নামে একটা জন-সংগঠনে দেখতে না দেখতে সে জাগরণ কেন্দ্রিত হয়েছে, আর বিরাট কার্যক্রম নিয়ে সে সংগঠন সক্রিয় সংগ্রামে এগিয়ে চলছে ; দেখে মনে হয়েছে—এই তো সেই জনপথ-স্বরাজপথ। মাত্র এক-দু' বৎসরে যা ঘটছে, তা কি আগে কল্পনা করা যেত ? এত বড় অরগ্যানিজেশন, ও এত বড় প্রকাশ্য উদ্যোগ, ডিরেক্ট্ অ্যাক্‌শান,—এই তো বিপ্লবের পূর্বাভাস। অহিংসায় ব্রিটিশ শাসনের উচ্ছেদ যদি অবাস্তব কল্পনা হয়, তবে এখানে-ওখানে গোপন-চক্রে সহিংস বোমা-পিস্তলে ইংরেজ তাড়ানো কি কম অবাস্তব ? বিশেষ করে ইংরেজ এখন জার্মান যুদ্ধের মতো দুর্বিপাকেও পড়ে নেই। কিন্তু যা'ই ভাবি, আমি পড়াশোনা ছেড়ে গান্ধীজীর আন্দোলনেও ভেসে যাই নি। ১৯২২-এ বর্দৌলির পরে কংগ্রেসের সংগ্রামী কার্যক্রম চাপা পড়ল। আন্দোলনের দিন ফুরিয়ে গেল। তর্ক করতাম, গান্ধীজীর আন্দোলনের দম ফুরোয় নি, ফুরিয়েছে গান্ধীজীর আন্দোলনে যারা বিশ্বাস করে না তাদের দম। চাই জনগণকে সচেতন করা। অর্থাৎ কপ্‌চাতাম যা বিশ্বাস করতাম না তাই—কংগ্রেসের সেই 'নো-চেঞ্জারদের' বুলি, আর কার্যতঃ করতাম স্বরাজী দলেরই মতো আচরণ। জনসাধারণকে সচেতন করতে এগিয়ে যাই নি। পরীক্ষা দিয়েছি, পাশ করেছি, কলেজে পড়ছি। আমার অগ্রজ বন্ধুরা যারা পুরোনো বিপ্লবী দলের মানুষ, তারা দেশবন্ধুর অনুগামী। তারা স্বরাজী

দলের আসল কর্মী—নিষ্ক্রিয় থাকতে নারাজ। সুভাষচন্দ্রকে অগ্রে স্থাপন করে দেশবন্ধুর কর্মকাণ্ডকে তাঁরাই রূপদান করছিলেন।—চিত্তরঞ্জনের নীতি রিভোল্যুশন নয়, তবে প্রতিরোধের রাজনীতি, ; তাতে যে তাঁরা সম্পূর্ণ তৃপ্ত ছিলেন তা নয়। কিন্তু চিত্তরঞ্জন মানুষটাই ছিলেন তাঁদের প্রিয়। যেভাবে বর্দৌলির পরে আন্দোলন বানচাল হয়ে গিয়েছে তাতে চিত্তরঞ্জনের রাজনীতি কতকটা আন্দোলনকে সক্রিয় রাখতে চায়। তাতে কিছুটা ইংরেজের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জও আছে। অন্যদিকে এরই মধ্যে নিজেদের Revolutionary Nationalism বা স্বদেশীর অস্ত্রশস্ত্রের রাজনীতিকেও গোপন চক্রে আপাততঃ সামলে রাখা যাক? অবশ্য পরিবর্তিত আন্তর্জাতিক অবস্থায় অস্ত্রশস্ত্রের যোগান কোথাও পাওয়া যায় কিনা সে চেষ্টাও দেখতে হয়। জার্মানি না হোক, চীন, জাপান, রুশিয়া প্রভৃতি দেশে সেরূপ অস্ত্র সংগ্রহ করা যেতে পারে কি? বিপ্লবীদের এসব কথা যে আমার জানা ছিল, ঠিক তা নয়। কারণ, দাদাদের গোপন চক্রে কী ভাবা হয় না হয়, তা আমার অজ্ঞাত, আর জানতেও আমি তখন আগ্রহহীন। কিছু আঁচ পেতাম, ভাবতাম—ওসব বাৎ কী বাৎ। আসলে বর্দৌলির পরে সকলেই পথহারা বিভ্রান্ত।

স্বরাজী সভাপর্ব

১৯২৩-এ দিল্লীতে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন হয়, তাতে স্বরাজ্য পার্টি আইনসভায় প্রবেশের অনুমোদন পায়। আরম্ভ হয় 'স্বরাজী সভাপর্ব'। অনুমোদন অবশ্য সহজলভ্য হয় নি। এক বৎসর ধরে চিত্তরঞ্জনরা মাথা কোটেন। চিত্তরঞ্জনের গৃহে তখন নিঃ ভাঃ কংগ্রেস কমিটির বিফল অধিবেশনে চেঞ্জার—নো-চেঞ্জার 'তক্‌রার' শুনতে মজা লেগেছে। এখনো মনে পড়ে কৌপীন-পরা সেই গান্ধীবাদী রাজাগোপালাচারী ও সীতারামাইয়াদের যুক্তি চিত্তরঞ্জনদের বিরুদ্ধে। সে তর্ক যে কত অন্তঃসারহীন তা না বুঝেছি তা নয়। আইনসভায় ইংরেজকে বাধা দিলে 'স্বরাজ' পণ্ড হবে কেন? আর বাধা দিলেই বা 'স্বরাজ' পকেটস্থ হবে কি করে? দু-এর কোনটাই আমি মানতাম না। যাই হোক, অবশেষে যখন দিল্লীতে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে চিত্তরঞ্জনের দরকার হয় দলে ভারী হয়ে সে কংগ্রেসে যাওয়া, যেমন গিয়েছিলেন ১৯২০-এর ডিসেম্বরে নাগপুরে, তখন সেবারের মত এবারও, চিত্তরঞ্জনের সহকারী হলেন বাঙালি বিপ্লবী দাদারা ; নিজ্ নিজ দলবল নিয়ে দেশবন্ধুর পক্ষে দিল্লী চললেন। আমি তখন এম. এ. পড়ি। আমি ও আমার নোয়াখালির বন্ধুরাও সে দলবলের মধ্যে হই কিছু বল।

দিল্লী কংগ্রেস, নির্বাচনে স্বরাজ্য দলের জয়, এসব শেষে দেশে রাজনীতিক পথসন্ধান আবার আরম্ভ হয়। তখন 'দাদারা' নতুন করে দল গঠনের কথা ভাবেন। আমাকেও একবার বুঝে দেখতে চাইলেন। দেখা করবার জন্য খবর দিলেন। দেশের পরিস্থিতি বিষয়ে এক অধ্যায় কথার পরেই গ-দাদা জিজ্ঞাসা করলেন ঃ

ঃ কী করবে মনে করছ ?

পড়াশোনা করছিলাম—সে বিষয়ে শুনেছেন। তা বুঝে বললাম—

ঃ কী করব, ঠিক বুঝি না। নির্বাচনের পরে স্বরাজ্য পার্টির যা কাজ তা কাউন্সিলে—যারা মেম্বর তা তাদের কাজ। আমাদের কিছু করার তো নেই এখন।

ঃ তা বলে কি কাজ নেই ?

ঃ যেমন ?—কী কাজ, বুঝতে চাইলাম।

স্পষ্ট জানালেন ঃ বিপ্লবের সংগঠন। আমরা সে কাজ আরম্ভ করছি।

একটু ইতস্ততঃ করে বললাম ঃ কী ভাবে—কোন্ পথে বিপ্লব ? রুশ বিপ্লব একটা পথ দেখিয়েছে। 'ম্যাস' বা জনসাধারণকে না নিয়ে বিপ্লব করা যায় না।

ঃ কেন, আয়র্লণ্ডে কি হয়েছে ?

এর উত্তর জানতাম· না। সিন-ফিনদের প্রতি অশ্রদ্ধা ছিল না, কিন্তু আমার মনে হ'ত—পিছনে সাধারণ মানুষের সক্রিয় চেতনা থাকা চাই। বিশেষতঃ, সাধারণ মানুষের উদ্যোগ না থাকলে বিপ্লবের পরে সাধারণ মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে কিনা সন্দেহ। কথাটা বুঝিয়ে বলতে পেরেছিলাম কিনা জানি না। গ-দাদা কথাটা স্বীকার করলেন না। বললেন—বিপ্লবের জন্য সংগঠন করতে হবে তো। ইতস্ততঃ করে বললাম—ম্যাস রিভোল্যুশনের জন্য সংগঠন ওভাবে হয় কিনা জানি না। সেদিকে যেতে হলে আয়র্লণ্ডের দৃষ্টান্ত ছেড়ে রুশদের মত আপনাদেরও ম্যাস অর্গ্যানিজেশন করা দরকার।

আমার উত্তরে ত্রুটি ছিল। 'দাদা' বোধহয় 'আপনাদের' কথাটায় বিশেষ করে একটা অভিযোগের সুর আবিষ্কার করলেন। তিনি একটু তীক্ষ্ণ ভাবেই বললেন,—আমরা তা করব না, তুমি কেমন করে জানলে ?

আমিও বললাম ঃ না, তা জানি না। কিন্তু গুপ্ত সমিতি ও তার ছুটোছাটা অ্যাক্‌শন সে পথ নয়, এই মনে হয়। বরং কংগ্রেস একটা জন-জাগরণের সূচনা করেছে। সেই সুযোগটা নিয়ে আরও ব্যাপক আন্দোলন গড়া উচিত—শ্রমিক ও কৃষকদের নিয়ে সেরূপ সংগঠন করা প্রয়োজন।

আমার কথাও যে বুলি কপ্‌চানো, তা এখন বেশ বুঝি। 'কি করে শ্রমিক-কৃষকদের বিপ্লবের দিকে টানবে?' দাদা এ প্রশ্ন করলে তখন কিছুই বলতে পারতাম না। এখন বলতে পারি অনেক কথা, কিন্তু যা'ই বলি ওই শ্রমিক-কৃষকের পথ এখন অবধি যা তৈরী হয়েছে, তাতে তার সদুত্তর হয় না। যা হোক, 'দাদা' বোধহয় আমার অত কথা বলা পছন্দ করলেন না। ওঁরা জানেন, ওঁরা বলেন, 'ভাইরা' শোনে, তারা কথা বলে না। সেই 'ভাইরা' এরূপ অন্য বুলি কপচাচ্ছে দেখে বিরক্ত ভাবেই বললেন, যাক। সংগঠন কী তা আমরা জানি। জানতে চেয়েছিলাম—কাজ করতে চাও কিনা; তা বুঝতে চাই। ভেবে দেখো—কাজ করতে হলে—এসো আবার।

বেশ একটু খোঁচা ছিল তাঁর কথায়। আমি তা গায়ে না মেখে বিদায় নিই। সেই খোঁচাটা যখন এতদিনেও মন থেকে মুছে যায় নি তখন বুঝি তা আমার গায়েও লেগে থাকবে। তখন বুঝি নি খোঁচাটা কিসের? শব্দ কয়টার? না, বলার বিশেষ ধরনের? আবার, বিশেষ ব্যক্তিত্বের এক-একটা বিশেষ ধরন থাকে—খোঁচা না দিয়ে কেউ কেউ কথা বলতে পারেন না। এসব বিশ্লেষণের প্রয়োজন আমার ছিল না; কারণ, আমি জানতাম ওপথ আমার মতে অচল। তার চেয়ে কংগ্রেসের পথ বৃহত্তর পথ, সদর রাস্তা—তা বেশি সচল। অন্ততঃ সে পথে সাধারণ মানুষকে কিছুটা ছোঁয়া যায়। অবশ্য তার পূর্বেই দেখছিলাম—গ্রহের ফেরে সেই সদর পথ একদিকে কাউন্সিলাগ্রহে অন্যদিকে চরকাগ্রহে অবরুদ্ধ প্রায়। সাধারণ মানুষ তাতে আর সাড়া দেয় না। —বরং সেই vacuum-এ দেখতে না দেখতে ছড়িয়ে পড়ল ক্রম-বর্ধমান হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ। আমিও দিগ্‌দেশহারা—'স্বদেশী' চাই বা না চাই। অসহযোগের ভাঙা-হাটে গুপ্ত সমিতি গজিয়ে উঠছিল পুরোনো পথে। সে যাত্রাতে শাঁখারিটোলা ডাকঘরের ডাকাতি ও তার পরেকার চাটগাঁয় ওরকম ঘটনায় আমি কিন্তু অসুখী হতাম। কংগ্রেসের জন-জাগরণের প্রেক্ষাপটে ওসব তো অকাজ। গোপীনাথ সাহার নামে মাথা নত করেছি, তবু মনে করেছি—তা শোচনীয়? সিরাজগঞ্জ কনফারেন্সের সেই প্রশংসা প্রস্তাবে দোষ দেখি নি, কিন্তু বুঝেছি তার ফলাফলে জন-সংগঠন জোরদার হবে না। আমার পুরোনো সুহৃদরা সবাই মনে করেন অন্যরূপ। বুঝছি না—তাঁরা ভাবতে গিয়ে কি পুরোনো পথ ছাড়া অন্যপথ দেখতে পান না?

একদিন অক্টোবরের সকালে—পূজার ছুটিতে আমরা নোয়াখালি আছি, —স্বদেশী দাদা ক্ষিতীশ রায়চৌধুরী কলিকাতা থেকে শেষ রাত্রিতে নোয়াখালি ফিরছিলেন। দেখলেন পুলিশ বাড়ি ঘেরাও করে বসে আছে তাঁর

জন্য অপেক্ষায়। ব্যাপার কী ? কিছুই বোঝা গেল না। শোনা গেল অর্ডিন্যান্স। বেলা দশটা-এগারোটার মধ্যে খবর এসে গেল কলকাতায় সত্যেন্দ্র চন্দ্র মিত্রকে ধরা হয়েছে, এবং সুভাষচন্দ্রকে ও আরও অনেককেও। অবশ্য ক্ষিতীশদা তল্লাসীতেই নিষ্কৃতি পান, গ্রেপ্তারের ওয়ারেণ্ট ছিল না। তল্লাসীটাও গুরুতর নয়। আইরিশ কবি 'এ-ঈর' National Being বইখানা নিয়ে পুলিশ একটু টানাটানি করে ; বইটা আবার আমার।

আমার সম্বন্ধে পুলিশের তখন সন্দেহের কোনো কারণ ছিল না। তবে শহরে অনেকেরই একটা অস্পষ্ট ধারণা ছিল আমি ও ক্ষিতীশ রায় চৌধুরী বুঝি উঠতি বয়সের 'স্বদেশী'দের প্রেরণা-দাতা। এ ধারণাও অমূলক। বরং, আমার ভাবনাতেই ক্ষিতীশদা দাদাদের ওরূপ 'কাজের' ধারাতে উৎসাহ হারান। তাঁর পূর্বতন সহকর্মীরা তাঁকে তাড়না দিতেন ; কিন্তু তিনি বিপ্লবী দল ত্যাগ না করলেও পুরোনো কর্মপদ্ধতি চাইতেন না—হঠকারিতা করে, স্থির ভাবে তৈরী না হয়ে, কিছু করতে যাওয়া দুর্বুদ্ধি। উঠতি বয়সের ছেলেদের স্বদেশী সংগঠনে ক্ষিতীশদার কাজ হয়ে পড়েছিল শরীর গঠনে, সাহসিক কর্মে ও মানসিক চর্চায় ও জন-সেবায় প্রেরণা দান—হঠকারিতায় বা দুর্বুদ্ধির পথে না গিয়ে তাদের আত্ম-প্রস্তুতি চলুক। তাঁর নিজের কাজ ছিল কংগ্রেসের সংগঠন, কংগ্রেসের ক্রম ক্ষয়িত শক্তিকে রক্ষা, আর সেইজন্যই স্থানীয় সাপ্তাহিক 'দেশের বাণী' পরিচালনা। আমি ও আরও দু'চারজন বন্ধু তাতে লেখার কাজে যোগান দিতাম খেয়াল-খুশি মতো। পুলিশের খাতায় নাকি লেখা হয় আমি ওপত্রের de facto সম্পাদক, ক্ষিতীশ চৌধুরী de jure। এটা জলমিশ্রিত দুগ্ধ নয়, দুগ্ধমিশ্রিত জল।

আসলে আমাকে ছাড়াই উঠতি বয়সের ছেলেদের নিয়ে পুরোনো স্বদেশী দলের নতুন গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল। তা না জানতাম তা নয়। তাতে বাধা দিই নি, বাধার কারণও দেখি নি। প্রথমতঃ, সেই কিশোর ও তরুণেরা চমৎকার চরিত্রের ছেলে—খেলাধূলায়, লেখাপড়ায়, কাজেকর্মে উদ্যোগে-আয়োজনে জীবনানন্দের প্রতীক। 'স্বদেশীর' আদর্শ তাদের দিয়েছে সচেতনতা, জাতীয় মর্যাদা-বোধ, 'রোগে-পীড়ায় দশজনের সেবায় সংকল্প। 'যৌবনে দাও রাজটীকা' —কবি সত্যেন্দ্রনাথের এই কথা বিশেষ করে গ্রাহ্য হ'ত যখন তরুণদের কপালে 'স্বদেশী-রাজনীতি'র টীকা দেখতাম। তারা আমাকে তাদের অগ্রজ ও সগোত্র ভাবত বোধ হয় জনশ্রুতির ফলে, আমি তাদের সগোত্র ভেবেছি তাদের জীবন *গঠনে ওই seriousness দেখে।*

আমরা যখন নোয়াখালি ছেড়ে কলকাতায় কলেজে পড়তে যাই তখন

করবার কিছু ছিল না—সেই ১৯১৮-এর শেষ ভাগে সেখানে স্বদেশী দলের ভার গিয়ে পড়েছিল যাদের হাতে তাদের মধ্যে দু'জনকে বরাবর দেখতাম—অসিত ঘোষ ও মহেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। অসিতকে কেন্দ্র করেই এখন (১৯২০/২১) বেশ কয়েকটি তরুণ গড়ে উঠছিল, বিশেষ করে চিত্তরঞ্জন দাস ও রসময় মজুমদার তাদের মধ্যে অগ্রগণ্য। জ্যোতির্ময় রায়কে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে আরও কয়েকটি ছেলে। পরিমল মজুমদার, ফণী সেন, সুবোধ মিত্র তৃতীয় গোষ্ঠী। অসিত পুরোনো সে যুগের নীরব কর্মী। অসিত শিশুদের স্কুল চালাতেন,—পরে (১৯৩৯-৪০-এ) সে ইস্কুলই পরিণত হয় হাইস্কুলে—কল্যাণ বিদ্যালয়ে। আর এখনো বাঙলাদেশের নোয়াখালি শহরে তা শ্রেষ্ঠ ইস্কুল। হিন্দু-মুসলমান অসিতের তখনকার ছাত্ররা আজ হয়তো প্রৌঢ়। কলকাতার আসপাশেও তাদের (১৯৩৯-৪০-এ) দেখা পেতাম। তারা কেউ মুসলমান, কলের মজুর, কেউ হিন্দু, ভালো ব্যবসায়ী ; কিন্তু অসিত ঘোষের ছাত্র বলতে তারা গর্বিত। আরও যাদের তখন বুঝতাম অসিতের সতীর্থ তারা আমার অনেক ছোট, অন্যেরা অনেকে আরও বেশি ছোট। সবাই আমাদের স্নেহভাজন, সকলেই ওরা কিছু হতে চায়, কিছু হবে, এমন ছেলে,—আর, তা ফাঁকি দিয়ে নয়, বুক্‌নি দিয়েও না। একটা ঘটনার উল্লেখ করলেই বোঝা যাবে।

ছেলেদের ছোটখাটো নানা ক্লাব থাকে ব্যায়াম, জিমনাস্টিক, কুস্তি ইত্যাদির। সবচেয়ে বেশি নাম তাদের যারা মোটর আটকায়, হাতে লোহা বাঁকায়, ইত্যাদি। তারা কিন্তু স্বদেশী ভাবের এই ছেলেদের থেকে পৃথক হয়ে গেল। তারা ধর্মপ্রাণ ;—অসিতদের কাজকর্মে তাদের নাকি ধ্যান নষ্ট হয়। অসিতরা অত ধর্ম-বায়ুগ্রস্ত নয়। এই ধর্ম-নবিশদের কার গ্রামের বাড়িতে হঠাৎ কলেরা লাগল। যাদের বাড়ি তারা শহরে চলে এল। এসে খবর দিলে অসিতদের,—'তোমরা নার্সিং-এর জন্য ওখানে যাও। বাড়িতে একটি চাকর মাত্র আছে কলেরায় মুমূর্ষু ; বাড়ির মুহুরিও তাকে ফেলে ভয়ে চলে গিয়েছে নিজ বাড়িতে।' (বাবুরা নিজেরাই মুহুরির পথপ্রদর্শক)। যেতে হ'ল অসিতদেরই দুই জনকে। সে গ্রামে তখন তাদের কেউ থাকবার মতো ঠাঁইও দেয় না, তবু সেবাশুশ্রূষার ব্যবস্থা করলে। রোগীটার পরমায়ু ছিল, সে বেঁচেছিল। কিন্তু যে ধর্মপ্রাণ তরুণ যুবকেরা অন্যদের ঠেলে পাঠিয়ে দিয়ে ওভাবে আত্মরক্ষা করাই মনে করে ধর্মকার্য,--তাদের কি বলব ? 'বাহবা নন্দলাল'। অবশ্য তাদের সঙ্গেও আমার বিরোধ হয় নি তা বলে। তবে সেই স্বদেশী ভাবাপন্ন তরুণদের আমি আপন ভাবব না কি আপন ভাবব ওই ধর্মপ্রাণদের ?—হাঁ, এরূপ

মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গির জন্যই আমি বোধহয় শহরে একটা 'স্বদেশীর' সূত্র থেকে গিয়েছিলাম—পুরোনোতে ও নতুনে। তবে কার্যতঃ তার দ্বারা 'স্বদেশী'তে কোনো সহায়তা হয় নি—বয়সের তফাৎ একটা দূরত্ব আনে। রুচিতে তফাৎ বেশি ছিল না,—সাহিত্যশিল্পে আগ্রহ ওদেরও ছিল। কিন্তু আমি কলকাতা চলে যাওয়ায় কার্যক্ষেত্রে আরও দূরত্ব ঘটে।

আসলে কার্যতঃ আমার সাহিত্য-নাটক প্রভৃতি নিয়ে ছুটি কাটত। আর অবসর মতো কংগ্রেসের আন্দোলনে একটু যোগও থাকত। তা ছাড়া, মনে মনে চোখ থাকত 'এ্যাড্‌ভান্স গার্ড'-পড়া নতুন দিগন্তের দিকে। কিন্তু হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িকতার আঁধিতে আমার সেই রাজনীতিক ঝোঁক কর্মক্ষেত্র আর খুঁজে পেত না। দেশের রাজনীতিতে সেটা অবসাদের কাল। ভাঁটার টান চলে বর্দৌলিতে গৃহীত সংগ্রাম-ত্যাগের সংকল্প থেকে একেবারে ১৯৩০-এর আইন ভঙ্গের আন্দোলনের আরম্ভকাল পর্যন্ত। দেশের পক্ষে তা সত্যকার দিগভ্রান্ত ভাবে ভেসে চলার অবস্থা। সেই দিশাহারা দিনে দিশা খুঁজতে না খুঁজতে 'স্বদেশী' দাদারা জেলে গিয়ে পড়লেন, বোধ হয় ইচ্ছা থাকলেও কিছু করেন নি। কলকাতা, চন্দননগর ও চট্টগ্রামের স্বদেশী-চক্র কয়টি তখন কিছুটা দাপাদাপি করে, সেসব এখন সুবিদিত। গোপীনাথ সাহার প্রতি অন্য বিপ্লবী দাদারা প্রকাশ্যে শ্রদ্ধা ও সহযোগিতা জানাতে দেরী করেন নি। সরকারের হাতে তা যথেষ্ট প্রমাণ। সুভাষবাবু সুদ্ধ প্রধান প্রধান 'স্বরাজী' নেতাদের অর্ডিন্যান্সে অবরোধ করাতে কী হ'ল সেই সব উগ্র চক্রগুলির, তা জানা গেল না। তবে ওরকম উগ্রতায় ভাঁটা পড়তে বাধ্য, পড়লও। আর কর্মীদের হারিয়ে দেশবন্ধুও কাউন্সিল-কাণ্ড নিয়ে কোনোদিকে এগুতে পারেন না। মৃত্যু এসে তাঁকে বিড়ম্বনা থেকে বাঁচাল—বার্কেনহেডের গঞ্জনা থেকে, না, তাঁর অনুগত কর্মীদের তিরস্কার থেকে, কে বলবে? তবে রাজনীতিতে বাঙালি তখন অসহায় হ'ল। দেশবন্ধুহীন কংগ্রেসকে গান্ধীজীও বাঙলায় বা ভারতে কোনোখানে জীইয়ে তুলতে পারেন নি; তবে দেশবন্ধুর হিন্দু-মুসলমান প্যাক্টকে নাকচ করে দিয়ে মধ্যবিত্ত বাঙালি হিন্দুকে তিন নিশ্চিন্তে নিশ্বাস ফেলতে দেন, আর বাঙালি মুসলমানদের সন্দেহকে দৃঢ়তর করেন—যে-বিভেদ বাড়ছিল তা ক্রমে বিরোধ হয়ে দেখা দিল।

ভদ্রলোকের 'স্বরাজ-সংকার'

বাঙালি স্বরাজী নেতারা দেশবন্ধুর সেই প্যাক্টকে কখনো মনে মনে মানেন নি—দেশবন্ধুর ব্যক্তিত্বের চাপে চুপ করে ছিলেন। শতকরা ৫০টা চাকরি

যদি মুসলমানদের দিতে হয়—আর বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনায়ও যদি মুসলমানদের সেরূপ অধিকার মানতে হয়—তা হলে 'বাঙালি ভদ্রলোকের' আর থাকবে কী? যে স্বরাজের জন্য 'তাঁদের ছেলেরা প্রাণ দিয়েছে', তাঁরা নিজেরা করেছেন এত ত্যাগ, সে 'ত্যাগের' শতকরা ৫০ ভাগ কেন, ২০ ভাগও কি মুসলমানরা করেছে?—সে 'স্বরাজ' যদি সত্যই প্যাক্ট অনুযায়ী আসে, হিন্দু ভদ্রলোকের এবং হিন্দু জমিদার ও ধনীদের তা হলে সর্বনাশের কী বাকী থাকবে?—দেশবন্ধু জীবিত থাকতেও হিন্দু ভদ্রলোকদের মনের এই কথা চাপা থাকত না। বিশেষ করে হিন্দু সংবাদপত্র সে কথা মনে চেপে রেখে কথা কইত না, আর বার লাইব্রেরির উকিলবাবুরাও না। তাদের সেসব কথা শুনে—ও স্বরাজী নেতাদের মনোভাব দেখে—শিক্ষিত মুসলমান ও মুসলমান মধ্যবিত্তরাও আশ্বস্ত হতেন না, তা বলাই বাহুল্য। দেশবন্ধুর মৃত্যুর পরে এই ধূমায়িত সন্দেহ প্রথম বিভেদ, শেষে বিরোধ হয়ে উঠল। হিন্দু-মুসলমান বিরোধই হ'ল বাঙলার রাজনীতির প্রধান ট্র্যাজিডি। ১৯২৬-এর দাঙ্গার পরে আইনসভায় স্বরাজীদের মধ্যে ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিতে হিন্দুস্বার্থের স্বর প্রবলতর হয়। কবি নজরুল ইসলামের মতো স্বাধীনতার কবিও নানাস্থানে হিন্দু-মধ্যবিত্তের ও এই রাজনীতিকদের সন্দেহভাজন হন—অথচ তাঁর গান ছাড়া রাজনীতির সভা তখন অচল। একমাত্র তাঁর কমিউনিস্ট বন্ধুরাই অ-সাম্প্রদায়িক ভারসাম্য ও সুস্থ চেতনা ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিল, কিন্তু তাদের না ছিল ধন, না ছিল সহায়সম্বল। অপর দিকে যে শ্রমিক-কৃষক সাধারণের ওপর তাঁদের ভরসা, তখনো পর্যন্ত সেই শ্রমিক-কৃষকদের মধ্যেও তাঁদের প্রভাব অসংগঠিত এবং অনিশ্চিত। অবশ্য দু'তিন বৎসরের মধ্যে শ্রমিকদের ভেতরে একটা চাঞ্চল্য এসে যায়—রেলে চটকলে বেশ বড় বড় ধর্মঘট হয়, সে ধর্মঘটগুলি সরকারকে চমকিত করে। তার আগেই সরকার ছুরি শানাচ্ছিল, ভারতে কমিউনিজম-এর আবির্ভাব না ঘটতেই তার দফারফা করা চাই। সুযোগ পেতেই সরকার (১৯২৯-এ) শ্রমিক আন্দোলনের নেতাদের গ্রেফতার করে, আরম্ভ করে মীরাট কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মামলা। এদিকে গ্রামাঞ্চলে জমিদারী প্রথার পীড়নে আর মহাজনী প্রথার কবলে কৃষকদের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে উঠছিল। কংগ্রেসের জন-আন্দোলন কিছুতেই জন-জাগরণকে জনস্বার্থের ভিত্তিতে গঠিত করে সুদৃঢ় হতে পারে নি—গান্ধীজীও সে দিকে কৃষক বা খাতকের স্বপক্ষে মুখ খোলেন নি। চিত্তরঞ্জনের 'শতকরা ৯৫ জনের স্বরাজ' দেশের শতকরা ৫ জনের ক্ষমতা-লাভের অক্ষম ষড়যন্ত্রে পর্যবসিত হয়ে রইল। সমস্ত ভারতেই কৃষকের-শ্রমিকের শোষণের

পীড়নের বিরুদ্ধে একটি টু শব্দও কংগ্রেস করে নি। বরং পরেকার সংখ্যাতত্ত্বের হিসাব থেকে দেখা যায়—এই ১৯২১-৩১-এর মধ্যে বাঙলার কৃষকের দুর্দশা চরমে উঠেছিল। তখন তারা উৎখাত হতে থাকে জমি থেকে, খাজনার উপর আইনী-বে-আইনী নানা বাড়তি আদায়-উশুল বেড়ে যায়, জমি মহাজনদের কবলে যেতে থাকে। দেখা যায় ১৯২১-১৯৩১-এর মধ্যে নানা ধরনের জমিদার ও খাজনা-ভোগীদের সংখ্যা ৩ লক্ষ ৯৫ হাজার থেকে বেড়ে দাঁড়ায় ৬ লক্ষ ৩৪ হাজারে ; অথচ মালিক-চাষীদের সংখ্যা ১২ লক্ষ ২৭ হাজার থেকে কমে হয় ৬ লক্ষ ৪১ হাজারে (প্রায় এক-তৃতীয়াংশ চাষী আর জমির মালিক রইল না)। তার ফলে গরীব চাষী ও খেতমজুরের সংখ্যা ১৮ লক্ষ ৫ হাজার থেকে বেড়ে হয় ২৭ লক্ষ ৩৮ হাজার—জাতির স্বরাজ না এলেও খাজনা-ভোগী শ্রেণীর স্বরাজ এসে গেছল, —আর প্রজা কৃষকের সর্বনাশ বেড়েই গেছল। জমির উপস্বত্ব-ভোগীরা একদিকে কংগ্রেসেরও কর্ণধার, অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদী সরকারেরও চিরদিনের পোষ্যপুত্র—দু'পক্ষ থেকেই তারা স্বার্থসিদ্ধি করছিল। ১৯২৮ সনে বাঙলা ভূমিসংক্রান্ত আইনের যে-সংশোধন সভায় পাশ হয় তা হচ্ছে এই জমিদারদের শোষণের দুমুখো চালের চরম দৃষ্টান্ত। সেখানে স্বরাজ পার্টি ও সরকারী সদস্যরা হাত মিলিয়ে প্রজা পক্ষের সামান্য আত্মরক্ষার চেষ্টাও বিনষ্ট করে—রিপোর্টে দেখা যায় সে আইনের বিরুদ্ধে একজন নিম্নবর্ণের 'হিন্দু রায়সাহেব' ছাড়া একটি হিন্দুও ভোট দেয় নি, আর জমিদার পক্ষে সমস্ত হিন্দু ও সরকারী সদস্য সাহেবরা ছাড়া একটি মুসলমান মাত্র ভোট দেন, তিনি খাঁ বাহাদুর আবদুল মমিন। সে-ই একমাত্র মুসলমান, কিন্তু তিনি সরকারী কর্মচারী, কাজেই সরকার পক্ষে ভোট দিতে বাধ্য। হাসি পায় ভাবতে—এই মমিন সাহেব ছিলেন ভূমি-ব্যবস্থা সম্বন্ধে সত্যই অভিজ্ঞ ও বিচক্ষণ কর্মচারী ; এবং নোয়াখালিতে ম্যাজিস্ট্রেট্ হিসাবে তাঁর বিশেষ কর্মদক্ষতা দেখেছিলাম—মুসলমানের স্বতন্ত্র সত্তা সম্বন্ধে তাদের সচেতন করে মধ্যবিত্ত মুসলমানদের কংগ্রেস আন্দোলন থেকে সরিয়ে আনার কাজে, আর গরীব মুসলমানকে পরোক্ষে হিন্দু জমিদার-মহাজন ধনী ব্যবসায়ীদের শোষণ সম্বন্ধে সচেতন করার কাজে। আইনসভার ভোটে অবশ্য সরকারী কর্মচারী হিসাবে ঠিক বিপরীত কাজই তিনি করেছেন। তবে ও আইন বেশি দিন টিকে থাকে নি। কিন্তু তার আগে যা হ'ল তাতে পরোক্ষে তাঁর উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হয়েছিল। ও আইনে স্পষ্ট প্রমাণ হয়ে যায়—"বাংলার আইনসভার কংগ্রেসী সদস্যদের কাছে চাষীর স্বার্থের চেয়ে জমিদারের স্বার্থ বড়।" আরও যা

স্পষ্ট হ'ল ওপরের ভোটের রূপ থেকেই তা স্পষ্ট, "প্রজারা সংখ্যায় অধিকাংশ মুসলমান,—যাদের বলা হয়, গ্রামের জনসাধারণ। আগেই মধ্যবিত্ত মুসলমান তো কংগ্রেস থেকে সরে গেছল, এখন গরীব মুসলমানদেরও তারা নিজ দলে কংগ্রেসের বাইরে ও বিরুদ্ধে জমায়েত করবার ষোল আনা সুযোগ পেল।" "এর পরে বাংলার চাষীর আনুগত্য আর বাংলার কংগ্রেস ফিরে পায় নি''—বলেছেন শ্রীযুক্ত অতুল গুপ্ত। আর তার অর্থ—বাঙলার মুসলমান সাধারণকে স্বরাজ ও স্বাধীনতার আন্দোলনের পরিবর্তে মুসলিম লীগ ও 'মুসলিম স্বাতন্ত্র্যের' (মুসলিম separatism) দিকেই ঠেলে দেওয়া হ'ল—যাতে বছর দশ পরে পাকিস্তানের দাবী যখন উত্থাপিত হ'ল তখন তারা সেই দেশ-বিভাগেই দেখল মুসলিম স্বাতন্ত্র্যের স্বাভাবিক আয়োজন। অবশ্য, ১৯২৬-২৭-এ কেন, ১৯৩০-এও সেই পরিণাম লক্ষণীয় হয় নি। কিন্তু যা অলক্ষিত, এবং তখনো অভাবিত, তা যে শেষ অবধি বাঙালি মুসলমানের লক্ষ্য হয়ে উঠল তার জন্য লীগ-এর মুসলমান-শিবিরের যতটা দায়িত্ব, কংগ্রেসের স্বরাজী ও অন্যান্য হিন্দু কায়েমি-স্বার্থের নেতাদের দায়িত্ব কি কোনো অংশে কম ছিল? কিম্বা কম ছিল বাংলার সংবাদপত্র-গুলির দায়িত্ব? কলকাতায় তখনকার সাহিত্য ও সাংবাদিকতার কার্যকলাপে এ সত্য অনুভব করতে হত। এখন তো পরিষ্কার—এই হিন্দু শিক্ষিত শ্রেণীর এবং তাদের সংবাদপত্রগুলির ভেদবুদ্ধি, দেশদ্রোহী নির্বুদ্ধিতা ও আত্মঘাতী স্বার্থপরায়ণতা বাঙালি মুসলমানের ভেদবুদ্ধির (separtism) মতোই সমান দায়ী। চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যুর পর থেকে তাঁর সাধারণ সুবুদ্ধিও অন্ততঃ তাঁর অনুগামীদের মনে রইল না, তারা মনে রাখল না তাঁর হিন্দু-মুসলিম প্যাক্টের সমর্থনে তাঁর বাঙালি হিন্দুদের প্রতি উক্তি: What you have to give finally, give in time and give gracefully.

সংশয়ে সংকল্পে

১৯৩০-এর ২৬শে জানুয়ারি পূর্ণ স্বাধীনতার সংকল্প গ্রহণের আনুষ্ঠানিক প্রথম তারিখ—এখন সে দিন 'প্রজাতন্ত্র দিবসে'র দিনে পরিণত। ভালোই হয়েছে। কিন্তু সেই প্রথম সংকল্প গ্রহণের দিনটা অবিস্মরণীয়। আরও অবিস্মরণীয় সেই প্রথম সংকল্পের বয়ান। অবশ্য, সহজ ভাবেই ১৯২১-এর 'স্বরাজ' কথাটার স্থান নিয়েছে তখন 'স্বাধীনতা'। জানি না, কে স্বাধীনতার সংকল্পপত্র রচনা করেন,—শুনেছি পণ্ডিত জওহরলাল। তবে গান্ধীজীরও হাত থাকার সম্ভাবনা। সে 'পাঠ' কিন্তু আমার মন ছুঁয়েছিল। আবার মনে সংশয়ও জাগত—ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বাধীনতা কি সত্যই সম্ভব? সংশয়ের

খোরাক যুগিয়েছিলেন বন্ধুবর নীরদচন্দ্র চৌধুরী। ব্যঙ্গবিদ্রূপ বাদ দিয়ে তাঁর সামরিক বিদ্যার বলে তিনি জানাতেন, "পশ্চিমে এডেন ও পূর্বে সিঙ্গাপুর দখলে না রাখলে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সম্ভবও না, টিকবেও না।" সামরিক বুদ্ধির পক্ষে এ যুক্তিটা হয়তো খাঁটি। কিন্তু তা ছাড়াও আরও বুদ্ধি আছে, হিসাবও আছে। পৃথিবীতে না হলে কোন্ জাতি স্বাধীন থাকতে পারত ? জাতিতে জাতিতে হিংসা ও স্বার্থের বিরোধ, বিশেষ করে সাম্রাজ্যবাদী যুগে সাম্রাজ্যবাদীদের পরস্পরের দ্বন্দ্ব, মিত্রভেদ মিত্রলাভের ডিপ্লোমেসিতে ক্রমাগত বল-পরিবর্তন, এসব তো মিথ্যা নয়। আরও মূল কথা ইতিহাস dynamic, আর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যেরও ক্ষয়বৃদ্ধি অনিবার্য। নীরদবাবুর অবশ্য ডায়েলেক্‌টিক্‌স-এ আস্থা নেই। ইকোনোমিক শক্তির ক্ষমতা ও ইতিহাসের গতিশীলতায় আস্থা তাঁর মনে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের চিরস্থায়িত্বে আস্থার তুলনায় কম। কারণ, অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে ব্রিটেন প্রত্যেকটা বড় যুদ্ধে জিতেছে, এবং ক্রমেই বৃহত্তম শক্তিতে পরিণত হয়েছে। এমন কি, ১৯১৪-১৮-র যুদ্ধ শেষেও ব্রিটিশ (ও ফরাসী) সাম্রাজ্য আরও অধিক শক্তিধর হয়েছে। অতএব —এ যুক্তি নিশ্চয়ই খাঁটি, ব্রিটেন দুর্জেয়। কিন্তু ব্রিটিশ (ও ফরাসী) সাম্রাজ্যবাদ যে আপাতবৃদ্ধি সত্ত্বেও আসলে কত অন্তঃসারশূন্য হয়ে পড়ছে, এ কথা সে মুহূর্তে তাঁর মতো ইতিহাসের পণ্ডিতের পক্ষে বোঝা অসম্ভব হ'ল কেন ? সোভিয়েত বিপ্লবটা ইতিহাসের একটা প্রক্ষিপ্ত ঘটনা নয়,—ইতিহাসেরই প্রকাশ। তা সত্ত্বেও, নীরদবাবুর নিঃসংশয়ী সামরিক বিশেষজ্ঞতা সত্যই আমার মনকে ছায়াচ্ছন্ন করত। কিন্তু কয় মাস পূর্বে কন্যাকুমারী থেকে ফিরেছিলাম একটা ভাবনা নিয়ে। তাই প্রথম ২৬শে জানুয়ারির সংকল্পের বয়ানে প্রাণ সাড়া দিল। আবার তখনি আমার সংশয়ী মন বললে—এ লক্ষ্য কি ভারতবর্ষের কার্যতঃ আয়ত্ত করা সম্ভব ? চোখে দেখি—আমার ফেণী কলেজের ছাত্ররা পতাকা তোলা, স্বাধীনতার সংকল্প পাঠে উৎসাহে উদ্দীপ্ত। আমি সেসব দেখছিলাম কতকটা সানন্দ দৃষ্টিতে, কতকটা সংশয়ী বুদ্ধিতে, কতকটা আবার উদ্বুদ্ধ চেতনায়। শুনছিলাম 'স্বাধীন ভারত দীর্ঘজীবী হোক।' সে সময়ে আমার ফেণী কলেজে ইতিহাসের সংগ্রহ শালা গড়ার ইচ্ছা ছিল ; তাতে আগ্রহ কমে গেল—ইতিহাস গড়ার ডাক আসছে যে ভারতবর্ষে। সে ডাকটা সত্যই এল লবণ সত্যাগ্রহ নামে।

জন-আন্দোলন গড়তে হলে জন-সাধারণের আর্থিক দাবী-দাওয়াকে ভিত্তি করতে হয়, এই কমিউনিস্ট সংগ্রাম-নীতি বুঝি গান্ধীজী গ্রহণ করলেন ; কিন্তু গ্রহণ করলেন সম্পূর্ণ ভারতীয় আধারে আর তাঁর নিজস্ব উদ্দেশ্যে ও পদ্ধতিতে।

লবণ সত্যাগ্রহ 'এক পয়সার মামলা' ; একথা সবাই বলত। কিন্তু দেশ উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল,—দেশ তর্ক বোঝে না—চায় কিছু করতে। দেখছিলাম —আমাদের ছাত্রদের কারও চিত্ত উৎসাহে প্রদীপ্ত, কারও আবার দোদুল্যমান, জানতে চায়, 'অহিংসায় কী হবে ?' আমি বুঝতাম—অহিংসার সঙ্গে কিছু না কিছু হিংসার খাদ মিশিয়ে নেবে জনতা—যদি আন্দোলন চলে। নিজের আবেগে-বুদ্ধিতে এখানে-ওখানে—জনসাধারণ যখন যেমন পারে চেষ্টা করবে, আন্দোলন এগিয়ে চলবে। আসল কথা—জন-আন্দোলন ; তাই হবে স্রোতের মূলধারা। এখানে-ওখানে হিংসার আবর্তও এসে মিশবে তাতে—গান্ধীজীকে মূল স্রোত বন্ধ করতে তা উদ্যত না করলেই হয়। তাই, দ্বিতীয় আসল কথা —সকল সংগ্রামী শক্তিকে ওই জন-আন্দোলনের সামিল করা ; সকলের যোল আনা না হোক, আপাততঃ যতটা সম্ভব চাই মিলিত সংগ্রাম। মোটামুটি জন-আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে চলাই সকল দলের সমুচিত। ব্যক্তিগতভাবে কে কতটা তাতে কী তালে যোগ দেবে সে তার নিজেকেই স্থির করতে হবে। কিন্তু সাধারণ ভাবে কৌশল—সকলের সহগামিতা, পা মেলানো, হাত মেলানো, মিলিত যাত্রা।

মার্চ থেকে এপ্রিলে পৌঁছে সন্দেহ রইল না—জন-আন্দোলন আপনার খাদ তৈরী করে নিয়েছে। পড়ছিলাম, বিদেশেও সেবার গান্ধীজীর আন্দোলনের সম্পর্কে বিপুল কৌতূহল, বেশ কিছুটা সহানুভূতি—ভারতবর্ষ অহিংস বিদ্রোহে গতিমান। মনে পড়ে, এক পত্রিকার ছবিতে দেখলাম ক্ষ্যাপা শিল্পী গর্ডন ক্রেইগ্ নিউ ইয়র্কের সমুদ্রতীর থেকে এক বালতি জল তুলছেন—গান্ধীজীর সঙ্গে আপনার একাত্মতা জানিয়ে আটলাণ্টিকের থেকে জল দিয়ে লবণ তৈরী করবেন। এদিকে কার্যতঃ কিন্তু দেখলাম বঙ্গোপসাগরের নোনা জল থেকে নুন তৈরী বড় ঝঞ্চাটের ব্যাপার—পুলিশ এসে গ্রেপ্তার করলে বাঁচা যায়, হাঁড়িকুড়ি ভেঙে দিলেও রক্ষা। না হলে বাঙলাদেশে বাড়ির দেওয়ালেই নোনা ধরে, সাগরের জলে নুন হয় না—নুন তৈরীর সব রীতি-পদ্ধতি বাঙালি বিস্মৃত। অথবা, আরও সত্য একালে ওরূপ সেকেলে প্রস্তুত-পদ্ধতি অচল। এ যেন সুলভ রেলস্টীমার হাতের কাছে পেয়েও বয়েল গাড়িতে তীর্থযাত্রা। সভ্যতা ওসব রীতি-পদ্ধতি কার্যতঃ বাতিল করে দিয়ে মনের অনেক বিরক্তি ও সময়ের অপচয় থেকে মানুষকে বাঁচিয়েছে। কিন্তু সভ্যতার একেলে রীতির সঙ্গে যে গান্ধী-নীতির মূল বিরোধিতা। তা বুঝেও গান্ধীজী চান জনসমাজকে তাঁর পথে টেনে আনতে, আর তা জেনেও আমাদের মত সভ্যতায় infected-দেরও আপাততঃ চাই ওই পথে একত্রে মেলা। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে একত্রে

মেলা, এটাই মূল কথা—নোনাজলে নুন তৈরী হোক কি না হোক। না হলে, সারা ভারতবর্ষে বোধহয় একশ টাকার বে-আইনী নুনও তখন তৈরী হয় নি। কিন্তু একশ মাসের জড়তা ভাঙল। বর্দৌলির পরে ১৯২২-এর থেকে ১৯২৯ পর্যন্ত এই জড়তাই তো রাজনীতিকে আচ্ছন্ন করেছিল—স্বরাজ্য পার্টি তাকেই ঝেড়ে ফেলতে গিয়েও পারছিল না। শেষ অবধি তারাও স্বীকার করছে—হ'ল না। কাউন্সিল এ্যাসেম্ব্লি থেকে বেরিয়ে এসেই আন্দোলন চালাতে হবে। তর্ক করা যেতে পারত—তাতেই কি স্বাধীনতা লাভ হয়ে যাবে? ওরকম তর্ক সকল পথের বেলাই করা যায়—কি নো-চেঞ্জারদের পথ, কি স্বরাজ্য দলের পথ, কি অহিংস সত্যাগ্রহের পথ, কি সহিংস ইতস্ততঃ বিদ্রোহের পথ। আসলে দেশের মৌলিক অবস্থাটাই যে ওরূপ—'বারে বারে জ্বালবি বাতি হয়তো বাতি জ্বলবে না'—সকল দলের পক্ষেই সত্য। কারো পক্ষে হয়তো বেশি, কারো পক্ষে কম। কিন্তু সবচেয়ে বড় সত্য—'তা বলে ভাবনা করা চলবে না।'

সত্যই তো, ১৯৪৭-এ যখন বাতি জ্বলল তখন তো কারো একার শক্তিতে তা জ্বলে নি—বাহ্যতঃ কংগ্রেসেরই হাতে জ্বলেছে, আর মুসলিম লীগও ভোগ করেছে তার ফল উল্টো হাতে। অবশ্য এও ঠিক, ১৯৪৭-এর সে কংগ্রেস গান্ধীজীর পরামর্শ-ত্যাগী কংগ্রেস, সীমান্ত গান্ধী প্রভৃতিকে বর্জনকারী কংগ্রেস,—ক্ষমতার লোভে বিলম্ব অসহিষ্ণু রাজাগোপালাচারী-বল্লভভাই পাটেলদের কংগ্রেস। কিন্তু ক্ষমতাটা তখন কংগ্রেসের (ও লীগের) লাভ হলেও একমাত্র কংগ্রেসের জোরে তা হয় নি, পুরোপুরি অহিংসার জোরেও নয়। হিংসার জোরেও নয়; বরং দেশীয় নৌ-সৈনিক, বিমান সৈনিক, আজাদ হিন্দ-ফৌজ প্রভৃতিরই তাৎক্ষণিক বা immediate বিদ্রোহের জন্যই বোধহয় বেশি সম্ভব হয়। অথবা, শুধু এসব বিবিধ ভারতীয় শক্তির প্রস্ফুরণেও নয়, বরং আন্তর্জাতিক আবর্তনের অনিবার্য ফলেই—যাতে সেই নীরদচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের যুদ্ধ-বিদ্যা ও ইতিহাস-দৃষ্টিকে সেলাম করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ও ফরাসী সাম্রাজ্য মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ল,—রোম সাম্রাজ্যের মতো,—সকল ভগ্নোন্মুখ সাম্রাজ্যের মতোই।—ইচ্ছা-অনিচ্ছায় নিজেকে গুটিয়ে নেওয়া ভিন্ন তাদের আর গতি রইল না। ওসব কিন্তু যুদ্ধ ও যুদ্ধের পরেকার কথা—১৯৩০-এ তা অগোচর ছিল। তবে একটা নির্বোধ বোধ সেই কন্যাকুমারী থেকে বুঝি অস্পষ্টভাবে মনে বাসা বেঁধে ছিল, 'তা বলে ভাবনা করা চলবে না।' —হয়তো বাতি এবারও জ্বলবে না। ...তবু 'ভাবনা করা চলবে না।'

তা বলে ভাবনা করা চলবে না—মানতে হ'ল আমাদেরও অনুভূতিতে

এ কথাটা প্রচ্ছন্ন থাকত। কন্যাকুমারীতে যে-অনুভূতি সামনে এসে গিয়েছিল, তা মিলিয়ে যায় নি। কিন্তু কী তার রূপায়ণের পথ? অনুভূতিটা যে অভাবিত-পূর্ব কর্মচক্রে এসে অভাবিত-পূর্ব পথে ফুটবে, তা তখনো জানতাম না। জানতাম—হাত মেলাও, পা মেলাও। কিন্তু আমার হাত মিলবে যদি, মিলবে উগ্র উদ্যোগীদের সঙ্গে নয়, সচেতন সহায়কের সঙ্গে; আমার পা মিলবে যদি—যদি কেন, নিশ্চয়ই মিলবে—প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে—মিলিত অভিযানে স্থির সংকল্প যাত্রীদের পার্শ্বে চলে চলে—শত-সহস্রের 'পদধ্বনির পদাবলী' মুখরিত জনপথে ও রাজপথে।

অথচ ইতিহাসের স্রোতাবর্ত এমনি মজার জিনিস যে, সে আবর্তে পাক খেয়ে খেয়ে আমিও ভেসে চললাম ঘাট থেকে ঘাটে।

'হাত মেলাও, পা মেলাও'

সেই আবর্তের জন্য লবণ তৈরীর সোরগোলে কলেজে পড়া হয় সামান্য। কার্যতঃ ছুটি জোটে, আর আমি তখনি পালাই ফেণী থেকে নোয়াখালি। চৈত্র-সংক্রান্তি, পয়লা বৈশাখ পেরিয়ে এসেছিল গুড্‌ফ্রাইডে ইস্টার-মন্‌ডের ছুটি। আমিও নোয়াখালিতে। উনিশে এপ্রিল সকালে সে শহরে সকলের মুখে একটা কথা ঘুরতে লাগল—'কী ব্যাপার? টেলিগ্রাফ আপিসে লাইন বন্ধ, চাটিগাঁর ঘাঁটি সাড়া দিচ্ছে না। 'কী ঘটেছে চাটিগাঁতে?' এখনো আশ্চর্য মনে হয়, কেমন করে সাধারণ লোক সংবাদ আঁচ করলে। টেলিগ্রামের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন, বেতারের যোগ অবশ্য জাহাজে-জাহাজে চাটিগাঁয়ে কলকাতায় সম্ভব; হয়তো অন্যত্রও হ'ত, কিন্তু নোয়াখালির মতো শহরের সঙ্গে সেরূপ যোগাযোগও নেই। যাই হোক, বেলা বাড়ে, অনুমান ও জনরবও বাড়ে, ক্রমশঃ তা একটা রূপ নেয়। সঠিক না হোক, মোটামুটি বোধগম্য। আমাদের বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যেও আড্ডায়-গল্পে জল্পনা-কল্পনা চলে—চাটিগাঁয় কী হয়েছে? যতটা জানি কী হয়েছে, তার চেয়ে কে তা করেছে সে কথাটাই বেশি অনুমান করতে চাই। ১৮ই এপ্রিল সেই আয়র্লণ্ডের ইস্টার অভ্যুত্থানের তারিখটা যে কেন স্থির করা হয়, তাও বুঝতে পারি। বাঙালি বিদ্রোহীদের মাথায় আইরিশ বিপ্লবীদের দৃষ্টান্ত ঘুরত,—জন-বিপ্লব নয়, স্বল্প সশস্ত্র লোকের বিদ্রোহ। আমি অবশ্য সঠিক ধরতে পারি না চাটিগাঁয়ের ক্ষ্যাপা 'স্বপ্নলোক' কারা, আমার ফেণী কলেজের অভিজ্ঞতায় তবু কিছু কিছু বুঝ্‌-ছিলাম। দু'-এক মাস আগে ফেণীতে অনুশীলন দলের একটা যুব-সম্মেলন হয়—চট্টগ্রামের চারুবিকাশ দত্ত এসেছিলেন সভাপতি হয়ে। সম্মেলনের প্রান্তে দাঁড়িয়েছিল জন আট-দশ যুবক, চট্টগ্রাম থেকে এসেছে। তারা উদ্যোক্তাদের

বিরোধী পক্ষ, (এ সম্মেলনের বিরোধী)। তাদের দলের একটি কিশোর (সুখেন্দু ?) খুন হয়েছে চাটিগাঁয়ের অনুশীলন দলের হাতে—এ'দের মতে 'এই সম্মেলনের সভাপতির নির্দেশে'। এই প্রতিবাদী দলের নেতাদের সঙ্গে আমার সেই প্রথম চাক্ষুষ সাক্ষাৎ। তাদের মধ্যে সেখানে যাঁরা ছিলেন বস্তুত 'তাঁদের দু-একজনাকে অনুমানেই চিনতে পেরেছি—অনেক কারণে অনেক দিন ধরেই তাঁদের জানতাম, এবং জানতাম অদ্ভুত সাহসী ও কর্মিপুরুষ রূপে। সেদিক থেকে তাঁদের কর্মশক্তিতে আস্থাও ছিল। কিন্তু তাঁদের ওই কর্মপন্থাতে আমার আস্থা অনেক দিন নেই। শুনেছিলাম ভাবনায় ও কর্মপদ্ধতিতে বাঙালি বিপ্লবী দলদের কতকটা মিলিত করেছিলেন যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়। কিন্তু ১৯২৮-এর কলকাতা কংগ্রেসের পরে অনুশীলন ও যুগান্তর গোষ্ঠী আবার পৃথক হয়ে যায় —পরস্পর বিরোধিতায় মাতে। তাদের সে বিরোধিতা কংগ্রেসের মধ্যে সেনগুপ্ত বনাম সুভাষ দলাদলিতেও প্রতিফলিত হয়। আমার কাছে এই অন্তর্বিরোধ মনে হয়েছে আরও stupid। আগেই আমি দূরে চলে গিয়েছিলাম, এখন আরও দূর হয়ে থাকি। যাক্। চট্টগ্রামের ওই আঠারই এপ্রিলের ঘটনাটা সেই লবণ সত্যাগ্রহের দিনে অভাবিত ছিল। নোয়াখালিতে বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে জল্পনায়-কল্পনায় আমি ভাবছিলাম চট্টগ্রামে ওরকমের কিছু ঘটাবার মতো প্ল্যানিং-এর বুদ্ধি কাদের আছে। অনুতোষ সেনগুপ্ত গত কয় বৎসর অনেক সময়ে চট্টগ্রাম শহরে কাটিয়েছেন—সেখানে নাট্য-অভিনয়ে আসর জমাতেন। তাঁর আত্মীয়-বন্ধু সতীভূষণ সেনগুপ্তের সঙ্গে সেই অভিনয়ের দলে এসে-ছিলেন তখন অনন্ত সিং ও লোকনাথ বল। কেউ তাঁর সঙ্গে রাজনীতি চর্চা করতেন না, অনুতোষবাবু বুদ্ধিমান মানুষ—আঁচ করতে পারতেন। অনন্ত সিং-এর সাহসে ও কর্মশক্তিতে—খানিকটা সতীবাবুর মুখে শুনেই—অনুতোষবাবুরও ছিল বিপুল বিশ্বাস। কিন্তু অত গোপন ও নিপুণ আয়োজন তাদেরও সাধ্যায়ত্ত হতে পারে, তা আমার ইতিপূর্বে মনে হয় নি। ক্ষিতীশদা (নোয়াখালির ক্ষিতীশচন্দ্র রায়চৌধুরী। বিপ্লবী দাদা হয়েও কংগ্রেসেরই জিলা সেক্রেটারি) আমাকে গোপনে জানালেন—কিছু একটা ওরা করতে চায়, তা জানতাম। চট্টগ্রাম থেকে নোয়াখালিতে লোক এসেছিল কিছু দিন আগে—এখানকার যুবক বন্ধুদের কাছে। তাদের পরামর্শ—এসো, উদ্যোগী হই। ক্ষিতীশদার এখানকার যুবক বন্ধুরা তাতে কান দেয় কি করে—তাদের নেতাদের নির্দেশ ছাড়া ? স্থানীয় নেতা ক্ষিতীশদাও তাতে কান দেন নি—ওসব ছুটোছাটা সংগ্রামপদ্ধতি ছেড়ে তিনি নিজে কংগ্রেস চালিত জন-সংযোগ ও জন-আন্দোলনেই ব্যস্ত ছিলেন। তিনি এখন বুঝে ফেলেছিলেন—ব্যাপারটা কাদের

আয়োজন। আমার মতো তিনিও ভাবছেন—এ রকম বিচ্ছিন্ন একটা দুর্জয় সাহসে তো স্বাধীনতা আয়ত্ত হতে পারে না। দু'জনারই দুঃখ—প্রাণ দেবে 'তারা যাদের প্রাণ দেশের পক্ষে হারানো চলে না। মর্মের মধ্যে ওরূপ বেদনা ও অনুভূতি দু'জনেরই জাগছিল, 'এমন করে এমন ছেলেরা মরবে—।' আমার ছিল নিজেকে প্রশ্ন, .'তা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবে ?' আমার নাড়ীতে নাড়ীতে বেদনার কাঁপুনি জাগল : 'তোমার কামনা—সকল মতের সংগ্রামীদের হাত মেলানো, পা মেলানো, মন মেলানো—'সকল দল কি এদের বাদ দিয়ে ?'

মোটামুটি খবর দু-একদিনের মধ্যেই জানা গেল—চট্টগ্রামের দু-একজন লোকের নাম করে বাবা তাঁর বন্ধুদের বলেছিলেন sons and guns all missing. ওদিকে রাজশাহীতে রাজনৈতিক কনফারেন্সের সম্মিলিত কর্মীদের মধ্য থেকে ১৯-এ এপ্রিলের ভোর হতে না হতেই বিপ্লবী নেতাদের পুলিশ ধরে নিয়ে জেলে পুরল। যারা তখন ধরা পড়ে নি, তারা উন্মাদের মতো কিছু করার চেষ্টায় ছটফট করছে, 'কিছু করব'। এবং কিছু না করতেই ধৃত হ'ল। আবার অনিশ্চিত কালের জন্য তাদেরও কারাবাস ব্যবস্থা। নিঃসন্দেহ তৃতীয় দফা সশস্ত্র বিপ্লবী চেষ্টার পর্ব (১৯১৪-১৯১৭ ; ১৯২৪-২৫ অঙ্কুরেই প্রায় বিনষ্ট হয়, এবার ১৯৩০-৩৫) আরম্ভ হয়ে গেল।

একটা কথা—আইন-অমান্য ও জাতীয় সংগ্রামের আবহাওয়া ভুলে যেমন এই তৃতীয় অধ্যায়টা সত্যই বোধগম্য হয় না, তেমনি ১৯২৯-এর বিশ্বজোড়া বাজার মন্দা, (ভারতে তার প্রতিক্রিয়া), আর অন্য দিকে অক্টোবর বিপ্লবের পরে পঞ্চবার্ষিক সংকল্পের সোভিয়েত কর্মযজ্ঞ—এই আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিত ছাড়াও এ অধ্যায় ভাবা যায় না। অন্ততঃ আমরা কেউ কেউ ভাবতে পারি নি।

দুদিনের মধ্যেই ঘটল ফেণী স্টেশনে পলায়মান জন চারেক বিপ্লবীর সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ। আমি তখনো নোয়াখালি, কলেজও বন্ধ—ঠিক বুঝলাম না—কারা সেই পলায়নমুখী ক'জন ;—কিছু অনুমান না করেছিলাম তা নয়। গোয়েন্দা সাব-ইন্‌স্পেক্টর, বলেছিলেন তাঁর এক বন্ধুকে—নিজে তিনি তখন ফেণীতে 'ওৎ' পেতে বসে ছিলেন। কিন্তু জ্বরাক্রান্ত বলে ঠিক সেই রাত্রিতে চট্টগ্রাম-ত্যাগী ট্রেনটা তল্লাস করতে যেতে পারেন নি। যারা পালাল তাদের বয়স, চেহারা প্রভৃতির যথাসম্ভব সত্য বিবরণই তিনি পেয়েছিলেন পুলিশদের থেকে। তা আমাদের কানেও এসে হয় অনেক মুখ ঘুরে, কিছুটা বুঝলাম ব্যাপারটা। এসে গেল ক্রমে পাহাড়তলীর যুদ্ধের খবর, কালার পোলের সংঘর্ষের কথা। চমকের পরে চমক, ঘটনার পিঠে ঘটনা, সত্য ঘটনারও বিকৃত প্রতিধ্বনি,—গুজবের পিঠে গুজব। কলেজ খুললে লাকসাম জংশন

থেকে চট্টগ্রামের গাড়িতে ফেণী যেতে যেতে কথাবার্তা শুনছিলাম। সর্বত্র ওই একমাত্র কথা। মুসলমান ভদ্রলোক তাঁরা, সরকারী আপিসের কর্মচারী, আলোচনা করছেন। একজন বললেন একটু প্রশংসা মিশিয়ে—'এ্যাক্‌স্‌ট্রিম্ ফেট্রিয়ট'। উচ্চারণটা এখনো কানে বাজে, প্রশংসার সুরটাও। মুসলমান হলেও তাদের স্পর্শ করেছে এই ছেলেদের প্রাণদান। অবশ্য তারাই দেখেছি উৎসাহী বেশি যারা অমন দুঃসাহসিক কর্মকাণ্ডে নিজেরা দূরে থাকতে সতত যত্নপর।

একে একে এসে যেতে লাগল একটার পর একটা বিদ্যুন্ময় ঘটনা—পেশোয়ারের সৈনিক বিদ্রোহ, কোলাপুরের শ্রমিক সংগ্রাম, আর বাঙলায় ডালহৌসি স্কোয়ার, ঢাকা, মেদিনীপুর—কোন্ খানে নয়? বোঝা গেল চট্ট-গ্রামের সেই অভ্যুত্থান বাঙালির জাতীয় জীবনে ত্রিশের আরেকটা দুয়ার খুলে দিচ্ছে—বিশেষ করে বাঙলার স্বাধীনতা-সংগ্রামের মধ্যে। এল দুর্জয়তম সাহসের ও আত্মত্যাগের দিন। বিশেষ করে বাঙালি মেয়েরা এগিয়ে এল, আর যে দৃষ্টান্ত তাঁরা সৃষ্টি করলে কোনো দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে কি তার তুলনা বেশি আছে? কিন্তু সেসব কথা নিষ্প্রয়োজন। যারা ঘটনার নায়ক বা বিশিষ্ট পরিচালক তাঁরা এ পর্বের কথা যথাযথ গর্বে এবং গৌরবে ইদানীং লিখেছেন। আবেগাতিশয্য ও অতিরঞ্জন কিছু তাতে থাকতে পারে, অনুমান করতে পারি। কিন্তু এ অধ্যায় বলার প্রয়োজন সন্দেহাতীত। অনন্ত সিংহ তা সার্থকভাবেই করছেন; অন্যেরাও লিখেছেন। সবই লেখা হোক্, কী রাখবার কী ফেলবার সে বিচার ইতিহাস পরে করবে। পরে, ধীরে সুস্থে, সাময়িক আঁধি কেটে গেলে। সরকারী স্বাধীনতা-যুদ্ধের ইতিহাস এখন সেই আঁধিতেই আচ্ছন্ন। তাতে যা স্থান পায় তা যতটা কংগ্রেস-মার্কা শাসক-গোষ্ঠীর মিথ্যাচার ও আত্মকীর্তন, তার থেকেও বেশি এই বোমা-পিস্তলের অধ্যায়কে বুঝে-না-বুঝে মুছে ফেলার অভিসন্ধি। তাই যাঁরা বিদ্রোহের সে গোপন অধ্যায়ের নেতা ও প্রণেতা নিজেদের কাজকে ভাবে-ভাষায় যথাযথ লিপিবদ্ধ করে যাওয়া তাদের একটা দায়িত্ব। অবশ্য কখনো তা সম্পূর্ণ লিপিবদ্ধ হবে কিনা সন্দেহ। কারণ, তাদের নানা দল, তারা বহুকেন্দ্রিক, পরস্পর বিচ্ছিন্ন। তার ওপর, গুপ্ত কাজকর্ম চক্রে চক্রে চলে—যার যা কাজ তা সে ভিন্ন তার নিকটতম সহকর্মীও জানার কথা নয়। কাজেই কারো একার কথা নয়, সকলের কথা মিলিয়ে—যাচাই করে, বাছাই করে,—ইতিহাস এক সময়ে যা গ্রাহ্য তা লিখবে। আপাততঃ তা দুষ্কর। ডঃ তারাচাঁদ বা ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার যত বড় ঐতিহাসিক হোন তাঁদের কারও পক্ষে তা সুসাধ্য নয়। কেন? কারণটা বলেছিলেন আরেকজন

ইতিহাসের ইংরেজ-ভক্ত গবেষক—তারাচাঁদের ইতিহাস পড়েঃ 'আজীবন আগুনের 'আঁচ' থেকে শত হাত দূরে যে কাটায় সে ১৯৪৭-এর পরে হঠাৎ অগ্নিষ্টোমের পুরোহিত হতে চাইলে তার লেখা এরকমই হয়। উনুন খোঁচাক তারা যত পারে, বোঝা যায় কাঠে আগুন ধরে নি। যাঁরা স্পর্শ করেছে তাঁরাই এই আগুনের কথা বলবার অধিকারী।' অবশ্য তাঁদের অনেকের ত্রুটি—লেখার বিদ্যাটা জানা নেই, মন্ত্রটা জানে, কিন্তু উচ্চারণ করতে শেখে নি। অতিরঞ্জনে ও আবেগ-বাহুল্যে আগুনও চাপা পড়ে, দেখেছি। আরও বাধা আছে; দলাদলির মোহে সময়ে সময়ে ভিন্ন দলের বা অন্য কর্মীর নিন্দায় প্রায় কংগ্রেসম্যানদের জুরি হয়ে ওঠেন; ব্যাপারটা তখনই হয় সবচেয়ে কমিক এবং ক্লেশদায়ক। অধিকার যাঁদের আছে তাঁদেরও প্রয়োজন আত্ম-পরীক্ষা ও স্থির-সমীক্ষা। তাও তাঁদের দায়িত্ব; দায়িত্ব শুধু প্রচার নয়, যথাযথ প্রকাশ।

আমার সে অধিকার নেই—সে দায়িত্ব-গ্রহণের যোগ্যতাও নেই। এই অধ্যায় আমার যতটুকু জানা, তার চেয়ে অনেক-অনেক বেশি অজানা। তবে মন দিয়ে বুদ্ধি দিয়ে এবং প্রীতি মমতা দিয়ে বোঝা হয়তো সেই অজ্ঞতার অপেক্ষা বেশি। অন্ততঃ সে চেষ্টা ছিল। মরণ-পথিকদের বুঝতে চেয়েছি, ভালোবেসেছি, তাদের পথ ও পরিস্থিতি যুক্তি দিয়ে বিচার করেছি, কিন্তু তাতে মরণ-কাণ্ড সম্বন্ধে লেখার অধিকার জন্মে কিনা সন্দেহ। সেই কথাটা নিজের মতো করে যা বুঝেছি তার এক-আধটুকু আভাস এখানে-ওখানে বলে ফেলেছি, কতকটা সুহৃদদের অনুরোধে, কতকটা নিজের শক্তিটা পরখ করবার জন্য—ধারণাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে সমগ্রভাবে দেখবার চেষ্টায়। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশিত বিপিনচন্দ্র পালের শতবার্ষিকী স্মারণিক গ্রন্থের ('রিনাইসেন্স ইন্ বেঙ্গল' অতুলচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় ছিলেন তার প্রধান সম্পাদক) একটা অধ্যায়ে 'রিভোল্যুশনারি টেররিজম্ ইন্ বেঙ্গল'-এ আমি যথাসম্ভব ও-পর্বের একটা আর্গুমেন্ট (চুম্বক) লিখতে চেষ্টা করেছিলাম। সংক্ষিপ্ত লেখা। কর্মকাণ্ডের অপেক্ষা জ্ঞানকাণ্ডের বিবর্তনেই ছিল আমার দৃষ্টি। অনেকেরই বোধ হয় সে লেখা চোখে পড়ে নি; তাই অনেক কশাঘাত থেকে বেঁচে গিয়েছি। দণ্ড না পেয়ে ঝোঁকটা রয়ে গিয়েছে। নিশ্চয়ই বৃক্ষের সমারোহেই বন, বৃক্ষের বৈশিষ্ট্য না দেখলে নয়। কিন্তু বনের তাৎপর্য বোঝার পক্ষে বনের সমগ্র রূপটা খোঁজাও দরকার। চাই আদিতে সমগ্রভাবে তার রূপটা ভাবা, অন্তেও সমগ্র করে তার রূপটা দেখা। এ ঝোঁকটা আমাকে আদিতে পেয়েছিল, অন্ততেও ছাড়ে নি। স্রোতের মধ্যখানটায় যে ঘটনার আবর্ত তারই নাম ফ্যাক্ট্স্। সে আবর্তের শত টুকরায় বিখণ্ডিত রূপ যাদের প্রত্যক্ষে জানা তাদের মধ্যে আমি

গণ্য নই। মজা এই, সেই আবর্তই তবু আমাকে অনেকের মত টেনে নিয়ে গিয়েছে ঘাটে ও আঘাটায়। অবশ্য নিয়েছে তবু সব কিছু সুদ্ধ 'অজস্র তরঙ্গ তাড়িত জনসমুদ্রের দিকে'। না হলে, সে ঘটনাবর্তের কতটুকু জানি আমি? প্রায় কিছু না।

তাই এখানে পরিষ্কার করে বলা দরকার: সমস্ত স্বাধীনতার প্রয়াসকে বুঝতে চেষ্টা করেছি, বুঝতে গিয়ে জানতে হয়েছে যতটা পারি, জানার সঙ্গে বুঝতে চেয়েছি তথাকথিত 'টেররিস্টদের' অহিংস বিদ্রোহ-খণ্ড। আর, জানতে জানতে ভালো-মন্দ সুদ্ধ তার সম্বন্ধে দুঃখ পেয়েছি, হতাশ হয়েছি, বুঝেছি তাদের দৃষ্টির সীমাবদ্ধতা, তবু মমত্ব বোধ করেছি। কারণ, সবসুদ্ধ চেয়েছিলাম তাদের সঙ্গে মিলেমিশে তাদেরও জন-সমুদ্রের মহত্তর আহ্বানের দিকে এগিয়ে দিতে, শক্তি বিক্ষিপ্ত না করে বিবর্তিত করতে জন-আন্দোলনের বৃহত্তর মিলিত প্রয়াসে। সে প্রয়াস দেখা গেছল পেশোয়ারের নীরব বিদ্রোহে গাঢ়োয়ালী সেনাদের, কিম্বা শোলাপুরের শ্রমিকদের। দুশ্চেষ্টা; তবু আশা ছিল দুর্মর। থাক ওসব কথা। মোট কথা এই: আমি নেতা নই, মধ্যম-নেতাও নই, সংগঠক নই, কর্মী নই; দুঃসাহসী থাক সাহসীও নই, কোনো কর্মকাণ্ডে বা কাজে অংশীদার নই। আমার কাছে ঘটনার বিবরণ দাবী করা বৃথা, তবে এই বাঙালি বিপ্লবীদের ভালোবাসা পেয়েছি এবং ভালোবাসা দিয়েছিও তাদের। বিশেষ বা অবিশেষ তাঁদের আর তাঁদের বিষয়ে আমার কথা বোঝাতে চেয়েছি 'একদার' উৎসর্গে: 'প্রাণের উন্মাদনা যাহাদের কর্মের উন্মত্ততায় নিঃশেষ হইয়াছে—পৃথিবীর ক্ষুদ্রতা যাহাদের জীবনকে নিষ্প্রভ করে নাই'। কিন্তু আমি নির্লিপ্ত নই; আমি 'সহকর্মী'ও নই, সহমর্মী মাত্র।' অতঃপর এ প্রসঙ্গে যতি টানলেও কোনো ক্ষতি হবে না।

তবে পথ, ব্যক্তির স্থানস্থিতির কিছুটা হদিস্ না দিলে নয়, পরিস্থিতি তারই সঙ্গে যুক্ত থাকে। সে-বার জুলাই মাসে ফেণী ছেড়ে চলে এসেছিলাম কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণার্থী হিসাবে মাসে পঁচাত্তর টাকা বৃত্তি নিয়ে। তারপরে আর ফেণীতে ফেরা ও কলেজের কাজ করা সম্ভব হয় নি। কিন্তু আরও সম্ভব হয় নি ওই গবেষণার কাজটা সত্যসত্যই করা। যাদের ভালোবাসি তাদের সঙ্গ আমায় পেয়ে বসেছিল। অবশ্য আরেকটা কথাও বলা দরকার—বাবা নোয়াখালিতে হৃদরোগে আক্রান্ত হলেন, সকলের পরামর্শ মতো কলকাতায় বাড়ি ভাড়া করে নোয়াখালির পাট তুলে দিয়ে বাবা-মাকে কলকাতা নিয়ে আসতে হ'ল। প্রথম বছরখানেক বন্ধুবর শ্রীযুক্ত নীরদচন্দ্র চৌধুরীদের মানিকতলার বাড়িতে

একটা অংশ ভাড়া নিয়ে আমরা ছিলাম। দেহমনে অপরিসীম সহায়ক হয়েছিল সে সময় চৌধুরী ভ্রাতাদের সঙ্গ, সেই বিদ্বান বুদ্ধিমান মানুষদের সৌজন্য ও সৌহার্দ্য। বছর খানেক ও-বাড়িতে থেকে উঠে আসি শ্যামবাজারের পিছনে ভবনাথ সেন স্ট্রীটের একটি তেতলা বাড়িতে। সেখানে আমাদেরই সঙ্গে থেকে নিচের একটি ঘর ভাড়া নিয়ে স্বতন্ত্র থাকতে এসেছিলেন নীরদবাবু। সে ঘরে তাঁর আকর্ষণে যাঁরা আসতেন তাঁদের মধ্যে অন্ততঃ দু'জনার নাম অবিস্মরণীয়। অধ্যাপক ক্রিস্টোফার এ্যাক্রোয়েড্ ও তাঁর তৎকালীন ছাত্র কবি বিষ্ণু দে। নীরদবাবুর আওতায় সে ঘরে দেশী-বিদেশী সঙ্গীত, সাহিত্য ও শিল্পানুশীলনের আসর বসত সপ্তাহে তিন-চার দিন। তার দশ ভাগের একভাগ অন্ততঃ আমার কানেও পৌঁছত, মন স্পর্শ করত; আর শতভাগের একভাগও আমার মন সঞ্চয় করতে পারত না—তুচ্ছ আমার ভাষাতত্ত্বের কাজের মতো। আসলে দেশ ও কালের ঘূর্ণাবর্তে শিল্পসংস্কৃতির কোনো ঘাটেই তখন লেগে থাকায় উপায় ছিল না, অথচ সেসব কোনো ঘাট না ছুঁয়ে যাবার সাধ্যও আমার ছিল না। বিশ্ব-রাজনীতির ও জাতীয় রাজনীতির তরঙ্গ-তাড়নায় জীবনস্রোত ঘাট, কূল-কিনারা মুছে দিয়ে ভাসিয়ে নিয়ে যায় কূলে-অকূলে।

মাঝে মাঝে এক-একটা দিন এক-একটা গোপন ঘাঁটিতে এসে বসতাম—কংগ্রেসের বাংলা-ইংরেজি বুলেটিন তৈরী করার স্থান। সত্যাগ্রহের বিশেষ কেন্দ্র থেকে কর্মীরা গোপন খবর পাঠাত। সংবাদপত্র তা প্রকাশ করতে পারে না—গোপনে সাইক্লোস্টাইল করে তা প্রচার করতে হয়, পাঠাতে হয় জেলায় জেলায়। এ রকম একটা গোপন সংবাদ-সম্পাদনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন একজন খ্যাতনামা অধ্যাপক—শান্ত-বুদ্ধি সজ্জন ও সৎমানুষ,—নাম না-ই বা করলাম, অনুমতি যখন নিই নি। তাঁর সহকর্মী হয়েছিলাম আমি, সহ-সম্পাদনা করতাম। বাইরের চিঠি-পত্রগুলি যেমন অপটু লেখা, তেমনি তা পাঠ ছিল বেদনাদায়ক। মাঝে মাঝে গ্লানিজনক। বিবরণ যদি সত্য হয়—তা হলে মানতে হবে, আমাদের দেশের পুলিশের একটা বিকৃত উল্লাস ছিল আইন-অমান্য দমনের নামে দেশের মেয়েদের প্রতি উৎকট অত্যাচারে। মনে হ'ত তা সম্পাদনার থেকে কলম ছেড়ে ছুরি নেওয়াই সমুচিত। অহিংস সৈনিকের কাজ হ'ত না, কিন্তু মনুষ্যোচিত হ'ত। একদিন এক যুব-কর্মী বলেই ফেলল, 'এসব অমানুষগুলিকে (পুলিশ) তো সহজেই শায়েস্তা করা যায়; দু-একটাকে গুলি করলেই সব ব্যাটারা ঠাণ্ডা হয়।' উত্তর দিলাম, কিন্তু তাতে নতুন চৌরিচৌরা ও নতুন বর্দোলিও ঘটতে পারে।—অবশ্য গান্ধীজী কারারুদ্ধ হবার পর এই উত্তর খাটত না। আমার তো মনে হ'ত—সত্য হোক মিথ্যা হোক, ওসব অঞ্চলে হয়

মেয়েদের সত্যাগ্রহ সংগ্রামে পাঠানো অনুচিত, নয় তাদের মর্যাদা রক্ষার জন্য বল প্রয়োগ না করাও কাপুরুষোচিত। যাই হোক, কোনো কোনো চিঠির ওরূপ বীভৎসতাই দেখতাম পুঁজি, সেসব চিঠিতে বিশ্বাসও কম হ'ত, আর তা আরও অসহ্য হ'ত। সাধারণ সংবাদে অতিরঞ্জন থাকত প্রায়ই, তা সইত ; কিন্তু সইত না লোককে উদ্দীপ্ত করার জন্য সত্য-মিথ্যা নারী-ধর্ষণের বিবরণের আধিক্য। সংবাদদাতারা বোধহয় ভাবত—এ দেশের মানুষকে তাতে সহজে তাতানো যায়। তা যায়, কিন্তু প্রথম দিকে ; পরে ক্রমেই এই পশুবৃত্তিও মানুষের গা সওয়া হয়ে যায়—মন মেনে নেয় 'ও রকম তো হয়ই।' যাক্, আমার বেশি দিন কাজ করতে হয় নি। নানা কারণে সংবাদ বেশি আসত না, আর সাইক্লোস্টাইল করা ছাপা কাগজেও মানুষের আগ্রহ কমে যায়,—সত্যাগ্রহও আসে কমে। যা হোক, এ ধরনের জন-আন্দোলনের 'সেবা' আমাকে তৃপ্তি দেয় নি। এ ঘাটে তাই আটকে থাকি নি। ভেবে পাই না, কংগ্রেসের তো তখন সুযোগ-সহায় কম ছিল না। ওরকম সাইক্লোস্টাইলে ভরসা না রেখে গুপ্ত ছাপাখানায় মুদ্রণে তাদের কী অসুবিধা ছিল ? হয়তো এক সময়ে সে ছাপাখানা ধরা পড়ে যেত। কিম্বা, সাইক্লোস্টাইল পদ্ধতি বহুকেন্দ্রিক পদ্ধতি অর্থাৎ গান্ধীবাদের বিকেন্দ্রীকরণের সঙ্গে বেশি সঙ্গতিযুক্ত। যা হোক, আমি দেখেছি ছাপাখানায় প্রচারপত্রাদি মুদ্রণ ও বিতরণে সুবিধা তখনো কিছু ছিল।

নাম-হারাদের দান

বড় ছাপাখানার কথা বলতে পারি না—সেখানেই ধরা পড়ার সম্ভাবনা বেশি। কিন্তু ছোট ছাপাখানায় সে বিপদ কম ; তার মালিকদের ও কর্মীদের দেখেছি সাহসও বেশি। না বললে নয়,—একবার একটা শহীদের ছবির বই সম্পর্কে পুলিশ 'প্রবাসী প্রেস' নাকি তন্ন তন্ন করে খানাতল্লাসী করে। তখন আমি জানতাম না, কর্তৃপক্ষ আমাকে পরেও কিছু বলেন নি,—কিন্তু শুনেছিলাম পুলিশের সন্দেহ হয়েছিল আমি ও-বইটির মুদ্রণে জড়িত, আর আমি 'প্রবাসী' প্রেসেই তার মুদ্রণ নির্বাহ করেছি। বুদ্ধি বটে ! অত বড় প্রেস, যেখানে আমার তো নিশ্চয়ই, আরও কত লোকের নিত্য যাতায়াত ;—আমি যদি তা মুদ্রণ করিয়েও থাকি তা হলে ও-প্রেসে যাব তা মুদ্রণ করতে ? কিন্তু মনে একটা সংকোচ এসেছিল—'প্রবাসীর' কর্তৃপক্ষ কি আমার সে আপিসে যাতায়াতে বিরক্ত বোধ করবেন না ? তাঁদের ব্যবহারে সঙ্কোচটা আশঙ্কায় পরিণত হতে পারে নি—পরে তার প্রশ্নও ওঠে নি।—আড্ডার ও গোষ্ঠীসুখের জন্য 'শনিবারের চিঠি'র মতই 'প্রবাসী' আমার ঘাঁটি ছিল বরাবর।

এ প্রসঙ্গে সামান্য আরেকটি কথা বলব। ছোট একটি প্রেসের মালিক ছিলেন এক ভদ্রলোক। তিনি ও তাঁর ভাইরা তিনজনে মিলে কম্পোজ করেন, একটি ট্রেডল মেশিন নিয়ে প্রেস চালান। পূর্ববঙ্গের মানুষ, স্বল্পভাষী সৎ লোক। অনেক অনেক বে-আইনী মুদ্রণ করে দু' বছর পরে একদিন তিনি তাঁর স্বদেশী কর্মীকে বললেন, 'আর আমাকে কাজ দেবেন না, আমি প্রেস ছেড়ে দেশে যাচ্ছি।' 'কেন ?' জানালেন, 'ভাইরা ভয় পাচ্ছে। আমার সঙ্গে ওদের এ নিয়ে মতানৈক্য। মনোমালিন্য চাই না। আমি ওদের হাতেই প্রেস দিয়ে তাই বিদায় নিচ্ছি—দেশে যা হয় কিছু করব। না, আপনাদের ভয় নেই। আমার ভাইরা কেউ আপনাদের সঙ্গে বিশ্বাসভঙ্গ করবে না। তবে অন্যত্র ছাপার কাজ করাতে আপনাদেরও সাবধান হতে হবে।'—সে প্রেস, সে ভদ্রলোকের নাম-ঠিকানা,—সব কোথায় মুছে গিয়েছে, সেই স্বদেশী কর্মীও নিজে এখন নেই। কিছু [illegible] আগে ভাবছিলাম—অনেক অনেক লোকের ত্যাগ ও নির্যাতনের কথা যখন বড় গলায় বলাই নিয়ম হয়ে গিয়েছে তখন ওই সৎ লোকটির কথা কারুর মনে পড়ে কি ? সাধারণ মানুষের অসাধারণতার এই এক দৃষ্টান্ত। এই রকম কত দৃষ্টান্তই না আছে। বড় বড় যুদ্ধেও তো এরূপই ঘটে—সেনাপতিরই নাম থাকে, কিন্তু যে সাধারণ মানুষের অসাধারণতায় যুদ্ধ চলে তাদের নাম কে জানে ? খবর রটে বটে 'জোর মরেছে দশটা হাজার সৈনিকে'। তারপর তাও সবাই বিস্মৃত হয়। অথবা যুদ্ধ কেন, জন-আন্দোলন মানেই তো তা। আর জন-আন্দোলনই বা কেন, সমাজ-সভ্যতা সবেরই তো জোয়াল-টানা ওসব সাধারণ মানুষের স্বীকৃতিহীন দৈনন্দিন আত্মদানের মধ্য দিয়ে চলে, এবং মোটামুটি তাতে সমাজ এগিয়ে চলে। সেই little man-ই ইতিহাস, অর্থাৎ ইতিহাস এই martyrdom of little man. Martyrdom of Man-ও এই অর্থে সত্য। তারই ওপর শাসক ভাবুক প্রভৃতির কীর্তি রচিত। সংসারে সর্বসময়ে এরূপই ঘটছে। তবে বড় বড় পতন-অভ্যুদয়ের লগ্নে এই প্রচ্ছন্ন অসাধারণত্ব প্রকাশিত হয় ক্ষুদে বড় মেজ সেজ সকলেরই মধ্য দিয়ে কিছু না কিছু করে। কিন্তু সকলের সর্বক্ষণের সম্পদ তা নয়। স্বাধীন ভারতে কি আমরা দেখি না সেই বড়দের বড়ত্ব ছিল কত ঠুনকো, কত ক্ষণিক ? তাই বলে, স্বাধীনতার অভিযানের বৎসর [illegible] ও তাদের সকলের সবটা ভুয়ো ছিল, তা নয়। তবে আমি সামান্যদের সময়েই সা[illegible] সে সময়ে বুঝেছি—তাদের অসাধারণত্ব মিথ্যা নয়। বড়দের সাক্ষাৎ [illegible]নাথকে [illegible] কতটা দেখি ? সাক্ষাৎ সূত্রে তাদের তখন দেখবার অবকাশ বিশেষ হয় নি [illegible] নিশ্চয়ই, কেউ কেউ তাঁরা অসাধারণ, অনেকেই বিশেষ তা নয়। সাক্ষাৎ সূত্রে আমি বড়জোর মেজো-সেজোদের কিছু দেখেছি—ধিকি ধিকি

আগুন তাদের মধ্যে জ্বলত। অনেকটা আবার তা ফুঁ দিয়ে জ্বালানো। সেই ফুঁ ফুরিয়ে গেছে, এখন অনেকেই ছাইয়ের গাদা, অনেকে পোড়াকাঠ।

চক্রব্যূহ ও পাপচক্র

তখন ছোটদের দেখেছি বেশি—বয়সেই তারা ছোট, কাজে নয়। কিন্তু বয়সের গুণে আর মন্ত্রের গুণে 'ভাব্‌তে তাদের মানা'। যে কর্মপদ্ধতিতে জড়িয়ে পড়েছে তাতে দেশের মুক্তি, দাদাদের এই কথাই যুক্তি। কিন্তু দাদাদেরও ভাবনা ও যুক্তিতে যে বেশি ঝোঁক ছিল তা মনে হয় না। নিজ নিজ চেতনা ও রুচি মত এক-এক জনের এক একটা প্রকরণে ঝোঁক দেখা যেত। আমার ধারণা,—তাদের লাইন ধরে এগুলে 'অল্পের আত্মদানে সকলের মুক্তি' এ যুক্তিই বেশি শোনা যেত। লাইনটা আসলে জ্যামিতির লাইনের মতো অবাস্তব,—যার দৈর্ঘ্য আছে ব্যাস নেই। একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করলে, দশটা তেমনি দৃষ্টান্ত তাতেই সৃষ্টি হবে,—চট্টগ্রামের বিপ্লবীদের এযুক্তি যতটা সম্ভব তাঁরা রূপ দিয়েছেন। কিন্তু সমস্ত ভারতবর্ষের, স্বাধীনতার সমস্যার জটিলতা ও বিপুলতার কথা ভাবলে তার তাৎপর্য কী দাঁড়ায়? ঢাকায় মেদিনীপুরে দুর্জয় কর্মীদের ধারণা—এক-এক করে জেলার ইংরেজ কর্তাদের বিনাশে ইংরেজের শাসক-মনোবল বিনষ্ট হতে বাধ্য। এরূপ প্রকরণেও সীমিত সার্থকতা আয়ত্ত হতে পারে। কিন্তু সেই একই প্রশ্ন: সমস্যার তুলনায় এ সাফল্য সত্যিই কতটুকু? অবশ্য, কেউ কেউ দীর্ঘ কালের সংগঠন ও আয়োজনের কথাও ভাবতেন, কিন্তু কার্যতঃ তাতে অটল থাকতে পারেন নি। সেরূপ কর্মে উদ্দীপনা কোথায়? অনেকে বুঝতেন না—কী করা যায়; দল ও দলাদলির সেই চক্রান্তব্যূহে জড়িয়ে থাকতেন। 'ভাঁওতা' বলে চিহ্নিত করে খুব স্বাভাবিক ভাবেই এ দাদাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তাদের মেজো ভাইরা ও ছোট ভাইরা। তারা ছিল অধীরতায় কর্মচঞ্চল,—এবং আসলে অনভিজ্ঞতার জন্য জটিল সমস্যার স্বরূপ বুঝতে দাদাদের থেকেও বেশি অক্ষম। তাই মেছুয়াবাজারের ষড়যন্ত্র মামলায় অধিবাস-বোধনের পূর্বে, দ্বিতীয়াতেই, প্রতিমার বিসর্জন হয়ে যায়। অথচ, কী অসামান্য ছিল উপকরণ! অপূর্ব। অন্যান্যদের পক্ষেও অল্পাধিক এই বিশেষণ খাটত। 'আবাদ করলে ফলত সোনা'। এই ধারণাটা তখনো মনে হ'ত সত্য, বরং মনে হয়েছে সত্য—আংশিক সত্য অবশ্য। তবে এদের তুলনায় অন্ততঃ পারে হয়তো বড়রা বা কংগ্রেস কর্মকর্তারা অনেকে ছিলেন না। তাই তো চাইতুলাম সত্যকারের 'আবাদের' সাধনায় যুবকরা যুক্ত হোক। আর বুঝছিলাম—সে

পথে অনেক বাধা। একটা বিশেষ রকমের কর্মচক্রে অনুশীলন-যুগান্তর এই দুই দলের কর্মীর ও নানা দলের কিশোর যুবকরা জড়িয়ে যায় ১৯০৫-০৭-এর পর থেকে। যারা তার বাইরে অহিংসা আন্দোলন করে তারাও জানে না—কঃ পন্থা? সাহসের মর্যাদার ও সার্থতার কর্মকাণ্ড কোন্‌টা? রোমান্টিকতা থেকে জন্মায় কি Revolutionary Romanticism? সত্যই সমস্ত সমস্যাটা এতই জটিল যে, ভাবলে মনে হয়—বুঝি পথ নেই। দীর্ঘ ও দুস্তর পথ মনকে অবসন্ন করে দেওয়ার কথা। কিন্তু রোমান্টিক অধীরতায় ও আদর্শবাদী আত্মদানে তো দীর্ঘ পথ খাটো হয় না; চোরাগলিতে শুধু পথ হারাতে হয়।

তখনো মনে হ'ত রবীন্দ্রনাথ ছাড়া কেউ বুঝি এ দেশের সমস্যাটা সমগ্র ভাবে ভেবে দেখেন নি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে হ'ত—কবিও ভেবেই দেখেছেন, করে দেখতে পারেন নি—দু'পা এগুতে গিয়ে দেখেছেন আর এগুনো যাচ্ছে না। আরও বেশি এগুতে গেলে হয়তো দেখতেন কাজের মধ্য দিয়ে আরও কত অভাবিত জটিলতায় তাঁকেও জড়িয়ে পড়তে হ'ত। দেশের ওপর শাসক-গোষ্ঠী যে সক্রিয় ভাবেই আছে সে সত্যটা তিনি লঘু করে দেখে ভাবতে চেয়েছেন—শাসকদের সঙ্গে সরাসরি সংঘর্ষে না গিয়ে নিজের রচনাশক্তি দিয়ে পল্লীর কেন্দ্রে কেন্দ্রে সত্যই 'স্বদেশী সমাজ' গড়ে তোলা যায়। কিন্তু বিদেশী শাসকরা কি তা বেশিক্ষণ নিষ্ক্রিয় ভাবে বসে বসে দেখবে?—দেখবে তাদের জেলা-জোড়া শোষণ-যন্ত্রের মালিক ম্যাজিস্ট্রেট্ কলেক্টর যারা জানে তারাই দেশের মানুষের মা-বাপ? দেখবে তাদের পল্লী-জোড়া শাসন-যন্ত্রের দুরন্ত ও অতিসচেতন হুকুমদার দারোগা-পুলিশ-চৌকিদার? তা হয় না। এই শাসন-শোষণের দেশী-বিদেশী ভাগীদাররা কি অতই নির্বোধ না নিঃস্বার্থ? গাছে ফুল আসবে, ফল আসবে, তা পাকবে, পাকা ফলটি এসে পল্লী-সমাজের হাতে পড়বে আর তা বসে বসে দেখবে শাসকরা? 'গোরা'র স্রষ্টা জানতেন চরঘোষপুর কেন, দেশের সর্বত্র প্রত্যেক পাপের ওপরই গড়ে ওঠে কতকগুলি স্বার্থ। সব পাপ শুধু বিদেশী শাসন সমুদ্ভূত নয়। দেশীয় সমাজ-শোষণ-পালিত পাপও সেই সঙ্গে আছে। বর্তমান সমাজটা খাদ্য-খাদকের সম্পর্ক দিয়ে টানা-পোড়েনে বোনা। সম্পূর্ণ সুষমাসম্পন্ন পল্লী-সমাজ কোনো দেশে কোনো কালে ছিল কিনা কে জানে। অন্ততঃ দু'শ বৎসর ধরে এ দেশে জমিদার, জোতদার-মহাজন ও তাদের নায়েব গোমস্তা সব সময়েই সাধারণের শোণিতে red in truth a claw, কাজ করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথকেও তা মানতে হয়েছে। তবে পথ কী? তবু মূল পথটা তিনি বুঝেছিলেন—মানুষকে নিজের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন করা, রচনায় উদ্যোগী করা; সমগ্রভাবে তিনিই ভারতবর্ষের সমস্যাটা বুঝেছিলেন। আর, এ দেশের

জটিলতম সমস্যাটার তিনিই দেখিয়েছিলেন সমাধানের পথ, অর্থাৎ হিন্দু-মুসলমান বিভেদের মূল সমাধান কোথায়। অত বড় করে সামগ্রিক ভাবে গান্ধীজীও ওই সমস্যাটা বুঝতে চান নি। বড় করে নয়, কাজের দিক থেকে যতটা তা না বুঝলে নয়, গান্ধীজী তার ততটাই বুঝতে চেয়েছেন। তবে 'একবছরের স্বরাজের' কল্পনার পরে বুঝেছিলেন পাথেয় সঞ্চয় করতে হয়; পথযাত্রা নির্বাহ করতে চাই প্রস্তুতি। 'কাজের মানুষ' তিনি, ক্রমেই দেখেছিলেন কার্যক্ষেত্রে নতুন নতুন জটিলতা তাঁর পথে উদ্ভূত হয়, পথই হয় ক্রমাগত রুদ্ধ। চক্রব্যূহের সমস্যা? তবে ওই—'তা বলে ভাবনা করা চলবে না।'

বাঙালি বিপ্লবীদের মধ্যে বোধ হয় সমগ্রভাবে স্বাধীনতার সমস্যা ভেবেছিলেন প্রথম যুদ্ধের সময়কার দু' একজন—একজনকেই আমরা জানি—যাঁরা বৈদেশিক সহায়-সম্পর্কের সন্ধানও করেছিলেন, আবার সেই সঙ্গে দেশেও ভেবেছিলেন 'চতুরঙ্গ' শক্তি সংগঠনের কথা—ছাত্র ও যুবা, সৈনিক, কৃষক ও শ্রমিকের সম্মিলিত আয়োজন। প্রস্তুতিপর্বে গ্রামে গ্রামে সেরূপ শক্তির মিলিত গেরিলা নিউক্লিয়াস গড়া, তারপর আন্তর্জাতিক বা আভ্যন্তরীণ সংকট সময়ে সম্মিলিত বিপ্লবে নামা। এও দীর্ঘ পথ—দীর্ঘ সময়ও চাই, কাজ ধৈর্য সাপেক্ষ, আর দুস্তর সংগঠন-সাধ্য। শাসক শক্তি সেরূপ সুযোগ দেবে কেন? তাই এ ভাবনা তাঁর নিজের সহযাত্রীদের মধ্যেও ঠাঁই পায় নি। কার্যক্ষেত্রে ভদ্রশ্রেণীর মুষ্টিমেয় যুবকদের ভিন্ন আর বিশেষ কোন শক্তির সঙ্গে সম্পর্ক তারা স্থাপন করতে পারে নি, —দেশের 'শতকরা নব্বুই জন' সম্বন্ধে বরং তাদের অনাস্থাই ছিল। কংগ্রেসেরও যেটুকু জন-আন্দোলনের দিক তা থেকেও তারা ছিল প্রায়ই বিচ্ছিন্ন। তাই কার্যতঃ বারে বারে ঘুরে ফিরে সেই সাহেব খুন, গোয়েন্দা খুন, বোমা-পিস্তল যোগাড়ের চেষ্টা, তার জন্য টাকার সন্ধানে ডাকাতি, তার জেরে মামলা, মামলার খরচ যোগাতে ফের ডাকাতি—এই 'পাপচক্রে'র মধ্যে অনুশীলন ও যুগান্তরের দলগুলি বারে বারে বারো আনা শক্তি খুইয়েছে। যে কাজ করবার ইচ্ছা তা ভেস্তে দিয়েছে, তখন ভাবনার থেকে ভাঁওতায় তারা আত্মছলনা করেছে। 'ভাঁওতা' বললে হবে কি? সত্যই ভাবলে পথ দেখা যেত না—যে পথ দেখা দিত রবীন্দ্রনাথের গান্ধীজীর যাদুগোপালের দৃষ্টিতে কোনোটাকেই মনে হ'ত না কার্যকর (practical)। আসলে গভীরতর সংকল্প ও সীমাহীন ধৈর্য ভিন্ন শুধু মৃত্যুপণেও বিপ্লব সংগঠিত হয় না। 'তা বলে ভাবনা করা চলবে না'—সকলেরই আবার আশ্রয় হ'ত ওই অনুভূতি।

বাদ-বিবাদ

অহিংস সত্যাগ্রহ ও সহিংস সংগ্রাম ব্যতীত তৃতীয় একটা ভাবনাও কিশোর ও যুবকদের মধ্যে আসছিল—কিন্তু তখনো তা রূপ ধরতে পারে নি। সে ভাবনার উদ্ভব ১৯১৭-এর অক্টোবর বিপ্লবে। বলা যায়—পৃথিবীর সকল রকম শোষণের অবসান চাই; তত্ত্বটা পরাধীন জাতির ও শোষিত শ্রেণীর সম্বন্ধে সমান প্রযোজ্য। ইতিহাসকে সমগ্রভাবে দেখে একশ বছর পূর্বে পাওয়া গিয়েছিল এই ধ্যান-দৃষ্টি, ১৯১৭-এর অক্টোবর বিপ্লবে অনেকটা মিলেছে তার থেকে ধ্যানরূপ। তবু তার রূপ এদেশে না এসেছে ধ্যানে—না এসেছে মনে; হাওয়ায় ভেসে বছর দশ ধরে কিছু আসছিল কারও কারও কানে। কিন্তু যাদের কানে পৌঁছুবার তাদের কানে পৌঁছয় নি। শুধু চট্টগ্রাম নয়, প্রায় সর্বত্রই এ দেশের বিপ্লববাদীদের কান পাতা ছিল আইরিশ বোমা-পিস্তলের ধ্বনির দিকে। ভাবত—এদেশের প্রোলিটারিয়েট,—কোথায় তারা? কোথায় বা তাদের সহযোগী কৃষক? শুধু ফিউডালিজম ইম্পারিয়ালিজম্-এর শোষিত দেশ বললেও তো সব বলা হয় না; অনেক-অনেক রকমের বৈশিষ্ট্য যে এই দু হাজার বছরের ভূতে পাওয়া দেশের ওপরে চেপে বসে আছে, কয়েক হাজার রকমের ধর্মকর্মের পেত্নীরাও আছে সেই সঙ্গে। শ্রমিক-কিষাণরা এদেশে আছে, কিন্তু হিন্দু-মুসলমান আছে, ছোট বড় উঁচু-নিচু শতশত জাতও আছে। তাদের বোঝাতে হবে, তারা জাত নয়, তারা বঞ্চিত শ্রেণী। সেজন্য এদের প্রাথমিক কয়েকটা পর্বের অভিজ্ঞতা তাড়াতাড়ি পেরিয়ে না গেলে নয়। তাদের সেই আত্মপরিচয় লাভও পাশ্চাত্ত্য দেশের ছকে-ধরা কোনো নিয়মে হবে না। ছক বাস্তবে পুরোপুরি কোথাও খাটে না। ছকের নিয়মে প্রথমে ব্রিটেনে শ্রমিক-বিপ্লব এল না, এসে গেছে বরং রুশিয়ায়। এদেশে সেই পথের একটা ধাপ—জাতীয় জন-আন্দোলনের এই প্রাথমিক পর্ব। এই আন্দোলনে হাত মিলিয়ে, পা মিলিয়ে, অহিংস সহিংস কর্মী ও বিপ্লবীরা সকলে মিলে এগিয়ে আনতে পারে আপাততঃ জাতীয় স্বাধীনতা, আর তারই স্রোতে, তার মধ্য থেকে, ফুটে উঠতে পারে শ্রমিক কৃষক বিপ্লব।

'শ্রমিক বিপ্লব' একটা বুলি হয়েছিল কারো কারো ভাবনায়। তবে বুলি না বলে বাষ্পাচ্ছন্ন ভাবনা বা আলেয়াও বলতে পারি। শুনেছি, তখনকার কোনো কোনো ছোট ছোট বিপ্লবী গোষ্ঠীতে এরূপ ভাবনা দেখা দেয়। কমিউনিস্ট ভাবাপন্ন বলে তাদের নাম হয়। মধ্য কলকাতায় জাহাজী খালাসীদের যোগা-যোগে বোমা-পিস্তল সংগ্রহ করায় তাদের নাকি বেশ দক্ষতা ছিল। তেমনি দক্ষতা ছিল ও-নাম করে অর্থ-সংগ্রহের। আসলে বোমা-পিস্তল-ডাকাতি এই

[illegible] এই বিপ্লবীরাও প্রায় সকলে পাক খেত। কিন্তু কেন? ও দুটা অস্ত্র কার্যতঃও নির্ভরযোগ্য নয়; তবু কেন তাদের অভীষ্ট 'সন্ত্রাস' বা 'অভ্যুত্থানের' পক্ষে ওসব অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল? মধ্য কলকাতার এদের মতোই ছুটোছুঁটা অন্য কমিউনিস্টরা ওসব নিয়ে কারবার না ফাঁদত তা নয়। সম্ভবতঃ যা-ই বইতে পড়ুক, সত্যকার শ্রমিক সংগঠনে, কৃষক-সংগঠনে তাদেরও ধৈর্য ছিল না। এদেশে তখন কমিউনিজম্‌ও যেন দলছাড়া গোষ্ঠীর ও ভেজাল কর্মনীতির একটা খিচুড়ি। অথবা কখনো রাজনীতিক অধ্যায়ের ফুটনোট। তাই আশ্চর্য নয়, কানপুর মামলা কেউ বিশেষ মনে রাখে নি। কিন্তু ক্রমে বাসনায় আগুন দেওয়া হয়। মীরাটের মামলায় অমনি ধরা পড়ে গেল; বাইরে কমিউনিস্ট পার্টি প্রায় নেই। 'এ ও সে' প্রত্যেকেই বলে সেই পার্টি বলে দাবীদার, আর স্বভাবতঃই দলাদলিতেই তখন তাদের বেশি পরিচয়। নানা লোকের মুখে এসব নানা কথা আমাদের কানে পৌঁছুত; জানতাম আমার সঙ্গে এদের কারও মনের মিল হবার কথা নয়। কিন্তু সেরূপ মিল তো কারো সঙ্গেই পুরোপুরি হয় না, তবে, 'হাত মেলাও পা মেলাও' যখন চাই, তখন তাদের থেকে একেবারে দূরে থাকি কি করে?

কাছে গেলে দেখতাম এদের কমিউনিজম্‌ও কাঁচা, অথবা ভেজাল। একটা সাধারণ মিল তাদের মধ্যে ছিল—গান্ধীজীর বিরুদ্ধে, কংগ্রেসের বিরুদ্ধে, গালমন্দে কেউ কারও থেকে কম যেত না; আর জাতীয় বিপ্লবীদের বিরুদ্ধেও তারা একমত—সে বিপ্লবীরা মধ্যবিত্ত শ্রেণী-স্বার্থের বাহক।—সে সময় পর্যন্ত ভ্রান্ত, কিন্তু সময় এলেই হবে 'ট্রেটর'! 'direct from the horse's mouth'ও এ উক্তি শুনেছি। অবশ্য আপত্তিও জানিয়েছিলাম মৃদুভাবে। তবে 'হর্স' তাদের মধ্যে দুর্লভ; আসলে বক্সী-বয়েলদের বাদ অর্থ ছিল বিবাদ। এক আধজন মানুষও অবশ্য ছিল, তাদের মুখেও বিবাদের কথা শুনতাম, হাসতাম, বলতাম 'আপাততঃ চলুন না তবু সকলে একসঙ্গে'। আসলে যারা চলতে চাইত তারা ছিল সংখ্যায় কম। 'বাদ' বাদে কাজের পথও খুঁজে পেত না কাজ। তাই বোধহয় স্বাধীনতার নামে বা সেদিনকার জন-আন্দোলনের বিরুদ্ধে এসব pseudo-কমিউনিস্টদের উগ্রতা ছিল অশোভন। দু-এক সময়ে প্রায় 'ইতর'। প্রোলেটেরিয়ান অর্থ যেন সমাজের 'ইতর সাধারণ', ইতুরে ভাষাই যেন শ্রমিকের স্বভাষা। অবশ্য তখনো বুঝি নি, দেখিও নি, তাদের মধ্যেও এক আধজন মানুষের বুদ্ধি ছিল, অকপট আস্থা ছিল শ্রেণী-সংগ্রামে, এবং ছিল স্থির সঙ্কল্প ও দীর্ঘ তপস্যা। কেন যে তারা ওই শৃঙ্গী নখীদের সঙ্গে মিলে সেই প্রথম পর্বের নতুন গজানো শিং-এর ঢু'তে ভারতবর্ষে

প্রোলেটেরিয়ান্‌ নীতি ও প্রোলেটেরিয়ান্‌ পার্টির সুষ্ঠু বিকাশকেই বিলম্বিত, খণ্ডবিখণ্ডিত করছিলেন, তা ভেবে পাই না। আমি ভাবতাম এ'রা মোটামুটি পথের নিশানা পেয়েছেন, তাই এ'রাই বুঝবেন সে পথে অন্য পথের পথচারীদেরও না আনলেই নয়। তাই সেদিনের কমিউনিস্টদের সঙ্গে পরিচয়ে আমার আগ্রহ ছিল। যদিও বুঝতাম এরা হয়তো আসলে কমিউনিস্ট পার্টির কেউ নয়, এবং যত জন সাম্যবাদের অনুচর তার চেয়েও বেশি আছে তাদের মধ্যে পুলিশের গুপ্তচর।

আমাদের তখনকার এক সাম্যবাদী বন্ধুকে মনে হ'ত খাপছাড়া মানুষ। মৃদুভাষী কিন্তু দুর্ধর্ষ কর্মী। তিনি নাকি পূর্ব-পাকিস্তানে ভাগ্যবান ব্যবসায়ী হন ১৯৪৭-এর পর। আমাকে বেশ কিছু বইও তিনি পড়িয়েছিলেন, যেমন, বুখারিন-এর বিখ্যাত A.B.C. of Communism, তখনো বুখারিন স্বনামখ্যাত, 'more left than Lenin himself' বলেও তাঁর পরিচয়। আমার বন্ধু কলকাতায় তাঁর মতের নেতৃস্থানীয়দের কাছেও নিয়ে যেতেন। একবার নিয়ে গিয়েছিলেন যাঁর কাছে তিনি সদ্য বিলাত ফেরত ধনাঢ্য পরিবারের বিদ্বান্‌ পুত্র, একটু প্রচ্ছন্ন থেকেই তখনো সর্বহারার পার্টি গড়ছেন। বললেন, 'কী আশ্চর্য মিলিটেণ্ট আমাদের শ্রমিকেরা, তা দেখে হতবাক্‌ হতে হয়।' বলে, 'মজুর সংগঠনে ফুট 'যারা ধরাচ্ছে', দেরী করে লাভ নেই, তাদের দু-একটাকে সরিয়ে ফেলা এখনি দরকার'। আমার মনে প্রশ্ন উঠল অর্থাৎ সেই গুপ্ত সমিতির সন্ত্রাস-বাদ ? তবে বিদেশী সাহেব বা দেশী গোয়েন্দাদের বিরুদ্ধে নয়, স্বদলের বা মতের বিরোধী অন্য মজুরদের বিরুদ্ধে। কম্‌রেড মৃদু হেসে বললেন, 'যখন সত্যাই বিপ্লব এগিয়ে আসবে তখন যে কী দুর্জয় হয়ে উঠবে ওরা আমি তো ভেবে অবাক হই !' আমি ভাবি—কেমন এই মিলিটেণ্ট মজুর ? বাঙালি ছেলে, কৃষকদের দেখেছি। সেই গান্ধী-আন্দোলনের দিন থেকে রাজনীতিতে তাদের আনার কথা হয়েছে। কিন্তু 'তরিখা' খুঁজে পাই না। ওদের ভাষাই যেন কেউ জানি না। কলের মজুর তো এক হিসাবে চোখেই দেখি নি, দেখেছি গতর-খাটা মুটে-মজুর ও ছুটোছাঁটা ঠিকাদারদের হাতের দিন-মজুরদের। কলকাতার চটকল এলাকায় যেখানে কমিউনিস্টদের 'কাজ' হচ্ছে সেখানে আমাকে নিয়ে যাবার উপদেশ আমার বন্ধুকে দিলেন তাঁর নেতা। একদিন গেলাম, তার চেনা মজুরদের সেদিন দেখা পাওয়া গেল না। যাদের এদিকে সেদিকে দেখলাম তারা কেউ হিন্দুস্থানী, কেউ মধ্যপ্রদেশের, কেউ তেলুগু। নিজেই তারপরে গেলাম আরও দু-এক দিন সে এলাকায় ও অন্য এলাকায়। তখন কাজের টাইম শেষ হয়েছে, বস্তিতে কেউ ফিরেছে, কেউ যাচ্ছে নিকটের সরাবখানায়,

আমার দিকে কেউ তাকিয়েও দেখে না, কথা জিজ্ঞাসা করলে দাঁড়িয়ে একবার দেখে। ভাবটা—এ কোন্ জন্তু রে? তারপর মুখ ফিরিয়ে চলে যায় নিজের পথে। বোধহয় 'এজিটেটর' বা মজুর-জমায়েতের আড়কাঠিদের সঙ্গে না গেলে মজুরকে ধরা যায় না, ভাষা জানা নেই, চেনাও যায় না। মিলিটেণ্ট মজুর খুঁজে পেতে হলে ধৈর্য চাই। সারা দেশ তখন লবণ আইন অমান্য করে মারমুখো না হোক জেলমুখো। মজুর এলাকায় দু-একদিন ঘুরে দেখলাম ওখানে গান্ধীজীর জন-আন্দোলনের কোনো চিহ্ন নেই, 'কমিউনিস্ট মিলিটেণ্ট' কেউ থাকলেও চিনতে পারি না। হয়তো সে মিলিটেণ্টদের দেখা পাওয়া যেত ভবানীপুরের বা মধ্য-কলকাতার 'ব্যারিস্টার সাহেবদের' মন্ত্রণাগৃহে। সে সুযোগও আমার তখন হ'ল না। মাস ছয় পরে শুনেছি সেই বিলাত ফেরত নেতাকে কলকাতার বাইরে যেতে হয়, পুলিশ তাঁর খোঁজ পেয়েছে, তাঁকে তাই সাবধান হতে হয়েছে। তারপর শুনেছি বাইরেই তিনি গিয়েছিলেন —তবে নয়াদিল্লীতে ও উচ্চ রাজকর্মে। সত্য কথা, তাঁর যা বিদ্যা ও বংশ-পরিচয় তাতে সেরূপ উচ্চাসনই তাঁর প্রাপ্য।

ঠিক মনে পড়ে না, কি-সূত্রে একবার একটা ওরূপ কমিউনিস্ট-নামীয় এক গোষ্ঠী আমাকে আকর্ষণ করে। আমার সেই মুসলিম বন্ধুই নিয়ে গিয়েছিলেন কিনা মনে নেই। যাই হোক্, কানাকানি শুন্‌ছিলাম—এম. এন. রায় বার্লিন থেকে ভারতবর্ষে এসে গিয়েছেন; তিনি মনে করেন এই তাঁর কর্মক্ষেত্র। মস্কো তাঁকে তাড়ালে কি হবে, তিনি জানেন এদেশে কমিউনিস্ট আন্দোলনের তরিখা। কমিউনিজম্ গড়তে হবে এদেশে, দেশের জন-আন্দোলনকে ভিত্তি করে, এবং সংগ্রামের এই স্তরে কংগ্রেসী আন্দোলনের সঙ্গে মিলেমিশেই হবে কমিউনিস্টদের পা বাড়াতে। শুনে নানা কারণে পুলকিত হয়েছিলাম। প্রথমত এম. এন. রায় বছর দশ-বারো ধরে একটা আশ্চর্য নাম। তার পরে, এরূপই যদি তাঁর নীতি হয় তা হলে তিনি তো আশ্চর্যতর রকমে আমাদের মনের কথা ব্যক্ত করছেন। তাঁকে রুশ-কর্তারা কেন জাতিচ্যুত করেছেন, জানি না। তবে এদেশের পুলিশ তাঁকে নিশ্চয়ই ছাড়বে না। অবশ্য, এ খবর কলকাতার হাওয়ায় যখন ভাসছিল তার আগে কিন্তু আরও অনেক কিছু ঘটেছে।

ঘটনার স্রোত এগিয়ে গিয়েছে—গান্ধীজীর গ্রেপ্তার উপলক্ষে সাময়িক উত্তেজনা সকল গোষ্ঠীতেই দেখা দেয়। নোয়াখালিতে জনকয় যুবক সেদিন শাসন অচল করে দেয়—অস্ত্র দিয়ে নয়, বরং বহু পুলিশের বন্দুকের সামনে অটল দাঁড়িয়ে। দিন কয়েকের মধ্যেই তারা বিনা বিচারে ধৃত ও আবদ্ধ হ'ল। ওদিকে ত্রিশের আইন অমান্য আন্দোলনে তার পূর্বেই দিনের পর দিন মন্দা দেখা

দিয়েছে। এবং গান্ধীজীও নিজের নিয়মেই তা বন্ধ করতে ব্যস্ত হয়েছেন। তাতে করে গুরুত্ব লাভ করেছে দুই বিখ্যাত আইনজীবীর ছুটোছুটি, তেজ বাহাদুর সাপ্রু ও মুকুন্দরাম জয়াকরের আপোষ-রফার দৌত্য। তাঁরা একবার যান কংগ্রেসী উচ্চমহলে আবার ছোটেন বড়লাটের দরবারে—একটা সম্মানজনক রফার চেষ্টায়। দুপক্ষেরই বোধ হচ্ছিল একটা সুবিধা মতো মীমাংসার প্রয়োজন ; দুই পক্ষই ভাবছে সুবিধা অর্থ নিজেদের সুবিধা। বাঙলাদেশের মনের সামনে তা তখন এক ঔৎসুক্যের ব্যাপার, আর প্রধান ব্যাপার চট্টগ্রাম থেকে মেদিনীপুর পর্যন্ত বাঙালি বিপ্লবীদের দুরন্ত ও দুর্দমনীয় কর্মকাণ্ড ; আজ এখানে কাল ওখানে। লোকে দেখে সাধারণভাবে লবণ তৈরীর অমান্যের আগুন আর তেমন না জ্বলুক, একটা আগুন ছেলেগুলিই কিছুটা জ্বালিয়ে রাখছে।—সে আগুনে সরকারেরও দুর্ভাবনা, জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে এই অগ্নিধারীদের যোগাযোগ সম্ভাবনা অসম্ভব নয়, তা আরও বড় আশঙ্কার বিষয় ! আবার, গান্ধীজীর কাছে এসব কাণ্ড নিশ্চয়ই আপত্তিকর,—তাঁর অনুগামীদের সবাইকার নিকট কিন্তু ততটা অস্বস্তিকর নয়। এসব কারণে দেশের বেশ কিছু মানুষ বিপ্লবীদের দিকে চেয়ে থাকে। যা হোক্, সাপ্রু-জয়াকরের চেষ্টাতে হোক্ আর নিজ নিজ গরজেই হোক্, শেষে গান্ধী-আরুইন্ প্যাক্ট হ'ল। ব্যক্তিগতভাবে বুঝলাম—এবারও 'বাতি জ্বলল না' ; বরং আগুন জ্বলবার আগেই নেবানো হচ্ছে। বিদেশ থেকে সুভাষচন্দ্র ও বীঠলভাই প্যাটেল তাই আপত্তি করেন। কোনো কোনো কংগ্রেসকর্তার মতো আমরা নিজেদের বুঝাতে চাইলাম—এক কদম এগিয়ে একবার দম নেওয়া, কংগ্রেসের পক্ষে তা মন্দ ডিপ্লোম্যাটিক চাল নয়। তবে 'পূর্ণ স্বাধীনতা'র প্রতিশ্রুতি-পূরণে এই আন্দোলন —একথা বলা কেন ? গান্ধীজী কতটা পূর্ণ স্বাধীনতা চান, বিপ্লবীদের এ সন্দেহও তা হলে অন্যায় সন্দেহ নয়। কিন্তু দেশ গান্ধীজীকে চায়, তাঁকে নিয়ে যে কয় কদম এগুনো যায় আপাততঃ তাও ভালো। —জেলের কংগ্রেসম্যানরা মুক্তি পেল। কিন্তু বিপ্লবীরা জেলে আর বন্দিশালায় রুদ্ধ রইল—তাদের হয়ে গান্ধীজী কথা বলেন না। তাতে সাধারণ কংগ্রেসম্যানও একটু লজ্জিত, বিভ্রান্ত হলেন, আর উগ্র 'কংগ্রেসম্যান' হলেন হতাশ ও বিক্ষুব্ধ। শেষ পর্যন্ত অবশ্য গান্ধীজীও বুঝলেন লর্ড আরুইন হাই চর্চের খাঁটি খ্রীস্টান হতে পারেন কিন্তু জাতিতে ও শ্রেণীতে শাসক-ধর্মী ;—হাই চর্চ অর্থ তো ব্রিটেনের গোঁড়া রক্ষণশীল চর্চ। তাদের 'চর্চ আর 'স্টেট্' 'এক প্রাণ এক টিকিট', সাম্রাজ্য আর চর্চীয় খ্রীস্টানি একই ধর্মব্যবস্থার দু'পীঠ। তবু গান্ধীজী চেষ্টা করলেন—কংগ্রেসের শক্তিকে এ সময়ে নতুন করে সংহত করে, নিজেদের রাজনৈতিক প্রস্তাব ও অহিংসার

কর্মপন্থা সুস্থির রূপে প্রণয়ন করে, ব্রিটিশ শাসকদের কাছে সুনির্দিষ্ট দাবী উপস্থাপিত করে, মীমাংসায় পৌঁছুবেন। তার জন্য কংগ্রেসের অধিবেশন বসবে করাচীতে।

কিন্তু অধিবেশন যত এগিয়ে এল উত্তর ভারত জুড়ে ততই নামল একটা গভীর উত্তেজনার ঢেউ। ভগৎ সিং, রাজগুরু ও শুকদেব, এই তিন বিপ্লবীর ফাঁসি সন্নিকট। ভগৎ সিং তখন সন্ত্রাসবাদী পথ থেকে মতে অন্ততঃ কমিউনিস্ট—বাঙালি বিপ্লবীদের কারো কারো মতো। কিন্তু তিনি হত্যার অপরাধে দণ্ডিত। দেশের লোক চায় গান্ধীজী ভগৎ সিংদের বাঁচান। এ দাবী সকলের; শুধু বাঙলা দেশের মানুষের হলে তা চেপে যাওয়া যেত—যেমন করছিলেন কংগ্রেসকর্তারা। ভগৎ সিংদের কাজও গান্ধীজীর অহিংসার সম্পূর্ণ বিরোধী; তাই গান্ধীজী সর্বান্তঃকরণে তাঁদের বাঁচাতে চাইতেও পারেন না, আর উত্তর ভারতের মতের চাপে তাঁদের প্রাণদণ্ডে একেবারে নীরবে উদাসীনও থাকতে পারেন নি। করাচী কংগ্রেসের প্রায় পূর্বক্ষণে যথানির্দিষ্ট দিনে তিনজনার ফাঁসি হয়ে গেল। ব্যাপারটা গান্ধীজীর কার্যক্রমের ও তাঁর পরিকল্পিত করাচী কংগ্রেসের অধিবেশনের নীতির পক্ষে শুভ সূচনা নয়। উত্তর ভারতের, বিশেষ করে, পাঞ্জাবের 'নওজোয়ান'রা তখন—কার্যতঃ না হোক্, বাহ্যতঃ— প্রায় বাঙলার যুববিপ্লবীদের মতোই বিক্ষুব্ধ হ'ল। বাঙলাদেশ থেকে ট্রেন বোঝাই খাঁটি কংগ্রেসী, বিপ্লবী কংগ্রেসী, বিদ্রোহী দাদারা,—বড়দা, মেজদা, সেজদা প্রভৃতি যাঁরা তখনো বাইরে ছিলেন করাচী যান—কী হয় দেখা যাক। আমার মতো লোকও তাঁদের মধ্যে ছিল—সত্যই দেশে ঘুরে দেখা যাক দেশের কী অবস্থা—কংগ্রেসী জন-সংগ্রামের শক্তি কোথায়, উত্তর ভারতের বিপ্লববাদী নওজোয়ানদেরও মতি কী, কতটা তা সম্মিলিত জন-আন্দোলনের দিকে। অবশ্য কিছুই পরিষ্কার বোঝা সম্ভব হয় নি। তবে উত্তর ভারত আর করাচী বোম্বাই কলকাতা পরিক্রমায় দেশটা দেখা হয়,—বিশেষ করে এলিফ্যান্টায় ত্রিমূর্তি দেখে ধ্যানশুদ্ধ হয়েছিলাম; অন্য সর্বত্র নানা লোকের সঙ্গে কথায়-আলাপে কিছু জানা বোঝাও হ'ল। তা না হলে করাচী কংগ্রেসের এক তরফা অর্থহীন্ বাগাড়ম্বর মোটেই তৃপ্তিকর নয়। করাচী প্রোগ্রাম-এ অনেক বড়-বড় কথা ছিল যা নতুন, কিন্তু তা কার্যতঃ করার মতো কংগ্রেসের সাধ্য ছিল না, তা করতে কর্তাদের ইচ্ছাও ছিল না। ওদিকে বোঝা গেল, কংগ্রেস মন্ত্রীদের কাজকর্মে গান্ধীজী খুশী নন, কিন্তু আবার সংগ্রামে নামাতেও উদগ্রীব নন। সে তুলনায় গান্ধী-আরুইন্ প্যাক্টের সুবিধা ব্রিটিশ শাসকরাই নিতে পারবে—কংগ্রেস যখন দ্বিধাগ্রস্ত। দু'দিন পরেই তা বোঝা গেল—রাউণ্ড টেবলে হতাশ হয়ে গান্ধীজীকে

যখন দেশে ফিরতে হ'ল তখন আন্দোলনের ভাঙা হাটে জেলে যাওয়া ছাড়া তাঁর ও কংগ্রেস নেতাদের আর কোনো কিছু করা সম্ভব নয়। সরকার তাঁদের জেলে পুরলেন। গান্ধীজী জেলে গিয়ে প্রয়োপবেশনেই পথ খুঁজলেন—অন্য নেতারা জেলে বসে সকল কিছু করবার দায় থেকে নিষ্কৃতি পেলেন। কিন্তু বিপ্লবীদের নিষ্কৃতি কই? তাদের নীতি স্পষ্ট, 'তা বলে ভাবনা করা চলবে না।' তাদের স্থান কংগ্রেস আন্দোলনের সঙ্গে নয়,—আন্দোলন নেইও,—বিচ্ছিন্ন সন্ত্রাস কর্মে ও ক্রম-ক্ষয়িত আক্রমণের চেষ্টায় তারা অক্লান্ত রইল। কী করে যে কী-রূপ নেবে তাঁদের আদর্শ—তা আর ভাববার সময় নেই। আসলে ভাবার প্রকৃত সময়ই এসেছিল, কিন্তু ভাবলে অভ্যস্ত পথ পরিত্যাগ করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না।—এমনি একটা সময়ে জানা গেল এম. এন. রায় উত্তর ভারতে ধরা পড়েছেন। তিনি করাচী কংগ্রেসেও উপস্থিত ছিলেন। নেতাদের কারও কারও সঙ্গে সেখানে তাঁর সাক্ষাৎ আলোচনাও হয়েছে। তবে কাজে কিছু করবার সুযোগ তাঁরও হ'ল না। এখন চলবে তাঁর মামলা।

কলকাতায় মানবেন্দ্রনাথ রায়ের প্রধান এক চ্যালার সঙ্গে আলাপ হ'ল,—আর কলকাতায় তাদের ছোট গোষ্ঠীর বন্ধুদের সঙ্গে তাই কথাবার্তা হ'ত। ফাইভ্ ইয়ার প্ল্যান সম্পর্কে কলকাতায় আমদানি-করা গ্রিন্কো'র এক কপি বই কিনে ফেলেছিলাম। তাদেরই কারও হাত-ঘুরে তা চলে গিয়েছিল নাকি বঙ্কিম মুখুজ্জের হাতে—তাঁর তখনো আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ আলাপ-পরিচয় নেই। অবশ্য বুঝেছিলাম রায়ের অনুগতদের সঙ্গে তাঁর খুব সৌহার্দ্য নেই। তা হতেই পারে, কারণ, রায় তো তখনো মস্কোর বিতাড়িত—তাঁর কোনো তক্‌মা নেই। আমি ভাবছিলাম—ফাইব্ ইয়ার প্ল্যান বিষয়ে তবু ওই রায়-অনুগামীদের কাছে কিছু জানা ও শোনা যাবে। কারণ, গ্রিন্কোর বই দেখে ও পড়ে তো আমি নিরাশ—শুধু কাঠখোট্টা স্ট্যাটিস্টিকস্—কী রুশ নেতাদের পরিকল্পনা, কোন দিকে, তার নিতান্ত শুষ্ক আভাস। আসলে তা হওয়াই তো স্বাভাবিক। কিন্তু সেসব সাংখ্যিক ও নিষ্প্রাণ তথ্যের মূল্য আমি বুঝব কি করে? বরং তত্ত্বটা কী, তা বুঝতে চাই। অর্থনীতির নিয়ম ও সমাজ অজ্ঞাত রহস্যের অভিপ্রায়ে চলে—পুরোনো অর্থনীতির এ মর্মের কথা মানতাম না। তবে জানতাম না—বস্তু-বিশ্বের কেনা-বেচার বাজারের রহস্য। ঝানু অর্থনীতিজ্ঞদের মতে সেসব অবজ্ঞা করে রুশিয়ার বলশেভিকদের ইকোনমি নিয়ন্ত্রণের স্পর্ধা হাস্যকর মরণবুদ্ধি—এ কথা শুনতাম। কিন্তু সঠিক কী বুদ্ধি বা দুর্বুদ্ধিতে রুশিয়ার 'ক্ষুদে মানুষরা' কী করতে চাইছে? তাদের সেই বুদ্ধি, তাদের সেই যুক্তি, প্ল্যানের rationale, আর্থিক চিন্তায় প্ল্যানের তাৎপর্য,—আমি এসব বুঝতে চাই। কে বোঝাবে? বইটা এ

কৌতূহল মেটায় না। তাই ভাবছিলাম—সেই স্পর্ধাশীলদের যে প্রত্যক্ষ দেখেছে তাঁর শিষ্যদের কাছ থেকে পরোক্ষ হলেও কিছু বুঝবার মতো কথা জানা যেতে পারে। এ আশাটা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হ'ল। তার বদলে মানবেন্দ্র রায়ের কথা জানলাম, তাঁর লেখা কিছু পড়লাম। কেন চিয়াং কাই-শেকের কমিউনিস্ট নিধন-যজ্ঞে মানবেন্দ্রের দুর্নাম হ'ল কমিণ্টার্নের নেতৃ-মহলে, আর তারপরে পতনের পূর্বে মস্কো থেকে তাঁর পলায়ন, তৎপর তাঁর বিতাড়ন—এ সবও কিছু শুনলাম। যা শুনলাম, সত্য হলেও অসঙ্গত নয়, মিথ্যা হলেও আশ্চর্য হবার কিছু নয়। কিন্তু তাঁরা মানবেন্দ্র রায়ের অনুগত, তৎকালীন ভারতীয় রাজনীতি বিষয়ে রায়ের বিশ্লেষণ ও সে রাজনীতির ক্ষেত্রে তাঁর পুনরাবির্ভাবের আয়োজন সম্বন্ধীয় প্রচারে বেশি উদ্যোগী। সে উদ্যোগের অর্থ বাক্য-বিস্তার, ঘোরা-ফেরা, গোষ্ঠী-গঠনের চেষ্টা। সে উদ্দেশ্যেই আমাকে তাঁরা ধরলেন—আমিও ছাড়াতে চাই নি। রায়ের সেসব লেখাতে আমাদের কাঁচা ধারণার পাকা রূপ যেন দেখতাম। না আছে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে কমিউনিস্ট সুলভ জেহাদ, না, সশস্ত্র বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধা ; আছে সম্মিলিত জন-সংগ্রামের তত্ত্ব। যথাসম্ভব সকল সংগ্রামীদের মিলিয়ে—একটা প্রোগ্রাম। তখনো সম্পূর্ণ তা বুঝি নি। পরে দেখেছি মানবেন্দ্রনাথ রায় সত্যই ভাবতে পারেন, লিখতে পারেন—চরম পর্বে তিনি 'জগদগুরু' না হতে চেষ্টা করলে বোধহয় তাঁর সম্বন্ধে এ ধারণা আমার আজও বজায় থাকত। তবে সত্যই রায় নিজে এই লেনিনীয় কলোনিয়াল বিপ্লব নীতির বিরুদ্ধে পূর্বে কি বলেছেন, আর এখন মস্কো যখন কলোনীতে মিলিত জাতীয়-সংগ্রামের নীতির বিরোধী, তখনই বা কেন (বিতাড়িত হয়ে) হয়েছেন এই সময়ে মিলিত সংগ্রাম নীতির প্রবক্তা, এসব তখন জানতাম না। জানলেই বা কী যেত আসত ? যদি স্বাধীনতার জন্য মিলিত সংগ্রামই এখন তাঁর নীতি হয়, তা হলে সে নীতিটা অগ্রাহ্য করা চলে না। কিন্তু কথা হ'ল—ওরা কার্যতঃ কী করে তা প্রয়োগ করবেন। পথ চলার প্রশ্ন ;—কার্যতঃ অন্যদেরও সামনে পথ বিশেষ নেই, ওদেরও তা'ই। আমরা বুঝি হোক পথ দুর্গম, 'তা বলে ভাবনা করা চলবে না'।

ভাবনা না করার পক্ষে অতর্কিত ঘটনাও ঘটছিল প্রায়ই। চরম একটা ঘটনা হিজলীর বন্দীনিবাসে অকারণে কর্তৃপক্ষের গুলিচালনা ও তিনজন বন্দি-হত্যা। যতদূর শুনেছি—ও ব্যাপারে বন্দিশালার ইংরেজ অফিসারের সম্ভবতঃ দায়িত্ব ছিল না। বন্দীরা কেউ কেউ সিপাহী জমাদারদের নানাভাবে উত্যক্ত করত—কতকটা যেন খেলা, পুলিশরা চটলে তাদের আরও উৎসাহ। ব্যাপারটা কোথায় গড়াচ্ছে অধিকাংশ বন্দীই জানত না, যারা উত্যক্ত করত

তারাও বোঝে নি। ওই দেশী পুলিশের বড়ো বা মেজো কর্তারাই হাল্কা ভাবে উত্যক্ত সিপাইদের বলতেন—'একবার দিয়ো ঠাণ্ডা করে।' সেকথাটাই কি সে ঘটনার কারণ? ঠিক সেদিন রাত্রিতে সিপাহী জমাদার সুবাদাররা কেন কী যে করতে গেল, কী ঘটেছিল সেদিন বিবাদের, তা সত্যই বোঝা যায় না। অন্ততঃ সেদিন ও-ঘটনার পূর্বে কোনো গোলযোগ ঘটে নি। যাই হোক, ঘটনা ঘটল, অকস্মাৎ পাগলা ঘণ্টি' বাজিয়ে গুলি করতে করতে পুলিশ বন্দিশালায় চড়াও হল—তিনটি প্রাণ গেল। তারপর? একটা বন্দিনিবাসে নিরস্ত্র মানুষদের উপর কেন গুলি চলল তার কোনো কৈফিয়ৎ তখনো পাওয়া যায় নি—পরেও না। কিন্তু হিজলীর বন্দীদেরকে 'ঠাণ্ডা' করতে গিয়ে যা করা হ'ল তার নাম খুঁচিয়ে আগুন জ্বালানো। অবশ্য সে আগুনও নিভে যাবে এক সময়ে,—জালিয়ানওয়ালাবাগও তো এক সময়ে ক্ষতের পুরোনো দাগ হয়ে যায়,—কিন্তু তার আগে জ্বলবে দেশের মন, জ্বলবে মানুষের প্রাণ, আর জ্বলবে যুবকদের বুক—কে ঠেকাবে তাদের সে আত্মাহুতির পথ থেকে? এ শুধু তাদের কর্মশক্তি নয়, আত্মমর্যাদার বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ। আত্মদানের এমন অকাট্য যুক্তি আর কি আছে—জাতীয় আত্মমর্যাদার, গোষ্ঠীগত আত্মমর্যাদার বিরুদ্ধে শত্রুর গায়েপড়া এই অপমান-অত্যাচারের মতো? জন-আন্দোলন, মিলিত জন-সংগ্রাম, দীর্ঘ কঠিন তপস্যা—সে কথা কে শোনে, কে ভাবে মনুষ্যত্বের এই পরীক্ষার ক্ষণে?

একটি ছোট ঘটনা—নীরদচন্দ্র চৌধুরী ও তাঁর তরুণ বন্ধু অধ্যাপক এ্যাক্রয়েড্ দু'জনাই হিজলীর ওই হত্যাকাণ্ডে বিশেষ আহত হন। এরূপ ব্যাপার বিলাতের ইংরেজের অভাবনীয়—তারা অন্ততঃ সহজ বুদ্ধিতে এরকম কলোনিয়াল অমানুষিকতা জানতে পারলে সহ্য করবে না। ব্যাপারটা তাদের জানানো দরকার। এক রকম জোর করেই হিজলী থেকে নীরদ চৌধুরী ও অ্যাক্রয়ডের জন্য direct সংবাদ সংগ্রহ করতে হ'ল। অত্যন্ত ধীর ভাষাতেই সে সংবাদ লিখে নিজ নামে 'মাঞ্চেস্টর গার্ডেনে' প্রকাশ করেন সেণ্ট্‌পলস্ কলেজের অধ্যাপক ক্রিস্টোফার এ্যাক্রয়েড। তারপর তাঁকে নিয়ে শাসক মহলে একটা হৈ-চৈ—এ্যাক্রয়েডকে ভারতবর্ষ ছাড়তে হয়। কয়েক বৎসর পরে অবশ্য চর্চ থেকে আবার তিনি প্রেরিত হয়েছিলেন কানপুরে তাঁদের কলেজে অধ্যাপনায়—সে অন্য ইতিহাস। এ পর্বে এ্যাক্রয়েডকে যা দেখেছি—তাতে একটি খাঁটি ইংরেজ যুবক দেখে মুগ্ধ হয়েছি;—আমাদের ইংরেজ জাতির ওপর শ্রদ্ধা শুধু ইংরেজী সাহিত্যের জন্য নয়। যতদূর বুঝেছি, পলিটিক্সে এ্যাক্রয়ডের আগ্রহ ছিল না। তাঁর ঝোঁক জীবন-জিজ্ঞাসা, হয়তো বা অধ্যাত্ম-জিজ্ঞাসা—আর তাই মানব-মঙ্গল। এবং অধ্যাত্মের আনুষঙ্গিক হিসাবে তার মন ও রুচি ছিল শিল্প-

সংস্কৃতিতে। হ্যাণ্ডমেড গ্রামাফোনের মস্ত চোঙায় তিনি নীরদচন্দ্র চৌধুরীর পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীত জিজ্ঞাসার খোরাক যোগাতেন—আমাদেরই বাড়িতে নীরদবাবুর ঘরে। পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীত বুঝি না, কিন্তু কিছু না কিছু বুঝতাম সেই সঙ্গীতের অপার্থিব আবেদন। এ ভাবেই 'আননউন ইণ্ডিয়ান'-এর একদিকের বিকাশের সহায়তা করেন এ্যাক্রয়েড। আরও অন্যদিকে তিনি কিছু খাদ্য যুগিয়েছিলেন দু-একজন আনৃওয়ার্দি ইণ্ডিয়ানের। যে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার রূপ-উপলব্ধি ছিল দুঃসাধ্য —শুধু সংবাদের ছিটেফোঁটায় শোনা যেত রুশিয়ার সেই তাজ্জব কাণ্ডের অস্পষ্ট আভাস,—এ্যাক্রয়েড তার একটা স্পষ্ট রূপরেখা আমাদের চোখে তুলে ধরলেন। মস্কো থেকে ইংরেজিতে লেখা সেই ফাইব ইয়ার প্ল্যানের সচিত্র কাহিনী আসত একটি মস্তবড় ছবির কাগজে, তা পাক্ষিক না সাপ্তাহিক মনে নেই, নিশ্চয়ই দামী। কিন্তু অমন উৎকৃষ্ট ছবির কাগজ তখনকার দিনে লণ্ডনের ইলাস্ট্রেটেড্ লণ্ডন নিউজ ও প্যারিসের লিলাস্ত্রেশিয়ে' ছাড়া আর দেখি নি। মস্কোতে এমন চিত্র ছাপা হতে পারে তাও আমরা ভাবতে পারতাম না, বোধহয় নীরদবাবুরও ধারণার অতীত ছিল। এ্যাক্রয়েড পূর্ব থেকেই নিজের পয়সায় ' পত্রের গ্রাহক ছিলেন, তা এখন দেখাতে দেখাতে আমাদের চোখ খুলে দেন। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী প্ল্যানের কর্মযজ্ঞের আগুন না হোক যজ্ঞস্থলের এক আধটুকু ঘৃতসুবাসিত হাওয়া কলকাতায় ভবনাথ সেন স্ট্রীটের ' কটি ঘরেও এসে এভাবে পৌঁছুত। এবারে উপলব্ধিতেও কিছু এল সোভি ত পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার রূপ কী এবং কী স্বরূপ। মানুষ নিজের ই শানমি সচেতন ভাবে গড়ছে, অর্থ, মানুষ গড়ছে আপনাকেও, Man makes himself—অবশ্য যতটা পরিস্থিতিতে সম্ভব।

এ্যাক্রয়েড চলে গেলেন। তার পূর্বেই আরেকটা ঘটনা ঘটে—মনুমেন্টের তলাকার সভায় হিজলীর বন্দিহত্যার প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথের ভাষণ। সভার বহু পিছনে দাঁড়িয়ে সকলের চোখের আড়ালে ছিলাম, ভাষণ শুনতে। যতীন্দ্র-মোহন সেনগুপ্তের উদাত্ত কণ্ঠস্বরও তা কানে পৌঁছে দিতে পারে নি। দিন দুই পরে সকাল বেলা একদিন সুনীতিবাবুর বাড়ি যাচ্ছি—ওজুহাত সেই ভাষা-তত্ত্বের গবেষণা—যা কিছুই আসলে বিশেষ করি না। কর্নওয়ালিস স্ট্রীটের মোড়েই অধ্যাপকের সঙ্গে সাক্ষাৎ, ব্যস্তভাবে কী খুঁজছেন। পরে বুঝেছিলাম গাড়ি। আমি কথা বলতেই বললেন, 'চলুন, কবির সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ করতে হবে। সময় প্রায় অতিক্রান্ত। ট্রাম-বাস-এ যাওয়ার সময় নেই, অন্ততঃ একটা ঠিকে গাড়ি দরকার।' তা পাওয়া গেলে গাড়িতে উঠতে উঠতে বললেন, 'উঠুন'।

'হাঁ ; আপনি।'

আমি বিব্রত হয়ে নিজের পোশাক-পরিচ্ছদের দিকে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম—ময়লা খদ্দরের ধুতি খদ্দরের নাতিপরিষ্কৃত পাঞ্জাবী গায়ে, পায়ে বিদ্যাসাগরী চটি। এ পোশাকে, এ পরিচ্ছদে, কবির সম্মুখে যাওয়া যায় ?

'হোক্। উঠুন গাড়িতে।'

উঠে বসলে বললেন, 'হিজলীর পরে কবি বিশেষ মর্মাহত ও বিচলিত—আপনি চলুন, আমার সঙ্গে।'

নীরবে বসে রইলাম। সব সময়েই কবি-সঙ্গম সৌভাগ্য—নিজের সঙ্কোচে আমি যথাসম্ভব তা এড়িয়ে চলি। কবি অবশ্য আশীর্বাদে বিধাতার আলোক বাতাসের মত মুক্তহস্ত, স্বচ্ছন্দে দুহাতে তা ছড়িয়ে যান। কিন্তু তপস্যা বিনা কি বিধাতার আলোক-বাতাসকেও সত্যই আপনার করা যায় ? অথবা, কবির সান্নিধ্যই যথেষ্ট তাঁর উপস্থিতিতে দর্শনার্থীর অন্তরে সত্য স্বতঃপ্রকাশিত হয়।

দোতলার নিজের কক্ষ থেকে সুনীতিবাবুকে নিয়ে কবি এসে বসলেন '[illegible]চিত্রা'র বাম দিকের ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে। পিছনে চলতে চলতে দেখি এখন ঈষৎ [illegible]নত সেই দীর্ঘ দেহ। নিভৃত কক্ষে বেতের আরাম কেদারায় বসে কবি সুনীতিবাবুর সঙ্গে কথা বলছিলেন—তাঁদের আলোচ্য ছিল বিশ্বভারতীর ব্যবস্থাপনা। বেশ [illegible]য়েক মিনিট আলোচনা হ'ল। শেষ হলে, সুনীতিবাবু আমাকে দেখিয়ে [illegible]রও একটু বিশেষ পরিচয় দিলেন—তাঁর কাছে ভাষাতত্ত্বের গবেষক মাত্র নই, [illegible]জনৈতিক যে-সব সমস্যায় কবির কিছু জানার প্রয়োজন, তাও কিছু আমার জানা থাকতে পারে। বার্ধক্য ক্লান্ত সেই মুখে চোখে বেদনা ও ক্লেশের একটি ছায়াও তখন দেখেছিলাম। সে মুখে তখন তা থাকা অস্বাভাবিক নয়, জানতাম। পরক্ষণেই দেখলাম হিজলীর প্রতিবাদ-ভাষণের মন্থনশেষ প্রশান্ত নিরুত্তাপ ভাবনা - যেমন জালিয়ানওয়ালাবাগের প্রতিবাদ-পত্রের পরে আপনার কবিতার জগতে সৃষ্টিমগ্ন হয়েছিলেন কবি—সেই রূপেরই আভাস।

—তোমরা কী ভাব তা জানি না। কিন্তু ক্রোধ ও ক্ষোভে তো এ সমস্যার সমাধান নেই। তাতে শক্তির অপচয়ই হয়। শক্তিকে সত্যের উপরই প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। কিছু মানুষের আকস্মিক উদ্দীপনা, শাসকদের গুপ্ত হত্যা, এভাবে স্বাধীনতা আসতে পারে না।...

ভাষা ঠিক এ নয়, কিন্তু মর্ম—অবিস্মৃত, তা জোর করে বলতে পারি। 'ব্যাধি ও প্রতিকার' থেকে 'সত্যের আহ্বান' পর্যন্ত প্রবাহিত ভাবনার নির্বিকার নির্মল ধারা শান্ত ধীর গতিতে বয়ে যাচ্ছিল। অবনত শিরে আমি শুনছি। মিনিট পাঁচ পরে কবি একবার থামলেন। তখন সঙ্কুচিত

মৃদু কণ্ঠে বললাম,—যদি অনুমতি করেন তা হলে দু-একটি কথা নিবেদন করতে পারি।

কবি সাগ্রহে নড়ে বসলেন, সস্নেহে বললেন, —বলো, বলো—কী বলবে।

সকলের কথা তো জানি না—তা বলাও আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তবে, আপনি যে কথা বলছেন সে কথা অনেকে বোঝেন, মানেনও,—মুষ্টিমেয় মানুষের এরূপ প্রয়াস সার্থক হয় না। কিন্তু তাঁরাও কেউ-কেউ যুক্তি দেখান—স্বল্প মানুষের চরম আত্মত্যাগে প্রভূত-তম মানুষের যৎসামান্য ত্যাগের ইচ্ছা জাগ্রত করা যাবে (maximum sacrifice by minimum men to rouse minimum sacrifice by maximum men),—এ হচ্ছে তাঁদের যুক্তি।

কবি বললেন, ও একটা ভুল কথা। তারপর কবি যা বললেন তার ভাষা মনে নেই, ভাব মনে আছে।—প্রাণদানে ওভাবে জন-সমাজকে ক্ষণিক চমৎকৃত করা যেতে পারে। তাতে অধিকাংশ মানুষ সে তুলনায় নিজেদের অযোগ্য মনে করে পিছিয়ে থাকতেও পারে। চমকিত করে নয়, সৎ কর্মশক্তি ও কর্মপদ্ধতির মধ্য দিয়েই মানুষের স্থির কর্মবুদ্ধিকে জাগ্রত ও কর্মপথে তাদের নিয়োজিত করতে পারা চাই।

ওই maximum-minimum বক্তব্যটাতে আমারও বিশ্বাস ছিল না। তবে কথাটা শুনেছি—উচ্চ নেতৃত্বের মুখেও শুনেছি,—তাই নিবেদন করেছিলাম। কবির কথা আমার মনেও স্বীকৃত। আরেকটি বক্তব্য তাই তাঁকে জানালাম।

'—আরও কেউ-কেউ আছে—তারা বয়সে বড় নয়, তরুণ। তাদের বক্তব্য—আমাদের এত বিরাট দেশ, এত প্রাচীন সভ্যতার উত্তরাধিকার তার। সামান্য এক দূর দেশের মানুষেরা শাসক-শক্তি হয়ে বসে এমন ভাবে তাদের দণ্ডচালনা করবে,—এ যেন আমাদের মনুষ্যত্বের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ ও প্রত্যেকের ব্যক্তিসত্তার অপমান। এর কোনো উত্তর না দিতে পারলে আমার নিজের কাছে আমি মিথ্যা হয়ে যাই।'

সত্যই, এ মর্মের কথা দু-একটি তরুণের মুখে শুনেছিলাম হিজলির বন্দি-হত্যার পরে। তাদের অন্তরবেদনা আমাকে স্পর্শ করেছিল; তা নিবেদন করেছিলাম শান্ত কণ্ঠে হলেও আন্তরিকতা দিয়ে।

কবি যেন অপ্রত্যাশিত একটা কথায় চমকিত হলেন 'সত্তার অপমান'? মনে হ'ল এক নিমেষ কবি নীরব রইলেন। তারপর ললাটের উপর থেকে একটা ছায়াকে সরিয়ে দিয়ে স্থির এবং আরও দৃঢ় চিত্তে কবি বললেন।

—তোমাদের আন্তরিক যন্ত্রণা বুঝলাম। কিন্তু দ্যাখো, ব্যাপারটাকে ওভাবে

দেখলে হবে না। আমাদের দেশে এ এক অসামান্য সমস্যা—বিরাট বড় প্রশ্ন, সম্ভবতঃ সমস্ত পৃথিবীর বৃহৎ সমস্যার সঙ্গে তা জড়িত। এবং সমস্ত পৃথিবীর গ্রহণ-যোগ্য সমাধানের মতো করেই তাঁর সমাধানও আমাদের দেশে আমাদের করতে হবে। এমন ছোট করে তার উত্তর হয় না—বড় সমস্যার বড়ো করেই উত্তর দিতে হবে।...

কবির কথা সঠিক বাক্যে ও শব্দে আরও দৃঢ়ভাবে আমার মনে গাঁথা ছিল—কোনো কোনো বন্ধু তখন তা ধরে রেখেছেন।

সে মুহূর্তে যা বেশি মনে হচ্ছিল তা হচ্ছে আমার ভাবনা-অনুভূতির মধ্যেও অনুচ্চারিত আত্মজিজ্ঞাসা। —জনসংগ্রামের দিকে এগিয়ে না গিয়ে সংখ্যাল্প গুপ্তচক্রেই কি আমি পাক খাচ্ছি না ?—'বিচিত্রা'র সে কক্ষ থেকে কবিকে প্রণাম করে বিদায় নিই নিজেকে প্রশ্ন করতে করতে, 'স্খলৎপাদ' ? 'স্খলৎপাদ' ? —মনের মধ্যে মন স্বীকার করলে—হাঁ, 'স্খলৎপাদ, স্খলৎপাদ'। বড় সমস্যাকে বড় করে ভাবতে চাই নি।

অনেক পরে—তখন আমি বন্দিশালায়—কবির ললাটের ওপর থেকে যে ছায়াটা সেদিন তিনি সরিয়ে দিয়েছিলেন আমি যেন তার কারণ দেখতে পেলাম পড়তে পড়তে—'আমি যে দেখিনু তরুণ বালক উন্মাদ হয়ে ছুটে / কী যন্ত্রণায় মরেছে পাথরে নিষ্ফল মাথা-কুটে।" 'বিচিত্রা' গৃহের সেই স্মৃতি কি 'প্রশ্নে'র মধ্যে প্রতিধ্বনিত ? 'তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ'।...

কবির কথার উত্তর মনে মনে খুঁজি। 'বিচিত্রা'র সে দিনের কথা থেকে মনে মনে কবিরই একটি কথা স্মরণ করেছিলাম—'স্বজাতির মধ্যে সর্বজাতিকে এবং সর্বজাতির মধ্যে স্বজাতিকে সত্যরূপে অনুভব করা'। কিন্তু কী তার পথ-প্রকরণ ? 'স্বদেশী সমাজ', না, জনবিপ্লবে মানবমুক্তির আয়োজন ?—

—বড় সমস্যার বড় করেই উত্তর ভাবতে হবে।

ইস্টারের দিন হঠাৎ আমার বাবা মারা যান। পিতৃবিয়োগে এল সাংসারিক জীবনে নতুন পরিস্থিতি, বড় সমস্যা,—ব্যক্তির হলেও যার উত্তরও বড় করেই দেওয়া প্রয়োজন—অবশ্য সেই ব্যক্তির কাঠামোতে। কালাশৌচের দিনগুলি অন্যবিধ দুর্জয় পরিশ্রমে তবু কাটাতে বাধ্য হই। গোটা আশি চটকলের শাদা মালিক তখনকার মাত্র গোটা তিন ভারতীয় চটকলের মালিকদের গলা টিপে ধরছে। সুশৃঙ্খল ও পরিমিত আকারে দেশীকলের বক্তব্য রচনা করা দরকার। চাই সেরূপ নিবেদন রচনাকার। আমার পিতৃদশা। তা না শোনেন ন্যাশনাল

ইনসিওরেন্সের দুতিয়ারা দু'ভাই, না আদমজীর ম্যানেজার রাজা আলী। তবে তাঁদের কথা ও কাগজপত্র থেকে চটকলের ছবিটা বুঝতে পেরেছিলাম। দেখছিলাম সত্যকারের ন্যাশনাল বুর্জোয়াজির ন্যাশনালিস্ট চরিত্র, বিশেষ করে ও-কয়টি ব্যক্তির। আর দেখছিলাম ইম্পিরিয়ালিস্ট শোষণের ক্রুরতা ও ক্ষমতা-মত্ততা। অমানুষিক পরিশ্রম হ'ল। হাত পেতে পারিশ্রমিক নেওয়ারও সময় হয় নি তখন।

ওদিকে অনেক প্রশ্ন সামনে। বাড়িতে সদ্যবিধবা মা, প্রায় নিঃসম্বল সংসার, আমি তাদের দায়িত্বভার গ্রহণে বাধ্য, আর, মায়ের মতে, সংসার পাততেও। এই শেষ বিষয়টা যৌবনের প্রায় শেষ মধ্যাহ্নে পৌঁছুতে পৌঁছুতেও বিশেষ ভাবি নি। তখন ভাবি নি বলে কি এখন ত্রিশ বছরে তার ভাবনা করা চলবে না? বরং 'বড় প্রশ্নের বড় করে ভাবনা'র তো সংসারের প্রশ্নের ও উত্তরের সঙ্গে সঙ্গতি থাকা চাই। জীবনটাকে রঙে রসে ছুট করে যে উত্তর সে উত্তর উত্তরই নয়; বড়ই বা কি ছোটইবা কি। সে উত্তর?—'সে আমার নয়।'

বছর চার-পাঁচ পরে বন্দিশালায় শুনছিলাম হরিদা (স্বদেশী নেতা হরিচরণ চক্রবর্তী) জিজ্ঞাসা করছেন তরুণ সুরাজকে (রাজবন্দী সুরাজ রায়চৌধুরী)। হরিদা বয়সে প্রায় সুরাজের পিতৃতুল্য, একজন তখন ২০।২১ আর জন ৫৫।৫৬। সম্পর্কে দু'জনা সুহৃদ। হরিদা জিজ্ঞাসা করছেন এই সুরাজ, জেলে এসেছিস, যৌবনটা তো এখানেই খোয়ালি। কখনো কবিতা লিখেছিস?

সঙ্গত উত্তর হ'ত—'যৌবন বিষম কাল', জেলই সে পক্ষে নিরাপদ।

সুরাজও চৌকোস, বুদ্ধিতে ও কথায়, "কবিতা? পদ্য? গদ্য লিখতে পারি না বলে ক্লাশে প্রমোশন পেতে কত কষ্ট হ'ত। আমার মাথায় লাঠি মারলেও পদ্য বেরুবে না!"

"তবে? —প্রেম করেছিস?"

"প্রেম! আপনাদের জ্বালায় সময় পেলাম কই? বরং আপনাদের শিক্ষায় জানতাম প্রেমকারীদের ঠেঙাতে হবে।"

সুরাজের কথাটা মিথ্যা নয়। 'স্বদেশী' দাদার মধ্যে হরিদা ব্যতিক্রম, রঙ্গরস বুঝতেন। কিন্তু দাদাদের অনেকে জীবনকে গ্রহণ করতেন যৌবনকে ছাঁটাই করে! স্বদেশীদের ভালোবাসতে নেই। তাই 'স্বদেশী' ভাইদেরও ওভাবে জীবন থেকে যৌবনের একটা দিক পড়ত ছুটে; 'রঙছুট যৌবন' নিয়ে চলে যেত তাদেরও দিন। জীবন গেছে জেলে জেলে। তারা যৌবনকে না দিয়েছে বিষয়কর্মে না সংসারধর্মে; ওদের না ছিল জীবনের স্বচ্ছন্দ রূপ-রস

আস্বাদনের, না অস্তিত্বের অনন্ত বিস্ময়কে স্বচ্ছন্দ রূপে উপলব্ধি করবার মতো সুস্থ অবকাশ। '...They gave their youth...their immortality.' অবশ্য স্বরাজ ও স্বাধীনতায় আলোড়িত সেই যৌবনকে দু'-চারজন একটা সামগ্রিক শ্রীতে প্রতিষ্ঠিত করতেও পেরেছেন। তাঁরা জানিয়ে গিয়েছেন—দেশ স্বাধীন করতে হলে আনন্দমঠের 'সন্তান'দের মতো নারীমুখ অদর্শনীয় নয়। আনন্দ-মঠই তো জানিয়ে দিয়েছে—পৃথিবীতে নারী বলে প্রাণী আছে, নারীরা বড় জীবন্ত সত্য, কোনো পুরুষের পক্ষে তা অজ্ঞাত নয়। সুন্দরী-অসুন্দরী যা'ই হোক তারা, ক্ষণে ক্ষণে তাদের সঙ্গে প্রেমে না পড়ে উপায় আছে ভবানন্দ জীবানন্দদের? আর কবিতা? আমি তো পদ্য লিখেছি মহাবলীপুরম্-এর যুধিষ্ঠির রথের শিলাবতীরানীকে দেখে; 'তাম্বুলকরঙ্কবাহিনী' নামে একটা নামও দিয়ে ফেলেছিলাম। তা আবার পুলিশের হাতে পড়ে, তাদের ভাবিয়ে তোলে কে এই তাম্বুলকরঙ্কবাহিনী? কী তার ঠিকানা? কিন্তু তখন আমিই কি তার ঠিকানা জানতাম? তবে পথে পথে প্রতিনিয়ত তাকে দেখেছি, আর ক্ষণে ক্ষণে প্রেমে পড়েছি। কখনো না কখনো তার ঠিকানা জানব আশা করছি; চাই কি, যৌবনের জয়টীকাও তখন জুটে যাবে।

আশায় আছি, এমন সময়ে সেই এপ্রিলের প্রত্যূষে (২৪-এপ্রিল, ১৯৩২) পরোয়ানা নিয়ে এসে গেল পুলিশ,—আমার যৌবন পেল রাজটীকা।
